

আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে ইতিহাস, মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ: পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ]

গবেষক: মহম্মদ সামসুর রহমান

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা: A00BE1401618

নিবন্ধীকরণের তারিখ: 21.12.2018

তত্ত্বাবধায়ক: ড. বরেন্দ্র মণ্ডল

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

২০২৪

CERTIFIED THAT THE THESIS ENTITLED

‘আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে ইতিহাস, মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ: পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ’

submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Barendu Mandal, Professor, Department of Bengali, Jadavpur University.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the Supervisor:

Dated:

Candidate:

Dated:

গবেষণা পদ্ধতি

‘আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে ইতিহাস, মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ: পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ’— শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নির্মাণের জন্য নিম্নলিখিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- প্রাথমিক পর্যায়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচনের পর বিষয়ের অভিমুখ অনুযায়ী আকর গ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থ, সহায়ক পত্র-পত্রিকা, আর্কাইভাল ও বৈদ্যুতিন তথ্য (আন্তর্জালিক তথ্য) সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই কারণে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, ওয়েবসাইট ও সংগৃহীত গ্রন্থাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।
- সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে প্রস্তাবনা, ভূমিকা, বিষয়ানুগ পাঁচটি অধ্যায়, তিনটি অধ্যায়ের তিনটি পৃথক পরিচ্ছেদ, উপসংহার, পরিশিষ্ট, গ্রন্থপঞ্জি— এইরকম বিভাজনে বিন্যস্ত করা হয়েছে।
- গবেষণার সুবিধার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী তুলনামূলক পদ্ধতি, পাঠ্য-বিশ্লেষণ ভিত্তিক পদ্ধতি এবং কোথাও কোথাও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।
- সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বাংলা ভাষায় (প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সমূহের একাংশ ব্যতিরেকে) অত্র সফটওয়্যারের কালপুরুষ ফন্টে ১৪ পয়েন্টে লিখিত হয়েছে। দুটি লাইনের মধ্যে দূরত্ব রাখা হয়েছে ১.৫।
- উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিচিহ্ন বর্জন করা হয়েছে। পরিবর্তে উদ্ধৃতাংশগুলি ১২ পয়েন্টে ইনডেন্ট করা হয়েছে। উদ্ধৃতি ছাড়া সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভ-এ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
- গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের ক্ষেত্রে MLA হ্যান্ডবুকের সপ্তম সংস্করণ-এর মান্য পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা	i-vi
ভূমিকা	১-১১
প্রথম অধ্যায়: ইতিহাস, মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ ও বাংলা কথাসাহিত্য	১২-৫৯
দ্বিতীয় অধ্যায়: ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ: আবুল বাশারের আখ্যানভূবন	৬০-১৯৩
ক. উপন্যাসে ইতিহাস প্রসঙ্গ	
খ. ছোটগল্পে ইতিহাস প্রসঙ্গ	
তৃতীয় অধ্যায়: আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে ইসলামিক মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ	১৯৪-৩৭০
ক. উপন্যাসে ইসলামিক মিথ-পুরাণ	
খ. ছোটগল্পে ইসলামিক মিথ-পুরাণ	
চতুর্থ অধ্যায়: ইহুদি ও খ্রিস্টীয় মিথ-পুরাণ: আবুল বাশারের কথাসাহিত্য	৩৭১-৪৪১
ক. উপন্যাসে ইহুদি ও খ্রিস্টীয় মিথ-পুরাণ	
খ. ছোটগল্পে ইহুদি ও খ্রিস্টীয় মিথ-পুরাণ	
পঞ্চম অধ্যায়: আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে নবমিথ নির্মাণ	৪৪২-৪৭২
উপসংহার	৪৭৩-৪৭৭
পরিশিষ্ট-১. আ. বা. সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি ও উর্দু শব্দের তালিকা	৪৭৮-৫১১
পরিশিষ্ট-২. আবুল বাশারের সাক্ষাৎকার ও আলোকচিত্র	৫১২-৫৩৩
গ্রন্থপঞ্জি	৫৩৪-৫৫০
ক. আকরগ্রন্থ	
খ. সহায়ক বাংলা গ্রন্থ	
গ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ	
পত্র-পত্রিকাপঞ্জি	৫৫১-৫৫২
অভিধানপঞ্জি	৫৫৩
বৈদ্যুতিন তথ্যপঞ্জি (অন্তর্জাল সূত্র)	৫৫৪-৫৫৫

প্রস্তাবনা

মিথ-পুরাণ— মানবসভ্যতার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভারতীয় পুরাণ বা বিদেশি পুরাণ— বিশ্বাসের উপরিসৌধের গমকে ধর্ম পরিচয়-ই ইদানীং হয়ে উঠেছে মানুষের আত্মপরিচিতির মূল আয়ুধ। মানুষের বড়ো হয়ে ওঠার পরিবেশ ও প্রতিবেশের সঙ্গে ধর্মীয় মিথ-পুরাণের মধ্যকার সম্পর্কটি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় পুরাণ, বিশেষত হিন্দু পুরাণে বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রাধান্য স্বীকৃত, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের আব্রাহামিক ধর্মগুলি (ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম) একেশ্বরবাদী ধর্ম। আরব মরুভূমির বুকে সৃষ্ট এই তিন ধর্মের ঐশ্বরিক গ্রন্থগুলির আন্তঃসংযোগ ও দ্বন্দ্বের জায়গাটি ভারী মজাদার।

আমাদের পরিবার ছিল ইসলামি পুরাণ-মুগ্ধতায় ভরপুর। বাংলা শিশুসাহিত্যের কোনো পুস্তক সেখানে ঠাঁই না পেলেও ইসলামি পুরাণ বিষয়ক বইয়ের সম্ভার ছিল অফুরন্ত। প্রবল বিশ্বাস এবং পুণ্যের লোভে সে বই পড়ার আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না তখন। শৈশব-কৈশোরের মনে কোনো অনুসন্ধিৎসা ছিল না, ‘পুরাণের কাহিনির পবিত্রতা রক্ষা এবং নিঃসন্ধিগ্ন হৃদয়ে তার প্রতি অবিচল থাকা’— এই ছিল আমাদের মতো ‘গ্রামীণ মুসলমান সমাজে’র শিশুদের বড়ো হয়ে ওঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ইসলামি কথা-কাহিনি সম্পর্কে অবগত হওয়ার ফলে পরবর্তীকালে সেই পুরাণের পুনর্কথন-মূলক গল্প-উপন্যাস পড়তে পড়তে নতুন করে মুগ্ধ হই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাকাহিনির প্রতি অবিশ্বাস-সংশয় বেড়েছে, যুক্তির বোধ পুরাকথার গল্পকে মহৎ সাহিত্য হিসাবেই দেখতে চেয়েছে। বস্তুত, বিশ্বাসের সপক্ষে প্রামাণ্য দলিল না থাকলেও সেই

কাহিনির প্রতিটি অনু-পরমাণু প্রতিনিয়ত ভাবায়। আসলে ধর্ম তো শুধু ধর্ম নয়, তা মানুষ ও তার সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাসও। অতীতের অলিগলির চোরাস্রোতে ভেসে যাওয়া স্মৃতিরা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি থেকে উত্থিত পুরাণের কাহিনি নিয়ে বাংলা গল্প-উপন্যাস রচিত হতে পারে, ইতোপূর্বে ভাবিনি কখনও। সেই পুরাণকথা-ই আমায় টেনে নিয়ে এল গবেষণার জগতে।

গবেষণা-জীবনে যাঁদের সান্নিধ্য না পেলে কোনোভাবেই আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ সমাপ্ত করতে পারতাম না তাঁদের প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই। শুরুতেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি আমার বাবা প্রয়াত মহম্মদ হাবিবুর রহমানের কথা। তাঁর কাছেই ইসলামি পুরাকাহিনির হাতেখড়ি বলা যায়। যাঁর আত্মা ছিল ইসলামি গল্পকথার আকর। তাঁর দৌলতেই শৈশব-কৈশোরের দিনগুলিতে ইসলামি পুরাণকথার অজস্র বাংলা গ্রন্থ পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার মা মোসলিমা বেওয়া, নিতান্ত একজন গ্রামীণ গৃহবধূ অথচ তাঁর সমগ্র জীবনটাই ইসলামি কোরান-হাদিস পাঠ ও পুণ্য-সঞ্চয়ের পথেই ধাবিত। ধর্মীয় পরিমণ্ডল ও শরিয়তি আইনকানুনের খাসতালুক এমন পরিবারে বেড়ে ওঠার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম হরেকরকম আরবি-ফার্সি শব্দ ও পরিভাষার। ধর্মসভা বা জলসার অনুষ্ঠান কিংবা খুৎবা-ওয়াজ-নসিহত-এ ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি শব্দ বা ইসলামি পরিভাষার সঙ্গে আজন্ম পরিচিত বলেই তার আভিধানিক অর্থ-বুৎপত্তি অজানা থাকলেও ব্যবহারিক জীবনে প্রায়োগিক নিয়মের ব্যত্যয় হয়নি কখনও। আমার দাদা, বিশেষত হাফিজ জিয়াউর রহমান, ইসলামি পুরাণের আকর গ্রন্থ কোরান বিষয়ক যাঁর জ্ঞান অপরিসীম, সমগ্র কোরান যাঁর কণ্ঠস্থ, তাঁর কাছে কোরানের ঘটনাবলীর পুঞ্জানুপুঞ্জ বিবরণ ও তার সূত্র-সন্ধান পেয়েছি। এছাড়া পরিবারের সবার কাছেই আমি ঋণী। তাঁরা সবসময় পাশে ছিলেন, সাহস

দিয়েছেন। তাঁদের সকলকে নতুন করে কৃতজ্ঞতা কী জানাব! আজন্ম ঋণী আমি তাঁদের কাছে, এ ঋণ অপরিশোধ্য।

আমার গবেষণা উপদেশক সমিতির সদস্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শম্পা চৌধুরী এবং তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. ঈঙ্গিতা হালদার মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের সুচিন্তিত মতামত আমার গবেষণার কাজে প্রভূত সহায়তা করেছে, তাঁদেরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস সংক্রান্ত বইপত্রের হৃদিশ দিয়ে সহায়তা করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. অমিত দে। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বিকাশকান্তি মিত্র মহাশয়কে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল কাফি, অধ্যাপক ড. রাজেশ্বর সিংহা, অধ্যাপক ড. জয়দীপ ঘোষ, অধ্যাপক ড. সেলিম বক্স মণ্ডল মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাই। হিব্রু বাইবেল ও কোরানের আন্তঃসংযোগ, লোকায়ত এবং শাস্ত্রীয় মিথ, সাতের দশকের বাংলার রাজনৈতিক সংকট ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনায় আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি।

নানান বইপত্র ও মূল্যবান মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ পাণ্ডা, অধ্যাপক ড. নির্মাল্যকুমার ঘোষ, অধ্যাপক ড. মৃন্ময় প্রামাণিক, অধ্যাপক ড. মৃদুল হক, অধ্যাপক ড. সুরশ্রী কুণ্ডু, অধ্যাপক ড. মহর্ষি সরকার, অধ্যাপক ড. হাসনুহেনা—
এঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। *অরম্ভ* পত্রিকার সম্পাদক লালন বাহারউদ্দিন আবুল বাশারের বেশকিছু উপন্যাস জোগাড় করে দিয়েছিলেন, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আবুল বাশারের কয়েকটি উপন্যাস দিয়ে সাহায্য করেছেন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অগ্রজ গবেষক বিশ্বজিৎ ঘোষাল ও অনুজ গবেষক মৌলিকা সাজোয়াল, মিথ-পুরাণ-ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনা করে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন অগ্রজ গবেষক ও বন্ধু দিব্যেন্দু দলুই। এঁদের সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাই। ভালোবাসা জানাই গবেষক ও বন্ধু রিয়া মুখার্জি, সুরঞ্জনা দাস, অর্পণ নস্কর, মৌমিতা দাস, সৃজিতা সান্যাল, অলোক সরকার, বিশ্বজিৎ সর্দার, আমির সোহেলকে। শাহ্‌যাদ ফিরদাউসের দুটি উপন্যাস জোগাড় করে দিয়েছিলেন বন্ধু অরিত্রি দে, বেশকিছু রাজনৈতিক নিবন্ধের সন্ধান দিয়েছিলেন বাংলা বিভাগের অনুজ ছাত্র মোস্তাক আহমেদ মোল্লা। এঁদের সকলকেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আই.এ.সি.এস-এর রসায়নবিদ্যার ভূতপূর্ব গবেষক ও বন্ধু দেবব্রত হালদারকে ভালোবাসা জানাই। মিথের সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্তর্বিরোধ সংক্রান্ত তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা গবেষণার কাজে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

প্রফ দেখা এবং প্রযুক্তিগত কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন বাংলা বিভাগের অনুজ গবেষক ও বন্ধু মহ. সাইয়াকুল সেখ ও পৌষালী হালদার। এঁদের দুজনকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও সতত শুভেচ্ছা।

সবশেষে যাঁর কথা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয় তিনি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. বরেন্দ্র মণ্ডল মহাশয়। আমার গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহের দিনগুলির মাঝেই বিশ্বব্যাপী আছড়ে পড়েছিল করোনা নামক এক মারণঘাতি মহামারী। গবেষণার সমস্ত সম্ভাবনা একরকম নষ্ট করে দিয়েছিল। সেইসময় নিয়মিত খোঁজ নিয়েছেন, ভরসা জুগিয়েছেন, সাহস দিয়েছিলেন অধ্যাপক ড. বরেন্দ্র মণ্ডল মহাশয়। অজো পাড়া-গাঁয়ে বেড়ে ওঠা এক পরিবারের ‘ফাস্ট জেনারেশন লার্নার’ ছেলের কাছে এ

এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থা থেকেই বহু বইপত্র দিয়ে তিনি সাহায্য করেছেন। গবেষণার শুরুর দিনগুলি থেকে তাঁর মূল্যবান মতামত, সুপারামর্শ, গবেষণাপত্রের সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন গবেষণা কর্মে আমাকে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছে। গবেষণা সংক্রান্ত লেখালেখির পাশাপাশি প্রুফ সংশোধন, গবেষণা নির্মাণের পদ্ধতি তিনি হাতে ধরে শিখিয়েছেন। তাঁর স্নেহ-সাহচর্য থেকে কতটুকু শিখেছি, জীবনে কতটুকু তার আবেদন রাখতে পেরেছি জানি না! আদর্শ শিক্ষকের মতোই তিনি ‘অ’ থেকে ‘চন্দ্রবিন্দু’ পর্যন্ত শেখানোর চেষ্টা করেছেন, সবসময় পাশে থেকেছেন। যতটা তত্ত্বাবধায়ক ততটাই অভিভাবক তিনি। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সর্বদা তাঁর শারীরিক সুস্থতা ও কুশল মঙ্গল কামনা করি।

কথাকার আবুল বাশারকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। সাক্ষাৎকার-এর জন্য তিনি মূল্যবান সময় দিয়েছেন। তাঁর অদম্য প্রেরণা ও উৎসাহ আমার জীবনের পাথেয়। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আমি বিশেষভাবে ঋণী কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের কর্ণধার প্রয়াত সন্দীপ দত্তের কাছে। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তাঁর অকালপ্রয়াণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষকরা কী পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হলেন তা একজন গবেষক হিসাবে সর্বদা অনুভব করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগারিক আইভি আদক ও হরিশ মণ্ডল মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাই। গবেষণার কাজে ব্যবহৃত নানান বইপত্র জোগান দিয়ে তাঁরা প্রভূত সহায়তা করেছেন। তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেকশন এবং পিএইচ.ডি সেল-এর আধিকারিক
ও কর্মচারীদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই গবেষণার প্রযুক্তিগত দিকগুলিকে সুষ্ঠুভাবে
সম্পন্ন করার জন্য।

কৃতজ্ঞতা জানাই পুরা-পৃথিবীর সেইসব চিন্তক ও স্রষ্টাদের যাঁরা প্রকৃতি-অলৌকিক
ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মানুষের সমাজ-জীবনের ইতিহাসকে গ্রহিত করেছিলেন।

গবেষণার অন্তর্গত ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং গ্রন্থ সংশোধনের ক্ষেত্রে বিধিসম্মত
সর্তকতা অবলম্বন সত্ত্বেও যদি কিছু মুদ্রণ এবং বানানগত অসাবধানতা থেকে যায়, তার
জন্য গবেষক আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

যাদবপুর
ডিসেম্বর, ২০২৪

মহম্মদ সামসুর রহমান
(গবেষক)

ভূমিকা

ভারতীয় আখ্যানের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। গল্প থেকে গল্পান্তরের দিকে যাত্রা, গল্প ভেঙে নতুন গল্প নির্মাণ, এক গল্পের সঙ্গে অন্য গল্পের সমন্বয়— মানুষ ও তার সভ্যতার ইতিহাস ও আখ্যানের সূচনার ধারাটি এমনই। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্য নির্বাচিত আধুনিক আখ্যানগুলিকেও আমরা মূল গল্পের কাঠামোর সঙ্গে আন্তঃসংযোগ ও অন্তর্বিরোধের স্থানটি যথাসম্ভব নির্ধারণ করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। কোনো তাত্ত্বিক পরিসরে রেখে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়নি। ‘পরিগ্রহণ’— বলতে ধর্মীয় মিথ-পুরাণের ‘Adaptation’ বা ‘Reception’— উভয়ই বোঝানো হয়েছে। ‘Adaptation’— মূলত পুরাণের মূল কাহিনির বিন্যাস বা বিষয়বস্তু গ্রহণ করে রচিত আখ্যান। ‘Reception’- বা প্রতিগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো কাহিনির মূল কাঠামোর সবটা গৃহীত হওয়ার পরেও কোনো ‘আইডিয়া’ বা ‘ধারণা’-কে মহিমাম্বিত করা হয়। পরিগ্রহণ এবং প্রতিগ্রহণের মধ্যে দিয়ে পুরাণের মূল কাহিনির পুনর্বিন্যাস, পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ ঘটে, কখনও মূল কাহিনি ভেঙে প্রতিষ্ঠিত হয় নবমিথের।

আমাদের আলোচিত বিদেশি মিথ-পুরাণের কাহিনিগুলি হিব্রু-আরামাইক বা আরবি ভাষায় গ্রন্থিত হলেও তা অনুদিত হয়ে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। বহুভাষিকতার ক্ষেত্রে বহু সময় মূল কাহিনির অনেক অংশ মিথে রূপান্তরিত হয়েছে এবং অঞ্চলভেদে গল্পের ‘প্যাটার্ন’ বদলে গেছে। বিশেষত, বাংলায় মুসলমান শাসকদের হাত ধরে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটলেও পরবর্তীকালে মধ্যপ্রাচ্যের সুফি-দরবেশদের আগমনের পর লৌকিক ইসলামের বহু গল্পকথা বাংলার সমন্বয়ী সংস্কৃতির জল-হাওয়ায় বড়ো হওয়া পালা ও কিস্সার সঙ্গে মিশেছিল। যার সঙ্গে কোরান-হাদিস সম্বলিত শরিয়তি ইসলামের দ্বন্দ্ব-

সংঘাত ক্রিয়াশীল। এই পর্যায়ে বাউল ও ফকিরপন্থা, পিরপূজা বা কবরপূজার সঙ্গে শরিয়তি ইসলামের বিরোধ অবশ্যাস্তাবী হয়ে উঠেছিল শুরু থেকেই। বস্তুত, মানুষের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বুদ্ধিমত্তা, জাত্যাভিমান, ধর্মীয় পরিচিতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য— এসবই আধিপত্যবাদের হরেকরকম স্তর। মিথ-পুরাণের তলদেশে প্রতিস্থাপিত ক্ষমতার স্বর ও প্রতিস্বর-এর দ্বন্দ্বকে আখ্যানের ঘটনাক্রম ও প্রবণতার মধ্যে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি আমরা।

আমাদের আলোচনার বীক্ষণবিন্দু— ইহুদি, খ্রিস্টীয় এবং ইসলামি পুরাণ হলেও ‘পুরাণ’ শব্দটি দ্বারা মূলত পুরাকালের গল্প বা আখ্যানকে বোঝানো হয়েছে। উল্লেখিত তিনটি ধর্মই মধ্যপ্রাচ্য থেকে সৃষ্ট ‘আব্রাহামিক’ ও ‘সেমেটিক’ ধর্ম নামে পরিচিত। আব্রাহামিক ধর্ম বলা হয় কারণ প্রতিটি ধর্মই আব্রাহামকে তাদের ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূর্বপুরুষ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। অন্যদিকে ভাষাগত ঐতিহ্যের কারণে সেমেটিক ধর্ম নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ইহুদি ধর্মের প্রাথমিক ভাষা হিব্রু, খ্রিস্টান ধর্মের প্রাথমিক ভাষা আরামাইক এবং ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক ভাষা আরবি— এগুলি সেমেটিক ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। পাশাপাশি তিনটি ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ সেমেটিক লিপিতে লেখা হয়েছিল। এবং ধর্মগুলি প্রধানত সেমেটিক জনগোষ্ঠীর প্রভাবে উদ্ভূত। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের নাম *তানাখ*। প্রধান নবিদের কাহিনি নিয়ে রচিত ২৪টি পুস্তক হল *তানাখ*। এছাড়া ২৪ জন গৌণ-নবিদের বইগুলিও *তানাখ*-এর অন্তর্ভুক্ত। ‘তানাখ’— শব্দটি তিনটি হিব্রু অক্ষর দিয়ে গঠিত। যথা—

ত (Torah) - আইন বা শিক্ষা।

ন (Nevi'im) - নবিদের বই।

খ (Ketuvim) - পবিত্র লেখা।

পবিত্র বাইবেলের ‘পুরাতন নিয়ম’ (Old Testament)-এর অন্তর্গত প্রথম পাঁচটি পুস্তক হল—

১. ‘আদিপুস্তক’ (Book of Genesis),
২. ‘যাত্রাপুস্তক’ (Book of Exodus),
৩. ‘লেবীয় পুস্তক’ (Book of Leviticus),
৪. ‘গণনা পুস্তক’ (Book of Numbers),
৫. ‘দ্বিতীয় বিবরণ’ (Book of Deuteronomy)

ইহুদিরা এই পাঁচটি খণ্ডের সমন্বয়কে বলে ‘তোরাহ্’ এবং খ্রিস্টানরা একে বলে ‘পেন্টাটিউক’ (Pentateuch)। ‘পেন্টাটিউক’— শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ ‘পাঁচটি বই’। ইহুদি ও খ্রিস্টীয় পুরাণ-মিশ্রিত আখ্যানের আলোচনা সূত্রে পবিত্র বাইবেলের সমগ্র অংশটির ইংরেজি ও বাংলা উভয় অনুবাদ ব্যবহার করা হয়েছে এবং ইহুদি কিংবদন্তি বা লোকায়ত মিথনির্ভর গ্রন্থগুলিও অনুসরণ করা হয়েছে।

ইসলাম পুরাণের আকরগ্রন্থ *কোরান*। ১১৪-টি সূরা (আধ্যায় বা পরিচ্ছেদ বা খণ্ড) নিয়ে গঠিত হয়েছে *কোরান*। প্রতিটি সূরা সৃষ্টির কারণ হিসাবে এক বা একাধিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যা সূরা রচিত হওয়ার প্রেক্ষাপট বা ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে। আরবি ভাষায় একে ‘শানে নুযুল’ বলা হয়। ইসলামি পুরাণের অন্যান্য আকরগ্রন্থগুলি হল হাদিস-সমূহ, ইসলামি ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি, নবিদের জীবনীমূলক গ্রন্থ বা ‘কাসাসুল আশ্বিয়া’। ইসলাম ধর্ম মতে, *কোরান* এবং হাদিস প্রামাণিক গ্রন্থ। *কোরান* স্বয়ং আল্লাহর বাণী এবং হাদিস নবি-পয়গম্বর হজরত মুহম্মদের বাণী ও উপদেশ। ইসলাম

ধর্মের প্রধান ও অপ্রধান হাদিসগুলির মধ্যে প্রধান ৬-টি বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থগুলি হল—

১. সহি বুখারি— ইমাম বুখারি কর্তৃক সংকলিত।
২. সহি মুসলিম— ইমাম মুসলিম কর্তৃক সংকলিত।
৩. সুনানে আবু দাউদ— ইমাম আবু দাউদ কর্তৃক সংকলিত।
৪. সুনানে তিরমিজি— ইমাম তিরমিজি কর্তৃক সংকলিত।
৫. সুনানে নাসাই— ইমাম নাসাই কর্তৃক সংকলিত।
৬. সুনানে ইবনে মাজাহ্— ইমাম ইবনে মাজাহ্ কর্তৃক সংকলিত।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ হাদিস গ্রন্থগুলি হল— ‘মুসনাদে আহমাদ’ (ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কর্তৃক সংকলিত), ‘মুসনাদে আবু হানিফা’ (ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক সংকলিত) ইত্যাদি। অধিকাংশ হাদিসই হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পরে সংকলিত হয়েছিল। এরফলে আসল ও নকল হাদিসের বিভাজনরেখা হাদিস অনুসরণকারীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে প্রায়শই। বহু ‘জাল হাদিস’ যা হজরত মুহম্মদের বাণী বলে প্রচার করা হয়। শরিয়তি ইসলাম এ হাদিসগুলিকে মান্য করে না। ‘কাসাসুল বা কিসাস উল-আম্মিয়া হল’— ইসলামি পুরাণে নবি এবং রসুল হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিদের জীবনের গল্পের একটি সংকলন যা তাফসির (কোরানের ব্যাখ্যা)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কাসাসুল শব্দের আরবি অর্থ হল গল্প এবং আম্মিয়া হল নবি শব্দের বহুবচন। যার অর্থ নবিগণ। ইসলাম অনুসারীদের মতে, ইসলাম পৃথিবীর আদি ধর্ম, ইহুদি-খ্রিস্টসহ একাধিক ধর্মের উৎসস্থল ইসলাম। আমরা ধর্মীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে ইতিহাসগত দিক থেকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি। নির্বাচিত গল্প-উপন্যাসের বয়ানের সাপেক্ষে ইসলামি ধর্মীয় পুরাণের কাহিনিকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে।

আখ্যানের পথ ধরে আমাদের আলোচনার প্রেক্ষাপট ছিল প্রধানত গ্রামীণ মুসলিম জনমানস। পাশাপাশি তাদের আচার-সংস্কার, শরিয়ত নির্দেশিত প্রথা ও আইন এমন বিবিধ বিষয় আলোচনার সূত্রে বাঙালি মুসলমানের ব্যবহৃত কিছু শব্দ-পরিভাষা বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে ব্যবহার করা হয়নি। ইসলাম ধর্ম বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ (মূল ও অনুবাদ)-এ কোরানের সুরা ‘অবতীর্ণ’ বা ‘নাজিল’ হয়েছে বলা হয়, তার পরিবর্তে আমরা ‘রচিত’ শব্দটির উপর জোর দিয়েছি। ইসলাম ধর্মের প্রধান পুরুষ হজরত মুহম্মদের জীবন ও কার্যাবলি সম্পৃক্ত নানাকাহিনির উল্লেখ থাকলেও আখ্যানের সাপেক্ষে তার আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কথাকার আবুল বাশার তাঁর কথাসাহিত্যে ইতিহাস এবং পুরাণের পাশাপাশি উপকথা, কিংবদন্তি ও লোককল্পনার বিবিধ উপাদানকে সমকালীন সময়ের সঙ্গে একীভূত করে তুলেছেন। ইহুদি পুরাণের প্রতিটি চরিত্রই তাঁর আখ্যানে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে হাজির হয়েছে। *হিব্রু বাইবেল*-এর ঈশ্বর কূটনীতিজ্ঞের মতো ভাষার বিভাজন ঘটিয়েছিলেন, সেই পৌরাণিক উপাখ্যানকে লেখক আধুনিক মানুষের বিচ্ছেদ-প্রবণ মানসিকতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। লেখকের বয়ানে, ভাষা এবং ধর্ম— সভ্যতার বাহন হলেও এই দুটি জৈবনিক উপাদান কেবল আজকের ভারতবর্ষেই নয়, প্রাচীন দুনিয়াতেও মানুষকে বিচ্ছিন্ন, দগ্ধ এবং যুদ্ধলিপ্ত করেছিল। আদম-ইভের বিচ্ছেদ ব্যক্তিগত ট্রাজেডি হলেও মরুভূমির মানুষের ভাষা-বিচ্ছেদ ছিল সামাজিক ও গোষ্ঠীগত সংকট। এই ছিন্নতা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে আধুনিক মানুষের শোণিতে। বিশেষত, ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্ম ও ভাষা সংকট এবং পরবর্তীকালে অখণ্ড রাষ্ট্র ভেঙে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ক্ষমতাশীল মানুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের লড়াই— সমকালীন বহু ঘটনাবলীকে স্পর্শ করেছে লেখকের আধুনিক আখ্যান। আখ্যানকার জানিয়েছেন, ‘মরুস্বর্গের বীজ দাদিমায়ের

দান— মূলত রাজাবলি, তাঁরই উপহার— দাদিমায়ের আত্মা ছিল পুরাণ-মুগ্ধ।’ *হিব্রু বাইবেল* থেকে কাহিনি গৃহীত হলেও কথাকার তাঁর স্মৃতির তলদেশে জমে থাকা অতীত পৃথিবীর গল্পকেই উপন্যাসে প্রতিস্থাপন করেছেন— এদিক থেকে তাঁর পুরাণ-মিশ্রিত উপন্যাস কেবল পুরাণের প্রতিগ্রহণ নয়, তা পুরাণের পুনর্কথনও বটে। তাঁর আখ্যানের পৌরাণিক উপাদান একালের সমাজ-জীবনের সঙ্গে প্রতীকী অর্থে উঠে এসেছে। *হিব্রু বাইবেল*-এর ঈশ্বর আখ্যানে আরও বেশি রক্তমাংসের ঈশ্বর হয়ে উঠেছেন। *রাজাবলি*-র ঈশ্বর রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আরবি বর্ণমালার প্রথম অক্ষর আলিফ (ا) দেখতে লাঠির মতো। প্রাচীন পৃথিবীর মরুতে লাঠি পুঁতেই মানুষ মাটি দখল করত। আবুল বাশারের মতো দ্রষ্টা কথাকার পুরাণ-প্রতীকির সময়োচিত পুনর্নির্মাণ করে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত অতীতের কৃষক ও যাযাবরগোষ্ঠী এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক-ধর্মীয় মৌলবাদ প্রসূত জনগোষ্ঠীর চেতনাবিশ্বকে তাৎপর্যবহ করে তুলেছেন। ‘আদিপুস্তক’-এর ঈশ্বর জাদুময়, অলৌকিক এবং ঐন্দ্রজালিক হলেও মানুষের সঙ্গে তার মল্লযুদ্ধের ঘটনা, যেখানে ঈশ্বর অবধি আঘাতপ্রাপ্ত হন। অন্যদিকে, ইসলামি পুরাণের ‘খোদার দুশমন’ আজাজিলের স্পর্ধিত মনের প্রকৃতি যেন ক্ষমতার সর্বোচ্চ নিয়ামক ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী বয়ানকে স্পর্শ করেছে। অথচ পুরাণই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এর ফলস্বরূপ ইবলিশ অনন্তকাল নরক ভোগ করবে। আসলে প্রতিস্বর একটা ধাক্কা দিতে পারে, ক্ষমতাকে তছনছ করার শক্তি তার নেই। ইবলিশ বা শয়তানের ট্রাজিক পরিণতি সদর্পে ঈশ্বরের জয়ঘোষণা করলেও *মরুস্বর্ণ*-এর সাদইদকে কথাকার চিরাগত কথকতার আদল ভেঙে সাধারণ মানুষের ভরসা, প্রেরণা ও বিশ্বাসের আশ্রয়ের আধেয় করে তুলেছেন। সাদইদের সঙ্গে ঈশ্বরের নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্ঘাতে তার স্বপ্ন চুরমার হলেও উপন্যাসের সাদইদ বিভেদ ও সংঘর্ষের পৃথিবীতে মানবতার বন্ধন রচনা

করতে বদ্ধপরিকর। আমরা গল্প-উপন্যাসের বিশ্লেষণ পর্যায়ে পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্রকে সমকালের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে চেয়েছি।

ইহুদিদের *হিব্রু বাইবেল* এবং মুসলমানদের *কোরান*— এই দুই ঐশ্বরিক গ্রন্থের আন্তঃসংযোগ ও বিরোধ কয়েক হাজার বছরের পুরানো। নির্বাচিত গল্প-উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে দুই পুরাণের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় এবং আন্তঃসংযোগের বিষয়টি পাঠকের কাছে পরিচ্ছন্ন করার নিমিত্তে বহুস্থানে *কোরান*-এ বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে। অনেক উপন্যাসের চরিত্ররা ‘আদিপুস্তক’-এর চরিত্র, ‘আদিপুস্তক’-এর কাহিনি নিয়েই সেইসব উপন্যাস রচিত। বর্ণিত পৌরাণিক চরিত্রদের ঈশ্বর প্রেরিত দূত কিংবা রক্তমাংসের মানুষ যেভাবেই দেখিয়েছে ‘আদিপুস্তক’, সেভাবেই পৌরাণিক ঘটনা এবং কাহিনির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনার মধ্যে কোথাও *কোরান*-এর বিরোধিতা বা অপব্যাখ্যা করা হয়নি। *হিব্রু বাইবেল*-এর সঙ্গে *কোরান*-এর আন্তঃসংযোগ ও দ্বন্দ্বিকতার সৃষ্টি হয়েছে ‘শিশুবধ্য’ ও ‘পশুবধ্য’ মরুতে আব্রাহাম ও তার শিশুপুত্র ইস্রায়েলকে ‘উৎসর্গ’-এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে। দুই পুরাণের এই সংযোগ এবং বিরোধের স্থানটিকে বেছে নিয়ে কথাকার পুরাণ ও উপন্যাসের আকাজক্ষা ও স্বপ্ন-সম্ভাবনার জমি প্রস্তুত করে উপেক্ষিত চরিত্রকেই মহিমান্বিত করে তুলেছেন। ‘আদিপুস্তক’-এ ঈশ্বরের নির্দেশে আব্রাহামের উৎসর্গের সম্মান পেয়েছে তার পুত্র ইসহাক, ইস্রায়েল ছিল দাসীপুত্র, অতএব সে পরিত্যাজ্য। আবার ‘আদিপুস্তক’ রচিত হবার প্রায় চার হাজার বছর পর ইসলামি পুরাণে ইসমাইল (*হিব্রু বাইবেল*-এর ইস্রায়েল) মহান হয়ে উঠেছেন, সেইসঙ্গে হজরত মুহম্মদ ইসমাইলকে নির্বাচন করেছেন তাঁর ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূর্বপুরুষ হিসাবে। যেখানে *হিব্রু বাইবেল* আব্রাহাম ও দাসী ইগারের পুত্র ইস্রায়েলের প্রজন্ম পরম্পরা সম্পর্কে নীরব, সেখানে *কোরান* তাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ

করেছে। কোরান এবং আখ্যানের অন্তর্ভবন-এ ইস্রায়েল বা ইসমাইলকে গৌরবময় করার পেছনে সূক্ষ্ম তফাৎ রয়েছে, কোরান ইসমাইলকে দাসীপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেনি, ইব্রাহিম (হিব্রু বাইবেল-এ আব্রাহাম) ও দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার পুত্র রূপে গ্রহণ করেছিল। পক্ষান্তরে, আখ্যানে কথাকার দাসীপুত্র ইস্রায়েলকেই মহৎ করে তুলেছেন। আবুল বাশারের কৃতিত্ব এখানেই। মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়ার খেলায় তিনি ইহুদি এবং ইসলামি পুরাণে উপেক্ষিত, নিন্দিত ও অভিশপ্ত চরিত্রদের আখ্যানে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইহুদি পুরাণের বয়ানের মতোই তাঁর গল্প-উপন্যাসে দেবতারাও দোষেগুণে চিত্রিত। আমাদের অস্বিষ্ট ছিল ইহুদি ও ইসলামি পুরাণের ভেদরেখা স্পষ্ট করে আখ্যানের দৃষ্টিভঙ্গিকে যৌক্তিক শৃঙ্খলায় বিশ্লেষণ করে ঘটনাবল্ল মরুমর্ত্যের বস্তু ও কল্প ইতিহাস, পৌরাণিক ও কল্পিত চরিত্রের সমন্বয় সাধন করা। পরোক্ষভাবে সমকালীন সময় ও স্মৃতিস্তর সঙ্গ্রে তার যোগসূত্রের ইঙ্গিত এবং অন্যান্য কথাকারদের পাশাপাশি আবুল বাশারের সৃজন অনুভূতির ‘সাবলাইম’ বোধ অনুসন্ধানই ছিল আমাদের গবেষণার সংকল্পিত উদ্দেশ্য।

‘আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে ইতিহাস, মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ: পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ’— শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটির ভূমিকা, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি, পরিশিষ্ট বাদ দিলে মূল গবেষণাটি প্রধানত পাঁচটি অধ্যায় এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়গুলিকে দুটি পর্বে (উপন্যাস ও গল্প) ভাগ করা হয়েছে। নিম্নে অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় জ্ঞাপন করে আমরা কোন অধ্যায়ে কী বিষয়ক আলোচনা করেছি তা বলার চেষ্টা করেছি।

‘ইতিহাস, মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ ও বাংলা কথাসাহিত্য’— শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে মিথ-পুরাণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পাশাপাশি ইতিহাস, মিথ-পুরাণ— এই তিনের আন্তঃসম্পর্ক ও বিরোধের জায়গাটি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতীয় পুরাণ ও

বিদেশি পুরাণের সমন্বয় ও দ্বন্দ্বের স্থানটি যথাসম্ভব নির্ণয় করার চেষ্টা করে মিথ-পুরাণ সৃষ্টির নেপথ্যে ক্ষমতার স্বর ও প্রতিস্বরের যে আখ্যান তা ইতিহাস ও পৌরাণিক উপাদান থেকে সংগ্রহ করে বিষয়টি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিহাস থেকে পুরাণ সৃষ্টি, মিথ থেকে পুরাণের সৃষ্টি ও পুরাণ থেকে মিথের জন্ম— কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে ইতিহাস ও পুরাণের যোগসূত্র এবং বিবর্তনের রেখাচিত্রকে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতীক, আর্কেটাইপ, টোটেম, ট্যাবু, কিংবদন্তি, লিজেভ ইত্যাদি বিষয়গুলির বীক্ষা মিথ সৃষ্টির পেছনে কেমন ভূমিকা পালন করে তা সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সবশেষে বিজ্ঞানের সঙ্গে মিথ-পুরাণের দ্বন্দ্বিকতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পর্বে আমরা এগারো জন কথাকারের নির্বাচিত গল্প-উপন্যাসে ব্যবহৃত ইহুদি ও ইসলামি মিথ-পুরাণের বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি বাংলা কথাসাহিত্যে বিদেশি পুরাণের পরিগ্রহণের ক্রমিক বিবর্তন ও প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি।

‘ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ: আবুল বাশারের আখ্যানভুবন’— শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইতিহাস ও গল্প-আখ্যানের সমন্বয় ও দ্বন্দ্বিকতাকে ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি কথাকার আবুল বাশার কীভাবে ইতিহাসের উপাদান গ্রহণ করেছেন, ইতিহাসের কোন সময়কে তিনি ব্যবহার করেছেন এবং সেই সময়ের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের যোগসূত্র ইত্যাদি বিষয়গুলি নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি। আমাদের নির্বাচিত গল্প-উপন্যাসগুলিতে মূলত বিশ শতকের সাতের দশক থেকে অদ্যাবধি সময়ের ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। যে সময়কে আখ্যানে নির্মাণ করা হয়েছে লেখক নিজেই কমবেশি সেই সময়ের অংশীদার ছিলেন, কাজেই লেখকের ইতিহাসমূলক আখ্যান মূলত তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সময়কে দর্শনেরই ইস্তাহার। কথাকারের ঐতিহাসিক আখ্যানের ঘটনাক্রম তাঁর কাছে এমন এক স্মৃতি, যাকে আমরা সুখের বা সদর্থক নস্টালজিয়া বলতে পারি না। তাঁর আখ্যানের চরিত্র

যেন তাঁরই খণ্ড-বিখণ্ড আত্মতা এবং আখ্যানের ঘটনাবলী সমকালীন সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক সংকট ও মানুষের নিরবচ্ছিন্ন অধিকার রক্ষারই আলেখ্য। সময়ের দলিলীকরণে বিশ্বাসী লেখকের ইতিহাস-নির্ভর আখ্যানকে এমনভাবেই আমরা পড়তে চেয়েছি।

‘আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে ইসলামিক মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ’— শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে নির্বাচিত গল্প-উপন্যাসে ব্যবহৃত ইসলামি মিথ-পুরাণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইসলামি পুরাণের উৎস হিসাবে কোরান ও হাদিস, ‘কাসাসুল আশিয়া’ জাতীয় গ্রন্থগুলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আখ্যানে প্রতিফলিত মিথ-পুরাণের ঘটনা ও চরিত্রের পর্যালোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের প্রেক্ষাপট মূলত গ্রামীণ মুসলিম জনগোষ্ঠী। আখ্যানে নির্মিত চরিত্রদের বিশ্বাস-সংস্কার, শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে লোকায়ত ইসলামের দ্বন্দ্ব, বামপন্থী রাজনৈতিক তত্ত্ব-দর্শনের সঙ্গে লোকায়ত মিথ-সঞ্চারিত সমন্বয়ী জীবনের মিলন ও বিরোধ, আরব্য-রজনীর গল্পকথা, শরিয়তি ইসলামের নির্ধারিত তালাক প্রথা, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিবাহ-বিচ্ছিন্না গ্রামীণ মুসলিম নারীর অসহায়ত্ব, যৌনতার দাসত্ববৃত্তি এবং সামাজিক যৌনশোষণ, তালাক-ইদত-তহলীলের জটিল পাকে নিরন্তর নিষ্পেষিত নারী-জীবন ও ধর্মের কূট তামাশায় ধর্মহীন পুরুষের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, সেইসঙ্গে গ্রামীণ সমাজের মোল্লাতন্ত্রের দাপট ইত্যাদি বিষয়গুলি গল্প-উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গির সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

‘ইহুদি ও খ্রিস্টীয় মিথ: আবুল বাশারের কথাসাহিত্য’— শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে নির্বাচিত আখ্যানগুলিতে মূলত হিব্রু বাইবেল ও খ্রিস্টীয় বাইবেল এবং ইহুদি কিংবদন্তি ও লৌকিক পুরাণের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। আরব মরুভূমির বুকে একাধিক ধর্মের জন্ম, তাদের মধ্যকার আন্তঃসংযোগ ও বিরোধ, মানুষের ভাষা ও ধর্মের আধিপত্যবাদী

শক্তি, নবিদের দিব্যতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সংকট, পুরা পৃথিবীর ধর্মীয় আশ্রাসন এবং পৌরাণিক ঈশ্বরের রাজনৈতিক বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, প্রতিষ্ঠিত ও বিতাড়িত মরুমর্ত্যের মানুষের আত্মিক ও অস্তিত্বের সুমস্যা-সংকুল জীবন-ব্যবস্থা, মিথোলজিক্যাল চরিত্রের পাশাপাশি লেখক সৃষ্ট চরিত্রদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদি বিষয়গুলি গল্প-উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

‘আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে নবমিথ নির্মাণ’— শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে কথাকার মূলত ইহুদি মিথ ভেঙে তাঁর আখ্যানকে পাঠককে অন্যচোখে দেখতে প্রণোদিত করেছেন। ইহুদি পুরাণে পরিত্যাজ্য, উপেক্ষিত, নিন্দিত ও অভিশপ্ত চরিত্রদের আখ্যানে মহিমাস্বিত করে তুলেছেন। পুরাকথার শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত গল্প-উপন্যাসে নব-রূপায়ণে লেখকের অভিপ্রায়কে নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোথাও কথাকারের চরিত্ররা ধর্ম ও পুরাণের খোলস ছেড়ে আপামর সমাজের দীর্ঘকালীন অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে। আখ্যানে এই উত্তরগুলিই খুঁজতে চেয়েছি আমরা।

উপসংহার-এর পরে সংযুক্ত পরিশিষ্ট-এর প্রথম অংশে আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে আরবি-ফার্সি-উর্দু ভাষার শব্দ ও পরিভাষার একটি দীর্ঘ তালিকা যুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বর্তমান গবেষকের নেওয়া কথাকার আবুল বাশারের সাক্ষাৎকার সংযুক্ত করা হয়েছে।

পরিশিষ্টের পর সংযুক্ত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি। সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করার প্রয়োজনে ব্যবহৃত আকর গ্রন্থ, বাংলা সহায়ক গ্রন্থ, ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ, বাংলা পত্র-পত্রিকা, অভিধান গ্রন্থ, বৈদ্যুতিন তথ্য প্রভৃতি বিষয় এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস, মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ ও বাংলা কথাসাহিত্য

ইতিহাস, মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ ও বাংলা কথাসাহিত্য

পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম-সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পরিব্যাপ্ত অতিপ্রাচীন বিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছে হরেকরকম জনপ্রিয় আখ্যান বা ‘ন্যারেটিভ’— ‘মিথ’-‘পুরাণ’-‘কিংবদন্তি’ বা ‘লেজেন্ড’-এর মতো আদিম পুরাবৃত্ত। অঞ্চলভেদে পুরাকথার বয়ানের রূপান্তর ও বিবর্তন ঘটেছে। ‘মিথ’ (Myth) শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে উদ্ভূত হলেও ‘পুরাণ’ শব্দটি ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত। গ্রিক ‘মিথোস’ (Mythos) এর অর্থ ‘লোককথা’ সত্য ঘটনা বা ধারণ করা। অন্য অর্থে ‘Mythos’ শব্দের অর্থ কথা (Word) বা যে কোনো কথা। কিন্তু কথাটিকে নির্দিষ্ট প্রাচীন গ্রিক কিংবা অন্য দেশের অনুষঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, যে কোনো কথা-ই মিথ নয়। বিশ্বসৃষ্টির স্থিতি ও প্রলয়ের রহস্য, ভূমির উর্বরতার জাদু, জন্ম-মৃত্যু এবং দেবতাদের কার্যকলাপ প্রভৃতিই হল মিথের উপজীব্য।^১ অন্যদিকে ‘পুরাণ’ বলতে সাধারণত ‘প্রাচীন কাহিনি বা প্রাচীন কাল সম্বন্ধীয় শাস্ত্র’ বোঝানো হয়। মহাবৈয়াকরণ পানিনি তাঁর *অষ্টাধ্যায়ী*-তে পুরাণ বলতে ‘প্রাচীনকালে অস্তিত্ব ছিল’ এমন ঘটনা ও কাহিনি বুঝিয়েছেন। *বায়ুপুরাণ* মতে, প্রাচীনকালে যা জীবিত ছিল।^২ *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ* এ পুরাণ বলতে বোঝানো হয়েছে, ‘প্রাচীনকালে বা পুরাকালে এইরকম হয়েছিল’। বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস প্রভৃতি পুরাণে পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায়:

সর্গশ্চ প্রতি সর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরানি চ।

বংশানুচরিতশ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।

প্রথম লক্ষণ ‘সর্গ’-তে সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। দ্বিতীয় লক্ষণ ‘প্রতিসর্গ’-এ রয়েছে সৃষ্টির পর পুনঃসৃষ্টি, এক সৃষ্টি সমাপ্ত হওয়ার পর নতুন সৃষ্টি। তৃতীয় লক্ষণ ‘বংশ’

হল দেবদেবীদের আবির্ভাব ও ঋষিদের বংশপরিচয়। চতুর্থ লক্ষণ ‘মহাস্তর’ হল মনুদের রাজত্বকালের কাল নির্ণয়ের দ্যোতক। এবং পঞ্চম ‘বংশানুচরিত’ হল বিভিন্ন প্রাচীন রাজাদের বংশাবলীর পরিচয়, বিশেষত সূর্য এবং চন্দ্রবংশীয় রাজপুরুষদের বর্ণনা। পুরাণের পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে প্রথম তিনটি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এবং দেবদেবী বিষয়ক হলেও শেষ দুটির সঙ্গে ইতিহাসের একটা যোগসাজশ রয়েছে। ইতিহাসের দুটি ভাগ, বস্তু ইতিহাস এবং কল্প ইতিহাস। পুরাণ বিষয়ক গ্রন্থগুলি মূলত কল্প ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। *রামায়ণ* ও *মহাভারত* মহাকাব্যের পাশাপাশি ভারতীয় পুরাণ হিসাবেও পরিচিত। *মহাভারত* এবং *রামায়ণ* এ ইতিহাসের অল্পস্বল্প প্রেক্ষাপট থাকলেও তার সপক্ষে কোনো প্রামাণ্য নথি বা দলিল পাওয়া যায়নি। সাহিত্য মূলত ‘ফিকশনাল টেক্সট’, যেখানে বস্তু-ইতিহাস বহু সময় ঢাকা পড়ে মরমি আখ্যান শিল্পিত হয়ে ওঠে। বাল্মীকির রচিত মহাকাব্য *রামায়ণ* নিয়েও ভারতীয় সাংস্কৃতিক জগতে তর্ক-বিতর্ক পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। পণ্ডিতমহল এবং সাধারণ ধর্মভীরু মানুষের মধ্যে এই দুই মহাকাব্য বিষয়ক ইতিহাস ও কল্পনার অন্তর্বিরোধ ব্যাপক ও বহুধাবিস্তৃত।

প্রথমত স্রষ্টা বিষয়ে। যে বাল্মীকিকে একত্র সংকলিত মহান কাব্যধারা *রামায়ণ*ের রচয়িতা মনে করা হয় ব্যক্তি হিসাবে তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সন্দেহজনক। কারণ, যে উইটিপি বেড়ে গিয়ে চ্যবনমুনির শরীর ঢেকে ফেলেছিল তা থেকে তাঁর উৎপত্তির রূপকথা ঐতিহাসিক ঘটনা বলে বিশ্বাস করার যোগ্যই নয়। *মহাভারত*ের সৃষ্টিকর্ম ব্যাসদেবের উপর আরোপ করা হয় অথচ বিশালতায় ও গভীরতায় সুমহান *মহাভারত*, পণ্ডিতদের অভিমতে, একত্র সংকলিত কোনো সাহিত্য নয়। এ-ও সুপ্রতিষ্ঠিত যে এই কাব্য শতাব্দীব্যাপী বিভিন্ন কালপর্যায়ে রচিত। ফলত তা কোনো ব্যক্তি বিশেষের রচনা হতে পারে না। সংকলক অর্থে ব্যাস শব্দটির ব্যবহার এই যুক্তিকেই সমর্থন করে আর পৃথক

পৃথক স্থানে ও সময়ে প্রচলিত গাথা, আখ্যান ও উপাখ্যান-সংগ্রহকারী বহুসংখ্যক রচনাকার সম্ভবত ব্যাস নামে খ্যাত হয়েছেন।^৪ যদিও হিন্দু পুরাণে *রামায়ণ*-এর রাম হলেন বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। তিনি অযোধ্যার রাজা, মূলত একজন গোষ্ঠী বা সামন্ত রাজা ছিলেন। অবতার রাম হিন্দুধর্মে একজন জনপ্রিয় দেবতা। ভারত এবং নেপাল ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশে রামপূজা প্রচলিত আছে। ভারতীয় পুরাণ এবং সাহিত্যে রাজা রামের বহু কার্যাবলির উল্লেখ থাকলেও ইতিহাসের সঙ্গে তার যোগসূত্র নেই। রামের ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই। অথচ পুরাকাল থেকে রামের কাহিনি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে মানুষের মনে। মানুষের মিথ-পুরাণের বিশ্বাসের প্রাবল্য এতই গভীর যে সে কাহিনি ধর্মীয় ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের দাবি করে। রামায়ণের আদি উৎস সন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:

রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে রামচরিত সম্বন্ধে যে সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্ব সূচনা দেশময় ছড়াইয়াছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।^৫

রবীন্দ্রনাথ বিরচিত ‘আদিম পুরাণকথা’কেই বলা যায় মিথ। পৃথিবীর একাধিক ধর্মের ঈশ্বর, দেবতা, উপদেবতা বা অতিপ্রাকৃত মানুষের বৃত্তান্ত এবং সৃষ্টিতত্ত্ব এসবের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তির ঘোর বিরোধ। মিথ-পুরাণের পেছনে কী বিশ্ববীক্ষা কাজ করে! তা নিয়ে তর্কের শেষ নেই। বস্তু-ইতিহাস যখন মিথকে কল্প-ইতিহাস ব’লে বাতিল করে তখন মিথের সত্যতা ও প্রতিষ্ঠার দাবি সংশয়ের মুখে পড়ে। শুরু হয় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির লড়াই, ধর্মযুদ্ধ, আস্তিক-নাস্তিক তর্ক।

একজন সাহিত্যিক যখন মিথ-পুরাণকে আশ্রয় করে সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি সেই আদিম পুরাকথার সঙ্গে যুক্ত করেন সমকালীন জীবনজিজ্ঞাসার বিষয়টি। দেশকালের পটভূমিতে মানুষের ‘Creative fantasy’-ই একটি মিথকে ভেঙে আর একটি মিথকে গড়ে। আর মিথ-পুরাণের এই ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়েই অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে গড়িয়ে চলে মানুষের গল্পের প্রবাহ। যেহেতু আর্কেটাইপগুলি সর্বকালের ও সর্বদেশের সমস্ত মানুষেরই সাধারণ সম্পদ, তাই মিথের মধ্যে একটা কিছু রয়েছে যায়, যা একই বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে বহু ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।^৬ তাই মিথ শুধু মানুষের ‘মজ্জায় মিশে থাকা পিতামহদের কাহিনি’ই নয়, মিথ একইসঙ্গে মানুষের বর্তমান আর ভবিষ্যতের কাহিনি।^৭

কারণ মিথ-পুরাণের গভীরে রয়েছে ক্ষমতার রাজনীতি (Power politics)। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের পৌরাণিক ঘটনা বা কাহিনির মূলেই আছে দেব-দানব ভাবনা এবং শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব, স্বরের প্রতিস্বর। নাইজেরিয়ার কথাকার চিনুয়া আচেবে (১৯৩০-২০১৩) তাঁর *Things Fall Apart* (১৯৫৮) উপন্যাসে লিখেছিলেন: Until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter. ক্ষমতার অদৃশ্য জাল এভাবেই তথাকথিত মেধা, মনন, বুদ্ধিবৃত্তির গমকে নিচুতলার শ্রেণিকে দমিয়ে রাখে। দামোদর ধর্ম্যানন্দ কোশাশ্বীর (১৯০৭-১৯৬৬) *An Introduction to the study of Indian History* (১৯৫৬) গ্রন্থের দুটি ঘটনার উল্লেখ করে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করা যেতে পারে। সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাসে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ বলপ্রয়োগের শক্তির উপরই নির্ভরশীল ছিল। যার ফলে সংখ্যালঘু শাসকশ্রেণি উদ্ধৃত উৎপাদন থেকে উৎপাদক শ্রেণিকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। মেহনতি মানুষ যখন দেখল যে উচ্চ শ্রেণির নির্দেশমতো চলাই বাঁচার

একমাত্র পথ ও উপায়— তখন হিংসাত্মক সংঘাতের সম্ভাবনাও নূন্যতম মাত্রায় সীমিত হল। বস্তুত, ধর্ম হল সেই পদ্ধতি যার সাহায্যে মানুষকে বোঝানো হয় যে উদ্ধৃত তাদের পরিত্যাগ করা উচিত, নাহলে কোনো এক দৈবশক্তি তার রহস্যময় প্রতিভূদের দ্বারা তাদের ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু ক্ষুধিত মানুষ তো চিরদিন প্রতিবাদহীন হয়ে থাকবে না! ঠিক সেই পরিস্থিতিতে তাদের ‘ট্যাবু’ এবং ‘টোটেম’গুলিকে কাজে লাগানো হত।

সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা মূলত চাষাবাস করত। কৃষিনির্ভর ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঋগ্বেদ অনুসারে আর্যদের প্রধান যুদ্ধদেবতা ছিলেন ইন্দ্র, যিনি আবার ব্রোঞ্জ যুগের লুঠেরা সর্দারদেরই একটা মডেল। তাঁর অবিরাম কার্যক্রম ছিল দেবতাহীন মানুষদের সম্পদ লুণ্ঠ করা। বেদে ইন্দ্রকে জলস্রোতের বাধা অপসারণকারী রূপে বারবার বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়, বৃত্র নামক এক অসুরের কবল থেকে ইন্দ্র নদীগুলিকে মুক্ত করেছিলেন। পণ্ডিতদের মতে, বৃত্র শব্দের অর্থ বাধা, বাঁধ বা অবরোধ— অসুর নয়। ঋগ্বেদ-এ প্রকৃত যে বর্ণনা রয়েছে তা থেকেও স্বতন্ত্রভাবে এমন অর্থ করা যায়। অসুরটি ছিল কালো সাপের মতো, নদীর ঢালের উপর শায়িত। ইন্দ্র যখন তাঁর বিধ্বংসী অস্ত্র (বজ্র) দিয়ে অসুরকে আঘাত হানলেন— ভূমির বাঁধা ভেঙে রথচক্রের মতো ঘূর্ণমান প্রস্তররাজি ও অবরুদ্ধ জলরাশি অসুরের নিপাতিত দেহের উপর দিয়ে ঢুকে পড়েছিল।

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে এক ধরনের প্রেতাত্তা বা অপদেবতা হিসাবে বেতালের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান অনুসারে বেতাল একজন নিপুণ রঙ্গাবতার। শিবের সঙ্গে বেতালের শিলাকারগত সাদৃশ্য রয়েছে। বেতাল হলেন যাবতীয় ভূত-প্রেতের দেবতা। শ্রেণি-পূর্ব এই সমাজে হনুমান, যিনি মারুতি (পবন পুত্র) নামে পরিচিত, তিনি আলাদাভাবে কৃষকদের পূজা পেতেন এবং নিম্নবর্ণের অন্য দেবতাদের মতোই সিঁদুরে

প্রলেপে আবৃত থাকতেন। তিনি ছিলেন কৌমার্য ব্রতধারী এক মৃত্যুদেবতা। সাধারণত শ্মশানের কাছাকাছি তাঁর অবস্থান (শিব বা ভৈরবের মতোই)। মৃতদেহ দাহ করার আগে তাঁর সামনে এক বিশেষ আচার পালনের রীতি ছিল। এখন লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বানরের মতো মুখ এবং লেজবিশিষ্ট এই দেবতা এক টোটোম, সেইসঙ্গে বেতালের মতো তিনিও কুস্তিগীরদের (পেশাগতভাবে যাঁরা একসময় যোদ্ধা ছিলেন) বিশেষ পূজ্য এবং দুজনের জন্মদিনও একই। পূজারী বা ভক্তদের কাছে এই ব্যাপারটা গোলমালে, তাই তারা হনুমানকে মূল বেতালের অংশ বা তাঁর ভাই বা অন্য আর এক রূপ— এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু শিব বা ভৈরবের সঙ্গে তাঁর কোনো মিল নেই। পরবর্তীকালে দেখা যায়, বড়ো বড়ো মন্দিরগুলিতে হনুমান রামের ভক্ত— রামের সামনে তিনি জোড়হস্তে নতজানু হয়ে থাকেন। এই উপস্থাপনা এসেছে মূলত *রামায়ণ* মহাকাব্যের অনুসরণে— যেখানে তিনি বিষ্ণুর অবতার রামের অনুগত এক দাস এবং অপহৃত সীতাকে উদ্ধারে রামের সাহায্যকারী। শেষ পর্যন্ত কৃষকদের দেবতা এইভাবে রূপান্তরিত হয়েছেন ভূস্বামীদের দেবতার সেবকে— অথচ তিনি (রামেরই মতো) পূর্ব থেকেই পূজ্য ছিলেন উত্তরভারতের কৃষকদের কাছে। এই রূপান্তরে যেটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা হল, হনুমান তাঁর রক্ত-প্রলেপ খুইয়েছেন।^৮ অর্থাৎ ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির দৌলতে কৃষকদের দেবতা রূপান্তরিত হয়েছেন ভূস্বামীদের সেবকে। যেহেতু কৃষকদের পক্ষে থেকে বাল্মীকি নামধেয় কেউ *রামায়ণ* রচনা করেননি। এ রূপান্তরের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে মহাকাব্যের শক্তি, মহাকাব্যকে পুরাণ জ্ঞানে মান্য করার শক্তি। রাম ছিলেন গোস্বামীদের দেবতা, সামন্ততান্ত্রিক রাজা, কাজেই বহু আখ্যান ও উপকাহিনি কৃষকদের জীবনের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে থাকলেও মূল আখ্যানে হনুমানের রূপান্তর ক্ষমতার স্বরকেই স্পষ্ট করে তোলে। সাম্প্রতিক অতীতে বিশ শতকের সাতের দশকে সামন্ততন্ত্র বা বুর্জোয়া রাজনীতির

প্রতি একশ্রেণির বামপন্থী যুবাদের ‘চ্যালেঞ্জ’ এবং ‘কালচারাল মোটিভ’কে বাইরে থেকে বলপ্রয়োগ করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মূলে ছিল ব্যক্তিপূজার বিরোধিতা করা (মণীষীদের মূর্তি ভাঙার মতো ঘটনা ইত্যাদি), যদিও তাঁদের আন্দোলনের পদ্ধতিগত ত্রুটি পরবর্তীকালে চারু মজুমদার, সন্তোষ রানারা স্বীকার করেছিলেন, মূলত ব্যক্তিপূজার বিরোধিতা-র জায়গাটি স্পষ্ট করার জন্য বিষয়টি উত্থাপন করা হল।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় পুরাণের অভ্যন্তরে এই ক্ষমতার স্বর প্রতিষ্ঠিত। ইহুদি এবং ইসলামি পুরাণেও লিঙ্গভেদের দিকটি কিছু ঘটনার মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। ধর্মীয় নেতা বা শাস্ত্রকাররা যখনই অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য পেয়েছিলেন তখন থেকেই তাঁরা হতদরিদ্র জনসাধারণের আত্মিক প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্ম ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছিলেন। বিত্তবান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তখন প্রয়োজন হয়েছিল জনসাধারণের সম্ভাব্য প্রতিবাদ অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার আশ্বাস এবং পুরোহিতশ্রেণির প্রয়োজন ছিল ধন ও ক্ষমতা। এখন প্রশ্ন ওঠে, সাধারণ মানুষ কেন পুরোহিতশ্রেণির কথা মেনে নেবে? আসলে ধর্মকে তারা দেখেছিল সাধারণ জ্ঞানের অ-পর্যাপ্ততা অথবা অনুভূত অপর্যাপ্ততার পরিপ্রেক্ষিতে, জীবন অভিমুখে একটি সামগ্রিক মনোভাবের বিকাশ রূপে এবং পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞানের ওপরে গঠনাত্মক একটি প্রভাব হিসাবে। এইভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাখ্যা করে ধর্ম তাকে আরও বেশি বোধগম্য করে তুলেছিল বলেই মানুষ শাস্ত্রকারদের কথা শুনছিল।^৯ এবং শুরুর দিকের পুরাণগুলিও মুখে মুখেই রচিত এবং পরবর্তীকালে প্রজন্ম পরম্পরায় হস্তান্তরিত। ভারতীয় পুরাণের ক্ষেত্রে জন্মান্তর এবং পরলোক সংক্রান্ত ভাবনা সাধারণ মানুষের ভীতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। পণ্ডিতমহলের ধারণা কৃষি সভ্যতার যুগে জন্মান্তরবাদের সৃষ্টি, অর্থাৎ বীজ মাটিতে পড়লে তা থেকে নতুন শস্য উৎপাদন হয়— এর থেকে ধারণা হয়েছিল হয়তো যে, মৃত্যুই

জীবনের শেষ বা চূড়ান্ত অবসান নয়।^{১০} এরপরেই শুরু হয়েছিল নিয়তিতাদিত বা নিয়তি নির্ধারিত জীবনভাবনা। পূর্বজন্মের কৃত পাপের কারণেই সাধারণ মানুষের জন্মকে দোষ বা গুণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের ধূসর মরুতে সৃষ্ট ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম— এই তিন ধর্মই একেশ্বরবাদী ধর্ম এবং পরলোক সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রায় অভিন্ন। মৃত্যু পরবর্তী পরলোকে পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ থাকলেও জন্মান্তরবাদকে উপরোক্ত কোনো ধর্মীয় পুরাণই স্বীকার করে না। কেবল পুরাণেই নয়, বহু কথা মিথ আকারে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা মূলত নারী শোষণের অদম্য হাতিয়ার হিসাবে প্রযুক্ত। ইহুদি পুরাণের শুরুতেই রয়েছে, আদমের বাঁ পাঁজরের হাড় থেকে ইভকে সৃষ্টি করেছিলেন ঈশ্বর। একই কথা ইসলামি পুরাণের অন্যতম আকর গ্রন্থ হাদিসেও রয়েছে। আদম সৃষ্টির পর আদমের নিঃসঙ্গতা কাটাতেই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন ইভকে। ইভের প্ররোচনায় আদম নিজের ইচ্ছা বা স্বাধীনতার বীজ বপন করতে গিয়েই করে ফেলেছিলেন পৃথিবীর আদি পাপ (Original Sin)। পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের নিমিত্তে আদম-ইভ উভয়েই পতিত হয়েছিলেন মর্ত্যে— পৃথিবীর আদি মানব-মানবীর স্বর্গ থেকে মর্ত্যে গমন এবং সভ্যতার ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা— এই ক্লাসিক্যাল মিথ-পুরাণের নেপথ্যেই জমে আছে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সমীকরণ। বস্তুত ইভের প্ররোচনাতেই আদম করে ফেলেছিল আদি পাপ। আর সেই থেকে ইভকে তথা সমগ্র নারীজাতিকে প্ররোচনাকারী ও লোভ-লালসার প্রতীক হিসাবেই গণ্য করে সাধন মার্গে তাকে বর্জন করাই শ্রেয় বিবেচনা করা হয়।^{১১}

এ ঘটনার রেশ ধরেই ইসলামি পুরাণে এসেছে, ‘মেয়েরা হল শয়তানের পাতা ফাঁদ’। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, নিকৃষ্টতম প্রাণী যারা মানুষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে থাকে, যারা মূলত দুষ্ট আত্মা এবং সাধারণ মানুষকে খারাপ কাজে নিরন্তর প্রলুব্ধ করে—

তারাই হল শয়তান। এমন নানা কাহিনিই অজস্র রূপে বিশেষত গ্রামীণ মুসলিম জনমানসে বহু মিথের জন্ম দিয়েছে। গোঁড়াপন্থীদের মনে বাসা বেঁধেছে হরেকরকম কিসসা। জনপ্রিয় প্রবাদ— ‘সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে’— নারীকে স্বাবলম্বী না করার পেছনে এমন নানান যুক্তি তৈরি হয়েছে গ্রামীণ মুসলিম সমাজে। ভারতীয় পুরাণেও শোষিত মানুষের শেষ আশ্রয় ভগবান, শোষিত মানুষের ‘ভগবান যদি সত্যিই থাকেন, দেখবেন আমাদের’— এখানেও মূলত ক্ষমতার বিরুদ্ধ স্বর নির্মাণে ব্যর্থ সাধারণ মানুষের হাহাকার ও যন্ত্রণার আততি স্পষ্ট। ক্ষমতার কেন্দ্রের বাইরে আবার কিছু ‘মধ্যস্থতাকারী ভাবাদর্শ’ অবস্থান করে, যারা প্রধানত ক্ষমতার সরাসরি বিরোধিতার পথে পা বাড়ায় না, পরোক্ষভাবে ক্ষমতার পক্ষে দাঁড়ায়। কার্যত ‘সিস্টেম’কে ‘অ্যাডজাস্ট’ করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালায়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলি বিকশিত হওয়ার পর তার নির্দিষ্ট আইন ও বিধানগুলি নারী-পুরুষ ভেদে সমান নেই, কিন্তু তার সংস্কার করার পক্ষে প্রতিবন্ধকতার একটি বড়ো স্থান দখল করে রয়েছে ‘মধ্যস্থতাকারী ভাবাদর্শ’ গোছের মানুষ। সাম্প্রতিককালে ধর্মকে হাতিয়ার করে শোষণের রাজনীতি এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তাহলে ক্ষমতার স্বরের প্রতিস্পর্ধী বয়ান কি নির্মিত হয়নি কোথাও? আধুনিক আখ্যানে তো বটেই, খোদ পুরাণেই ক্ষমতার স্বরের প্রতিস্বরও প্রতিস্থাপিত হয়েছে। যেমন, ইসলামি পুরাণের কাহিনিতে মৃত্যুর দূত আজরাইল শত শত কোটি মানুষের প্রাণ হরণ করলেও কেঁদেছেন মাত্র দু’বার। একবার শাদ্দাদ বাদশাহের জন্মের সময় এবং একবার তার মৃত্যুর সময়। আজরাইলের আদেশপালনের দক্ষতা, সীমাহীন দায়বদ্ধতা ও আনুগত্যের জন্যই ঈশ্বর তাকে প্রাণ সংহারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এ হেন মৃত্যুর দূত আজরাইলের কান্না কোথাও যেন ঈশ্বরের আইন, বিচার বা ক্ষমতার প্রতিস্বর নির্মাণ করেছে। ঈশ্বরের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধ-স্বর উপস্থিত। মিথ-পুরাণ নির্ভর আখ্যানেও

ক্ষমতার লড়াইয়ে একরৈখিক স্বর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* উপন্যাসে একটি দহ-কে কেন্দ্র করে উচ্চ এবং নিম্নশ্রেণির মধ্যে বিশ্বাসের দ্বন্দ্বটি প্রকট হয়ে উঠেছিল। নায়েবমশাইদের মতো উচ্চশ্রেণির মানুষ ভবানীর দহ-কে শিবের ত্রিশূল থেকে উত্থিত এক পৌরাণিক ভিত্তিভূমির মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বৈকুণ্ঠসহ নিম্নশ্রেণির মানুষদের বিশ্বাস ছিল ভবানী পাঠক ইংরেজ সেপাইয়ের গুলিতে নিহত হন এই দহে, তাঁর সঙ্গে ছিল একজন পাঠান সেনাপতি। সেই থেকে ভবানীর দহ নামকরণ হয়েছে। যুযুধান দুই পক্ষের বিশ্বাসের দ্বান্দ্বিকতার মাঝে এসে পড়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ* উপন্যাসের প্রসঙ্গ। যেখানে ভবানী পাঠক মূলত ‘ম্লেচ্ছ’দের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। উচ্চশ্রেণির ক্ষমতার প্রতিস্বর হিসাবে অভাজনদের ভাষণকেই যেন সুকৌশলে ইলিয়াস প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এছাড়াও ইহুদি এবং ইসলামি পুরাণের ইবলিশ বা আজাজিলের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কোথাও প্রতিস্বরের বয়ানকে স্পর্শ করে। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, মানুষ মাটি থেকে সৃষ্ট এবং ইবলিশ-শয়তান বা জ্বিন হল আগুন থেকে সৃষ্ট মানুষের মতোই একপ্রকার প্রজাতি। *কোরানে* ইবলিশ সম্পর্কে বহু শ্লোক রচিত হয়েছে। হাদিসেও ইবলিশ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করার পর তাবৎ ফেরেশতামণ্ডলীসহ আজাজিল নামক জ্বিনকেও আদমকে সিজদা (মাথা নত করা) করতে বললে আজাজিল তা অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্র অভিশাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যে নির্বাসিত হয়। একসময় আজাজিল ছিলেন আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠতম দাস। এমন বিচক্ষণ জ্বিন খোদার অবাধ্যতা করার ফলস্বরূপ আল্লাহ্র আসমান থেকে বিতাড়িত হয়। খোদাকে সে হারাতে পারে না, আবার নিজেও পরাজিত হয় না, অর্থাৎ পরাজয়কে মেনে না নিয়ে যুদ্ধ করে খোদার বিরুদ্ধে। ইবলিসের প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সৃষ্ট মানুষ প্রজাতিকে পথভ্রষ্ট করে তাদের দলভুক্ত করা। আজাজিল

হলেন ইবলিশদের সর্দার। যদিও পুরাণে নির্দিষ্ট করা রয়েছে পরকালে ইবলিশের স্থান হবে জাহান্নাম বা নরক। পুরাণের ‘খোদার দুশমন’ আজাজিলের স্পর্ধিত মনের প্রকৃতি যেন ক্ষমতার সর্বোচ্চ নিয়ামক ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী বয়ান নির্মাণ করেছে। অথচ পুরাণই নির্দেশ করে দিয়েছে শাস্তিস্বরূপ সে অনন্তকাল নরকের যন্ত্রণা ভোগ করবে। আসলে প্রতিস্বর একটা ধাক্কা দিতে পারে, ক্ষমতাকে তছনছ করার শক্তি তার নেই। ইবলিশ বা শয়তানের ট্রাজিক পরিণতিই এ যাবৎকাল বিশ্বসাহিত্যে অন্যমাত্রা নিয়ে স্থান অধিকার করে আছে। এই সময়ের বিখ্যাত কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় তাঁর *ইবলিশের আত্মদর্শন* কাব্যের ‘প্রথম সর্গ’ ‘সিজদা করিনি অবিশ্বাসী’তে আজাজিল নামক ইবলিশের দ্রোহকে নতুন রূপে অঙ্কন করেছেন:

হাড়িকাঠে মাথা পেতে খচ্চরের বাচ্চা শুয়ে আছি
তুই তো প্রভুর পায়ে মাথা ঠুকে হাপাচ্ছিস গর্ভ থেকে নেমে
আমাকে ইবলিশ বলে সিজদা করিনি অবিশ্বাসী!
স্বর্গোদ্যানে ঠ্যাং নেড়ে ফেরেশতারা যা ইচ্ছে বলুক বলতে দাও
আমাকে ইবলিশ বলে জাহান্নাম যাব যেতে দাও
হাড়িকাঠে মাথা পেতে দুশমন আত্মার ছটফটানি
গর্ভ থেকে নেমে অন্দি যত বুজরুকের তৈরি নীতির বটিকা
গিলতে গিলতে ভুলে গেছি প্রকৃত জিহ্বার স্বাদ কীরকম ছিল
শুনতে শুনতে ভুলে গেছি শব্দের প্রকৃত অর্থ অক্ষরের ধ্বনি
যত ধূর্ত ধড়িবাজ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়ে গেছে জন্ম থেকে
এভাবে হিজড়ের মতো অপরের প্রজননকে স্বাগত জানিয়ে
বেঁচে থাকতে ইচ্ছে নেই [অথচ থাকতেই হয়, হয়রে নিয়তি!]^{১২}

ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ইবলিশের দ্রোহের এমন কাব্যিক উপস্থাপনা বাংলা কবিতায় দুর্লভ। শেষ পর্যন্ত ইবলিশ ঈশ্বরকে শাসানি দিয়ে যায় তার প্রিয় মানুষ প্রজাতিকেও সে দলভুক্ত করে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। ঈশ্বরের আদেশকে অমান্য করার পাশাপাশি তার প্রতি ‘চ্যালেঞ্জ’ জানায়:

হাতের চেটোয় মৃত্যু এবং জীবন খেলছে বুজরুকের মতো
আমার নফর বান্দা আমি যে ইবলিশ পাপী সিজদা করিনি
সিজদা করব না সুতো ধরে টানব জীবন-মৃত্যুর
ওরা তো আমার বান্দা প্রভু নয় কেউ।^{১০}

এভাবেই যেখানে বস্তু-ইতিহাস চাপা পড়ে যায়, সেখানে মরমি আখ্যান নির্মিত হয় ক্ষমতার
প্রতিস্বরের প্রতিস্পর্শী বয়ান হিসাবে।

ইতিহাস নির্ভর আখ্যান, যার তলদেশে বস্তু-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং পুরাণ
নির্ভর আখ্যান, যার তলদেশে মূলত কল্প-ইতিহাসের অনাড়ম্বর, বস্তু-ইতিহাস থাকলেও
হয়তো তা আবিষ্কারযোগ্য অথচ আবিষ্কার হয়নি। পৃথিবীর সকল দেশের সকল ইতিহাসই
বিজয়ীদের হাতে লেখা, সেখানে বিজিতদের প্রতাপ নেই। তাছাড়া ইতিহাস মূলত
অতীতের নথির সমকালীন ব্যাখ্যা এবং বিশেষত আধুনিক মনের ভেতর থেকে নিঃসৃত
হয়ে আসা সমাজবদ্ধ মানুষের কাহিনি। মুশকিলটা হল, প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানুষের সঙ্গে
বর্তমান (যে সময়ে ইতিহাসবিদ রচনা করেছেন ইতিহাস) মানুষের মন-মনন ও
মানসিকতার অন্তর্বিরোধ নিয়ে, কারা উন্নত-অনুন্নত তা তর্কের বিষয়। অন্যদিকে, একজন
সাহিত্যিক যখন আখ্যান নির্মাণ করেন তখন তিনি কল্পনার জগতে থাকেন মুক্ত ও স্বাধীন।
ইতিহাস বা মিথ-পুরাণ নির্ভর আখ্যানে তিনি সময়কে নিজের মতো করে উপস্থাপন
করেন। সেইসঙ্গে মানবিক সম্পর্কের নব্যরূপ, সামাজিক অচলায়তন, বিবিধ কুসংস্কারে
জর্জরিত জনজীবন এবং সমকালকে স্পর্শ করা— কল্পজগৎ নির্মাণের এই ব্যক্তিস্বাধীনতা
তাঁর রয়েছে। সেই কারণে বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে কোনো পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের যোগসূত্র
স্থাপিত না হলেও সাহিত্যিক যেটা ইচ্ছে সেটাকে বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করতে পারেন।
মধ্যপ্রাচ্যের আরব মরুভূমি থেকে উদ্ভূত ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম— এই তিন ধর্মের
সৃষ্টিতত্ত্বের আন্তঃসংযোগ যেমন রয়েছে, পাশাপাশি ভারতীয় পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে

তার অন্তর্বিরোধ বিদ্যমান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিথ-পুরাণের তিনটি বিষয় উল্লেখ করে ইতিহাস ও মিথ-পুরাণের যোগসূত্র এবং বিবর্তনের রেখাচিত্রটি স্পষ্ট করা যায়।

ক. ইতিহাস থেকে মিথ-পুরাণের পথে যাত্রা:

গৌতম বুদ্ধ বা হজরত মুহম্মদের জীবন ও বাণী। তাঁরা দুজনেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, পাশাপাশি তাঁদের জীবনের সঙ্গে পৌরাণিক উপাখ্যানের যোগসূত্র স্থাপিত। গৌতম বুদ্ধকে হিন্দু পুরাণে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়েছে।^{১৪} তবে ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী অঞ্জনের পুত্র অর্থাৎ সুগত বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার। আবার শিখ গুরু গোবিন্দ সিং তাঁর লেখা *দশম গ্রন্থ* নামক শিখ গ্রন্থের ‘চব্বিশ অবতার’ নামক রচনায় গৌতম বুদ্ধকে বিষ্ণুর ২৩তম অবতার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।^{১৫} হজরত মুহম্মদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও স্পষ্ট। মধ্যপ্রাচ্যের আরবভূমিতে তাঁর হাত দিয়েই ইসলাম ধর্মের সূচনা, *কোরান*-এর আত্মপ্রকাশ— বস্তুত, হজরত মুহম্মদের সামগ্রিক জীবনবৃত্তান্তই ইতিহাস ও পুরাণের সংমিশ্রণে রচিত।

খ. মিথ থেকে পুরাণের পথে যাত্রা:

এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে স্মরণে আসে *রামায়ণ*-এর রাম চরিত্র। ইতিহাসকারদের কাছে রাম চরিত্রের ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ধারিত না হলেও রামকথা যে *রামায়ণ* লিখিত হওয়ার বহু আগে থেকেই ভারতে, এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে প্রচলিত ছিল তার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়। অর্থাৎ মিথের চরিত্র যখন মহাকাব্যিক বা পৌরাণিক রূপ পায় তখন তা মিথকে ছাড়িয়ে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ. পুরাণ থেকে মিথের পথে যাত্রা:

ইহুদি পুরাণ *হিব্রু বাইবেল*-এ মোজেস একজন নবি বা ঈশ্বর প্রেরিত দূত। তিনি একাধারে ভাববাদী, সন্ত, দ্রষ্টা, আইনপ্রণেতা ও সংস্কারক। ইসলামি পুরাণে পরবর্তীকালে ইহুদি পুরাণের ঘটনারই অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মুসলমানদের *কোরানে* মোজেসকে মুসা নামে অভিহিত করা হয়েছে। মিশরের সিনাই পর্বতের অপর নাম তুর পাহাড়। ইসলামি ধর্ম মতে, নবি মুসা এই পর্বতে আল্লাহর রূপ দর্শন করেছিলেন। আল্লাহর জ্যোতির ছটায় পাহাড় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। *কোরান*-এর এ ঘটনা থেকেই মিথ তৈরি হয়েছে যে এই ভস্মীভূত পাহাড় থেকেই সূর্যার (চোখে দেওয়ার বিশেষ প্রসাধন) উৎপত্তি ও ব্যবহার। যদিও ইসলামি শাস্ত্র সূর্য্য উৎপত্তির ঘটনাকে মান্যতা দেয় না। বিশেষত গ্রামীণ মুসলিম জনমানসের বিশ্বাস আরব থেকে যে সমস্ত সূর্য্য আমদানি হয় এবং মক্কা ফেরত হজ্জ যাত্রীরা যে সূর্য্য শিশিবিন্দি অবস্থায় নিয়ে আসেন— এসবই আল্লাহর জ্যোতির বালুকণা। উল্লেখ্য, মিশরের তুর পর্বতের সঙ্গে সৌদি আরবের মক্কার কোনো ভৌগোলিক যোগ নেই, দুই স্থানের দূরত্ব অনেক। ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক সাফল্যের অভিসন্ধি এর জন্য দায়ী বলা যায়। পুরাণের সঙ্গে অর্থনীতির যোগসূত্র স্থাপিত হলে কীভাবে মিথের জন্ম হয় তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে এটিকে গণ্য করা যায়।

আসলে আদি থেকেই একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যে অর্থনৈতিক বা সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য থাকলেও পৌরাণিক ভাবনার মধ্যে মানুষ একটি ঐক্য সৃষ্টি করেছিল। এই ভাবনার সঙ্গে ফ্রয়েডের তত্ত্ব মিলে যায়। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বানুসারে, মানুষের ব্যক্তিগত চৈতন্যের অন্তর্গত নির্জ্ঞান স্তর থেকে বিভিন্ন বাসনা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেভাবে প্রতীকায়িত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে, ঠিক সেই একইভাবে বহির্বিশ্বের অনুশাসনে বদ্ধ নির্জ্ঞান মনের বন্দিত্ব

থেকে মুক্তির প্রতীকী প্রকাশ ঘটেছে লোকপুরাণগুলির কাহিনি বিন্যাসে। গোষ্ঠীগতভাবে এই প্রকাশই একটা ‘ট্রাডিশন’ বা ঐতিহ্য নির্মাণ করে। এই সামগ্রিক গোষ্ঠী-চৈতন্য যে নির্জ্ঞান স্তর থেকে সঞ্জাত— ফ্রেড শিষ্য ইয়ুং তার নাম দিয়েছেন ‘কালেকটিভ আনকনসাস’(সামূহিক নির্জ্ঞান বা যৌথ অবচেতন)। যে কোনো গোষ্ঠীর ঐতিহ্য— ‘কালেকটিভ আনকনসাস’ হল তার সমন্বিত ভাবনা।^{১৬} এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে ক্ষমতার স্বর এবং প্রতিস্বরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কেন? ক্ষমতার স্বরকে সাধারণ মানুষ কেন প্রতিহত করতে পারেনি? আসলে মানুষ ও প্রকৃতির যোগসাজশ এমনই নিবিড় এবং ঈশ্বরের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা ও শাস্ত্রকারদের বিচক্ষণতা পুরাণের অন্দরমহলের ঐক্য বিনষ্ট হতে দেয়নি। উদাহরণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়, ইহুদি পুরাণের ঈশ্বর অনেকটাই রক্তমাংসের ঈশ্বর। তিনি যতটা জাদুময় অলৌকিক, ঠিক ততটাই বাস্তব। ঈশ্বরকে রক্তমাংসে ধরার চেষ্টা মানুষের গোড়ার চেষ্টা। *হিব্রু বাইবেল*-এ মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে নদীর ধারে এক রাত্রিতে মল্লযুদ্ধ করে ঈশ্বরের আঘাতে নিজের উরু ভেঙে ফেলেছিল। ভগ্নউরু সেই মানুষটির নাম বাংলার মৌখিক পুরাণ অনুসারে ইয়াকুব (যার অর্থ প্রবঞ্চক)। কারণ যাকোব বা ইয়াকুব তাঁর যমজ-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে (*হিব্রু বাইবেল*-এ যিনি এষৌ) পিতৃ-সম্পত্তির অধিকার থেকে কূটকৌশলে বঞ্চিত করেছিলেন। *হিব্রু বাইবেল*-এ আবার তিনিই ইসরায়েল। ইসরায়েল মানে একজন (ভগ্নউরু) বিজেতা, যিনি মল্লযুদ্ধে ঈশ্বরকে পরাস্ত করেছিলেন। মল্লরণ একটি রক্তমাংসের ঘটনা, যাতে ঈশ্বরের মাংসে অবধি আঘাত করা যায়। সেই ঈশ্বরকে আঘাত করা যায় যিনি ভাষা দিয়ে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন এবং আজও সেই ছিন্নতা মানুষ বহন করে চলেছে।^{১৭} এখানেও মানুষ ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী। ইসলামি পুরাণে যেমন আজাজিল নামক ইবলিশের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইবলিশের স্ব-শ্রেণির আত্ম-অহংকার ও অস্তিত্ব ও ‘ব্যক্তিগত ইচ্ছা’র পরিচায়ক। ভারতীয় পুরাণে

ঋগ্বেদে-র কৃষি সভ্যতার যুগে ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্র (বাধ বা অবরোধ) বধ— দেবতার প্রতি মানুষের নির্ভরশীলতার নিদর্শন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। গ্রিক পুরাণে আগুন চুরির দায়ে প্রমিথিউসকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। এখানে শ্রমজীবী বা কৃষিজীবী মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের বৈরিতা স্পষ্ট। আবার লোকগল্পে যা দ্বন্দ্বহীন তা ইতিহাস হয়ে উঠেছে দ্বন্দ্ববিদীর্ণ। ইহুদি পুরাণে মরুভূমির মানুষ একজন রাজার অনুসন্ধান করেছিল। কারণ রাজার দখলীকৃত জমি তাদের ‘দেশ’ হিসাবে গণ্য হবে। এই প্রতীকী-ই ইদানীং সময়কে ছুঁয়ে যায়। মাটি দখল করে ঈশ্বর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চিন্তে ধর্মের নিশান ওড়ানো কিংবা রাজনৈতিক ধর্মীয় মৌলবাদ দিয়ে নিজের দেশকে ঈশ্বরের দেশে পরিণত করতে চাওয়া— এই জবরদখল ও বিচ্ছেদ-প্রবণতা-ই তো মানুষের আদি ও অসমাপ্ত ট্রাজেডি। আর এর সঙ্গে চলতে থাকে ভোগদখলের খেলা। এই প্রতীক মূলত উঠে আসে বহু আর্কেটাইপ থেকে। কোনো প্রতীক, প্রতিমা, শৈল্পিক ছাঁচ বা রীতি, চিত্রকল্প বা চিত্র— এসবের আর্কেটাইপ থেকে মানুষ আবিষ্কার করে কল্প-ইতিহাসের তলদেশের বস্তু-ইতিহাসকে। লোকবিশ্বাস এবং লোককাহিনির বিবিধ অনুষ্ঙ্গসহ বিভিন্ন আর্কেটাইপ, টোটেম ও ট্যাবুগুলি মিথ-পুরাণের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে আছে। মিথ মানুষের মানস জগতে এমনকি অবচেতন বা স্বপ্নের জগতে এমনভাবে জড়িয়ে আছে তাকে ইচ্ছে করলেও মানুষ সহজেই পরিত্যাগ করতে পারে না। সভ্যতার সূচনাপর্ব থেকেই আদিম মানুষের শিকারের উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, শিকার আর শিকারীর মধ্যে ছিল এক রহস্যময় সম্পর্ক। ভিন্ন অপরিচিত জগতের বাসিন্দা হিসাবে শিকারকে ভালোবাসতে শুরু করেছিল শিকারী এবং বারংবার ফিরে আসার জন্য তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। এই সন্তুষ্ট করার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উভয়ের মধ্যে এমনই এক অদ্ভুত জাদুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে তারা উভয়েই মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের এক চিরায়ত-অলৌকিক আবর্তে বাঁধা পড়ে যায়। ফলে সৃষ্টি হয়

টোটেমের, সৃষ্টি হয় ট্যাবু বিশ্বাসের। পরবর্তীকালে তা জাতিগত প্রথা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একইভাবে বর্তমান পৃথিবীর বেশিরভাগ ধর্মগুলির প্রাথমিক এষণাসমূহ আবিষ্কার করা যায় তাদের পূর্বপুরুষদের অঙ্কিত গুহাচিত্রে। যেখানে তারা তাদের বিশ্বাসের চিত্ররূপ উপস্থাপন করে পুরাণের একটি প্রায়োগিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। যার ফলাফল হিসাবে তৈরি হয়েছে সভ্যতার নানা ঐতিহ্য, ধর্ম ও কালচার।^{১৮} আর প্রাচীন লোকবিশ্বাসজাত কাহিনি বা আখ্যান জন্ম দিয়েছিল পুরাণের। টোটেম বা ট্যাবুর গভীরেও ‘ক্ষমতার রাজনীতি’ প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। যার মধ্যে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। টোটেম মূলত প্রাচীন আচার, সংস্কৃতি বা অনুশীলন যা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতীক বা সংরক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ট্যাবু হল ধর্মীয় বা সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ এমন কিছু, যার সঙ্গে পবিত্র-অপবিত্র, পাপ-পুণ্যের বোধ জড়িত। ট্যাবু মূলত প্রাক-ধর্ম যুগের একটি ধারণা হিসাবেই প্রতিভাত হয়, পরবর্তীকালে প্রায় সকল ধর্মেরই মিথ-পুরাণে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। সামাজিক বা ধর্মীয় কারণে আজও যা ভাঙতে মানুষ ভয় পায়। যেমন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে গরু এক পবিত্র প্রাণী, তাকে হত্যা করে মাংস ভক্ষণ প্রবলভাবে নিষিদ্ধ। অন্যদিকে আব্রাহামিক ধর্মগুলিতে এ নিষেধাজ্ঞা নেই। আবার আব্রাহামিক ধর্মগুলির অন্যতম ইসলাম ধর্মে গরুর মাংস ভক্ষণ বৈধ হলেও শূকরের মাংস বা মদ্যপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এইরকম হাজারো ট্যাবুর সম্মিলিত রূপ নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে টোটেম-এর। আব্রাহামিক ধর্মগুলির সৃষ্টির শুরুতেই রয়েছে মানুষের পাপ ও অবাধ্যতার প্রসঙ্গ— অর্থাৎ ট্যাবু ভাঙার পরিণতি স্বরূপ ঈশ্বর আদম-ইভকে স্বর্গের উদ্যান থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। ইহুদি পুরাণে তেমনভাবে উল্লেখিত না হলেও ইসলামি পুরাণের আদমের অপরাধবোধ সূচক ক্ষমাপ্রার্থনা ঈশ্বরের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে আরও শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গ্রিক নাটকের ইডিপাসের আত্মদংশনও অপরাধবোধ সূচক স্বরের

ধারণাকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইডিপাস যে কাজ সজ্ঞানে করেনি, এমনকি যে কাজ সে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করেছিল, সেকথা জানা সত্ত্বেও তার অপরাধবোধ দূর হয়নি।

আব্রাহামিক ধর্মগুলিতেও আদম-ইভের বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ছিল খুবই ভয়াবহ। পুরাণের ব্যাখ্যা অনুসারে, পুরাকালের পৃথিবীর দুই প্রান্তে দু'জন মানুষ নির্বাসিত হয়েছিলেন। এবং একে অপরকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, ইহুদি পুরাণ এবং ইসলামি মিথের ভাষ্য অনুযায়ী, আদমের শরীরের বাঁ-পাঁজরের হাড় থেকেই ঈশ্বর ইভকে সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ আদম-ইভের পারস্পরিক অনুসন্ধানের নেপথ্যে যেন ‘সোলমেট’-এর অনুসন্ধান— গ্রিক মিথের ব্যাঙ্গনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্লেটোর *The Symposium* গ্রন্থের তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায় আদম-ইভের ছিন্নতার পর মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও নিরন্তর পথচলা। প্লেটো লিখেছিলেন, প্রাচীনকালে মনুষ্যজাতির ছিল ভিন্ন এক আদিরূপ। জন্মগতভাবেই তখন মানুষের ছিল চার হাত, চার পা আর দু'মুখো এক মাথা। তার কোনও আচরণে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হয়ে বজ্রপাত ঘটালে মানুষ দুই ভাগ হয়ে যেত। সেই থেকেই নাকি মানুষ নিজের সত্তার অপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন। সবসময় সে অন্য অংশটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। প্লেটোর মতে, এই আকর্ষণটাই হল ভালোবাসা।^{১৯} আনুমানিক ৩৮৫-৩৭০ খ্রিস্টপূর্বে প্লেটো রচনা করেন *দ্য সিম্পোজিয়াম*। আর সেই ঐতিহাসিক রচনায় উঠে আসা অ্যারিস্টোফানেস নির্মিত এক গল্প থেকেই পাওয়া যায় ‘সোলমেট’(Soulmate) তত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা। অসাধারণ সে মানবসত্তার দেহে ছিল ক্ষিপ্ততা, লড়াই করার প্রবণতা ও অপরিমেয় শক্তি। তারা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, একটা পর্যায়ে তারা দেবতাদের শাসন মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছিল। দল বেঁধে মানবজাতি রওনা হয়েছিল

অলিম্পাস পাহাড়ের চূড়ায়। যুগে যুগে দেবতারা বজ্রের আঘাতে টাইটানদের ধ্বংস করে এসেছে। সে পরিস্থিতিতে মানবজাতিকেও তারা একইভাবে ধ্বংস করতে চাইলেন। কিন্তু, মানুষই যদি না থাকে, তবে দেবতাদের আরাধনা করবে কে! অদ্ভুত এ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন দেবতাদের রাজা জিউস। মানবদেহকে দ্বিখণ্ডিত করার মধ্যে দিয়ে তাদের সকল অহংকার চূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন পুত্র অ্যাপোলোকে। একইসঙ্গে, পরবর্তীকালে এমন কোনো ধৃষ্টতা দেখালে, আবারও মানবদেহ অর্ধেক করে ফেলার প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি। এ ঘটনার ফলে, মানবজাতি যেমন দুর্বল হল, একইসঙ্গে দেবতাদের আরাধনা করার মানুষের সংখ্যাও বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল। কিন্তু, নিজ দেহের অর্ধাংশ হারিয়ে তাদের অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, দুঃখ কষ্টে নাওয়া-খাওয়া ভুলে তারা দিনরাত কেবল হারানো অংশ ফিরে পাবার প্রার্থনাই করে যাচ্ছিল। এরফলে, গণহারে মারা যেতে থাকল তারা। অবশেষে, করুণা হল দেবতা জিউসের। অ্যাপোলোকে নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেকের মুখ তাদের কাটা অংশের দিকে ঘুরিয়ে দেয় যেন, যাতে তারা এ শাস্তির কথা কখনও ভুলে না যায়! পাশাপাশি তাদের মিলন ও বংশবৃদ্ধির সুবিধার্থে জনেন্দ্রিয়ও একই পাশে আনতে বললেন। নির্দেশ মতো, দেহের চামড়া পাকস্থলীর কাছে টেনে নাভিতে সেলাই করে তাদেরকে স্বাভাবিক করে তুললেন অ্যাপোলো। এতে প্রত্যেকের দেহে তখন একটি মাথা, এক জোড়া চোখ, এক জোড়া হাত, এক জোড়া পা ও কেবল একটি করে জনেন্দ্রিয় অবশিষ্ট ছিল। আর সেই খণ্ডিত মানুষটি বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়, তার দেহ ও মনের অপর খণ্ডিতাংশ নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষটির অপেক্ষায়। তার সত্তা থেকে হারানো অপর লিঙ্গের মানুষটিই ছিল তার সকল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।^{২০} সেই থেকে ‘সোলমেট’কে মানুষ খুঁজছে অনবরত।

গ্রিক মিথে কথিত আছে, যখন সত্যিই তারা একে অপরকে খুঁজে পেত, মিলন-সুখের বাঁধভাঙা আনন্দের জোয়ার তাদেরকে এতটাই গভীরভাবে গ্রাস করত যে, তাদের জীবনে অবশেষে আসত পরিপূর্ণতা। আর সে সুখের কোনো তুলনাই ছিল না। গ্রিক পুরাণের ‘অ্যানিমা’ এবং ‘অ্যানিমাস’-এর বর্ণনায় পৌরাণিক আর্কেটাইপগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। একজন পুরুষের ভেতরে নারীত্বের গুণাবলী অন্তর্নিহিত থাকে তাকে ইয়ুং বলেছেন ‘অ্যানিমা’, এবং সমান্তরালে একজন নারীর ভেতরে থাকে পুরুষসত্ত্বা, যাকে বলা হয় ‘অ্যানিমাস’। স্বভাবগত দিক থেকে এগুলি নেতিবাচক অথবা ইতিবাচকভাবে প্রত্যক্ষ হতেই পারে।^{২১} কেবল পৌরাণিক কাহিনি অথবা মিথ নয়, তার পাশাপাশি রূপকথা, কিংবদন্তি, লিজেন্ড, ফোকলোর জাতীয় গল্পকথাও কখনও ধর্মীয় পুরাণের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে ছড়িয়ে গেছে, কখনও পৃথকভাবে মিথের মতোই মানুষের সমাজজীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। *আরব্যরজনী*-র মতো গল্পগুলির সঙ্গে সরাসরি ধর্মীয় পুরাণের যোগ নেই, অথচ তার প্রসার ও ব্যাপ্তি মিথের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। সভ্যতার ভাঙা-গড়ার মাঝেও ধর্মীয় পুরাণের সঙ্গে এসে মিশেছে অজস্র পুরাবৃত্ত। ইতিহাস ও পুরাণের সামাজিক ব্যবহার এতই প্রবল যে কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ঘটনা বা চরিত্র বা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ‘লিজেন্ড’ হিসাবে পরিচিত পেয়ে যায় অনায়াসে। যেমন, রামায়ণের ঘটনা থেকে ‘ঘর শত্রু বিভীষণ’ কিংবা পলাশির যুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বাংলার সমাজে ‘মীরজাফর’ আর ‘বিশ্বাসঘাতক’ সমার্থক হিসাবে সর্বজনবিদিত। অর্থাৎ পুরাণ বা ইতিহাসের ঘটনাক্রম যেমন আকারে সমাজে বিস্তার লাভ করে সেই সমাজের মানুষদের মৌখিক বিশ্বাস, আচার-সংস্কারের মধ্যেও তেমন ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। ছেলেদের ‘রাম’ নামের আধিক্য থাকলেও মেয়েদের ‘সীতা’ নামকরণ সেই তুলনায় কম। বস্তুত, এসবই পুরাণ, লোককথা, কিংবদন্তি মানুষের যাপিত জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে

জড়িয়ে থাকার ফলাফল। যদিও বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে প্রাচীন গল্পগাথা এই সময়ের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ অনেকেই বিশ্বাস করে না। কেননা বিজ্ঞানের সঙ্গে মিথ-পুরাণের বেশিরভাগ স্থানেই ঘোর বিরোধ। মিথ-পুরাণের ঈশ্বর-সম্পৃক্ত কাহিনি এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সম্পর্কিত দার্শনিক প্রতীতি মানুষের চেতন-অবচেতন স্তরে বিশ্বাসের আকার নিয়ে অবস্থান করেছিল। মানুষের সংস্কার ও ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে মিথের গভীর যোগ রয়েছে। আদিকালের এই বিশ্বাস ও সংস্কারই সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মিথ-পুরাণের রূপ গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে ইতিহাসের সঙ্গে মিথ-পুরাণের সাযুজ্য থাকলেও দুইয়ের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ও দ্বন্দ্বিকতা বিস্তর। এক অর্থে বলা যায়, ইতিহাস বা পুরাণের কোনো ঘটনা মিথে পরিণত হতে পারে, কিন্তু কল্প-মিথ কখনই ইতিহাস নয়।

পুরাণ অপরিবর্তনীয়, স্থিরীকৃত এবং পুরাণের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস অবিচল যাদের, তাদের কাছে পুরাণের কাহিনি, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতিশাস্ত্র, আইনমালা হল সর্বোত্তম পন্থা। তা কখনও ঈশ্বর-গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত বা কখনও ঈশ্বরের অবতার দ্বারা নির্মিত। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানে বিশ্বাসের স্থান নেই, তা প্রামাণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিজ্ঞান একটি চলমান প্রক্রিয়া। পুরাণ মানুষের ‘জন্ম-মৃত্যু-ঈশ্বর-পরকাল-জন্মান্তর’ সংক্রান্ত বহু তথ্য দিলেও তার সপক্ষে প্রামাণ্য কোনো দলিল নেই। অন্যদিকে বিজ্ঞান রহস্যময় বিষয়গুলির জট ছাড়িয়ে তার কার্য-কারণ তত্ত্ব নির্মাণ করে চলেছে নিরন্তর। বিজ্ঞানে ‘পরম সত্য’ (Ultimate Truth) বলে কিছু নেই, বিজ্ঞান তার ‘সর্বোচ্চ সম্ভাবনা’র (Best possible) উপর দাঁড়িয়ে থাকে, যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে Falsifiability বা খণ্ডনযোগ্যতা।^{২২} ‘আমি জানি না’, অথবা ‘আমি ভুল জানতাম’— বিজ্ঞানের কাছে এই হল পবিত্রতম বাক্য। সংশয়ের আলোর থেকে উজ্জ্বল কোনো আলোও তার কাছে নেই।^{২৩} অর্থাৎ কোনো নতুন

তথ্য বিজ্ঞানের যৌক্তিকতায় পুরানো তথ্যের চেয়ে এগিয়ে থাকলে বিজ্ঞান পুরানো তথ্যকে সানন্দে বাতিল করতে পারে। পুরাণ বা মিথের মতো যা কিছু মানুষের চেতনার মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে চিরদিন। তা পাল্টানোর ক্ষমতা কারোর নেই, কারণ পুরাণ বিশ্বাসীদের কাছে তা ‘চরম সত্য’। এখানেই মানুষের সমস্ত ‘জিজ্ঞাসা’ ও ‘জানা’-তে ছেদ পড়ে যায়। কিন্তু সেই অজানাকে জানার উদ্দেশ্যেই এগিয়ে যায় বিজ্ঞান। অথচ সভ্যতার আদি থেকেই ‘জানিবার গাঢ় বেদনা’ নিয়েই মানুষের যাত্রা শুরু। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যেই মানুষ ক্রমশ গুহাবাসী থেকে সভ্য হয়েছে। একা থাকতে থাকতে জোট বেঁধেছে। দলবল নিয়ে তৈরি করেছে সমাজ গড়ার কাজ। আদিমতা থেকে সভ্য হবার পথে মানুষ তার ‘অনুভূতিপ্রদেশ’ থেকে উঠে আসা কোটি কোটি গল্পগাথা নিয়ে গড়ে তুলেছে আকর গ্রন্থাদি, শিলালিপি, ফলক, পাথরের রেখাচিত্র। যার স্তর থেকে স্তরান্তরে মিথ-পুরাণের মূর্ছনা। যার সঙ্গে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অন্তর্বিরোধ বিদ্যমান। আজ এই একুশ শতকের বিজ্ঞান জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে কোটি কোটি বছর আগের নক্ষত্রপুঞ্জ-ছায়াপথের (Galaxy) চিত্তাকর্ষক ছবি দেখিয়ে তাবৎ মানব জগৎকে তাক লাগিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে ‘ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্ব ও ধর্মের গালগল্প’কে ছাড়িয়ে বিজ্ঞান ছুটে চলে Exoplanet-এর সন্ধানে। এই বিরাট নক্ষত্রপুঞ্জের অন্য সৌর পরিবারে নানান গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা তা এখন বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। অথচ পুরাণ নির্ভর মানুষ সে পথে হাঁটতে ভয় পায়, কেননা তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ পথ মেলে না। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষেরই সংস্কৃতির আঙিনায় ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পুরাবৃত্ত। যা বিশ্বাসীদের কাছে আইনের নিয়ামক রূপে জোরালো এবং কংক্রিট। ধর্ম ও বিজ্ঞানের যুগপৎ ছত্রছায়ায় মানুষ তার ভাষাদেশ থেকে আমদানি করেছে শব্দ-অক্ষর। গড়েছে ইতিহাস। সৃষ্টি করেছে সাহিত্যের নানা সংরূপ। রচনা করেছে গল্প, উপন্যাস, নাটকের মতো কল্প-আখ্যান।

ভারতীয় মিথ-পুরাণ নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে বহু গল্প-উপন্যাস রচিত হলেও বিদেশি (বিশেষত ইহুদি, খ্রিস্টীয় ও ইসলামি মিথ-পুরাণ) পুরাণ নিয়ে বাংলা গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ইসলামি পুরাণ ও ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা বলা যায় মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) *বিষাদ সিন্ধু* (১৮৮৫-১৮৯১)। কারবালার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাস ঐতিহাসিক আখ্যানের দাবি করলেও অজস্র অলৌকিক ঘটনার সংমিশ্রণের কারণে সাহিত্য চিন্তক ও সমালোচকদের একাংশ *বিষাদ সিন্ধু*-কে খাঁটি উপন্যাস হিসাবে মানতে নারাজ। *বিষাদ সিন্ধু* যথাক্রমে ১৮৮৫, ১৮৮৭ ও ১৮৯১ সালে তিন ভাগে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীকালে একখণ্ডে মুদ্রিত হয়।

এ উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে রয়েছে কারবালার যুদ্ধের আভাস, উত্তাপ ও তার পরিণতি। কারবালার যুদ্ধ আরবি বর্ষপঞ্জি অনুসারে মহরম মাসের দশ তারিখ ৬১-হিজরিতে (ইংরেজি ১০-অক্টোবর, ৬৮০-খ্রিস্টাব্দ) বর্তমান ইরাকের কারবালা নামক প্রান্তরে সংঘটিত হয়েছিল। হজরত মুহম্মদের নাতি হোসেন এবং তার অল্প কিছু সমর্থক-আত্মীয়, উমাইয়া খলিফা প্রথম ইয়াজিদের বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে হোসেনসহ তার সকল সমর্থক নিহত হয় এবং নারী ও শিশুরা বন্দি হয়। *বিষাদ সিন্ধু*-র প্রধান চরিত্রগুলি নামের দিক থেকে ঐতিহাসিক হলেও ঘটনার বর্ণনায় এবং চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। এছাড়া কিছু উপকাহিনি সংযুক্ত হয়েছে যা যথার্থ ঐতিহাসিক নয়। গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক জানিয়েছিলেন তিনি পারস্য ও আরবীয় গ্রন্থ থেকে ঘটনার মূল সারাংশ সংগ্রহ করেছিলেন। গ্রন্থের ‘উপক্রমণিকা’ অংশে লেখক লিখেছেন হজরত মুহম্মদ স্বর্গীয় দূত জিবরাইল মারফত জানতে পেরেছিলেন, যে তাঁর প্রিয় কোনো মানুষের মধ্যে থেকেই

কেউ তাঁর দৌহিত্র হাসান-হোসেনের পরম শত্রু হবে। হাসানকে বিষপান করিয়ে হত্যা করবে এবং হোসেনকে অস্ত্রাঘাতে নিধন করবে। ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে মীর মশাররফ এ গ্রন্থ রচনা করলেও ঘটনার আদ্যোপান্ত জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ইসলামি ধর্মীয়-কথার মূর্ছনা। পৌরাণিক দৃষ্টিকোণ থেকে কারবালার যুদ্ধ পূর্ব-নির্ধারিত একটি বিষয় এবং হাসান-হোসেনের মৃত্যু কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, তা যেন অনিবার্য নিয়তি। পুরাণ এবং ইতিহাসের ঘটনা মাত্রই সর্বজনীনতার দাবি করে। কারবালা এক অর্থে ধর্মযুদ্ধ (জেহাদ)— বস্তুত, এই ঘটনা সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মিথের আকার নিয়েছে। ইতিহাস পুনঃপ্রোথিত হতে হতে মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস সত্যের আকার ধারণ করে। আজও প্রতি বছর মহরম মাসের ১০-তারিখ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ হোসেনের ট্রাজিক পরিণতিকে স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে ‘মহরম’ উৎসব পালন করে।

বিষাদ সিন্ধু-র বয়ান অনুসারে, কারবালার আনুপূর্বিক ঘটনা হজরত মুহম্মদের জ্ঞাত হলেও হাসান-হোসেনের ট্রাজিক পরিণামকে নিয়তি হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ইসলামি পুরাণে নিয়তির ধারণা স্বীকৃত নয়। ইসলামি শাস্ত্র অনুযায়ী, ইহজগতের সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণা-বিষাদ এসবই ঈশ্বরের হরেকরকম পরীক্ষা। ইসলাম ধর্মের আকর গ্রন্থ *কোরান*-এর ২ সংখ্যক সূরাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।^{২৪} আখ্যানে শাহেরবানুকে বলা সালেমা বিবির কথার মধ্যেও সেই তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন মীর মশাররফ হোসেন।

ও কথা মুখে আনিও না— বিপদ, ব্যাধি, জরা জগতে নূতন নহে। নূরনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার পরিজন হইলেই যে, ইহজগতে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে না, এ কথা কখনই অন্তরে স্থান দিও না। ঈশ্বর মহান, তাঁহার শক্তি মহান। কত নবি, কত অলী, কত দরবেশ, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। কত শত সহস্র মহাপুরুষ, যোগী, ঋষি এই ভবে জন্মিয়া গিয়াছেন! কত ভক্তের মন পরীক্ষার জন্য তিনি কত কি করিয়াছেন।

তুমি জানিয়া শুনিয়া আজ সেই সকল ভুলিয়া যাইতেছ? ছিঃ! ছিঃ! ঈশ্বরে নির্ভর কর। তুমি কি সকলই ভুলিয়া গিয়াছ? হজরত আদমকেও বেহেশতের চির-সুখশান্তি পরিত্যাগ করিয়া চির-সন্তাপহারিণী নয়নের মণি, পরম প্রিয়তমা, প্রাণের প্রাণ, অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিণী বিবি হাওয়ার সহিত বিচ্ছেদে এক নয়, দুই নয়, ৪০ বৎসরকাল সজল নয়নে দেশদেশান্তরে, পর্বতে, বিজনে, প্রান্তরে মহাকষ্টে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। হজরত ইব্রাহিমকেও গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা মধ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। হজরত নূহ পয়গম্বরকেও জলে ভাসিতে হইয়াছিল। হজরত আইউবকেও মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মহাকষ্ট পাইতে হইয়াছিল। হজরত ইউসুফকেও অন্ধকূপে ডুবিতে হইয়াছিল। হজরত ইউনুসকেও মৎস্যের উদরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। হজরত জাকরিয়াকেও করাতে দ্বিখণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। হজরত মুসাকেও প্রাণভয়ে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল। ঈসাইদিগের মতে হজরত ঈসাকেও শূলে আরোহণ করিয়া প্রাণবিসর্জন করিতে হইয়াছিল। আমাদের হজরত মোহাম্মদ কি কম বিপদে পড়িয়াছিলেন। প্রাণভয়ে তাঁহাকে জন্মভূমি মক্কা নগর পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে মদিনা যাইতে হইয়াছিল। ইঁহারা কি বিপদকালে ঈশ্বরের নাম ভুলিয়াছিলেন? নূরনবী মোহাম্মদের কথা একবার মনে কর। ঈশ্বরের আদেশে তিনি কি না করিয়াছেন? রাজাধিরাজ সাদ্দাদ, নমরুদ, ফেরাউন, কারুণ— ইঁহাদের অবস্থাও একবার ভাবিয়া দেখ। ধন-বল, রাজ্য-বল, বাহু-বল প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা কত বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই সকল প্রাচীন কাহিনী, প্রচীন কথা, কেবল সেই অদ্বিতীয় ভগবানের মহাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া দিতেছে। তিনি কি না করিতে পারেন? আজ ওমর আলীর প্রাণবধ হইবে, কাল এজিদের প্রাণ যাইতে পারে। ঈশ্বর যাহা ঘটাইবেন, তাহা নিবারণের কাহারও ক্ষমতা নাই। তিনি সর্বপ্রকারে দয়াময়— সকল অবস্থাতেই করুণাময়! ভাবিলে কি হইবে?— আর কাঁদিলেই বা কি হইবে?^{২৫}

ধর্মীয়-পুস্তকে উল্লেখিত নবিদের জীবন ও যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত হয়েছে। কারবালার ঘটনা গ্রামবাংলার মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিছু আর্কেটাইপ বা প্রতীকী মৌখিকভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। তেমনই একটি মিথ হল, যে পুরুষ মানুষের বুকে লোম নেই, সে নির্দয় ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়। হোসেনকে হত্যা করেছিল এজিদের সেনাপতি সিমার। মীর মশাররফ হোসেনের আখ্যানের বয়ান অনুসারে লোমহীন পুরুষের হাতে হোসেনের জীবননাশ হবে একথা হোসেন তার মাতামহ হজরত

মুহম্মদের তরফ থেকে জানতে পেরেছিল। কারবালার প্রান্তরে বুক দেখেই হোসেন চিনে নিয়েছিল তার হস্তারককে। সিমার ও হোসেনের উক্তি-প্রত্যুক্তি পর্যবেক্ষণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মাতামহ আমাকে বলিয়া গিয়াছেন: রক্তমাংসে গঠিত হইলেও যে বক্ষ লোমশূন্য, সে বক্ষ পাষণময়, সেই লোমশূন্য বক্ষই তোমার কাতেল; যাহার বক্ষ লোমশূন্য তাহারই হস্তে তোমার নিশ্চয়ই মৃত্যু! মাতামহের বাক্য অলঙ্ঘনীয়। সীমার! তোমার বক্ষের বস্ত্র খুলিয়া ফেল। আমি দেখি, যদি তাহা না হয়, তবে তুমি বৃথা চেষ্টা করিবে কেন? তোমার জীবনকাল পর্যন্ত আমাকে এ প্রকারে যন্ত্রণা দিয়া,— সহস্র চেষ্টা করিলেও আমার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

সীমার গাত্রের বসন উন্মোচন করিয়া হোসেনকে দেখাইল; নিজেও দেখিল। হোসেন সীমারের বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুই হস্তে দুই চক্ষু আবরণ করিলেন।^{২৬}

বিষাদ সিদ্ধ-র স্রষ্টা ইতিহাসের বিষয়কে আখ্যান নির্মাণের জন্য বেছে নিলেও এ কথা বলতে দ্বিধা নেই তাঁর অন্বিষ্ট ছিল ধর্মীয় কাহিনির আদল ও পরিসরকে অক্ষুন্ন রাখা, যার কারণে বস্তু-ইতিহাস এবং কল্প-ইতিহাসের বিভাজনরেখা কথাকারের কল্পনা ও ভাবপ্রতিভার সম্মিলনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যিক সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) লেখা *অভিশপ্ত নগরী* (১৯৬৭) ও *পাপের সন্তান* (১৯৬৯) উপন্যাস দুটি *বাইবেল*-এর কাহিনি অবলম্বনে রচিত। দুটি উপন্যাসের প্রেক্ষাপট জেরুজালেম। মধ্যপ্রাচ্যের জেরুজালেম এমন এক নগরী, যার শরীরে শতাব্দী প্রাচীন ইতিহাস, পুরাণ-মিথের উৎস ও বিবর্তনের কাহিনি লেপটে রয়েছে। এই নগরীই পৃথিবীর তিন একেশ্বরবাদী ধর্ম- ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলামের ভিত্তিভূমি এবং তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও আন্তঃসম্পর্কের অন্তঃস্থল। *অভিশপ্ত নগরী* উপন্যাসটির অন্তর্ভবনে ইতিহাসের প্রাধান্য থাকলেও চরিত্র নির্মাণে লেখক বাইবেলের ‘ওল্ড টেস্টামেন্টে’র আশ্রয় নিয়েছেন। এ উপন্যাসের মূল চরিত্র যেরেমিয়া। যিনি একটি গোষ্ঠীর

প্রতীক হিসাবে আখ্যানে উঠে এসেছেন। মিথের কাহিনি হলেও লেখক যেরেমিয়ার ‘জার্নি’কে বিদ্রোহী প্রধান নায়কের মতো করে তুলে ধরেছেন। যেরেমিয়ার মানুষ থেকে নবিত্বে উন্নীত হওয়া, এবং আত্মকলহে লিপ্ত, ধর্মবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হতভাগ্য ইহুদিরা যখন জেরুজালেমে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে, তখন যেরেমিয়ার বাণী জেরুজালেমবাসীদের বাঁচার মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। যেরেমিয়া জেরুজালেমবাসীদের বলেছেন ‘পাপের সন্তান’ এবং জেরুজালেমকে বলেছেন ‘অভিশপ্ত নগরী’। মিশরপন্থী ও বাবিলপন্থীদের যুদ্ধ উপন্যাসের উপকাহিনিতে অন্য মাত্রা বিন্যস্ত করেছে। *বাইবেল*-এর প্রাচীন কাহিনি ও অতীত ইতিহাসের মানুষের যুদ্ধযাত্রা, পূজা পদ্ধতি ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বকে লেখক আধুনিকতার উপত্যকায় এনে দাঁড় করিয়েছেন, যেখানে শোষিত এবং শোষকের মধ্যকার সম্পর্কের প্রতীতি নিত্য নবীয়মান হয়ে ওঠে।

পাপের সন্তান উপন্যাসটি *অভিশপ্ত নগরী* উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড হিসাবে নির্মিত হয়েছে। এ উপন্যাসের মূল কাহিনি ইহুদিদের পুনর্বাসন এবং নতুন নগর নির্মাণ। *অভিশপ্ত নগরী* উপন্যাসে ক্যালদীয় বাহিনীর হাতে জেরুজালেম ধ্বংস হয়েছিল, তারপর থেকেই *পাপের সন্তান*-এর সূচনা। ছিন্নবিচ্ছিন্ন ইহুদি জাতির মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন, সেইসঙ্গে ধর্ম বা জাতিগত ভেদাভেদ ও বৈষম্যের অবসান ইত্যাদি বিষয়গুলি সমকালীন সমাজ বাস্তবতাকে ছুঁয়ে যায়। আখ্যানের নায়ক মিকার ইহুদিদের গরিব বস্তিতে আগমন, মানুষের পাশে থাকার বার্তার মধ্যে দিয়ে লেখক যেন তাঁর কাক্ষিত নগরীকে নির্মাণ করেছেন। যেখানে মানুষ সত্য, মানুষকে ভালোবাসাই শেষ সত্য।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর (১৯২২-১৯৭১) কথাসাহিত্যে গ্রামীণ মুসলমান সমাজের বিশ্বাস, আচার-সংস্কার, লোকায়ত ও পৌরাণিক ইসলামি মিথের বিবিধ প্রসঙ্গ উপস্থাপিত

হয়েছে। বিশেষত, *লালসালু* (১৯৪৮) ও *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) উপন্যাস দুটিতে অঙ্কিত হয়েছে প্রাচীনপন্থী মানুষদের ধর্মাত্মক মানসিকতা ও ধর্মব্যবসায়ীদের মিথ্যাচার, ভণ্ডামি ও অন্ধবিশ্বাস। *লালসালু*-র জনপদে ধার্মিক বা মুক্তমনা মানুষের চেয়ে ‘ধর্মের আগাছা বেশি’— কথাকার ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মকে আক্রমণ করে কোনো বয়ান প্রকাশ করেননি, ধর্মব্যবসায়ীদের মুখ ও মুখোশের দ্বন্দ্বকে টেনে-হিঁচড়ে প্রকাশ করে দিয়েছেন। আখ্যানে দেখা যায়, ধর্মভীরু গ্রামীণ মুসলমান সমাজের সাধারণ মানুষের সরলতাকে কেন্দ্র করে মজিদ নামক এক চতুর ধর্মব্যবসায়ী কল্পিত মাজারকে কেন্দ্র করে কীভাবে ‘গোঁড়া সমাজে’র উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা পায়। নাটকীয়ভাবে একদিন মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করে মজিদ। ‘দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দুবেলা খেয়ে বাঁচবার জন্য’ তার অভিসন্ধি এবং লোকায়ত মিথকে আশ্রয় করে গ্রামের বাঁশঝাড়ের পাশে পুরানো এক জীর্ণ কবরকে অবলম্বন করে সে খুলে বসে তার অর্থ-উপার্জনের পসার। যে কবর আখ্যানে ‘মোদাচ্ছের পীরের মাজার’ হিসাবে চিহ্নিত। কবর পূজা বা পিরপূজা শরিয়তি ইসলাম মান্য করে না। লোকায়ত মিথ রূপে মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের একাংশ কবরপূজা-মানত-শিল্প-ধূপ প্রজ্জ্বলন করে থাকে। গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের দলভুক্ত করার পাশাপাশি মজিদ গ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি খালেক ব্যাপারীকে দোসর হিসাবে পাশে পায়। এইভাবে— ‘একজনের আছে মাজার আরেকজনের জমিজোত প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্রা, পথ তাদের এক।’ যুগ-যুগ ধরে প্রচলিত কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয়-ভীতি এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। সেইসঙ্গে রহিমা ও জমিলা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক মুসলিম নারীর যৌনশোষণের দিকটিও স্পষ্ট করে তুলেছেন। অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধ অনুকরণ মানুষকে কী পরিমাণ পাপবুদ্ধির অধিকারী এবং মানুষ পতিত হয় অশিক্ষার অন্ধকারে তা উন্মুক্ত করেছে *লালসালু*।

চাঁদের অমাবস্যা মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস হলেও এ উপন্যাসের বহিরঙ্গে নিম্ন-মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের পৌরাণিক বিশ্বাস ও সংস্কারের কথা বিধৃত হয়েছে। আখ্যানের শুরুতেই পাঠকের সঙ্গে পরিচয় হয় দরিদ্র স্কুলশিক্ষক আরেফ আলীর। গোটা আখ্যান জুড়ে যার নাম খুব বেশি ব্যবহৃত হয়নি। লেখক পাঠকের কাছে তার পরিচয় দিয়েছেন যুবক শিক্ষক হিসাবে। এই যুবক শিক্ষকই এ উপন্যাসের মূল চরিত্র, যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় উপন্যাসের অন্তর্মুখী ঘটনাপ্রবাহ। শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত্রে যুবক শিক্ষক একজন যুবতীর মৃতদেহ দেখে। জামগাছের তলায় দাঁড়িয়ে তার মনের ছটফটানি, দ্বন্দ্বিকতা ও অন্তরাত্মার কোলাহলকে লেখক অতীতের গা ছমছমে নস্টালজিয়া এবং ইসলামি পুরাণের সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছেন:

বালক বয়সে পরপর তিন বছর লায়লাতুল কদরের রাতে যুবক শিক্ষক সমস্ত রাত জেগেছিলো এই আশায় যে, গাছপালাকে ছেজ্জা দিতে দেখবে। গাছপালার এমন ভক্তিমূলক আচরণে আজ তার বিশ্বাস নাই, কিন্তু রাত্রি জাগরণের ফলে তার মনে যে-নতুন ধারণার সৃষ্টি হয় সে-ধারণা এখনো সে যেন কাটিয়ে উঠতে পারে নাই।^{২৭}

ফার্সি ‘শব’ শব্দের অর্থ রাত্রি এবং আরবি ‘কদর’ শব্দের অর্থ সম্মান বা মর্যাদা। একে ইসলামি পরিভাষায় ‘লাইলাতুল কদর’ও বলা হয়। আরবি ভাষায় ‘লাইলাতুল’ শব্দের অর্থ হল রাত্রি বা রজনী। হাজার বছরের উপাসনার চেয়েও এই রাতের উপাসনাকে উত্তম বলা হয়েছে কোরানে। আরবি বর্ষপঞ্জির আরবি রমজান মাসের (মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের রোজার মাস) শেষ দশ দিনের ২১,২৩,২৫,২৭,২৯- এর মধ্যে একটি রাত্রি হল শবে কদর। নির্দিষ্ট দিনের উল্লেখ নেই কোথাও। ইসলাম ধর্মপ্রচারক মহানবি হজরত মুহম্মদের অনুসারীদের সম্মান বৃদ্ধি করা হয় এই রাতে। শবেকদর সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইসলামি পুরাণে বলা হয়েছে, হজরত মুহম্মদের পূর্ববর্তী নবি এবং তাঁদের অনুসারীগণ দীর্ঘায়ু লাভ লাভ করার ফলে বহু বছর আল্লাহর উপাসনা (এবাদত) করার সুযোগ

পেতেন। কিন্তু মুহম্মদ থেকে শুরু করে তাঁর পরবর্তী অনুসারীগণের আয়ু অনেক কম হওয়ায় তাদের পক্ষে স্রষ্টার আরাধনা করে পূর্ববর্তীদের সমকক্ষ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয় বলে তাদের মাঝে আক্ষেপের সৃষ্টি হয়। এই আক্ষেপের প্রেক্ষিতে তাদের চিন্তা দূর করার জন্যে সুরা কদর রচিত হয়।^{২৮} শবেকদরের রাতের উপাসনা তাই হাজার রাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এই রাতে ফেরেশতারা মর্ত্যে আসে, সমস্ত গাছ ও বৃক্ষলতাপাতা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজ্দা করে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মূলত ধর্মাত্মক মানুষদের বিশ্বাস ও গ্রামীণ নিষ্প্রাণ সমাজের ধর্মব্যবসায়ীদের মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজের একটি বিশেষ দিককে উন্মোচিত করেছেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) ও *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) উপন্যাস ও বহু গল্পে ইসলামি পুরাণ ও লোকায়ত মিথের প্রসঙ্গ এসেছে। ইলিয়াসের মিথ মূলত আঞ্চলিক জনমানসের ধর্মবোধ ও অতীতের কোনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লোকায়ত বিশ্বাসের সম্মিলন। লেখকের প্রথম প্রকাশিত *অন্য ঘরে অন্য স্বর* (১৯৭৬) গল্পগ্রন্থের ‘ফেরারি’ গল্পের অন্তর্বর্তনে রয়েছে মিথের মূর্ছনা। ইলিয়াসের গল্প-উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে হ্যালুসিনেশন ও ইলুশন-এ জর্জরিত মানুষের অসুস্থতা ও যাপিত জীবনের হরেকরকম গল্পগাথা। একটি সাক্ষাৎকারে ইলিয়াস জানিয়েছিলেন:

গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রচলিত গাথা-মিথ বলেন, কেচ্ছা বলেন— আমাকে বরাবরই আকৃষ্ট করে।... ঢাকা শহরের পুরনো এলাকার ভিকটোরিয়া পার্কের আশেপাশে সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকে একজন গলাকাটা ব্যর্থ হলে সায়েবরা তাকে ফাঁসিতে ঝোলায়।^{২৯}

‘ফেরারি’ গল্পের ইব্রাহিম ওস্তাগর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে গল্পকার গ্রামীণ মুসলমান সমাজের জ্বিন-পরিষর মতো অদৃশ্য ছায়াশরীরের বর্ণনাকে মূর্ত করে তুলেছেন। ইসলামি

পুরাণ অনুসারে, কোরানের আয়াত পাঠ করলেই জ্বিন বা শয়তান ভয়ে পলায়ন করে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জ্বিন-পরিহ হাত থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ হল কোরানের সুরা-আয়াত। পাশাপাশি মুমূর্ষু বা মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের কানে কোরানের আয়াত গুঞ্জরিত হলে তার মনপ্রাণ শীতল হয়— গ্রামীণ জনমানসের ধর্মবোধ ও বিশ্বাসের বাস্তবতাকে ইলিয়াস নির্মোহ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন।

দোজখের ওম (১৯৮৯) গল্পগ্রন্থের শিরোনাম অঙ্কিত গল্পতেও শয্যাশায়ী, সম্ভানহারা ও বিপত্নীক কামালউদ্দিনের স্বপ্ন ও হ্যালুসিনেশন-এর মধ্যে দিয়ে ইলিয়াস গ্রামীণ মুসলিম জনমানসের ইসলামি ধর্মবোধ সম্বলিত পৌরাণিক বিশ্বাসকে যেমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, পাশাপাশি বার্ষিক্যজনিত অসুস্থতা, দুঃখী ও মানসিক দ্বন্দ্ববিদীর্ণ জীবন যে দোজখ বা নরকবাসের চেয়েও কোনো অংশে কম নয়— যন্ত্রণার সেই আততিকেও যেন স্পষ্ট করে তুলেছেন। দোজখ ফার্সি শব্দ। জাহান্নাম বা দোজখ ইসলাম শাস্ত্রের খুব পরিচিত শব্দ। ইসলামি পরিভাষায় দোজখ হল পরকালের জন্য পাপীদের আবাসস্থল। কোরান ও হাদিসে দোজখ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। কোরানে দোজখের সাতটি ভাগ বা স্তরের কথা বলা হয়েছে। যথা, জাহান্নাম, হুত্বামা (চূর্ণবিচূর্ণকারী বহ্নিশিখা), সাকার (ঝলসানো বা গলানো), জাহিম (জ্বলন্ত আগুন), লাযা (লেলিহান অগ্নিশিখা), সাঈর (উজ্জ্বল অগ্নিকাণ্ড), হাবিয়া (অতল গহ্বর)। এর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নরক হল হাবিয়া। নরকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর হল হাবিয়া। কামালউদ্দিনের মৃত স্ত্রীর সঙ্গে স্বপ্নে বা হ্যালুসিনেশন-এর কথোপকথন ইলিয়াসের শিল্পিত প্রকাশভঙ্গিতে ইহলোকের উদ্বেগ, ক্লান্তি, বেদনা যেন ইসলামি পুরাণের অলৌকিক নরকের কল্পরূপে মিশে যায়। কামালউদ্দিনের উক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তার খোদার প্রতি অভিযোগ-অনুযোগের ইস্তাহার:

আল্লা তুমি আমারে দুনিয়ার মইদ্যে দোজখ দ্যাহাও ক্যালায়? আমি তোমার কী করছি?
আমারে উঠাইয়া লও। আমারে তুমি যতো খুশি গোরআজাব করো, মগর এই দুনিয়ার
দোজখ থাইকা আমারে নাজাত দাও।^{৩০}

মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণের ক্ষেত্রে ইলিয়াস মিথকে আশ্রয় করে সমাজ-জীবনের
অন্তরাত্মাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। বস্তুত, তাঁর আখ্যান মিথের মূল গল্পকে ভেঙে
বহুমাত্রিক ধারায় ধাবিত হয়েছে, কখনও অলৌকিকতার খোলস ছেড়ে তার মানবিক
আবেদন ব্যাপক ও বৃহৎ হয়ে উঠেছে। ইলিয়াসের মিথের পুনর্বিন্যাস শেষ পর্যন্ত ধর্মাত্মতার
বর্ম ছেড়ে মানবতাবাদ এবং মনুষ্যত্ব-উদ্বোধনের সরণিতে এসে দাঁড়িয়ে যায়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের (১৯৩০-২০১২) *উত্তর জাহুবী* (১৯৭৪), *অলীক মানুষ*
(১৯৮৮) ও *জানমারি* (১৯৮৯)-র মতো উপন্যাসগুলিতে ইহুদি পুরাণ ও ইসলামি লৌকিক
মিথের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। *উত্তর জাহুবী* উপন্যাসের অন্তর্ভবনে রয়েছে ইসলামি
পুরাণ ও মিথের অনুসঙ্গ। জুহা মৌলবি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ মুসলিম আচার,
হানাফি-ফারাজি সম্প্রদায়ের দ্বৈরথ, মানুষের অলৌকিক বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়গুলি
উন্মোচিত হয়েছে। মুসলমানদের হানাফি ও ফারাজি সম্প্রদায়ের অন্তর্বিরোধ আখ্যানে
সাধারণ মুসলমানদের আত্মপরিচিতির ভাবনাকে উস্কে দিয়েছে। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর
পরবর্তী সময়ে ইসলামের বাহ্যিক উপাসনার নিয়ম-পদ্ধতি মূলত চারজন ইমামের নেতৃত্বে
সম্প্রসারিত হয়েছিল। বিশেষত সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে আইনশাস্ত্রের নানান নীতি
নির্ধারিত করেছেন চারজন ইমাম। এখান থেকেই মুসলমানদের ধর্মীয় উপাসনার
পদ্ধতিগত তফাতের কারণে চারটি গোত্রের উদ্ভব হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান দুটি
হল— ইমাম আবু হানিফার নিয়মনীতি নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘হানাফি সম্প্রদায়’ এবং ইবনে
ইদ্রিশ আশ-শাফির নিয়মনীতি নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘শাফি’ বা ‘ফরাজি’ সম্প্রদায়।^{৪০} ইতিহাস

খ্যাত উনিশ শতকের ‘ফরাজি আন্দোলনে’র সঙ্গে তথাকথিত আইনশাস্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। ফরাজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সূচিত হলেও পরবর্তীতে এটি কৃষক আন্দোলনের রূপ লাভ করেছিল। এই আন্দোলনের নামের সঙ্গে শাফির মতবাদের সাদৃশ্য থাকলেও শরিয়তি নীতিগত দিক থেকে কোনো মিল নেই। এ উপন্যাসের জুহা মৌলবি ফরাজি ধারার অনুসারী। রাঙামাটি নামক গ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও জীবনযাপনের বিভেদ ও মিলনের প্রসঙ্গটি সুকৌশলে কথাকার উত্থাপন করেছেন। ইসলাম ধর্মের হজরত আলী এবং হিন্দু পৌরাণিক দেবী কালীর পূজা করে একাংশ মুসলমান, যাদের সঙ্গে জুহা মৌলবির বৈরিতার সম্পর্ক। আখ্যানের উপকাহিনিতে ইয়াকুব নামক এক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক ইহুদি ও ইসলামি মিথের সমন্বয় ও আন্তঃসংযোগটির যোগসূত্র নির্মাণ করেছেন। ইয়াকুব ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েও কালীর সাধনা ও তন্ত্রসাধনা করত। সে কালীবাড়িতে পাঁঠাবলি দেখে উচ্ছসিত হয়ে হাততালি দিত। ইয়াকুবের পুত্র সন্তানের নাম ছিল ইসমাইল। এক অমাবস্যার রাতে ইসমাইল মারা যায়। অশরীরী আত্মার কোপে ছেলের মৃত্যু হয়েছে ভেবে ইয়াকুব ঘরের মেঝেতেই ইসমাইলকে কবরস্থ করে এবং কবরের ওপর বসে তন্ত্রসাধনা শুরু করে। গ্রামে লোকমুখে প্রচারিত হয় ইয়াকুব তার ছেলেকে নবি ইব্রাহিমের মতোই আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছে। ইহুদি ও ইসলামি পুরাণের আন্তঃসংযোগ ও অন্তর্বিরোধ রয়েছে আব্রাহাম বা ইব্রাহিমের উৎসর্গিত প্রসঙ্গ নিয়ে। ইহুদি পুরাণ মতে, আব্রাহাম তাঁর নিজ সন্তান (আব্রাহাম ও সারার পুত্র) ইসহাককে উৎসর্গ করতে উদ্যত হন, অন্যদিকে ইসলামি পুরাণ মতে, ইব্রাহিম ও দ্বিতীয় স্ত্রী হাজারার পুত্র ইসমাইলকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন ইব্রাহিম। ‘আদিপুস্তক’ রচিত হবার প্রায় চার হাজার বছর পর ইসলাম ধর্মের নবি হজরত মুহম্মদ *কোরান*-এ দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ইসমাইলকে উৎসর্গের সম্মান দিয়েছেন।

‘আদিপুস্তক’-এর বিতাড়িত ইস্রায়েল কোরান-এ মহাত্মা। ইসলাম ধর্মের অবশ্যপালনীয় কৃত্য (ইসলামি পরিভাষায় যাকে ‘ফরজ’ বলা হয়) হল পাঁচটি, যা ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ নামেও পরিচিত। প্রথম কৃত্য— কলেমা (মন্ত্রপাঠ অর্থাৎ ধর্মের উপর বিশ্বাস), দ্বিতীয় কৃত্য— নামাজ (দিন-রাত মিলিয়ে মোট পাঁচবার নামাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা করা), তৃতীয় কৃত্য— রোজা (আরবি বর্ষপঞ্জির ‘রমজান’ নামক মাসে ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিরন্তর উপবাস), চতুর্থ কৃত্য— জাকাত (স্বীয় সম্পদ এক বছরের বেশি সময় ভোগ করার পরেও যদি তার অতিরিক্ত সম্পদ থেকে যায়, তবে সেই সম্পদ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ দান করা), পঞ্চম কৃত্য— হজ্জ (শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকলে মক্কা ও মদিনার ‘ইসলামি তীর্থ’ দর্শন এবং ধর্মীয় বিশেষ আচরণবিধি পালন করা, এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, যে ব্যক্তি হজ্জ যাত্রা করবেন তার কারণে বা তাঁর আসা-যাওয়ার আগে বা পরে তাঁর পরিবার যেন কোনোরকম আর্থিক সংকটের মধ্যে না পড়ে)। উল্লেখিত ইসলামি পুরাণ অনুসারে, এই পঞ্চম কৃত্যের ‘হজ্জ’— রীতি প্রচলিত হয় ইব্রাহিমের (কোরানে আব্রাহাম হলেন ইব্রাহিম) সময় থেকেই। ‘আদিপুস্তক’-এর বেরশেবা এবং উপন্যাসের বীর-লহয়-রোয়ী কূপ হল ইসলামি পুরাণের জমজম কূপ। হাজেরাকে ইব্রাহিমের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে বর্ণনা করেছে ইসলামি পুরাণ। ধূ ধূ মরুপ্রান্তরে যখন হাজেরা জলের জন্য ছোট্টাছুটি করেছিলেন তখন শিশু ইসমাইলের পদাঘাতে ভূমি থেকে জল নির্গত হয় এবং সেটিই পরবর্তীকালে জমজম কূপে পরিণত হয়।^{৪১} জমজম কূপের কথা কোরান-এ সুস্পষ্টভাবে নেই, তবে মুসলমানদের হাদিসে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা জমজম কূপের জল পবিত্র বলেই বিশ্বাস করেন। হজ্জ-যাত্রীরা এই জল পান করেন এবং সঙ্গে করে বোতলবন্দি অবস্থায় নিয়ে আসেন। নির্বাসিতা ইগারের মর্মব্যথা ও যন্ত্রণা-বিষাদ উপন্যাসের মতো কোরান-এও রয়েছে।

তৃষ্ণার্ত শিশুর জলের জন্য হাজেরা মক্কার সাফা ও মারওয়া নামক পাহাড়ে ছুটে বেড়িয়েছিলেন।^{৪২} হাজেরার কষ্ট ও যন্ত্রণাকে অনুভব করার জন্যই হজ্জ যাত্রীদের সাফা-মারওয়া পাহাড় প্রদক্ষিণ করতে হয়।^{৪৩}

উপন্যাসের ইয়াকুব চরিত্রটির সঙ্গেও ইসলামি পুরাণের যোগ রয়েছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ গ্রামবাংলার ধর্মীয় তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ জমিতে ইয়াকুব চরিত্রটিকে উপস্থাপন করে মানুষের লোকবিশ্বাসের প্রোথিত শিকড়কে প্রতিস্থাপন করেছেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বহু চর্চিত ও আলোচিত উপন্যাস *অলৌকিক মানুষ*-এ ইসলামি পুরাণে উল্লেখিত জ্বিনের কথা, অলৌকিক জাদু বিশ্বাস, হানাফি-ফারাজি দ্বন্দ্ব, পিরপূজা সংক্রান্ত লোকাযত মিথের প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে লেখক মুসলমান সমাজের আচার-সংস্কৃতি ও অনাবিষ্কৃত প্রত্ন-ইতিহাসের দিকটি উন্মোচন করেছেন। এ উপন্যাস কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ইশতেহার, যা উনিশ-বিশ শতকের এক পির পরিবারের লৌকিক-অলৌকিক পরিমণ্ডলে ইসলামি মিথের নতুন এক দিগন্ত উৎসারিত করেছে।

জানমারি উপন্যাসে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ইতিহাস ও পুরাবৃত্তের যোগে গ্রামীণ লোকাচার ও সাধারণ ধর্মীয় বোধের অসংযমী প্রবণতাগুলিকে তুলে ধরেছেন শিল্পিত দৃষ্টিতে। মিথ-পুরাণের নেপথ্যে যে ক্ষমতার রাজনীতি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে তা দ্রষ্টার মতো কথাকারের বর্ণনায় স্পষ্ট। ক্ষমতাবানদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি এবং ব্যবহারিক বুদ্ধিতে নিতান্ত সাধারণ ধর্মভীরু মানুষ কীভাবে ঘাতকে পরিণত হয় তার বাস্তবতার ও গ্রামীণ জনমানসের ধর্মান্ততার দৌরাভ্য, ভয়, বীভৎসতা, জিঘাংসা, মৃত্যু—সবমিলিয়ে *জানমারি*-র আখ্যান যেন হনন-উল্লাসে মেতে ওঠা এক নিষ্ঠুর বধ্যভূমি। উপন্যাসের শেষে খ্রিস্টীয় পুরাণে যিশুর ত্রুশবিদ্বার মতো মর্মান্তিক ঘটনাকে লেখক গ্রামীণ

পরিবেশের ধর্মাত্ম মানসিকতার সঙ্গে একত্রীভূত করে তুলেছেন। ওহিদের পুত্র আনারুলের নির্দেশে আড়কাঠে বেঁধে কবরস্থানে নিয়ে আসে সোনারু খ্যাপাকে। আনারুলের সঙ্গীরা আড়কাঠকে মাটিতে পুঁতে সোনারু খ্যাপাকে আড়কাঠে বেঁধে ফেলে। তারপর ঝোড়ো হাওয়া-বাতাসের ভেতর ঝাঁকে ঝাঁকে নামে বৃষ্টিকণা, অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড় মেঘ শুরু করে গর্জন। সোনারু খ্যাপার ছটফটানি, কোলাহল বেড়ে গিয়েছিল। সে উচ্চারণ করেছিল:

আমি মৈরমের ব্যাটা/ আমার নাই চাটিপাটা/ আমারো ঘর দুনিয়াসংসার।^{৪৪}

এইভাবে সোনারু খ্যাপা ‘যথাযথ মরিময়পুত্রে পরিণত’ হয়েছিল এবং দুর্বোধ্য সুপ্রাচীন ভাষায় আতঁ চিৎকার করে বলেছিল— ‘এলি এলি লামা সা-বাজানি’। ‘Eli, Eli, LamaSabachthani’— হল আরামীয় ভাষায় একটি বাক্য, যার অর্থ ‘ঈশ্বর, ঈশ্বর, আমাকে কেন পরিত্যাগ করেছ?’— এটি *বাইবেল*-এর নতুন নিয়মে যিশুর শেষ কথা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

And about the ninth hour Jesus
cried with a loud voice, saying, Eli,
Eli, lama sabachthani? that is to say,
My God, my God, why hast thou
forsaken me?^{৪৫}

বাক্যটি মূলত যিশুর মৃত্যুর আগে তাঁর ঈশ্বরপিতার প্রতি করা একটি আকাজক্ষাময় আহ্বান। এটি *বাইবেল*-এর প্রতিটি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র বাক্য। এ উপন্যাসে খ্রিস্টীয় পুরাণের অনুষঙ্গে গ্রামীণ মুসলিম জনমানসের ক্ষমতার স্বর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

কথাকার আবুল বাশারের (জন্ম. ১৯৫১.) *মরুস্বর্গ* (১৯৯১) উপন্যাসে আছে একইসঙ্গে ইতিহাস ও মিথের ব্যবহার। আবুল বাশারের উপন্যাস মূলত ইহুদি ও ইসলামি পুরাণের পুনর্কথন, কেবল পুরাণ-নির্ভর নয়। খ্রিস্ট জন্মের হাজার বছর আগের প্রাচীন

পৃথিবীর প্রাচীন নগর সভ্যতার বিলুপ্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয় *মরুস্বর্ণ*। ইসলামি পুরাণে বর্ণিত, শাদ্দাদ বিন আদ নামের রাজা তৎকালীন নগর সভ্যতার নির্মাণ ও ভাস্করের বাস্তব সৌন্দর্য দেখে মর্ত্যে স্বর্গ গড়েছিল। ইলুদি এবং ইসলাম উভয় পুরাণে শাদ্দাদ নিন্দিত। কেননা সে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে স্বর্গ নির্মাণ করেছিল। আর তার ফলে ঈশ্বরের আদেশে শাদ্দাদের প্রাণ হরণ করেছিল যম দূত আজরাইল। নির্মিত স্বর্গ দেখার সৌভাগ্য হয়নি শাদ্দাদের। আধুনিক ঔপন্যাসিক আবুল বাশার পুরাণে অভিশপ্ত, নিন্দিত সেই চরিত্রের কাহিনি এবং ইতিহাসকে ও সেই অতীত বিশ্বকে বিনির্মাণ করছেন আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে।

আরব মরুভূমির বুকে একাধিক ধর্মের উদ্ভব এবং ঈশ্বর পূজার একাধিক মতভেদের মধ্যকার সংঘর্ষ ও যাযাবর- কৃষক গোষ্ঠীর সংকট— এই ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পরিবেশকে সামনে রেখে লেখক স্বপ্ন-সম্ভাবনাময় মানবিকতা ও মানবপ্রেমের জয়গান করতে চেয়েছেন সাদইদ নামক একজন সৈনিকের মধ্যে দিয়ে। সাদইদ এ উপন্যাসের নায়ক। ধর্মগ্রন্থে সাদইদ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, অতএব নিন্দিত। আর উপন্যাসের সাদইদ বিভেদ ও সংঘর্ষময় পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে মানবতার বন্ধন রচনা করতে বদ্ধপরিকর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পৌরাণিক কাহিনি ও মিথ ভেঙে আবুল বাশার মরুভূমির অতীত বিশ্বের ইতিহাস ও মিথকে পাঠককে অন্য চোখে দেখতে প্রণোদিত করেছেন। লেখক ইতিহাস ও পুরাণের কাহিনি নিয়ে আখ্যান রচনা করলেও সেই কাহিনির গভীরে আজকের পৃথিবীর মানুষের জাতধর্মের লড়াই, ঈশ্বর পূজার তারতম্য, মানুষের বিশ্বাসের অন্তর্বিরোধ ও দ্বন্দ্বের অবয়ব প্রকাশিত হয়েছে। *মরুস্বর্ণ*— তাই এক অর্থে, লেখকের আশাবাদী প্রত্যয়— যেখানে ইতিহাস ও পুরাণ এবং একালের সমাজজীবন এই তিনের ঘটেছে মেলবন্ধন।

মরুদেশ কেনানের সারগন বা রাজা শলোমনের বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত হয়েছে আবুল বাশারের *রাজাবলি* (১৯৯৭) উপন্যাস। ইতিহাসের শলোমন ছিলেন ইহুদিদের রাজা। আবার অন্যদিকে এই শলোমনই ইসলামি পুরাণে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বা নবি (Prophet) হিসাবে মান্য। ইসলামি পুরাণে শলোমনের অলৌকিক ক্ষমতার (মোজেজা) বর্ণনা রয়েছে। যেমন, পাখিদের ভাষা বোঝা, জ্বিন জাতিকে শাসন করার ক্ষমতা। আখ্যানকার তাঁর *রাজাবলি* নামক আধুনিক আখ্যানে রাজা শলোমন এবং নবি শলোমনের দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্বকে বিবৃত করেছেন। *রাজাবলি*-র পরতে পরতে দিব্যতন্ত্র আর রাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বের বীজ। রাজসত্তা এবং নবি সত্তার দ্বন্দ্ব শলোমনের পক্ষে হৃদয় বিদারক হয়েছে। যদিও এই হৃদয়কে দিব্য বলে হোক বা মনুষ্য চেতনা থেকেই হোক আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন শলোমন। শলোমনের জীবনের ঘটনাবলী ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’ এবং লোকায়ত পুরাণ নির্ভর হলেও উপন্যাসের প্রতিটিই চরিত্রই উঠে এসেছে রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে। পুরাণে শলোমনের দ্বৈতসত্তা গৃহীত হলেও ইতিহাসে তিনি শুধুই রাজা। শলোমনের হাতের অস্ত্রগুলি কখনও দিব্যাস্ত্র ছিল না, তা ছিল লোহার তৈরি। কারণ তাঁর যুগেই লোহা আবিষ্কার করেছে মানুষ। যাঁরা মরুভূমিতে প্রথম লোহা বানায় তারা ‘আদিপুস্তক’-এর অতি গৌণ চরিত্র কিন্তু ইতিহাসের চোখে তারা সম্মানিত। লোহার আবিষ্কর্তা এবং ঘোড়ার প্রথম ব্যবহারকারী হিটাইট জাতির সঙ্গে শলোমনের পূর্বপুরুষদের সংসর্গ অতি প্রাচীন।

প্রাচীন পুরাণে এবং ইতিহাসে উপেক্ষিত চরিত্রদের আবুল বাশার তাঁর উপন্যাসে ঠাঁই দিয়েছেন। ইতিহাস ও পুরাণের চরিত্রদের সঙ্গে লেখকের কল্পজাত চরিত্র এবং মৌখিক পুরাণ মিশে গিয়ে *রাজাবলি* হয়ে উঠেছে প্রকৃতপক্ষে এপিক, যার গভীরে সমকালীন যুগযন্ত্রণার চাপে মানুষের বিচ্ছেদ-প্রবণ মানসিকতা, ভাষা আর ধর্মের কারণে

মানুষের হীনমূল অবস্থা ও মানুষে মানুষে নিরন্তর দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রভৃতি সমস্যা জ্বলন্ত হয়ে আছে।

মহিষ মঙ্গলা কাব্য (২০১৩) উপন্যাসে রয়েছে খ্রিস্টীয় পুরাণের বাইবেল-এর ‘নতুন নিয়ম’-এ উল্লেখিত যিশু ও মেরির প্রসঙ্গ। কোরানে মেরি মরিয়ম নামে পরিচিত, নবি ঈশার সঙ্গেও যিশুর সাযুজ্য লক্ষণীয়। কোরান-এর বয়ান অনুযায়ী, মরিয়ম কুমারী অবস্থায় আল্লাহর অলৌকিক লীলায় গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং তার গর্ভেই জন্ম নিয়েছিলেন নবি ঈশা। কোরানে অতি অল্পসংখ্যক নারীদেরই নামের উল্লেখ আছে, কিন্তু মরিয়ম একমাত্র নারী যার নামে কোরানে একটি সুরা রচিত হয়েছে। মহিষ মঙ্গলা কাব্য উপন্যাসে আদিবাসী উদ্ভিন্ন যৌবনা মঙ্গলা মরিয়মকে অলি চৌধুরী ধর্ষণ করে এবং কুমারী মরিয়ম গর্ভবতী হয়। ধর্ষিতা মরিয়ম আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বাইবেলের দর্শনকে আশ্রয় করে নতুন করে বাঁচতে চেয়েছে। লেখক অপাপবিদ্ধা নারীর যন্ত্রণাময় জীবনকে আলোকিত করেছেন মানবতার দৃষ্টিতে। যেখানে খ্রিস্টীয় ও ইসলামি পুরাণের মরিয়ম ও আখ্যানের মরিয়ম একসূত্রে গ্রথিত হয়ে যায়।

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস (জন্ম. ১৯৫০) তাঁর বেশকিছু উপন্যাসে মিথ-পুরাণের অনুষ্ণ যেমন ব্যবহার করেছেন তেমনি পাশাপাশি তিনি মিথের পুনর্নির্মাণ ঘটিয়েছেন। ভারতীয় পুরাণের কাহিনি নিয়ে লেখা তাঁর প্রথম উপন্যাস ব্যাস (১৯৯৫)। ইহুদি পুরাণ ও মিথ নিয়ে লিখেছেন কানানগণ (শারদীয়া অনুষ্ণ, ১৯৯৭, গ্রন্থকারে প্রকাশ ২০০০) ও লামেদ-ওয়াফ (২০০৩)-এর মতো উপন্যাস। খ্রিস্টীয় বা বাইবেলীয় মিথ নিয়ে লিখেছেন অহিনকুল (শারদীয়া অনুষ্ণ ১৯৯৮, গ্রন্থকারে প্রকাশ ২০০২)। ইহুদি পুরাণ হিব্রু বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর ‘বুক অব জেনেসিস’-এ বর্ণিত কাহিনি অবলম্বনে শাহ্‌যাদ ফিরদাউস

কানানগণ উপন্যাসটি রচনা করেন। ইহুদি পুরাণ ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর ‘বুক অফ জেনেসিস’-এর চতুর্থ অধ্যায় জুড়ে আদম-ইভের দুই পুত্র কয়িন ও আবেলের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আখ্যানে কয়িন ও আবেলের দ্বন্দ্বিকতা এবং কয়িন কর্তৃক আবেলকে হত্যার প্রসঙ্গ পুরাণ আশ্রিত হলেও ঔপন্যাসিক পুরাণকথাকে হুবহু অনুসরণ করেননি। মূল কাহিনিতে রয়েছে, আবেল ছিল মেঘপালক এবং কয়িন ছিল কৃষক। আবেল তার পালিত পশু থেকে বাছাই করে সর্বোৎকৃষ্ট মেঘটি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিল এবং কয়িন নৈবেদ্য স্বরূপ জমির সর্বোৎকৃষ্ট ফসল উৎসর্গ করেছিল। ঈশ্বর আবেলের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তার নৈবেদ্য গ্রহণ করলেও কয়িনের উৎসর্গ ঈশ্বর গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হন। এতে কয়িন প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়। ঈশ্বর তাকে ক্রুদ্ধ হতে নিষেধ করলেও কয়িন তা অগ্রাহ্য করেছিল। এবং সে ভাই আবেলকে মাঠে বেড়াতে নিয়ে যাবার ছল করে হত্যা করেছিল। ইহুদি পুরাণ অনুসারে, পৃথিবীর প্রথম হত্যারক হল কয়িন। ঈশ্বর কয়িনকে জানিয়েছিলেন— যে ভূমি তোমার হাত থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত পান করেছিল, তুমি অভিশপ্ত হয়ে সেই ভূমি থেকে নির্বাসিত হবে। তুমি পৃথিবীতে পলাতক ও যাযাবর হয়ে বিচরণ করবে। এরপর কয়িনের দেহে এক প্রতীক চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন যাতে কেউ তাকে হত্যা না করে। কয়িন নোদ নামক দেশে পালিয়ে যায়।^{৪৬} এই ঘটনা নিয়ে উপন্যাসের অন্তর্কাঠামো নির্মিত হলেও আদিপুস্তকের ঘটনা সমকালীন সময়কে স্পর্শ করে যায়। উপন্যাসে ঈশ্বর অনুপস্থিত, দুই ভাইয়ের পিতা আদম তাদের অভিশাপ দেয়। সিন্দুকের সংযোজন আখ্যানের গল্পের ‘মোটিভ’ বদলে দেয়। আদিম পৃথিবীর ভ্রাতৃহত্যা যেন বর্তমান সময়ের লোভ-লালসা-রিরংসার আবর্তে জড়িয়ে থাকা পারিবারিক হত্যা ও কোন্দলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের প্রেক্ষাপটে কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর ‘১৯৪৬-৪৭’ কবিতায় লিখেছিলেন:

মানুষ মেরেছি আমি— তার রক্তে আমার
শরীর ভরে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কঙ্কালের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ করে ঘুমাতেছি।^{৪৭}

বিশ শতকের চারের দশকের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, অবসাদ, ভয়, হতাশা, অমানবিক উৎপীড়ন কবি জীবনানন্দের মানবিক বোধকে গভীরভাবে পীড়িত করেছিল। ঔপন্যাসিক শাহ্‌যাদ ফিরদাউস বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবসভ্যতার রক্ত এবং লাশের ধারাবাহিক ইতিহাসকে যেন বিধৃত করেছেন। তাই আদমের সিন্দুক কখনও মোহর, কখনও রক্ত বা কখনও লাশের প্রতীক হয়ে ওঠে। মানুষের লোভ-পাপ-মৃত্যু এবং মানবিক গুণাবলীর অপমৃত্যুর নানান দিক উন্মোচিত করেছে এ উপন্যাস।

আহি-নকুল উপন্যাসটি বাইবেল-এর ‘নিউ টেস্টামেন্ট’-এর অন্তর্গত ‘বুক অব ম্যাথু’, ‘বুক অব লুক’ ও ‘বুক অব জোহা’-র গল্প অনুসরণে রচিত। মূল কাহিনির যিশুর ত্রুশবিদ্ধ এবং বারাব্বাসের মুক্তিলাভ এর প্রসঙ্গ নিয়ে নির্মিত হয়েছে আখ্যানের অন্তর্ভবন। আখ্যানের বারাব্বাস একজন রাষ্ট্রদ্রোহী। কিন্তু এখানে তার মুক্তির জন্য যিশুকে ত্রুশবিদ্ধ হতে হয় না, বরং বারাব্বাস সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। মিথলজিক্যাল বৈরিতার সম্পর্কে ভেঙেচুরে ঔপন্যাসিক মিথের পুনর্নির্মাণ করেছেন।

কথাকার নীহারুল ইসলাম (জন্ম. ১৯৬৭) তাঁর *পিরনানার জ্বিন* (২০১২) উপন্যাসে ইসলামি পুরাণে বর্ণিত জ্বিনের মতো অলৌকিক অদৃশ্য প্রজাতির সঙ্গে মানুষের সৌহার্দ-বৈরিতার দিকটি যেমন উন্মোচন করেছেন, পাশাপাশি গ্রামীণ মুসলিম জনমানসের বিশ্বাস

ও ধর্মীয়বোধের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার স্বরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ‘জ্বিন’ আরবি শব্দ। তারা মানুষের মতোই একপ্রকার প্রজাতি। ইসলামি পুরাণ মতে, এরা আগুন থেকে সৃষ্ট। জ্বিনেরা আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। অথচ কোরান-এর নির্দিষ্ট কিছু মন্ত্রের সাহায্যে জ্বিনদের বশ করা যায়। এ উপন্যাসের পিরনানা ১৭০-টি জ্বিনকে নিজের কবজায় রেখেছেন। পুরাণে বর্ণিত জ্বিনদের সর্দার ইবলিশ আজাজিল আদমকে সিঁজদা করতে অস্বীকৃত হওয়ার কারণে নির্বাসিত হয়েছিল। ইবলিশের প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ প্রজাতিকে পথভ্রষ্ট করে তাদের দলভুক্ত করা, সেই জ্বিন প্রজাতির একাংশকে মানুষ ধর্মীয় মন্ত্রের বলে বশীকরণ করে। অর্থাৎ জ্বিন ‘আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী’— বিদ্যমান এই ক্ষমতা-কাঠামো যেন রূপান্তরিত হয়ে পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের রচিত মন্ত্রের ক্ষমতার স্বর বিচ্ছুরিত। আখ্যানের মূল কাহিনি পিরনানা ও জ্বিনের অলৌকিক কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হলেও লেখক উপন্যাসের অন্তর্ভবনে গ্রামীণ লোকবিশ্বাস ও লোকবাস্তবতাকে নিখুঁতভাবে আবিষ্কার করেছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে লেখা ইসমাইল দরবেশের (জন্ম. ১৯৭৮) *তালাশনামা* (২০২১), অনুপম মুখোপাধ্যায়ের (জন্ম. ১৯৭৯) *খ্রিস্ট* (২০২২), শামিম আহমেদের (জন্ম. ১৯৭৩) *বিষাদবিন্দু* (২০১৩) ও পার্থজিৎ চন্দ্রের *মরুপুত্রের দিনরাত* (২০২৪) উপন্যাসগুলিতে বিদেশি মিথ-পুরাণের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ইসমাইল দরবেশের *তালাশনামা*-র আখ্যানে গ্রামীণ মুসলিম সমাজ কাঠামোর ইহকাল-পরকাল, কবর-আযাব সম্পর্কিত পৌরাণিক প্রতীতি ও অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা নির্ধারিত মানুষ তথা শ্রেণি-বৈষম্য— গ্রামীণ সমাজবাস্তবতাকে বাস্তব ও অধিবাস্তবের সমন্বয়ে ধরতে চেয়েছেন সমাজসচেতন কথাকার ইসমাইল দরবেশ। অনুপম মুখোপাধ্যায়ের *খ্রিস্ট* এবং পার্থজিৎ চন্দ্রের *মরুপুত্রের দিনরাত* যিশুর জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস হলেও উভয় আখ্যানেই অলৌকিক যিশুর তুলনায় মানবিক

যিশুর আবেদন ব্যাপক ও গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শামিম আহমেদের বিষাদবিন্দু ইসলাম ধর্মে নিন্দিত, হজরত মুহম্মদের দৌহিত্র হাসান-হোসেনের হত্যারক এজিদের জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস। লেখক এ উপন্যাসে সেই ইতিহাসকে গ্রহণ করেছেন যাকে ইসলামি ইতিহাস চেপে দিয়েছে। যোদ্ধা বা যুদ্ধবিশারদ এজিদকে ছাপিয়ে গেছে তার সংগীতপ্রিয়তা, প্রেমিকসত্তা ও সৃজনশীলতা। কেবল নিষ্ঠুর হত্যাকারী নয়, সেইসঙ্গে এজিদ সাহিত্য অনুরাগী ও কবিতার উপাসক। ইসলামি ইতিহাসের আপাদমস্তক নিন্দিত চরিত্রের মৃত্যুতে আখ্যানের পরতে-পরতে বিষাদ ঝরে পড়ে।

ইতিহাস, মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ করে রচিত বাংলা কথাসাহিত্যের আলোচনা শেষে বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরিব্যাপ্ত মিথ-পুরাণ ও লৌকিক কাহিনি নির্ভর গল্প-উপন্যাসে কথাকাররা সমকালীনতার বহুমাত্রিক অভিমুখকে নির্মাণ করেছেন, কখনও তা গ্রামীণ সমাজবাস্তবতাকে ছুঁয়ে গেছে, কখনও ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। ভারতীয় মিথ-পুরাণের প্রেক্ষাপট মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তৃত ভূখণ্ডের ইতিহাস, মিথ-আখ্যান, লোককথা, লোকপুরাণ, লোকাচার, কিংবদন্তির জল-হাওয়ায় লালিত। অন্যদিকে খ্রিস্টীয় পুরাণ কিংবা ইসলামি পুরাণের গল্প কেবল পুথি-হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে বাঙালি বা ভারতের সমাজজীবনে সম্প্রসারিত হয়নি, ইতিহাসের পথ ধরেই তা কালক্রমে ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, আচার, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মিলনের সেতু রচনা করেছে। বস্তুত, ইহুদি পুরাণের কাহিনি নিয়ে জন মিলটনের (১৬০৮-১৬৭৪) *প্যারডাইস লস্ট* (১৬৬৭), অন্যদিকে ভারতীয় পুরাণের গল্প নিয়ে রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১) তাই কোথাও একসূত্রে গেঁথে যায়। আদিম পুরাবৃত্তের পথকে কোনো কাঁটাতারের সীমানা দিয়ে রোধ করা যায় না। মানুষের সমষ্টিগত জীবনের শত শত আখ্যানের শরীরে জমে আছে সমাজ গড়ার বীক্ষা ও অনুভূতি,

স্মৃতি ও প্রেরণা, দমন-পীড়ন, বস্তু ও কল্প ইতিহাসের কত শত অচেনা গলি। কাজেই অতীতের পুরাকথা নিয়ে সমকালে যেমন বহুমুখী আখ্যান নির্মিত হয়েছে উত্তরকালেও তার ব্যত্যয় হবে না, এ সম্ভাবনার কথা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করা যায়।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. জোন্স, ডেভিড; ও কট্রিল, আর্থুর, *দ্য গ্রেট মিথোলজি*, (অনুবাদ ড. মনজুর রহমান), সৃজনী, ঢাকা, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ৭
২. *বায়ুপুরাণ*, তর্করত্ন, পঞ্চগনন (সম্পাদিত), বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩
৩. *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ*, তর্করত্ন, পঞ্চগনন; (সম্পাদিত), নবভারত পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১
৪. রায়, নীহাররঞ্জন; ‘রামায়ণ-মহাভারতে মিথ ও বাস্তবতা’, *মিথ সাহিত্য সংস্কৃতি* (অঞ্জন সেন ও উদয়নারায়ণ সিংহ সম্পাদিত), ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১২
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; ‘সাহিত্য সৃষ্টি’, *সাহিত্য*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০২
৬. বসু, বুদ্ধদেব; *মহাভারতের কথা*, এম সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭
৭. জোন্স, ডেভিড; ও কট্রিল, আর্থুর; *দ্য গ্রেট মিথোলজি* (অনুবাদ ড. মনজুর রহমান), সৃজনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ১২
৮. Kosambi, Damodar Dharmanand; *An Introduction to the Study of Indian History*, Popular Book Depot, Bombay, December 1956, P. 39-40
৯. ভট্টাচার্য, সুকুমারী; *নিয়তিবাদ: উদ্ভব ও বিকাশ*, ক্যাম্প, কলকাতা, জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ১৫
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১১. দে, রামকৃষ্ণ; 'প্রসঙ্গ: পিতৃতন্ত্র' (সম্পাদনা) পুলক চন্দ, নারীবিশ্ব, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৮ পৃ. ৬১৮

১২. মুখোপাধ্যায়, পবিত্র; *ইবলিশের আত্মদর্শন*, দিবারাত্রির কাব্য, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১৪. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Buddha, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ২১.০৭. ২০২৪, সময়: ১২: ৩৫ am

১৫. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/TheBuddha>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ২১.০৭. ২০২৪, সময়: ২: ১৩ am

১৬. পল্লব, সেনগুপ্ত; *লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৬০, পৃ. ৬

১৭. বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ৮

১৮. মাহমুদ, শিমুল; *মিথ-পুরাণের পরিচয়*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৭

১৯. Plato; *The Symposium*, (Translated by W. Hamilton, The Penguin Books. P. 81

২০. আহমেদ, ফুয়াদ আনাস; 'প্লেটোর সিম্পোজিয়াম: জীবনসঙ্গী হিসেবে কেন সোলমেট খুঁজি আমরা?', লিঙ্ক- <https://roar.media/bangla/main/history/plato-symposium-soulmate>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ১৮.১২.২০২৩, সময়: ১: ৩০ am

২১. <https://appliedjung.com/the-archetypes-of-the-anima-and-animus/>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ২৩.০৭.২০২৪, সময়: ১১: ৪৩ pm

২২. কার্ল পপার (১৯০২-১৯৯৪) অস্ট্রিয়ান দার্শনিক। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ প্রসঙ্গে লেখা তাঁর বই *The Logic of Scientific Discovery*। শ্রী আশীষ লাহিড়ী পপারের দর্শন ও চিন্তা বিষয়ে *বিজ্ঞানের দর্শন ও কার্ল পপার-বইতে 'Falsifiability'-র বাংলা ভাষার*

রূপান্তর করেছেন ‘খণ্ডনযোগ্যতা’। দ্রষ্টব্য: ঘোষ, জয়দীপ; *তারই কিছু রঙ*, ধানসিঁড়ি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২১, পৃ. ৫৯

২৩. ঘোষ, জয়দীপ; *তারই কিছু রঙ*, ধানসিঁড়ি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২১, পৃ. ১৭

২৪. *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (২ সংখ্যক সুরা- বাকারাহ, আয়াত সংখ্যা ১৫৫), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০২০, পৃ. ২৪

২৫. হোসেন, মীর মশাররফ; *বিষাদ সিন্ধু*, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা, বইমেলা ২০১৮, পৃ. ২৭৪-২৭৫

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

২৭. ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ; *চাঁদের অমাবস্যা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস-সমগ্র*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১২০

২৮. *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (৯৭ সংখ্যক সুরা-কদর), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৩৩৭

২৯. মণ্ডল, আলাউদ্দিন;(সম্পাদিত), ‘চতুরঙ্গ-এ আলোচনা ও আবদুর রউফ-এর চিঠি’, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস চূর্ণভাবনা ও চূর্ণকথা সংগ্রহ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ১৪৫-১৪৬

৩৯. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান; ‘দোজখের ওম’, *দোজখের ওম*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৬১

৪০. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Madhhab>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ২৭.০৭.২০২, সময়: ৪: ৫৬ pm

৪১. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/ZamzamWell>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ২৭.০৭.২০২৪, সময়: ১: ৩২ am

৪২. https://en.wikipedia.org/wiki/Safa_and_Marwa, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ২৮.০৭.২০২৪, সময়: ১৫৫ am

(কোরান-এর ১৪ সংখ্যক সূরা ইব্রাহিম ও ৩৭ সংখ্যক সূরা সাফফাত্- এ ইব্রাহিম এবং হাজেরা বিবির কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে।) দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

৪৩. *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (২ সংখ্যক সূরা বাকারাহ্, আয়াত সংখ্যা ১৫৮), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২৯

৪৪. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা; *জানমারি, উপন্যাস সমগ্র* (খণ্ড-২), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ১৫৭-১৫৮

৪৫. (Matthew 27: 46/ Mark 15: 34), New Testament, দ্রষ্টব্য: *The Holy Bible* (Old and New Testament), The church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City, Utah, USA, 2013, P. 1197

৪৬. *The Holy Bible* (Old and New Testament), (Book of Genesis, Chapter-4), The church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City, Utah, USA, 2013, P. 6-7

৪৭. দাশ, জীবনানন্দ, ‘১৯৪৬-৪৭’, *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ভারবি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ: আবুল বাশারের আখ্যানভূবন

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ: আবুল বাশারের আখ্যানভূবন

বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকেই ঐতিহাসিক উপাদানের ব্যবহার হয়ে আসছে বাংলা কথাসাহিত্যে। সভ্যতার ক্রমিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ইতিহাস রচনা করেছে মানুষ। আপাত বিচ্ছিন্ন বহু তথ্য, প্রত্নলেখ, গুহাচিত্র, পুথি ইত্যাদির সুবাদে অতীতকে জানতে পেরেছে ইতিহাসবিদ। রপ্ত করেছে বস্তু ও কল্প ইতিহাসের পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া। স্পষ্ট করেছে পুরাণ ও ইতিহাসের ভেদরেখার নানান ফাঁকফোকর। বিজ্ঞানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উন্মোচন করেছে ক্রমশ মানুষের সার্বিক বিবর্তনের রেখালেখ্য। যতটা অতীতে যাওয়া যায়, বিজ্ঞানের হাত ধরে ইতিহাস মাটি খনন করে এগিয়ে চলেছে সুদূর অতীতের দিকে। ইতিহাস হল ভাঙা টুকরো দিয়ে জোড়া এক বিশাল ধাঁধা যার অনেক টুকরো হারিয়ে গেছে।^১ খুঁজে পাওয়া এইসব টুকরো ঘটনা এবং চরিত্র এবং সময়ের পালাবদল, স্বর ও স্বরান্তরকে নিয়ে নির্মিত হয়েছে অজস্র সাহিত্য। ইতিহাসের এই লিখনের সঙ্গে সাহিত্যের একটি অবিরাম সংযোগ তথা আদানপ্রদান রয়েছে। অতীত ঘটনাবলি সংক্রান্ত তথ্য আহরণের জন্য ঐতিহাসিকরা সাহিত্য মন্থন করেন এবং বক্তব্যকে অন্যান্য প্রকারের প্রমাণাদির সঙ্গে মিলিয়ে নেন।^২ প্রাচীনকালে ইতিহাস ও সাহিত্যের সম্পর্ক ছিল ভীষণ গভীর। ইতিহাসকে সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা বলেই গণ্য করা হত। কলহন্ (জন্ম. দ্বাদশ শতাব্দী) তো তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ *রাজতরঙ্গিনী* লিখেছিলেন কাব্যরীতির বিধিবিধান মেনে। তথ্যের অভাব যেখানে দেখা দিয়েছে, কল্পনা সে অভাব অনায়াসে দূর করে দিয়েছে। তথাপি ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত হয় এভাবেই। অতীত তার পারিপার্শ্বিক নিয়ে মানুষের কাছে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছে কল্পনাশ্রিত এ সমস্ত রচনাতেই।^৩

বাংলা সার্থক উপন্যাসের সূচনা হয় যাঁর হাত ধরে সেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)ও তাঁর আখ্যানের প্লট হিসাবে অতীতকেই বেছে নিয়েছিলেন। ইতিহাস তাঁর উপন্যাসে একটি বিশেষ মাত্রা নিয়ে উঠে এসেছে। অতীতের গৌরবময়তাকে সাহিত্যের আদলে দেখবার ঝোঁক ছিল তাঁর। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন শক্তিমান সাহিত্যিক, বস্তুত তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের পাশাপাশি কল্প ইতিহাস এবং লেখকের কল্পিত চরিত্ররা দারুণভাবে ক্রিয়াশীল। অন্যদিকে রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) ঐতিহাসিক উপন্যাস কিংবা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৮৫-১৯৩০) রচনায় ইতিহাসের চরিত্র ও ঘটনা প্রধান হয়ে উঠেছে। তাঁরা মূলত ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আখ্যানের মধ্যে যে রোমাঞ্চ এনেছেন তা এঁদের লেখায় অনুপস্থিত। আর সেটা কেবল সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে। পরবর্তীকালে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭০) ইতিহাস নির্ভর আখ্যানের দিকে আলোকপাত করলে দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে ইতিহাস প্রধান হলেও তা গল্পের বয়ানে নির্মিত। ইতিহাসের আবহে নির্মাণ করেছেন লেখক তাঁর আখ্যানকে, অথচ প্রেম যেন প্রধান হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের সঙ্গে আখ্যানের ঘটনাক্রমের মিল কতটুকু তা নিয়ে তর্ক চলতেই পারে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন:

ইতিহাস থেকে চরিত্রগুলো কেবল নিয়েছি কিন্তু গল্প আমার নিজের। সর্বদা লক্ষ রেখেছি কি করে সেই যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায়। যে সময়ের গল্প তখনকার রীতিনীতি, আচার, ব্যবহার, অস্ত্র, আহার, বাড়িঘর ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব জানা না থাকলে যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায় না।^৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)ও তাঁর ইতিহাস-নির্ভর আখ্যানে ঘটনাক্রমের বিন্যাস ও সজ্জায় কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইতিহাসের উপাদান নিয়ে উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেছেন যাঁরা তাঁদের হাতের মূল আয়ুধ হল সময়। যে সময়কে নিয়ে লেখক

লিখছেন সেই সময় কি তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন! ‘সাম্প্রতিক অতীত’ এবং ‘সুদূর অতীত’ এই দুটিকে দেখার দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ আলাদা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) সেই সময় (১৯৮১) উপন্যাসের ঘটনাক্রম উনিশ শতক, এ ইতিহাস প্রায় সবটাই পুথিগতভাবে পেয়েছেন লেখক। উপন্যাসের পরিশিষ্টে তার দীর্ঘ তালিকা সংযুক্ত হয়েছে। এছাড়া রবিশংকর বলের (১৯৬২-২০১৭) *দোজখনামা* (২০০৯)— এমন বহু আখ্যান রচিত হয়েছে। যুগপৎ ঐতিহাসিক এবং কল্পিত চরিত্র নির্মাণ করলেও সময়কেই নায়ক করে তুলেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও রবিশংকর বল। আবার অন্যদিকে যিনি দেশভাগ প্রত্যক্ষ করেছেন, ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সে যন্ত্রণা বয়ে বেড়িয়েছেন তাঁর লেখা আখ্যানে দেশভাগের গল্পগাথা এবং এই সময়ে দাঁড়িয়ে কেউ নানান পুথি-ইতিহাস-নানান গ্রন্থাবলীসহ বিস্তারিত বইপত্র পড়ে, বয়োজ্যেষ্ঠদের মৌখিক বর্ণনা শুনে যদি দেশভাগকেন্দ্রিক আখ্যান লেখেন সে আখ্যানও মহৎ হয়ে উঠতেই পারে, কার্যত তার সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের বয়ানের ফারাক থাকবেই। বস্তুত, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৭) এ ইলিয়াস যেভাবে ৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের কথা লিখেছেন তা তাঁর প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতার ফসল। *চিলেকোঠার সেপাই* ইতিহাস নিয়ে লেখা হলেও লেখক কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। অস্থির সময় নির্মাণে লেখকের কৌশলগত দক্ষতা অসীম। সাহিত্যিকদের কাজ ইতিহাস লেখা নয়, তাই তাঁরা ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি নিয়েও খুব বেশি নাড়াচাড়া করেন না। ইতিহাস নির্ভর আখ্যানের এই ধারারই নবতর সংযোজন হল আবুল বাশারের *অগ্নিবলকা* (১৯৯২)। *অগ্নিবলকা*-র প্রেক্ষাপটে রয়েছে সাতের দশক। যা লেখকের ‘দেশ-গাঁ-সমাজ’-সময় ও রাজনৈতিক দর্শনের লেখ্য দলিল। বাংলার নকশালবাড়ি-রাজনীতির ছাইভস্মের আচমকা জ্বলে ওঠা এবং সেই আগুনে ঘৃতাভূতি দেয় এমার্জেন্সি— সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের

কবলে একদল মানুষের স্বৈরাচার, নোংরামি এবং অপরপক্ষের মধ্যকার রাজনৈতিক সংকট ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত। স্পষ্টতই আবুল বাশার এ উপন্যাসে দেখিয়েছেন, সাতের দশকের সাধারণ যুবাদের হতাশা-ক্লান্তি ও টিকে থাকার ভয়াবহতাকে।

২. ক. উপন্যাসে ইতিহাস প্রসঙ্গ:

আবুল বাশারের *অগ্নিবলকা*-র সময়ক্রম হল ১৯৭৫-১৯৭৭ এই দুই বছর। *অগ্নিবলকা*— নামকরণের মধ্যেই রয়েছে অগ্নিগর্ভ সাতের দশকের ব্যঞ্জনা। ‘সাতের দশককে মুক্তির দশকে’ পরিণত করার লক্ষ্যে যে হাজার হাজার ছাত্র-যুবারা জোতদার খতম এবং ‘আত্মত্যাগের রাজনীতির’ আকাশে ডানা মেলে উড়তে চেয়েছিল তাদেরই জীবনের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতার ধারাবিবরণীর খতিয়ান হল *অগ্নিবলকা*। ১৯৯১-এ *দেশ* পত্রিকায় দীর্ঘ ১৪-মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এই উপন্যাস। ছয়ের দশকের শেষে যখন নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে ‘জোতদার খতমের রাজনীতি’ শুরু হয়, তখন লেখকের বয়স ১৬-বছর। তিনি তাঁর উপন্যাসের নায়ক রাহুলের সমবয়সী। এবং ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয় তখন লেখক চব্বিশ বছরের যুবা। কিশোর থেকে যুবা— এই ‘জার্নি’র মধ্যে দিয়ে লেখক স্বচক্ষে দেখেছেন সমকালীন ভারতবর্ষ কীভাবে ‘পুলিশের দেশ, সংগঠিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দেশে পরিবর্তিত হয়েছে, প্রত্যক্ষ করেছেন নকশালপন্থী এবং অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনের কার্যক্রম এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। সময় যখন উপন্যাসের নায়ক হয়ে ওঠে তখন তাতে ধরা পড়ে লেখকের বোধ ও বোধির গভীরতা। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে মানুষের বিশ্বাসের ভাঙন, সম্পর্কের ভাঙন, পরিবারের ভাঙন ইত্যাদি বিষয়গুলি উঠে আসতে শুরু করেছিল বাংলা উপন্যাসে। সাতের দশকে-এর সঙ্গে যুক্ত হল রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের ট্রাজেডি। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত

লেখকদের রচনায় স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা তাঁদের লেখায় যে যাপিত জীবনের কথা উঠে এসেছে, লেখক নিজেই কমবেশি সেই জীবনের অংশীদার ছিলেন। ইতিহাসের যে অনুষ্ণ আবুল বাশারের উপন্যাসকে স্পর্শ করেছে তা লেখকের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন ও সময়কে দর্শনেরই ইস্তাহার। আবুল বাশারের *অগ্নিবলকা* হল জরুরি অবস্থা জর্জরিত ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের সামাজিক পরিমণ্ডল এবং সময়ের চালচিত্রের বয়ান। মুর্শিদাবাদের এক শহরতলি এবং তার পাশ্ববর্তী গ্রাম নিয়ে আবর্তিত হয়েছে এ উপন্যাসের আখ্যান। বিশ শতকের ছয় ও সাতের দশক ভারতবর্ষ তো বটেই, বিশেষত বাংলার রাজনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। পাশাপাশি পৃথিবীর নানান দেশের সাধারণ মানুষের আন্দোলনও বাংলার রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৬৭-তে পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তা নকশাল আন্দোলন নামে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই আন্দোলনের মূল স্রোত ছিন্নভিন্ন হলেও তার শাখাপ্রশাখা স্রোতবিন্দু সাতের দশকেও বহু জায়গায় ক্রিয়াশীল ছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন, পরবর্তীকালে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূচনা এবং তারপর জরুরি অবস্থা কবলিত দেশের দুরবস্থা— রাজনীতির এই ক্রমিক বিবর্তনকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য আমরা সূচনাবিন্দু থেকে আলোচনা করেছি।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সি.পি.আই) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালে রাশিয়ার তাসখন্দে। এবং ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালে কানপুরে।^৫ সি.পি.আই-পন্থীরা ১৯২৫ সালকেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে মনে করেন। অন্যদিকে সি.পি.আই(এম) ১৯২০ সালকেই প্রাধান্য দেয়। পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে বামপন্থীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ

হয়ে লড়েছে কখনও এবং কখনও তাঁদের মতাদর্শ ও বলপ্রয়োগ করে লড়াই করেছে। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হবার পরেও কমিউনিস্ট পার্টি স্বতন্ত্র দল হিসাবে নির্বাচনে লড়েছে। যদিও শুরুর দিকে কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি, কারণ তাঁরা সংসদীয় নির্বাচন পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাসী ছিল না।^৬ ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে শুরু হয় দ্বন্দ্ব।^৭ ১৯৬৪-তে চীন-ভারত যুদ্ধ বাঁধে। ওই সময় পার্টির অভ্যন্তরীণ মতভেদ নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দু'টুকরো হয়ে যায়। কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই) ভেঙে নতুন অংশটির নামকরণ হয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সি.পি.আই(এম)।^৮ মূলত মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। একটা দেশের বাইরের ঘটনা নিয়ে, অন্যটা দেশের ভেতরের ঘটনা নিয়ে। মূল পার্টি সি.পি.আই ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির আঁচলে বাঁধা। তার একটা ফল হয়েছিল এই যে তাদের সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বর্জন করার সংকল্প নিতে হয়েছিল। কারণ আর কিছু না হোক, সোভিয়েতরা ভারত সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক চাইছিল। আর যারা বেরিয়ে এল, অর্থাৎ সি.পি.আই(এম), তারা রুশ আর চৈনিক উভয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেই ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় রাখায় বিশ্বাসী ছিল। তাদের মতে, ভারতীয় রাষ্ট্রকে চালাচ্ছে বুর্জোয়া-জমিদার জোট, এখানে সংসদীয় গণতন্ত্র মূলত একটা ধাপ্লাবাজি।^৯

এরপরের সময়টা বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ছিল তুমুল অশান্তির কাল। ১৯৬৭-তে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে জমি নিয়ে বিবাদ ফেটে পড়ল। নকশালবাড়িতে ভারতের সীমান্তরেখা পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে পাকিস্তানকে ছুঁয়ে আছে। তিব্বত আর অর্ধ-স্বাধীন ভুটান ও সিকিম রাজ্যও সেখান থেকে বেশি দূরে নয়। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এইসব জায়গার অর্থনীতি প্রধানত চা-বাগিচা নিয়ন্ত্রিত, তার মধ্যে

অনেকগুলিই ব্রিটিশ মালিকানাধীন। জমির অভাবের ইতিহাস সেখানে ছিল। জমি নিয়ে সংঘর্ষের ইতিহাসও ছিল। বাগিচা-শ্রমিকরা চাইত নিজের নিজের জমি খুঁজে নিতে আর দেশজ ভাগচাষিরা মহাজন-জমিদারদের হাত থেকে মুক্তি চাইত। নকশালবাড়ি অঞ্চলে গ্রামের গরিব লোকেরা সি.পি.আই.এম-এর অধীন কৃষক সভায় সংগঠিত হয়েছিল। এর নেতা ছিলেন কানু সান্যাল নামে মধ্যশ্রেণির ‘radical’ নেতা। নিজস্ব পরিমণ্ডল ছেড়ে এঁরা গ্রামে কাজ করতে চলে গিয়েছিলেন বলে অনেকেই তাঁদের অনুগামী হয়েছিল।^{১০} এইভাবে একটা অনুগামী গড়ে তোলে এরা কৃষকদের হয়ে শ্রেণিশত্রু খতমের পথে পা বাড়িয়েছিল। ১৯৬৭-র শেষের দিকে কানু সান্যাল সহ বহু নেতা কারাবন্দি হলেন।^{১১} কিন্তু এতেও তাঁদের দমিয়ে রাখা যায়নি। নকশালবাড়ি অচিরেই ভারতের বিপ্লবীদের কাছে এক প্রতীকী মর্যাদা অর্জন করল। ‘নকশাল’ এবং ‘বিপ্লবী’ শব্দ দুটো সমার্থক হয়ে উঠল।^{১২} যাঁরা নকশালদের সমর্থন করলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিস্ট চিনের নেতারা। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে রেডিও পিকিং ঘোষণা করল:

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত দার্জিলিং জেলার গ্রামাঞ্চলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবীদের নেতৃত্বে কৃষকদের এক সশস্ত্র সংগ্রামের একটি অধ্যায় রূপ লাভ করেছে। ভারতীয় জনগণ মাও সে তুংয়ের শিক্ষায় পরিচালিত হয়ে যে-বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন, এই হল তার সামনের থাবা। বর্তমান সময়ে ভারতীয় বিপ্লবের এই হল সাধারণ অভিযুক্ত। ভারত, চীন এবং বিশ্বের সব জায়গায় জনগণ এই বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের অভ্যুদয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছে।^{১৩}

নকশালদের এই স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনের ডাক, কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জোতদারদের রাজত্ব খতম করার সশস্ত্র রাজনীতি, জোটবদ্ধ গণসংগ্রাম, শোষণ শ্রেণির প্রতি বিষোদগার, জোতদারশ্রেণির পদচ্যুতির আশু দাবি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শেষমেশ ১৯৬৯-তে নকশালকর্মীরা (নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন হয়েছিল এবং যাঁরা এর প্রত্যক্ষ সমর্থক ছিলেন) নতুন পার্টি গঠন করলেন। যার নাম হল ভারতের কমিউনিস্ট

পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) অর্থাৎ সি.পি.আই.এম.এল। একের পর এক জেলায় ক্যাডাররা মূল পার্টি ছেড়ে এই নবজাত পার্টিতে যোগ দিতে লাগল। ঠিক যেভাবে ১৯৬৩-৬৪-তে তারা দলে দলে সি.পি.আই ছেড়ে সি.পি.আই.এম-এ যোগ দিয়েছিল। সি.পি.আই.এম এবং সি.পি.আই(এম.এল) এর মধ্যে প্রবল রেষারেষি শুরু হল, যা অনেক সময়ে সহিংস রূপ নিল। এই সময় সি.পি.আই.এম.এল-এর নেতা চারু মজুমদার ‘শ্রেণিশত্রু’ আখ্যা দিয়ে জমিদারদের এবং ‘দক্ষিণপন্থী সংশোধনপন্থী’ আখ্যা দিয়ে সি.পি.আই(এম) ক্যাডারদের খতম করার ডাক দিলেন। এর জবাবে সি.পি.আই.এম-ও নিজস্ব বাহিনী গড়ে তুলে (তার নিরীহ পোশাকি নাম অবশ্য স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী) তাদের ভাষ্যমায়িক জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব-এর পথ প্রশস্ত করতে লাগল।^{১৪} কংগ্রেস বা অন্যান্য পার্টির সঙ্গে কোনওরকম সমঝোতা না করে স্বতন্ত্র দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সি.পি.আই(এম.এল)। পৃথিবীর নানান দেশে তখন সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন আলোড়ন তুলেছিল। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে তারা ‘গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার লড়াই’ এই আদর্শের পথে এগোতে চাইল। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারিয়ে শ্রেণিশত্রু খতমের উপর দিল জোর। পাশাপাশি মণীষীদের মূর্তি ভাঙা এবং স্কুল-কলেজ পোড়ানোর মতো কর্মকাণ্ডও ছিল তাদের বিপ্লবের অংশ। আসলে ‘তৃতীয় বিশ্বে বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল গ্রাম’— এই তত্ত্বকে আরও একধাপ প্রসারিত করে লিন পিয়াও ষাট দশকেই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে পশ্চিম ইউরোপ-আমেরিকা প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলি পৃথিবীর শহর স্বরূপ এবং তৃতীয় বিশ্ব পৃথিবীর গ্রামাঞ্চল এবং গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার সেই সুপরিচিত তত্ত্বকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকায় গণমুক্তি সংগ্রামগুলিকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।...চিনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিণাম ও সত্তর দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের অবস্থান্তর প্রাপ্তি অনেকটা এই

জাতীয়।^{১৫} যদিও নকশালদের এই আন্দোলন শেষমেশ ব্যর্থ হয়েছিল। এই আন্দোলনকে সরকার কঠোরভাবে দমন করেছিল। নকশালদের পুলিশ খতম এবং সরকারের দমননীতি নিয়েও বিস্তর তর্ক-বিতর্ক আছে। মূলত ১৯৭১-এ সুশীতল রায়চৌধুরী ও সরোজ দত্তের মৃত্যু এবং ১৯৭২-তে চারু মজুমদারের মৃত্যুর পরে এ আন্দোলনের ঢেউ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অসীম চট্টোপাধ্যায় ও সন্তোষ রাণার মতো নেতারাও দলত্যাগ করেছিলেন। বস্তুত, ছয়ের দশকের শেষে নকশালপন্থীরা অতর্কিত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শাসকশ্রেণির খোলনলচে নাড়িয়ে দিয়েছিল এ নিয়ে দ্বিমত নেই। কার্যত নকশালপন্থীদের আদর্শগত দ্বন্দ্বিকতা তাদের সাফ্যলের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আশঙ্কার অশুভ লক্ষণ হিসাবে ধরলে দেখা যায়— নেতৃবৃন্দের অধিকাংশের মধ্যে একধরনের উৎকট সংকীর্ণ মনোভাববশত শ্রমিক আন্দোলন সংগঠন করার প্রয়োজনীয়তার ঔদাসীন্য, সৈন্যবাহিনীর ভেতরে গোপন সংগঠন গড়ে তোলার গুরুত্বকে অবহেলা, অন্যান্য বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির প্রতি সন্দেহপ্রবণতা ও বিরোধিতা, অতীতের ভুল সংশোধন করতে প্রচণ্ড অনিচ্ছা এবং সর্বোপরি একজন নেতাকে (চারু মজুমদার) প্রায় অব্রান্ত দেবতার আসনে উত্তোলিত করার প্রবণতা^{১৬} — এসব কারণে অচিরেই এ আন্দোলন ভেঙে পড়ে। সন্তোষ রাণা তাঁর *রাজনীতির এক জীবন* বইতে লিখেছেন:

যে চারু মজুমদার বিপ্লবী ছাত্রদের গ্রামে যাওয়ার সময় অস্ত্র নিয়ে যেতে বারণ করেছিলেন, তিনিই অস্ত্র-নির্ভর শ্রেণিশত্রু খতমের উপর এত জোর দিলেন। এই দ্বন্দ্বের ফল, সবাই জানে, ভালো হয়নি।^{১৭}

১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নকশালপন্থী সমস্ত বন্দিদের মুক্ত করে দেয়। যদিও সি.পি.আই(এম.এল)-রা সি.পি.আই.এম-নামক দলটাকেই অস্বীকার করে। সি.পি.আই(এম)-এর সঙ্গে এদের মূলত ঘেন্নার সম্পর্ক। কারণ তারা মনে করে ভোটে অংশগ্রহণ করে সি.পি.আই(এম) বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কংগ্রেস ছিল

তাদের শত্রু, কংগ্রেসের হাত ধরেই একদিন নকশাল আন্দোলন খতম হয়েছে। এছাড়াও কমিউনিস্ট দল বা গ্রুপ রয়েছে, যেমন আর.এস.পি, ফরওয়ার্ড ব্লক। এদের সঙ্গে বাকিদের সমঝোতা বা সহযোগিতার সম্পর্ক থাকলেও তাদের ঘোষিত আদর্শের সঙ্গে সবটা মেলে না। চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর নকশালদের দাপট ক্রমশ কমে গিয়েছিল। এ আন্দোলনের একরকম ভাটা পড়ল। সময়ের বদলে ভাটার পরে পুনরায় জোয়ার আসে।

১৯৭২-এর পর নকশাল আন্দোলন স্তিমিত হলেও তার রেশ অত দ্রুত মুছে যায়নি। বন্যার জল নদীতে ফিরে গেলেও সে রেখে যায় পলি, যা থেকে আবার শস্য উৎপন্ন হয়। কিংবা কোনো ভয়ঙ্কর ঝড় এসে আচমকা সবকিছু তছনছ করে দিলেও তা মেরামত হতে ব্যয় হয় বহু সময়। এরপরেই তেমনই এক ধাক্কার ঢেউ এসে নাড়িয়ে দিল আসমুদ্র হিমাচল। সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক ঘটনার ধাক্কায়ে দেশের রাজনীতির চেহারা পুরোপুরি বদলে গেল। ১৯৭৫ সালের ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর লোকসভার আসন বাতিল হল। বিরোধী নেতারা ১১-১৫ জুন প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে ধর্না দেন, রাষ্ট্রপতির কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করেন প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলার দাবি জানিয়ে। ইন্দিরা গান্ধী জানালেন, তিনি বিরোধীদের কথায় পদত্যাগ করবেন না। সুপ্রিম কোর্টের অবসরকালীন বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আয়ার তাঁর রায়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর লোকসভায় ভোটাধিকার ছাড়া আর সব ক্ষমতা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে— নির্বাচনী মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত। এই রায় ঘোষিত হয় ২৪ জুন, ১৯৭৫। আর ২৬ জুন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদের ১ নম্বর ধারা অনুযায়ী আপেক্ষিকালীন জরুরি অবস্থা ঘোষণা

করেন। এবং ভোরবেলা থেকেই বিরোধী পক্ষের নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক গ্রেপ্তার শুরু হয়।^{১৮} ২৭.০৬.১৯৭৫-এ *আনন্দবাজার পত্রিকা*য় লেখা হয়:

জরুরি অবস্থা ঘোষণার কথা জানিয়ে আজ সকালে জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'অল্প কিছু সংখ্যক লোকের কাজকর্মে বিশাল গরিষ্ঠ অংশের অধিকার আজ বিপন্ন। যদি এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয় যাতে জাতীয় সরকার দেশের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনা ও কাজ করার শক্তি হারান, তাহলে দেশের বাইরে থেকে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। সে সব কথা বিবেচনা করেই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।'^{১৯}

জরুরি অবস্থা ছিল দেশের জনগণের কাছে এক বিরাট ধাক্কা। জরুরি অবস্থার অজুহাত দেখিয়ে বিরোধী পক্ষের উপর আক্রমণ হানা হয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত বিরোধী শক্তির নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর নিজের পার্টির মধ্যে যারা তাঁর নীতিগুলির বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই সময় জনগণের প্রতি সি.পি.আই(এম) এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর আহ্বান ছিল: গণতন্ত্রের উপর এই বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলুন। ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি চাই। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার চাই।^{২০}

ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবলোকন করলে দেখা যায়। জে.পি বোম্বাইয়ের হাসপাতালে রোগ শয্যায় ডায়ালিসিস যন্ত্রের সঙ্গে একটি শিকলে বাঁধা পড়ে রইলেন, কিন্তু সাধারণভাবে রাজবন্দির প্যারোলে মুক্তি পেলেন না। MISA-য় (The Maintenance of Internal Security Act) আনুমানিক ৩৬,০০০ জনকে জেলে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছিল। সারা ভারতের সব রাজ্য থেকে প্রায় সুষমভাবে ধরা হয়েছিল লোকদের। ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে ধরলে, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ১,০৭৮ জনকে, ২,৩৬০

জনকে বিহার থেকে, এইভাবে নামতে নামতে অবশেষে উত্তরপ্রদেশ থেকে ৭,০৪৯ জনকে এবং পশ্চিমবাংলা থেকে ৫,৩২০ জনকে। রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার এই বন্দিদের সাধারণ অপরাধীদের মতোই থাকতে, খেতে ও জামাকাপড় দেওয়া হত। বস্তুত তাদের সাধারণ অপরাধীদের কুঠুরিতেও থাকতে বাধ্য করা হত (যা থেকে একটা রসিকতা চালু হয়েছিল যে, ইন্দিরা গান্ধীর ঢক্কা-নিনাদিত সমাজতন্ত্র আর কোথাও না কোথাও হোক, জেলখানাতে অন্তত অনুশীলন করা হয়।^{২১} পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী সেদিন বলেছিলেন, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় স্বাধীনতার সময় আমাদের দেশে ফ্রান্স বা রাশিয়ার মতো একটা সত্যিকারের বিপ্লব যদি ঘটত তো বেশ হত।^{২২} ফ্রান্স-রাশিয়া বা ভিয়েতনামের মতো বড়ো বিপ্লব হয়নি ঠিকই, কিন্তু ১৯৭৫-এ সরকারের স্বৈরতন্ত্র একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ-শিল্পী সমস্ত শ্রেণির মানুষ যে গর্জে উঠেছিলেন, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তা বিপ্লবের থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিপ্লবের আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল, তা চূড়ান্ত রূপ নেয় জরুরি অবস্থার সময়। কারণ জরুরি অবস্থা ঘোষণার পেছনে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আইনি পরামর্শেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন।^{২৩} ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁর বইতে লিখেছেন:

It is believed that Siddhartha Shankar Ray played an important role in the decision to declare Emergency: it was his suggestion, and Indira Gandhi acted on it. In fact, Indira Gandhi told me subsequently that she was not even aware of the constitutional provisions allowing for the declaration of a state of Emergency on grounds of internal disturbance, particularly since a state of

Emergency had already been proclaimed as a consequence of the Indo-Pak conflict in 1971.^{২৪}

গণতান্ত্রিক অধিকার হ্রাসের খেলায় সেদিন পশ্চিমবঙ্গও সঙ্গ দিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীকে। ‘নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়!’ শাসকের আধিপত্যবাদী নীতির কারণে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারই শুধু বিলোপ হয়নি, পাশাপাশি জরুরি অবস্থার সুযোগে মালিক শ্রেণি অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল শ্রমিকদের উপর।^{২৫} ৭-অক্টোবর ১৯৭৫ ‘ইন্ডিয়ান স্কুল অফ সোস্যাল সায়েন্স’ আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান কৃষি সম্পর্কিত আলোচনাসভায় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. অমিয় বাগচি বলেছিলেন— আন্দোলন ছাড়া গরিব মানুষের অবস্থার উন্নতি হবে না। উৎপাদন বাড়লেই যে খেতমজুরের অবস্থার পরিবর্তন হয় না তার প্রমাণ পাঞ্জাব।^{২৬} ৮ অক্টোবর, ১৯৭৫ বর্ধমান পৌরসভার আসন্ন নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বিবৃতি প্রচার করেছিল ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি ওয়াকার্স পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি ও সি.পি.আই. (এম)। এই দলগুলোর মতে রাজ্যে ওই সময়েও ১৯৭১-র মতোই সন্ত্রাস ও নিপীড়নের আবহ বর্তমান ছিল।^{২৭} ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বহরমপুরে নির্বাচনী সভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন— প্রধানমন্ত্রী সমস্ত দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই প্রধানমন্ত্রীর উপর আক্রমণের অর্থ হল সমগ্র জনগণের উপর আক্রমণ। বিরোধীরা আমাকে লক্ষ্য করে যেভাবে অপমানের ছুরি নিক্ষেপ করছেন তাতে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে।^{২৮}

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে নাটকীয়ভাবে। পুলিশের কালোগাড়ি এসে রাহুলের বাবা সাদা চৌধুরীকে তুলে নিয়ে যায় জেলে। সাদা চৌধুরীর আচমকা গ্রেফতার আমাদের মনে করিয়ে দেয় জয়প্রকাশ নারায়ণের কথা। যা তৎকালীন শাসকের ঔদ্ধত্যের নিকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে রয়ে গেছে ইতিহাসে। ‘বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি!’— প্রবচনটি ব্যবহার

করেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। ২৬ জুন ১৯৭৫ ভোররাতে দিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায়
মার্গে গান্ধী পিস ফাউন্ডেশনের অতিথি নিবাসে পুলিশ হাজির, হাতে থ্রেপ্তারের ফতোয়া।
৭৩ বছরের অসুস্থ বৃদ্ধকে ঘুম থেকে তুলে থ্রেপ্তার বার্তা শোনবার পর তাঁর এই উক্তি
ছিল।^{২৯} সাদা চৌধুরীর পরিবারকে ঘিরেই শুরু হয়েছে উপন্যাসের গল্প। একদিকে সাদা
চৌধুরী জেলে যায়, অন্যদিকে তার বৌমার (বড়ো ছেলে বুলবনের স্ত্রী চন্দ্রিমা মুখোপাধ্যায়)
আগমন— এই হর্ষ-বিষাদের সুরধ্বনির আবেশে আখ্যানের গতি ও গতিপথ বদলে যায়।
সাদা চৌধুরীর আসল নাম সাহির আজীজ চৌধুরী। বড়ো ছেলে বুলবন তাহির চৌধুরী,
মেজ ছেলে রাহুল পারভেজ চৌধুরী, ছোট ছেলে মণির আজীজ চৌধুরী। দুই মেয়ে নাতাশা
চৌধুরী এবং নূপুর চৌধুরী। স্ত্রী চামেলি চৌধুরী ওরফে আয়েশা বিবি। এই হল রাহুলদের
পরিবার। রাজনীতির গোলকবৃত্তে ঢুকে পড়ার পর প্রেম হয় বুলবন ও চন্দ্রিমা ওরফে
দোলা বা দোলনের সঙ্গে। হিন্দু পরিবারের মেয়ে চন্দ্রিমা বিয়ে করে বুলবনকে। যা নিয়ে
গোঁড়াপন্থী মানুষদের মধ্যে ভয়ানক জলঘোলা হয়। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের চিৎপুর সংলগ্ন
অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের সঙ্গে জোতদারদের সম্পর্ক আখ্যানের ভরকেন্দ্র বলা যায়।
রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে ‘চিৎপুরের বাঘ’ হিসাবে পরিচিত
ললিতমোহন। ললিতের ভাই শশাঙ্কমোহন। দুই ভাই এবং তাদের শাগরেদ মিলে এলাকার
ত্রাস সঞ্চার করে রেখেছে। ছ-মাস আগে শশাঙ্কমোহন সোভান আলী নামক এক গরিব
চাষিকে খুন করে এবং জেলে যায়। আর এই ঘটনায় সাক্ষী দিয়েছিলেন সাদা চৌধুরী।
বস্তুত জরুরি অবস্থা কবলিত সময়ে একজন বৃদ্ধ মানুষের গ্রেফতারকে চৌধুরী পরিবার
ললিতের কারসাজি এবং প্রতিশোধের রাজনীতি হিসাবেই গণ্য করে। কিন্তু আখ্যানের জট
খুললেই আমরা জানতে পারি, সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী এবং অতিবাম রাজনীতির সমর্থক
মমতাজ আলী ছিলেন সাদা চৌধুরীর বন্ধুর ছেলে। সাদা চৌধুরী মুমতাজের রাজনীতি বা

সংগঠনের ব্যাপারে কোনো খবরই জানতেন না। আটক হবার পর তিনি জানতে পারেন কিছুটা, এবং রাহুলকে বারবার আশ্বস্ত করেন, মুমতাজ যেন লুকিয়ে থাকে, কারণ পুলিশ তাকে হাতে পেলে মেরে ফেলবে। সাদা চৌধুরী এও জানতে পারেন, মুমতাজ একসময় একটা বন্দুক রেখে গেছিল সাদা চৌধুরীর বাড়িতে এবং পুলিশ পায় সে খবর। মুমতাজ ফেরার হলেও গ্রেফতার হন সাদা চৌধুরী। পুলিশ সেই তথ্য আদায় করতে চায় সাদা চৌধুরীর কাছে। শুরু হয় জেলবন্দি আসামীর উপর অত্যাচার। এই ঘটনায় রাহুলের মনে তৈরি হয় অনেক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা।

সাদা চৌধুরীকে জেলে ভরে দিয়ে ললিত এখন রয়েল বেঙ্গলের মত হালুম হালুম করে কথা বলছেন। যেন তিনি শান্তির পারাবত উড়িয়ে দিয়েছেন— এ কথা ভাবতে গিয়ে রাহুলের দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। যে রাজনীতির সে বিন্দুবিসর্গ জানে না, পছন্দও করে না, যে ভূমি আন্দোলনে তাদের পরিবারের কোনো ভূমিকা ছিল না, যে টুনটুনির ইশতেহার তারা চোখেও দেখেনি, সেই সব অচেনা অপরিজ্ঞাত বিষয় কেন তাদের এভাবে জড়িয়ে ধরছে!°° এখান থেকেই বদলে যায় রাহুলের যাত্রাপথ। বাবার গ্রেফতার এবং ললিতদের ক্ষমতার রাজনীতি তার চোখ খুলে দেয়। এক আকস্মিক আঘাত তাকে টেনে নিয়ে যায় রাজনীতির জটিল আবর্তে এবং সে ক্রমশ তলিয়ে যায় ভারত আত্মার অন্তঃমূল অবধি। বাবার মতো নিরীহ সাধারণ মানুষের এমন পরিণতি রাহুলকে ভাবিত করে। দূরত্ব বাড়লে যেমন কাছের মানুষের বহু স্মৃতি মানুষ আঁকড়ে ধরে তা রোমন্থন করে একরকম সুখ পেতে চায়, তেমনটাই হয় রাহুলের। বাবা ছিলেন প্রাক্তন আর্মি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের দিকের ঘটনা, তখনও বাতাসে মিশে ছিল যুদ্ধের আতঙ্ক। সেই বাবা ছেলেবেলার রাহুলকে বলেছিলেন, তুমি একজন মুসাফির। এবং তিনি পাঁচটি সুমহান জিনিসকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন— আকাশ, সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্য এবং মরুভূমি। বালক রাহুলকে একা

চলার পাঠ দিয়েছেন সাদা চৌধুরী। একদিকে সাদা চৌধুরীর বন্দিজীবন এবং অন্যদিকে কবির আকস্মিক আবির্ভাব— এই দুইয়ের টানাপোড়েন রাহুলকে নিয়ে যায় রাজনীতির অলিন্দে। শাসকের স্বৈরাচারী শাসনের কবলে সংশোধনাগারে কীভাবে গণতন্ত্র শোধিত হয়, তার এক টুকরো উদাহরণ যেন সাদা চৌধুরী। আজও বহু গণতান্ত্রিক দেশের স্বৈরাচারী শাসন আমাদের মনে করিয়ে দেয় গণতন্ত্রের নামে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার হ্রাসের নিষ্ঠুর খেলা। বুলবনের চাকরির জন্য দরখাস্ত এবং স্কুল কমিটির বিয়ের প্রমাণপত্র চাওয়ার মধ্যে দিয়েও সমকালীন সমাজ পরিস্থিতির নির্মম রূপটি ফুটে উঠেছে। মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরের গোরাবাজারের একটি মেসে থাকে রাহুল। আখ্যানের পটভূমি বহরমপুর এবং তার পাশ্বেবর্তী অঞ্চল। সাদা চৌধুরীকে জেল থেকে মুক্ত করার প্রাণান্তকর দৌরাণ্ডে মুমতাজ আলীর প্রতি কৌতূহল আরও বেড়ে যায় রাহুলের। ক্রমশ নকশালদের দেওয়াল লিখন, স্লোগান সবকিছুর সঙ্গে পরিচিতি হয় রাহুলের। দাদার বেকারত্ব, দাদা-বৌদির সুস্থ দাম্পত্যে আর্থিক টানাপোড়েনের স্রোত, পারিবারিক দুরবস্থার বিচিত্র রূপ সবকিছু রাহুলের গোটা পরিবারটিকেই গোত্রাসে গিলে নিতে চায়। কিশোর মণি থেকে সোনাই সবার মনেই নানাখানা হয়ে পল্লবিত হয়েছে দেশ, সময়, রাজনীতির তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জন-অরণ্য।

গ্রামের জোতদার শশাঙ্কের বাহিনীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের লড়াই সমকালীন গ্রামীণ রাজনীতির সংকটকে চিত্রিত করে তুলেছে। ললিতমোহনের বাগাল (গোরু চরানো) কদম আলী ও হাওয়া বিবির ছেলে ইমান ওরফে ইমানি। ইমানির অসতর্কতায় গোরুর পায়ে ফাল লাগে এবং ললিতের গোরু আহত হয়। ললিতের ভাই শশাঙ্কের গোরুপ্রীতি বিখ্যাত সারা গাঁয়ে। এমতাবস্থায় শশাঙ্কের সমস্ত রোষ গিয়ে পড়ে নিরীহ ইমানির উপর। বেদম প্রহার করে কিশোর ইমানিকে শশাঙ্ক। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু

শেষমেশ ডাক্তাররা তাকে বাঁচাতে পারে না। শশাঙ্কমোহন মানুষের চেয়ে গোরু বেশি ভালোবাসে। শশাঙ্কমোহনের এই গোরুপ্রীতি আমাদের মনে করিয়ে সাম্প্রতিক সময়ের গোবলয়ের রাজনীতিকে। মনে পড়ে সাম্প্রতিক অতীতের অনেক কুখ্যাত ঘটনা। ভারতবর্ষের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশেই ২০১৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের দাদরি পরগনার বিসরা গ্রামে হিন্দুত্ববাদীদের হাতে খুন হন মহম্মদ আখলাক। গো-মাংস খাবার অপরাধে তাকে খুন করে উন্মত্ত জনতা, যদিও রিপোর্টে জানা যায়, সেটা গো-মাংস ছিল না।^{৩১} শশাঙ্কমোহন সংঘ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত কিংবা হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ধ্বজাধারী সৈনিক কিনা সে বিষয়ে উপন্যাসে কোনো ইঙ্গিত নেই, তবে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং তার অমানবিক প্রয়োগ নিপুণভাবে ক্রিয়াশীল। সোভান আলীকে খুন করে জেলে যাবার পরেও সে অনায়াসে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্রভাব-প্রতিপত্তির দুর্গে বসে নিতান্ত এক কিশোরের খুনে তার কিছু যায় আসে না। অন্যদিকে এই ঘটনা রাহুলের মনে প্রবলভাবে দাগ কেটে যায়। এই ঘটনার পর রাহুলের ছটফটানি ছিল ভয়াবহ:

ইতিহাসের সেই বইখানি খুলে রাহুল। বাবাকে যখন পুলিশের কালোগাড়ি উঠিয়ে নিয়ে যায়, তখন এই বইখানি তার হাতে ছিল। এর পৃষ্ঠায় মৃত ধান-পতঙ্গের নষ্ট ডানার দাগ অক্ষরগুলিকে বিক্ষত করেছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, ভারতবর্ষ একটি ভুল সভ্যতার দেশ। এর ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস প্রকৃত ইতিহাস নয়। আমানির সঙ্গে এই ইতিহাসের কোন যোগ নেই। রাজারাজড়ার যুদ্ধের কাহিনী, অস্ত্রের বনবানা, অস্ত্রের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত, সেই উচ্চ নিনাদ, সেই ঐশ্বর্যশালী যুদ্ধযাত্রা হাওয়া বিবির কণ্ঠস্বরকে কোথায় অশ্রুত রেখে বিজয় ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে, ইতিহাসের ভাষা ইমানের উপভাষাকে দাবিয়ে দিয়ে চেপে মেরেছে পলে পলে। ইমানের কণ্ঠস্বর রাহুলকে নিস্তার দিচ্ছে না। ঘুমাতে দেয় না। ‘মানুষ যদি হই’— কখনও ভুলব না এই ঘটনা। মনে মনে বিড়বিড় করে রাহুল।^{৩২}

ইমানিদের মতো অস্তিত্বহীন মানুষদের গল্প শুনে সাতের দশকের বিপ্লবীরা এদের অস্তিত্বের ফুটপ্রিন্টকে কোথাও দাগিয়ে দিতে চেয়েছিল সরকারের উঠোনে। অস্তিত্বহীনতার

খোলনলচে উপড়ে সেখানে বসিয়ে দিতে চেয়েছিল পরিচিতির সিলমোহর। রাহুল সেই বিপ্লবীদের একজন যোগ্য সহযাত্রী হয়ে উঠতে চায় এই মুহূর্তে। সে ছুটে যায় কবির কাছে। একই পরিবারের মানুষদের মধ্যে এরপর শুরু হয় রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংকট। চন্দ্রিমার পার্টির শরৎ জন্ম শতবর্ষের প্রোগ্রাম শুনে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) অর্থাৎ এস.ইউ.সি.আই(সি) পার্টির কথা। ১৯৪৮ সালে শিবদাস ঘোষ এই পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। শরৎচন্দ্রকে নিয়ে শিবদাস ঘোষের আলোচনা-লেখালেখি সেই ইঙ্গিতই দেয়। পক্ষান্তরে, কবির সশস্ত্র বিপ্লবীপন্থা রাহুলকে পৌঁছে দেয় চারু মজুমদারের আদর্শে লালিত নকশালপন্থী সি.পি.আই(এম.এল)-এর ঘূর্ণাবর্তে। এই দুই পার্টির রাজনৈতিক সংকট এবং বিরোধ আখ্যানের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। লেখক ব্যক্তিগত জীবনেও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি নিজেই একজন ‘অ্যাক্টিভিস্ট’। এ উপন্যাস তাঁর সেই ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতারই বয়ান।

চন্দ্রিমা রাহুলের ডায়েরিতে খুঁজে পায় রাহুলের বিপ্লবের মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ইস্তাহার। রাহুল লিখেছে, ‘মৃত্যু জীবনে অবশ্যম্ভাবী, একথা কৌম-মানুষও বুঝত! সেই ‘ক্ল্যানএজের’ কথা। গোষ্ঠী-মানুষের উপলব্ধি ছিল, মৃত্যু অনিবার্য। তাই সে তার আপন প্রজাতির সুখ আর সমৃদ্ধির জন্য আত্মবিসর্জন করাকে জীবনের ধর্ম মনে করেছিল। তার প্রবৃত্তির মধ্যেই গঠিত হয়েছিল আত্মবিসর্জনের শিক্ষা। প্রজাতিকে রক্ষা করার তাগিদে সে তার জীবন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাত। সে তার বাসস্থানের চারপাশে পাথরের দেওয়ালে ঐকে রাখত তারই শিকারী-জীবনের নানান অভিজ্ঞতার বিবরণ। একটি দেশের বিপ্লবের জন্য আত্মবিসর্জনের এই প্রবৃত্তিগত প্রবণতাকে সচেতনভাবে বিপ্লবী শিক্ষার আলোকে এই সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যন্তরে জড়ো করে তুলতে হবে। এবং ছড়িয়ে দিতে

হবে। এটাকেই বলে বিন্দু ভাঙার কাজ। আমাদের রাজনীতি ব্যক্তিগত এই উদ্যোগ এবং আত্মবিসর্জনের রাজনীতি।^{৩৩} ‘বিন্দু ভাঙা’ শুনলেই মনে পড়ে রাহুলদের কমরেড সি.এম অর্থাৎ চারু মজুমদারের কথা। কবিই শিখিয়েছিল রাহুলকে। একটা বিন্দু ভেঙে আর একটা বিন্দু সৃষ্টি করা যায়। একটার থেকে নিয়ে আর একটা, এভাবে আর একটা। একটা বন্দুক ঘিরে একটি পাঁচজন বিপ্লবী জড়ো হতে পারে, একটা গ্রাম একটা তল্লাট জেগে উঠতে পারে। চন্দ্রিমা ও রাহুলের কথোপকথনে উঠে এসেছে তৎকালীন বাম রাজনীতির বিরোধের চিহ্ন। নকশালদের মূর্তিভাঙা রাজনীতির সমালোচনা করেছে চন্দ্রিমা:

মূর্তি ভেঙে, বই পুড়িয়ে চিন্তাকে হত্যা করা যায় না রাহুল। তোমাকে আমি চিনতে
পেরেছি! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে^{৩৪}

নকশালপন্থীদের মূর্তি ভাঙার রাজনীতি নিয়ে রাজনৈতিক সমালোচনা ও চাপানউতোর আজও বিদ্যমান। সরোজ দত্ত বলেছিলেন, ‘...তারা গান্ধীর মূর্তিকে ভাঙছে মঙ্গল পাঁড়ের মূর্তি গড়ার জন্য। কারণ চেয়ারম্যান মাও শিখিয়েছেন তাদের— না ভাঙলে গড়া হয় না। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে যখন ফাঁসিতে উঠেছিল বিদ্যাসাগর কি তখন সংস্কৃত কলেজে বসে ব্রিটিশের জয়গান করে ‘বাংলার ইতিহাস’ রচনা করেনি? তাই তো আজ ছেলেরা ভাঙছে গান্ধী ও বিদ্যাসাগরের মূর্তি মঙ্গল পাঁড়ের মূর্তি গড়ার জন্য। এ কাজ নেতিবাচক নয়। মূর্তি ভাঙছে তারা পাল্টা মূর্তি প্রতিষ্ঠার তাগিদে। গান্ধীর মূর্তি ভাঙছে ঝাঁসীর রাণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। গান্ধীঘাট ভাঙছে তারা মঙ্গলঘাট তৈরীর জন্য।^{৩৫} সি.এম-এর রাজনৈতিক আদর্শে দীক্ষিত হয়ে রাহুল শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতির মধ্যে ঢুকে পড়ে। জোতদার ললিত-শশাঙ্ক কীভাবে তাদের সমগ্র পরিবারটিকে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে শেষ করে দিতে চায়, তা অচিরেই বুঝে যায় রাহুল। সে দাদা বুলবন বা চন্দ্রিমার রাজনীতির সঙ্গে পা মেলায় না। পড়ুয়া যুবক সে, তার পড়ার টেবিলে ভর্তি বই, পার্টির

একনিষ্ঠ কর্মীদের মতো গোপন ডায়েরি, যা ইতিমধ্যে পড়েছে বৌদি চন্দ্রিমা, এই টেবিলে অন্যের হাত এসে পড়লে রাহুল সহজেই কাতর হয়। রাজনৈতিক বিরোধ সঞ্চারিত হয় গোপন ফন্দি-ফিকির ভর্তি ডায়েরির সৌজন্যে। এই টেবিলই রাহুলের গোপন এক মহাদেশ, যেন এখানে একটি যুদ্ধ শুয়ে আছে। যে কোনো মুহূর্তে তা জাগিয়ে দেবে রাহুলকে।

আনিসুল করিম সম্পাদিত ‘আজান’ পত্রিকায় বিয়ের সার্টিফিকেট দর্শিয়ে বুলবনের চাকরির দরখাস্ত বিষয়ক খবর চন্দ্রিমার মনে তুলে দেয় অনেক প্রশ্ন। শরৎচন্দ্রের মতো আপোসহীন সংস্কৃতিভাবাপন্ন মানুষ নয় বুলবন। ক্রমশ একই পরিবারের মানুষদের মধ্যকার রাজনৈতিক বিরোধ সামনে চলে আসে। বুলবন কিছুটা ভিত্তি, মিতভাষী, অন্তর্মুখী প্রকৃতির ছেলে। চন্দ্রিমা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী। অন্যদিকে রাহুল-মণি সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী। বাবা সাদা চৌধুরী শান্তিপ্রিয় অহিংস আন্দোলনের দিশারী। ১৯৪২-র আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) তাঁর *জাগরী* (১৯৪৫) উপন্যাসে একই পরিবারের চারজন মানুষের রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ এবং মানবমনের জটিল অন্তর্লোক উন্মোচন করেছিলেন। আলোচ্য উপন্যাসেও রাহুলের সঙ্গে দাদা-বৌদির বিরোধ সেই চিত্রকেই মনে করিয়ে দেয়। পাশাপাশি তিমিরবরণদের মতো স্বার্থসিদ্ধির গোছানোর মানুষদের হাতে সাধারণ মানুষ ‘ব্যবহৃত হতে হতে শুয়োরের মাংস’ হয়ে যায়। নাগরিক জীবনে লালিত চন্দ্রিমা গ্রামের এই রহস্যময় রাজনীতি ও দুর্বোধ্য সংগ্রাম আত্মস্থ করতে পারে না কিছুতেই। মুখচোরা বুলবন সব জায়গায় অপমানিত হয়ে যন্ত্রণায় কাতরায়। দেশ-কাল-সমাজের বদলে যাওয়া সময়ের প্রেক্ষিতে কীভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পারিবারিক সম্পর্ক। রাজনৈতিক অভিজ্ঞান দামামা বাজিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কে। বেকারত্ব দমবন্ধ করে দেয় নিমেষে। জরুরি অবস্থায়

মুম্বু ভারত আত্মার সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবনের শ্বাসরোধ হয়। ‘মান্য পিতার সন্তান, কয়েদখাটা বাপের ছেলে’ বুলবনের মর্মভেদী উচ্চারণে ফুটে উঠেছে সে কথা:

চাকুরি কি স্বর্ণ মরীচিকা; মা এই ললিতের কাছে চাকরি চাইবেন বলেছিলেন! সমস্ত গ্রামগুলোকে যে হেলায় শাসন করে, পুলিশ থানাকে যে চালিয়ে নিয়ে ফেরে, যার দাপট নয়কে হয় করে এবং হয় নয় হয়, সশ্রদ্ধায় বারংবার তারই চরণ চুম্বন করে ভারতবর্ষ, মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষ চিরতমসার দেশ। এমারজেন্সির ললিতকে যে দেখেনি, সে ভারতবর্ষ চেনে না। মনের মধ্যে এই চিন্তা মুহূর্মুহ বুলবনকে পীড়িত করতে থাকল। সে মেনে নিতে পারছে না যে, এই চাকরিটা তার আর হবে না। একটু আগে অবিশ্বাস করছিল হিফাজতকে, এখন সে ললিতের আবির্ভাবকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে হচ্ছে ললিত আসেনি বুলেট মেরে, ভুল দেখল সে। অর্থাৎ বুলবন যা দেখল, তা ঠিক নয়। অথচ যা ঘটল তাই-ই চিরতমসার উপমহাদেশে বাস্তব ছিল এবং আগামীতেও থাকবে, ভারতবর্ষে এমারজেন্সি কখনও ফুরাবে না—নানান ঘটনায়, বিচিত্র নামে, বিচিত্র ছত্রতলে, মসনদের নীচে ফিরে ফিরে আসবে।

সেই চাপে কতবার মানুষের বিক্ষোভ দানা বাঁধবে, গমকে গমকে আন্দোলন ফেটে পড়তে চাইবে, কিন্তু বিপ্লব হবে না, যদি না সঠিক বিপ্লবীদল এবং নেতৃত্বের জন্ম হয়— একজন যুবক তারই মত, যার চাকরির বড়ই প্রয়োজন ছিল, কোনো দিন কোনো এক মুহূর্তে নিশ্চয়ই একবারও অনুভব করেছে সেকথা।^{৩৬}

বুলবনের ভাবনায় সমকালীন গ্রামীণ সমাজের মধ্যে দিয়ে দেশের সার্বিক চিত্র উঠে এসেছে। ভারতবর্ষের এক ক্ষুদ্র গ্রামের নিতান্তই এক সাধারণ ছেলের অনুভূতিতে ধরা পড়েছে নিম্ন-মধ্যবিত্তের হতাশা, ক্রোধ ও বেকারত্বের গ্লানি।

আখ্যানের গ্রামীণ অঞ্চলের জোতদারশ্রেণির সঙ্গে সাধারণ কৃষকশ্রেণি, শ্রমজীবী মানুষদের সংঘাত অন্য এক ভারতবর্ষের রূপ প্রতিফলিত করেছে। উপন্যাসে মুসলমান মৎস্যজীবী বা মাহেফরাসদের রুজি-রোজগারের সংকটকে নিপুণভাবে ঐক্যেছেন ঔপন্যাসিক। মাহেফরাস হল মুসলিম জেলে, মৎস্যজীবী। প্রণামপুর, নটখুলি, দৌলতডিহা, বীরকুচি এসব জেলেদের এলাকা। রাহুলের রাজনৈতিক জীবনের বর্ণপরিচয় হল এই

শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গে একাত্মতা তৈরি করে শশাঙ্ক-ললিত-নাটাদের মতো জোতদারশ্রেণির মানুষদের সঙ্গে মোকাবিলা। কবি-রাহুলসহ সবাই সি.এম.-এর ‘গেরিলা যুদ্ধ’-এর পথে হাঁটতে চেয়েছে। অতীতের রাজনৈতিক গণআন্দোলন তাদের সাহস জুগিয়েছে, আন্দোলনের পাথেয় হয়েছে। ‘সত্তর দশক মুক্তির দশক’ করার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন চারু মজুমদার, অথচ সেই কাজক্ষিত মুক্তি তাঁর মৃত্যুর পরেও আসেনি। জরুরি অবস্থা মানুষদের মৌলিক স্বাধীনতার ভিত্তিমূলে জোরালো আঘাত করেছিল। এই হারানো বাক-স্বাধীনতা, চিন্তার-স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আত্মসাৎ করার নামই ছিল ‘মুক্তি’। চন্দ্রিমাও দেশ-কালের পরিস্থিতি পরখ করে রাহুলকে সহযোদ্ধা হিসাবে পাশে পেতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। কারণ তারা দুজনেই বামমনস্ক, পার্টির দর্শন আলাদা হলেও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। একটাই উদ্দেশ্য শ্রেণিশত্রু খতম। ললিতদের জলগেটের চাবি আটক রাখা এবং মাহেফরাসদের জন্য জল ছাড়তে অস্বীকার করা— সমকালীন শোষক শ্রেণির একচেটিয়া বলিষ্ঠ হুকুম। যে জলের প্রতিটি ফোঁটায় মাহেফরাসদের শ্রম সংযুক্ত। নদী কেটেছে, বিলের জল তাদের, মেহনত তাদের, জলের অধিকার তাদের। সেই অধিকার হননের খেলায় নিষ্ঠুরভাবে মেতে উঠেছে ললিতের দলবল। ছয়ের দশকের শেষেও গ্রামে যখন শ্রেণিশত্রু খতমের হিড়িক পড়ে গেছিল, ছাত্র-যুবরা খেপে উঠেছিল, তখন ললিতের মতো শোষিতশ্রেণিকে খতমের নির্দেশ দেন স্বয়ং চারু মজুমদার।^{৩৭} অন্যদিকে বুলবনের পার্টির রাজনৈতিক অভিমুখ-এর সঙ্গে মেলে না। কখনও বুলবন কিংবা চন্দ্রিমার সঙ্গে রাহুলের সংঘাত বাঁধে। একজন মানুষকে সর্বোচ্চ নেতার আসনে বসিয়ে এবং ব্যক্তিপূজার চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করে রাহুলদের শ্রেণিসংগ্রাম চন্দ্রিমা মেনে নিতে পারেনি, সে রাহুলদের অনেক কাজের প্রশংসা করলেও রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে সরে আসেনি। একই পরিবারের মানুষদের মধ্যে

হৃদয়তার সম্পর্ক থাকলেও তার অন্তঃসলীলে বহুমুখী সংঘাত প্রকট হয়ে উঠেছে।

এস.ইউ.সি.আই-এর প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষ তাঁর ‘ভারতবর্ষের কৃষি সমস্যা ও চাষী

আন্দোলন প্রসঙ্গে’ ভাষণে বলেছিলেন:

মুষ্টিমেয় লোকের হাতে দেশের বেশিরভাগ জমি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়া, গ্রামের বেশিরভাগ লোকের ক্রমাগত সর্বহারা এবং অর্ধ-সর্বহারার স্তরে নেমে আসা, জমির পুঁজি বিনিয়োগের উপায় হিসাবে রূপান্তরিত হওয়া, মালিক মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হওয়া এবং কৃষি উৎপাদনের জাতীয় বাজারের পণ্যে পরিণত হওয়া— এই সবগুলিই প্রমাণ করে ভারতের কৃষি অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি^{৩৮}

এই সত্য অবলোকন করেই চন্দ্রিমার পার্টি তাদের মতাদর্শ মার্কসবাদী কাজ করতে চেয়েছিল। রাহুলরা চেয়েছিল শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে শ্রেণি-সচেতনতা বৃদ্ধি করতে। দুই পার্টির লক্ষ্য এক হলেও কার্যপ্রণালীর মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। বিয়ের সার্টিফিকেট দেখিয়ে চাকরির প্রত্যাশা বুলবনের বামপন্থী রাজনীতির মর্যাদাবোধে কালিমালিপ্ত করে ‘আজান’ পত্রিকা। ঘরে বাইরে চরম বাকবিতণ্ডা ভর্তি এই ডামাডোল পরিস্থিতিতে রাহুল প্রথম সাক্ষাৎ পায় মুমতাজ আলীর। রাহুলের মতোই উত্তীর্ণ কিশোর সে। মুমতাজের সংস্পর্শে এসে রাহুল জানতে পারে সি.এম-এর রাজনীতির আত্মত্যাগ ও আত্মবিনাশের সীমারেখা, এই দুইয়ের বিরোধ ও ঐক্য। ললিতমোহন-নাট্য তরফদারদের দৌরাণ্য থামাতেই রাহুলরা একজোট হয়ে তৎপর হয়। সাদা চৌধুরীকে জেল ছাড়াবার নানান ফন্দিফিকির কষতে থাকে রাহুল ও তার কমরেডরা। ডাক্তার বিশ্বরঞ্জন, খোদা, তুহিন সকলেই একত্রিত হয়। বহরমপুরের মোহন সিনেমায় তখন ধর্মেন্দ্র অভিনীত ‘হকিকৎ’ সিনেমা চলছে। যে সিনেমার মূল গল্প চিন-ভারত যুদ্ধ। যেখানে চিন আত্মসনবাদী এক হিংস্র শক্তি। চিনের প্রতি দরদী হয়ে এবং সি.এম-এর আদর্শকে পাথেয় করে রাহুল পুরোপুরিভাবে প্রবেশ করল সশস্ত্র সংগ্রামে। আজ তার প্রথম পরীক্ষা। রাহুল এবং

মুমতাজকে সিনেমা হলে বোমা ফেলার নির্দেশ দেয় বিশ্বরঞ্জন এবং অন্য দুজনকে নির্দেশ দেওয়া হয়, নাটার বন্দুক ছিনতাইয়ের। এই বন্দুক কাড়তে পারলেই নাটা এবং ললিতের মনোবল ভেঙে পড়বে। জেলার উন্নত্ত প্রশাসককে থামাতে এই কর্ম তাদের আশু প্রয়োজন। ১৯৭২-এ চারু মজুমদার মারা যান, অথচ তাঁর দর্শন ও আদর্শে লালিত হয়ে একদল কিশোর-যুবক শাসকের রণকৌশলকে ভাঙতে বহরমপুরের বুকে গর্জে উঠেছে। জীবনের শেষ পাঁচ বছরে চারু মজুমদার এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন উপস্থিত করেছিলেন— বলপ্রয়োগ না করে বিপ্লব করা যাবে না। বিপ্লব এখনই শুরু করতে হবে। অস্ত্রশস্ত্র যা আছে, কাস্তে, কাটারি, দা, কুঠার নিয়ে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করতে হবে। ১৯৭৫-সালের মধ্যে দেশে তাঁর দলের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম হবে এবং সত্তর দশকের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৮০-র মধ্যে দেশের মুক্তি ঘটবে।^{৩৯} চারু মজুমদারের রেখে যাওয়া স্বপ্নকেই যেন রিলে-রেসের মতো একদল যোদ্ধা বয়ে নিয়ে চলেছে জরুরি অবস্থা বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষের এক জেলার গ্রামাঞ্চলে। সাধারণ ছাত্র থেকে রাহুলও জড়িয়ে পড়ে আত্মত্যাগের গোপন রাজনীতির ‘এলিপসয়েড’-এ। সি.এম একদিন গরিব কৃষক, খেতমজুরদের জোতদারদের গলা কাটার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ছাত্র-যুবাদের বলেছিলেন, লেখা পড়া ছেড়ে বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তাঁর কথনভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যা, জয়ের অনিবার্যতা সম্পর্কে অনুগামীদের সুনিশ্চিত করেছিল।^{৪০} দিয়েছিল প্রবল আত্মবিশ্বাস ও অদম্য জেদ। এই জেদের বশেই মুমতাজ আর রাহুল মোহন সিনেমার ভেতরে বোমা ফেলে বেরিয়ে আসে। শুরু হয় তাদের গেরিলা যুদ্ধের সূচনা। এমার্জেন্সি পীড়িত ভারতবর্ষে সরকারের ফ্যাসিবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে শুরু হয় রাহুলদের জেহাদ। অথচ চিনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ শেষ হয়েছে সীমান্তে এবং সাধারণ

মানুষ রাহুলদের প্রতিবাদকে কীভাবে গ্রহণ করবে— এ নিয়ে শুরু হয় প্রশ্ন ও তর্ক।

সৌরেন বসু চারু মজুমদারকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন:

চারুদাকে বরাবরই দেখেছি শোধানবাদ বা আপোষের প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে, ঘৃণা করতে। দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট পার্টি করার পর নেতৃত্বের প্রতি জন্মেছিল তাঁর এক প্রচণ্ড বিরূপতা। ... ১৯৬২ সালে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের সময় চারুদা পরিষ্কার বললেন, সমস্ত দেশপ্রেমের জোয়ার উপেক্ষা করে, ‘ভারত অনেকদিন থেকে চীনকে আক্রমণ করছে চীন তার জবাব দিচ্ছে। দেশের আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ দমনোর জন্য এছাড়া সরকারের কাছে অন্য কোনো রাস্তা নেই। কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ অন্য দেশের সীমানা আগে লঙ্ঘন করে না এটা জেনে রাখবে। ভারত সরকার চীনকে আক্রমণ করছে। তাই আমাদের উচিত এই যুদ্ধের বিরোধিতা করা।’ চারুদা এসব কথা বলছেন এমন সময় যখন দেশজুড়ে দেশপ্রেমের বন্যা। কংগ্রেসী গুণ্ডারা আমাদের তখন বলত, ‘চীনের দালাল চীনে যা, চাংচুং কইরা আরশুলা খা’। কমিউনিস্ট পার্টির বিরাট সংখ্যক কর্মীদের সঙ্গে চারুদাও জেলে গেলেন তাঁদের যুদ্ধবিরোধী অবস্থানের জন্য।^{৪১}

সি.এম-এর ঘোষিত পথেই রাহুলদের যাত্রা। কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিল, কেবলমাত্র গেরিলা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই বিপ্লবের বিকাশ ও অগ্রগতি সম্ভব। ভারতবর্ষ ডিনামাইটে পরিণত হয়েছে, সি.এম-রা শুরু করলেই বোঝা যাবে তার বিস্ফোরণের ক্ষমতা।^{৪২} এমার্জেন্সির বারুদ বুকে নিয়ে রাহুল-মুমতাজদের দলবল এই বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সি.এম-এর দর্শন সমকালীন সময়ে বহু ছাত্রদের মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। দর্শনের দুটি মূল উপাদান ছিল— স্বপ্ন এবং মৃত্যু। স্বপ্নকে মৃত্যুর রঙে সি.এম রাঙিয়ে তুলেছিলেন এবং তুলির নিপুণ আঁচড়ে মৃত্যুকে স্বপ্নের মতো শিল্পসুষমা দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখেই বোঝা যেত, সুনিশ্চিত পা ফেলে মৃত্যুর দিকে তিনি এগিয়ে চলেছেন। তিনি নিজেও সে কথা জানতেন। তাঁর তীব্র দৃষ্টিতে, বেপরোয়া হাবভাবে, কথাবার্তায় বিপ্লবের দীপ্তি আর মৃত্যুর বিভা যুগপৎ ঝলসে উঠত। নিজের রোগশীর্ণ শরীর থেকে তিনি মৃত্যুর গন্ধ পেতেন এবং বিপ্লবী ধমক দিয়ে কিছু সময়ের

জন্যে মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তাঁর বিপ্লবী আবেগে মিশেছিল মৃত্যুচিন্তার চোরাস্রোত। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বারবার আশাভঙ্গের বেদনা এবং নতুন পৃথিবী দেখার ব্যাকুলতা থেকে তাঁর চিন্তায় ভিন্নমুখী দুই প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। যে কোনওভাবে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছানো ছিল তাঁর দর্শনের মূল কথা। দরকার হলে প্রাণ দিতে হবে এবং প্রাণ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। রাজনীতির রহস্যময় মোড়কে মৃত্যুকে গোলাপ ফুলের তোড়ার মতো যুব-ছাত্রদের তিনি উপহার দিলেন। আত্মত্যাগ আর আত্মরক্ষার রোমাঞ্চকর ব্যাখ্যা শোনালেন। মৃত্যু ঘিরে এমন এক মনোমোহিনী বলয় তৈরি করলেন, যার আকর্ষণে তরুণরা দল বেঁধে জীবন দিতে এল। সামাজিক শক্তি হিসাবে ছাত্র-যুবকদের গুরুত্ব তিনি জানতেন। তাদের উদ্দীপ্ত করার মতো আবেগ তাঁর ছিল। সময় এবং পরিস্থিতি সাহায্য করেছিল তাঁকে। রাজনৈতিক, সাংগঠনিক প্রতিটি ঘোষণার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে তাঁর দর্শন। দর্শনের ভেতরকার অংশটা বুঝলেই জানা যায়। তাঁর স্বপ্ন ছিল, ১৯৮০ সালের মধ্যে ভারতীয় সমাজের আমূল পরিবর্তন করা। এই সূত্রেই এসেছে মৃত্যু প্রসঙ্গ। প্রশ্ন আর মৃত্যু গায়ে গায়ে লেগে থাকলেও প্রথমটা সহজে বোঝা যায়। দ্বিতীয়টা বুঝতে সময় লাগে, মৃত্যু প্রসঙ্গ এসেছে অন্যভাবে, সি.এম যখন বলেন, ‘এটা আত্মরক্ষার যুগ নয়, আত্মহত্যার যুগ’, তখন আত্মরক্ষার অর্থ ‘আপন প্রাণ বাঁচার’ মতো হালকা মনে হয়।^{৪০}

এই দু’রকম মৃত্যুর প্রসঙ্গই এসেছে উপন্যাসে। সি. এম-এর ঘোষিত আন্দোলন এবং প্রকৃত কমিউনিস্ট হবার দৌড়— রাহুলের ভেতরে মারাত্মক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। বিপ্লবের প্রথম দিনেই ঘটে যাওয়া অপ্রত্যাশিত এবং অতর্কিত ঘটনা তার মনে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। রাহুলের অনুভূতিতে ফুটে উঠেছে সে কথা:

আত্মত্যাগের একটি হঠকারি নেশা রক্তে ঘুমিয়ে থাকে, শ্রেণীঘৃণা তাকে উগ্রভাবে জাগিয়ে তোলে। হঠকারিতাকে পাগলামি বলা হয়। কিন্তু এই পাগলামিরও একটি দীর্ঘ

অতীত ইতিহাস আছে। কিন্তু এত ভাবনা কিসের তার! মৃত্যুর টিকিট তো তার কাটা হয়ে গেছে। অন্তর্গত রক্তের ভিতরে এ এক অন্য চলচিত্র শুরু হয়ে গেছে। বাস চলছিল। দূর হাওয়া থেকে কানে ভেসে আসছিল মাইকের গান। ‘একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি’। আপনমনে বিড়বিড় করল রাহুল, আবার এসেছি ফিরিয়া। বড়লাটকে মারতে চাইল ক্ষুদিরাম। মরল এক নিরীহ ভারতবাসী। শহিদ ক্ষুদিরাম, তবু তো অবজ্ঞেয় নয়, পূজিত। সিনেমার পর্দায় ছুঁড়ে মারা বোমাটি কি তা হলে অর্থহীন ছিল না গতকাল! রাহুল আপন মনে গুনগুন করে— ‘আবার হবে তো দেখা, এ দেখাই শেষ দেখা নয় তো!’^{৪৪}

সহিংস রাজনীতির অলিন্দে প্রবেশ করার পরেও মৃত্যুভয় রাহুলকে যেন কোথাও গিলতে চায়। বাবা জেলবন্দি হবার পর যে পণ নিয়ে সে এ পথে এসেছে সে পথের উপরিসৌধ, আন্দোলনের ধরন সবটাই তাকে অবাক করে দেয়। তারই বয়সের এক শহিদের মৃত্যু স্মরণ করে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় সে। ক্ষুদিরামের নিশানা ভুল হলেও প্রতিবাদের ভাষা ছিল নির্ভুল। আজকের সিনেমা হলের বোমা বর্ষণের পর যেন রাহুল হয়ে উঠেছে ক্ষুদিরামের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। ‘আঠারো বছর’ বয়সের রক্ত টগবগ করে, ‘বিপ্লবী স্পন্দিত বুকে মনে হয়’ সে ক্ষুদিরামের মতোই সাহসী এবং প্রতিবাদী। অথচ পরক্ষণেই মুমতাজের প্রেম বিষয়ক কথাবার্তা তার অন্তর আলোড়িত করে। যুদ্ধ আর প্রেম রক্তের নিশান উড়িয়ে যেন বয়ে চলেছে রাহুলের সারা শরীরে। মোহরের কথা বারবার মনে পড়ে তার। রাহুলের লক্ষ্য এবং পথ আলাদা, অথচ মোহরের সান্নিধ্যে সে পেতে চায় শান্তির নিশানা। ‘ভালোবাসার কাছেই ছিল নদী/ ভালোবাসার পাশেই রণস্থল/ জীবন আমার উধাও সজ্জা স্রোতে/ যুদ্ধে আমার থোড়াই সংশয়’। কবিতা আউড়ে চলে যায় রাহুল। মোহরের অশ্রুসজল চোখ তার বিন্দুবৎ মিলিয়ে যাওয়া দেখতে থাকে। পুনরায় তারা একত্রিত হবে কিনা জানা নেই রাহুলের। প্যালেস্টাইনের বিখ্যাত কবি মাহমুদ দারবিশের (১৯৪১-২০০৮) সেই বিখ্যাত কবিতাটি আমাদের মনে পড়ে যায়:

She said: when will we meet?
I said: A year after the war ends.
She said: When will the war end?
I said: When we meet.^{৪৫}

একই পরিবারের মানুষদের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তৈরি হলেও সময় পরিস্থিতির চাপে তারা একে অপরের পাশে থেকেছে। শোষণমুক্ত সুখী সমাজ গড়ে না ওঠায় বুলবন বা চন্দ্রিমার মতো ডিগ্রিধারী মানুষেরা বেকারত্বের জীবন কাটিয়েছে। উপরমহলের তদারকিতে চাকরি পায় তাদের জ্ঞাতিস্বজন। ছয়ের দশকের বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কারণ ছিল বেকারত্বের সংখ্যাভীত বৃদ্ধি। শিক্ষা-কৃষির অচলাবস্থা ছাত্রদের উপরিসৌধের বদলে বুনিয়াদে ঘা দেবার প্রেরণা দিয়েছিল। সমাজবদলের স্বপ্ন ছাত্র যুবাদের একতাবদ্ধ করেছিল। নকশাল আন্দোলনের পরে এ স্বপ্ন আরও ব্যাপক ও বৃহৎভাবে ফেটে পড়ল বাংলার মাটিতে। নিপাট পড়ুয়া সমাজ আচমকা অসহিষ্ণু, প্রতিবাদী, নিষ্ঠুর, মারমুখী হয়ে উঠল ক্রমশ। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার লড়াইয়ের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব দাবিদাওয়া ও কর্মসূচি এবং বহুমুখী প্রশ্নসমূহের আলোচনা সমকালীন সময়ে সুশীল ছাত্রসমাজের দিকটাও একভাবে নির্ধারণ করা যায়। আজকের বাংলায় সমস্যা একই রয়ে গেছে কিংবা আরও বহু সমস্যা বাড়ছে উত্তরোত্তর, তবুও কোথাও একজোট হয়ে সে সবার প্রতিবিধান করার মতো মানসিকতা নেই। রাহুলদের মতো যুবকেরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল সমসাময়িক এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে। চন্দ্রিমার কথা শুনতে শুনতে রাহুল স্তম্ভিত হয়ে যায়। অসম্ভব এক তীব্র কষ্ট তার বুকে বেজে ওঠে। দাদা-বউদির মধ্যে সে এই দেশের বেকারত্বের যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করে। শিক্ষিতের চূড়ান্ত অবসাদ, চরমতম বেদনা অনুভব করে। পরীক্ষায় পাশ করে ফেলা যেন এখানে লজ্জা, এখানে সাংঘাতিক অপরাধ, সে ভারি কলঙ্কের ব্যাপার।^{৪৬}

পার্টির কর্মী এবং আন্তঃধর্মে বিবাহের কারণে বুলবনের চাকরি হয় না। বিপ্লবী হতে গিয়ে বুলবন বা চন্দ্রিমা কেউই সুখী দাম্পত্য যাপন করতে পারিনি। সাংসারিক অসচ্ছলতার মাঝে তাদের প্রেম বিচ্ছিন্নতা রোধ করতে পারেনি। জরুরি অবস্থা সমকালীন ভারতবর্ষের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এই সংকট শুধু বাংলায় নয়, আপামর ভারতবর্ষেই সংঘটিত হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর হঠকারিতা ভারতীয় শিক্ষার সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২৩ জুন, ১৯৭৬-এ দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে মেদিনীপুর জেলার তিনজন কংগ্রেস নেতাকে মিসায় আটক করেছিল পুলিশ। তারা হলেন— রজনীকান্ত দলুই (এম.এল.এ), জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুহাস দত্তরায় এবং জেলা কংগ্রেসের সহ সভাপতি রাজকুমার মিশ্র। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল— বেকার যুবকদের চাকরি দেওয়ার নামে প্রচুর টাকা নিয়ে চাকরি দেননি। এমনকি টাকা ফেরত চাইলে গেলে ভয় দেখিয়েছিলেন। অন্যদের মতে, এই তিন নেতা অরুণ মিত্র, জ্ঞান সিং ও সোহনপাল প্রিয়-কুমুদ গোষ্ঠীর অনুগত থাকায় মুখ্যমন্ত্রী এঁদের গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছিলেন।^{৪৭} সরকারি চাকরি এবং দুর্নীতি— আজকের সময়েও প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে। বুলবনের মতো সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান আজও ডিগ্রি মাথায় নিয়ে বেকারত্বের আগুনে গুমরে মরছে বাংলার নানান প্রান্তে। দূরদর্শী লেখকের হাতে অতীত-বর্তমানের সংকট একাকার হয়ে গেছে। কেবল পরিবারের চিন্তা নয়, আন্দোলনের বুনিয়াদকে শক্তিশালী করতে রাহুল ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে চায় সাংগঠনিক ক্ষমতা সম্প্রসারণের নানান পদক্ষেপ। নাট্য তরফদারের বন্দুক চুরির পর থেকেই শশাঙ্ক এবং নাট্যর মনোবল ভেঙে যায় অনেকটা। এই বন্দুকই তো মানুষের ক্ষমতার উৎস ও আধিপত্যের নিশান। একথা অর্ধশিক্ষিত, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ আয়েষা বিবি স্মরণ করিয়ে দেন রাহুলকে। মায়ের উপলব্ধিই যেন রাহুলের রাজনৈতিক দর্শনের

উপলব্ধি। মাও বুঝে গেছেন, ‘বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস’। বন্দুক হাতে ছিল বলেই জোতদার শশাঙ্ক খুন করেছিল সোভান আলীকে। মুমতাজ আলী বন্দুক রেখে গেছিল সাদা চৌধুরীর বাড়িতে, তার জেরে জেলে যেতে হল সাদা চৌধুরীকে। আচমকা রাহুল এসে পড়ল এই ঘটনাবলীর কেন্দ্রে। সময় এবং ঘটনার উৎক্ষেপণ অপ্রতিরোধ্য। শ্রেণি ঘৃণা রাহুলকে ক্রমশ তাড়িত করছে। এই ঘৃণার তীব্র উৎসার আকাশকে সমাচ্ছন্ন করে, ইতিহাস সেই উদ্গীরণ দেখেছে, ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে এমার্জেন্সির তামাম প্রেক্ষাপট। একরাশ জেদ নিয়ে রাহুল পাঠ করতে থাকে সি.এম-এর ‘ঐতিহাসিক আটটি দলিল’ বইটি। অষ্টম দলিলে চোখ পড়তেই তার জেদ আরও বেড়ে যায়:

মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলার সংগ্রামই আজকের দিনে কৃষক আন্দোলনের সবচেয়ে জরুরী, আর এই মুহূর্তের কাজ। মুক্ত অঞ্চল আমরা কাকে বলব? যে কৃষক অঞ্চল থেকে আমরা শ্রেণীশত্রুর উচ্ছেদ করতে পেরেছি, সেই এলাকাকেই আমরা মুক্ত অঞ্চল বলব। এই মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য চাই কৃষকের সশস্ত্র শক্তি। এই সশস্ত্র শক্তি বলতে আমরা কৃষকের হাতে গড়া অস্ত্রকেও যেমন ধরি, ঠিক তেমনি বন্দুকও চাই। কৃষক রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা তা আমরা বুঝব কৃষক বন্দুক সংগ্রহ করতে অগ্রসর হল কিনা এর ভিত্তিতে। বন্দুক কৃষক কোথায় পাবে? শ্রেণীশত্রুদের হাতে বন্দুক আছে এবং তারা গ্রামের মধ্যেই বাস করে... এই বন্দুক সংগ্রহ অভিযান যে এলাকায় আমরা সংগঠিত করতে পারব সেই এলাকা দ্রুত মুক্ত এলাকায় রূপান্তরিত হবে।^{৪৮}

মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে তুহিন, খোদা বক্স সহ সকলেই একজোট হলেও রাহুলের সংশয় থামে না। যারা কখনও চাষের কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল না তারাও এ কাজে এগিয়ে এসেছে। রাহুলদের সংকল্প কতদূর সার্থক হবে তা নিয়ে রাহুল সন্দেহান। পাশাপাশি সি.এম-এর তত্ত্বকে ষোলআনা নির্ভুল, নিঁখুত, বিস্তৃত মনে করে তা প্রমাণের দুরন্ত প্রয়াসকে চন্দ্রিমার নিছক হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। ছয়ের দশকের শেষে যে আগুনের স্কুলিঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল বঙ্গদেশে তা সাতের দশকের

গোড়ায় ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। জরুরি অবস্থার অতর্কিত আঘাত সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিল এবং রাহুলদের মতো যুবকেরা পুনরায় সি.এম-এর আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। চন্দ্রিমা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সমকালীন বামপন্থী দলগুলির বাকবিতণ্ডা এবং মিলনের সূক্ষ্ম প্রয়াসের ভেদরেখাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চন্দ্রিমা রাহুলদের ঘোষিত পথে সরাসরি যোগ দিতে পারেনি, অন্যদিকে তার পার্টির আদর্শ বুকে নিয়ে বুলবনকেও সহযোদ্ধা হিসাবে পাশে পায়নি— পারিবারিক এবং দাম্পত্যের টানাপোড়েনে চন্দ্রিমা নাজেহাল হয়েছে। সি.এম এবং জি.এস-এর রাজনৈতিক দর্শনকে পৃথক করতে গিয়ে তার সাংসারিক জীবন তছনছ হয়েছে। ‘কোথাও যদি সি.এম আর জি.এস না মিলেও থাকেন কখনও কোনো কালে— তার হৃদয়ের সরণিতে, কেবল তারই সূর্যোদয়ের পথে, দুটি প্রবাহ হৃদয়েরই দুরূহ শক্তিতে এক হয়ে গেছে। আজ তার দলের সর্বোচ্চ নেতার রাজনীতির প্রকৃত ক্ষমতাই রাহুলকে বলিষ্ঠভাবে টানতে পারে তার দিকে। বুলবনকে আরও ভালোবাসার জোরই তার একমাত্র পথ, বুলবন রক্ষা না পেলে, রাহুল রক্ষা পায় না। স্বামীটির ছবির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চন্দ্রিমা নিঃশব্দে কেঁদে ফেলে।’^{৪৯} চাকরি না পাবার যন্ত্রণায় ক্রোধের বশে বুলবন ছিঁড়ে ফেলেছিল বিয়ের সার্টিফিকেট। শাখা, সিঁদুর সহ বিয়ের কোনো বাহ্যিক চিহ্নই বহন করে না চন্দ্রিমা, এতে তার অভিমান হয়। স্বামী-দেবরের বিপরীতধর্মী মানসিকতা, একজন ভিত্তি, অন্যজন প্রতিবাদী— দ্বন্দ্ব পীড়িত হয় চন্দ্রিমা। তার দাম্পত্যের সুরের তার কেটে গেছে যেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুচর্চিত লাইন ‘বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্য বিধানের নাম জীবন’— বুলবন-চন্দ্রিমার দাম্পত্যে সেই সামঞ্জস্য নেই। অথচ এই পরিবারের সুখ-দুঃখ এবং ভালো-মন্দের সঙ্গে আদ্যোপান্তভাবে জড়িয়ে রয়েছে চন্দ্রিমা।

মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতার বোধ, সামাজিক অবস্থান, পরিণত মনের বহুমুখী প্রতিভা— এসবের স্বতঃস্ফূর্ত স্ফূরণ তার ব্যক্তিজীবনের বেড়ে ওঠার উপর নির্ভর করে। আর সে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং দেশের অন্তর্বর্তী সন্ধিক্ষণের ভিত্তিতে। সাতের দশকের ভারতবর্ষ, বিশেষত বাংলার দুর্বোধ্য জটিল জনজীবন এমনই হয়ে উঠেছিল যে রাতারাতি একগাদা দামাল ছেলে ছাত্র অবস্থা থেকে পরিণত মনের অধিকারী হয়ে উঠেছিল। রাহুলের ছোট ভাই মণি তেমনই এক চরিত্র। কিশোর মণির মধ্যে দিয়ে লেখক সমকালীন নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সেই কিশোরদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, যারা চারপাশের ন্যাকারজনক পরিস্থিতি দেখে আপোসহীন সংগ্রামী হয়ে উঠেছিল। কোনো তত্ত্বের ভুলভুলাইয়াতে নয়, কৃষকদের ন্যায্য অধিকার বুঝে নিতে তারা আগাপাশতলা না ভেবে সশরীরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নিজেদের শ্রেণি পরিচয় পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তাদের শরীর-মুখের প্রতিটি উচ্চারণ ছিল স্পর্ধিত।

গ্রামের জোতদার শশাঙ্ক গরিব চাষি কদম আলীর বৌকে ধর্ষণ করে এবং মণি সেই দৃশ্য দেখতে পায়। কিশোর মণি জানেই না যৌন অত্যাচার কী, কদম আলীর বৌয়ের গোঙানির স্বর তার মনকে ভয়ানকভাবে পীড়িত করে। ধর্মকথিত শশাঙ্কের ‘পাপ’— আচরণ, গ্রামের ক্ষমতার রাজনীতির জটিল ঘূর্ণিপাকের মাঝে কিশোর মণিকে পরিণত করে দেয়। চন্দ্রিমার সঙ্গে মণি নাট্য তরফদারের বাড়ি গেলে তাকে ভয়ানকভাবে প্রহার করে নাট্য তরফদার ও ব্যথা তরফদারের ছেলে হকিকত। কী অদ্ভুত মেটাফর ব্যবহার করেছেন লেখক। হকিকৎ নামের এক সিনেমা বামপন্থী আন্দোলনকারীদের পরিপন্থী ছিল সেই সময় এবং পাশাপাশি হকিকত নামের এক ছেলেই চোখ রাঙিয়ে শাসন করেছে রাহুলের ভাই মণিকে। দুই হকিকৎ একসূত্রে গেঁথে যায়। নাট্য বন্দুক চুরির দায়ভার সে চাপিয়ে দেয় মণির উপর। এরপর শুরু হয় মণির স্বীকারোক্তির খেলা। যেখানে রাজনীতি

আর ধর্ম এক ঘাটে জল খায়। ব্যথা তরফদার জোর করে মণির হাতে তুলে দেয় কোরান এবং বন্দুকের ব্যাপারে সত্য কথা বলিয়ে নিতে চায়। ধর্মভীরু মানুষের কাছে সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের মহার্ঘ বস্তু হল কোরান। তাকে স্পর্শ করে মিথ্যে বলতে ভয় পায় ধার্মিক। এসব দৃশ্য ভয়ানক পীড়িত করে চন্দ্রিমাকে। বুলবন তাকে সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি থেকে এক বিখ্যাত উক্তি শুনিয়েছিল, The Communist Party of India doesn't understand the mind of India.^{৫০} এই বাক্য উদ্ধৃত করে চন্দ্রিমা বামপন্থীদের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন:

ব্যথার আচরণের মধ্যে ভারতবর্ষ আছে। কমিউনিস্ট যদি ভারতবর্ষকে সঠিক চিনতে না পারে, তাহলে সে এই দেশটাকে বিপ্লবের আঘাতে বদলে দিতেও পারবে না। কোরানের স্পর্শে মণির দেহ জ্বালা করছে কেন! তা বোঝা কি মুখের কথা! ‘তুমি সরে দাঁড়াও বৌ! মুসলমানের ছেলে কোরান হাতে করে সত্য কথা বলবে’ সরে দাঁড়াও, কথাটি কী সাংঘাতিক! মুসলমানের ছেলে, কী নির্মম কঠিন উচ্চারণ! শত পবিত্র মনুষ্যত্বের কিরণে আত্মা বিধৌত হলেও কি হিন্দু-চন্দ্রিমা কখনও মানুষ নামে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে? এখানের কমিউনিস্টরা ঘরে ঠাকুর-পূজার পীঠ রাখে, বাইরে সেকুলার। এদের রয়েছে মিটিং কা কাপড়া, ক্লাব কা কাপড়া, অন্নপ্রাশন কা ধোতি! নানা রকম রঙ এদের। এরা অত্যন্ত গেরস্ত ধরনের লোক। রাহুলের দলে নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম ঘটছে। কিন্তু তারা কখনও ধৈর্য ধরে ব্যথা বিবির অতি নিষ্ঠুর ব্যথা যে কী বস্তু, বুঝেও বুঝতে পারেনি।^{৫১}

চারু মজুমদারের ডাকে নকশালপন্থীরা একজোট হয়ে লড়াই করলেও তারা তৃণমূল স্তরের নাড়ি-নক্ষত্র পুরোপুরিভাবে চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল। গ্রামের সাধারণ কৃষকের মতো ছাত্ররাও ছিল আবেগপ্রবণ ও অদূরদর্শী। হঠকারিতার বশে খুন জখম, নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন— প্রবল উৎসাহে শুরু হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সর্বস্তরের মানুষ সাড়াও দেয়নি। অথচ এই ‘গ্রাসরুট’ মানুষদের দ্বারাই মূলত নির্ধারিত হয় সরকারের জয়-পরাজয়। ধর্ম ও রাজনীতি পাশাপাশি রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের ফায়দা তোলে।

শুরু হয় ‘হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক’ এবং ‘মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক’-এর খেলা। আপাতভাবে ধর্মবিচ্ছিন্ন ও মানবতার সমর্থক চন্দ্রিমা এদের বিশ্বাস ও জীবনযাপনের ব্যবধান অতিক্রম করতে পারেনি। হাকিম কাকাদের মতো চরিত্ররা ধর্মের ধ্বজাধারী হয়ে চন্দ্রিমাকে কলেমা পড়িয়ে মুসলমানিত্বে উন্নীত করতে চেয়েছে। শাস্ত্রের কড়া আইন গাঁথতে চেয়েছে সেকুলার চন্দ্রিমার ‘আইডেন্টিটি’তে। শশাঙ্ক-ললিত-শরম আলীরা চেয়েছিল ছলে-বলে-কৌশলে মাহেফরাসদের আন্দোলনকে দমন করতে। বস্তুত সেই কারণেই রাহুলদের পরিবারের উপর শুরু হয় কঠোর নির্যাতন। আদিত্য বাবুদের মতো এস.ইউ.সি.আই-এর সমর্থকদের সঙ্গে নকশালপন্থী রাহুলদের তর্ক হয় বিস্তর। বন্দুকের নল বনাম শরৎচন্দ্রের লেখনী— এই তত্ত্বে রাহুল বেছে নেয় অস্ত্রের হুক্কার। মাহেফরাসদের জল সংকট নিয়ে তীব্র বাকবিতণ্ডা চলে দু’পক্ষের। রাহুল তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অভিযান* উপন্যাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। রাহুলদের কমরেড সি.এম যাঁকে বলেছিলেন, ‘সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন লেখক।’^{৫২} ছাত্র যুবকদের এই কৃষি বিপ্লবের রাজনীতি জোতদারদের ভিতে ফাটল ধরিয়েছিল। ক্ষুদ্র, লুম্পেন, প্রলেতারিয়েত সবাইকে আহ্বান করেছিল তারা এই লড়াইয়ের ময়দানে। জার্মান কবি বের্টোল্ট ব্রেশ্ট (১৮৯৮-১৯৫৬)-এর একখানা কবিতা রাহুলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ‘মজুরের চোখে ইতিহাসের কেতাব’ নামে কবিতাটি অনুবাদ করেছিলেন কবি সরোজ দত্ত। চন্দ্রিমা এই কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন আয়েষাকে। আলোচনার সুবিধার্থে কবিতাটি উদ্ধৃত করছি আমরা:

কারা গড়েছিল থিবিস নগরীর সাত সাতটি প্রবেশদ্বার?
ইতিহাসের কেতাবে লেখা হরেক রাজার নাম।
কিন্তু বড়ো বড়ো চাঙড়গুলো ঠেলে ঠেলে তুলেছিল যারা
তারা কি রাজা ছিল?

ধ্বংস হলো ব্যাবিলন

কিন্তু প্রতিবার নতুন করে তাকে গড়ে তুললো যারা, তারা কারা?
স্বর্ণ ঝলকিত লিমা নগরীকে গড়েছিল যারা—
নগরীর কোন্ গৃহটিতে তাদের বাসস্থান?

যে সন্ধ্যায় শেষ হলো চীনা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ
সে সন্ধ্যায় কোন আশ্রয়ে ফিরে গিয়েছিল ক্লান্ত রাজমিস্ত্রির দল?

সাম্রাজ্যিক রোম বিজয়-তোরণে তোরণে ভর্তি,
কিন্তু সেগুলি গড়েছিল কারা?
কাদের বিজিত করেছিলেন সম্রাটেরা?

গানে গানে অমর হয়ে আছে বাইজান্টিয়াম
কিন্তু তার সব গৃহগুলিই কি ছিল রাজপ্রাসাদ?

যে রাত্রে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে হঠাৎ প্লাবিত হলো—
পুরাণ কথিত আতলান্তিস্ নগরী,
সে রাত্রে, সেই দিশেহারা প্লাবনের মুখে দাঁড়িয়েও,
ডুবন্ত মানুষগুলো মালিকের মেজাজ নিয়ে ডেকেছিল
তাদের ক্রীতদাসদের?
তরুণ আলেকজান্ডার জয় করেছিলেন ভারতবর্ষ
জয় করেছিলেন কি তিনি একা?
সিজার মেরে তাড়িয়েছিলেন গল্দের
কিন্তু একটিও বার্বুচিও কি ছিল না তাঁর ফৌজে?

স্পেনের নৌবহর ধ্বংস হয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গেলে
কেঁদে ভাসিয়েছিলেন স্পেনের রাজা ফিলিপ,
কিন্তু আর কেউ কি কাঁদেনি?
সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন মহামতি ফ্রেডরিক,
আর কারা জয়ী হয়েছিল তাঁর সঙ্গে?
ইতিহাসের পাতায় বিজয় কাহিনী,
কিন্তু বিজয়োৎসবের খরচ জুগিয়েছে কারা?
প্রতি দশবছর অন্তর একজন করে মহাপুরুষের আবির্ভাব,

কিন্তু কাদের গাঁটের শেষ কানাকড়ি টেনে নিয়ে
তৈরি হয়েছিল এই মহা আবির্ভাব-পথ?

মনে আসে এই ধরনের নানা খুঁটিনাটি কথা,
এই হাজারো রকমের প্রশ্ন^{৫০}

শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে থেকে কবিতা কথক কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। এবং তাঁর প্রশ্নেই
নিহিত রয়েছে উত্তর। সমাজের নানান শ্রেণির মানুষদের কথা উল্লেখ করেছেন কবিতা
কথক। মানবসভ্যতার অগ্রগতির মূল কাণ্ডারী মানুষগুলি কোনোদিনই পায় না তাদের
শ্রমের মর্যাদা। অথচ ‘শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-‘পরে/ ওরা কাজ করে।’ এই প্রশ্নগুলি
উত্থাপন করে কবিতা-কথক বিতর্কটাকেই উস্কে দিয়েছেন। কবিতা শোনার পরেই আয়েষা
চন্দ্রিমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ন্যালার মায়ের কথা। কখনও তাকে সম্বোধন করা হয়
ন্যালার মা, কখনও কদমের বৌ। আত্মপরিচয়হীন একজন মানুষ যেন ন্যালার মা।
বের্টোল্ট ব্রেস্ট-এর কবিতায় বর্ণিত শ্রমজীবী মানুষদের মতোই নামহীন-গোত্রহীন।
ইতিহাসের পাতায় সর্বহারা মানুষদের ঠাঁই নেই। রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* নাটকের
শ্রমিকদের মতোই তারা পরিচয়হীন সংখ্যা মাত্র। মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশির মা*
উপন্যাসে বিপ্লবের আদর্শে শহীদ ব্রতী মৃত্যুর পর পরিণত হয় একটি নম্বরে। পরিবারের
সকলে ব্রতীর এই নম্বরের ‘আইডেন্টিটি’ মেনে নিলেও তার মা সুজাতা মেনে নিতে
পারেননি। ছয় এবং সাতের দশকের ছাত্র যুবারা এই ‘আইডেন্টিটি ক্রাইসিস’-এর পাঁজরে
সজোরে ঘা দিতে চেয়েছিল। বয়ঃসন্ধির আবেগ এবং মনের জেদ তাদের ভেতরে
আলোড়ন তুলেছিল। অপরিণত হয়েও তারা জনমানসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রাহুলের
ভাই মণি সাতের দশকের তেমনই এক কিশোর। শশাঙ্কের নির্দেশে কদম আলী মণিদের
স্যালোর মেশিনের পার্টস্ চুরি করে। সেই নিয়ে গ্রাম উত্তাল হয়। জোতদার শশাঙ্ক যেন

তেন প্রকারে চৌধুরী পরিবারকে খতম করতে চায়। অথচ এই শশাঙ্কের হাতেই খুন হয়েছে কদম আলী-হাওয়া বিবির সন্তান আমানি। শশাঙ্কের যৌন কামনার শিকার হাওয়া বিবি। গ্রামের এই সুবিধাবাদী রাজনীতির মানে বুঝতে পারে না কিশোর মণি। একগুচ্ছ প্রশ্ন তাকে তাড়া করে নিরন্তর:

এই পৃথিবীর সকল মেয়ে কেন দেবী সরস্বতীর মতো পবিত্র হয় না? কোনো কোনো মেয়ে এই রকম নষ্ট হয়ে যায় কেন? আচ্ছা! নষ্ট হওয়ারও কি আনন্দ আছে কিছু! শশাঙ্ক কেন গরিবের বউ, চোরের বউকে নষ্ট করবে? কেন সে চোরের মতন তার কাছে আসবে? মণি ভাবে, সবাই জানে না, সে এখন অনেক ব্যাপার বুঝে ফেলতে শিখেছে। ভাল আর মন্দ; সুন্দর আর অসুন্দর; বড়লোক আর গরিব; চোর আর সাধু সব সে ভাগ করতে পারে। তার হাতে কোরান তুলে দিয়ে সত্য বলতে চাইলেন ব্যথা খালা, কিন্তু শশাঙ্কর হাতে গীতা তুলে দেবে কে? হাওয়ার হাতে কোরান তুলে দিলে কি সে সত্য বলবে না? কোরান কি সবার হাত স্পর্শ করার সাহস রাখে? সকল ঘটনার কাছে কি পোঁছায় কোরান শরীফ! সোভান আলীকে মেরে ফেলেছিল শশাঙ্ক, কোর্ট তার হাতে ধর্মগ্রন্থ চাপিয়ে শপথ করিয়েছে সত্য বলার জন্য। শশাঙ্ক কি সত্য বলেছে? তাহলে শুধু তাকে, অর্থাৎ মণিকেই কেন সত্য বলতে হবে?^{৫৪}

সমাজিক বৈষম্য কিশোর মণির মনে গেঁথে দিয়েছে নানা জিজ্ঞাসা। সে পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কাস্তে কোদাল নিয়ে মাঠে কাজ করে। দাদা বুলবনকে নিয়ে সে চাষবাস করে পরিবারের তাগিদে। তার ঘাড়ে নতুন দাগ পড়েছে। গাড়ি টেনে টেনে গোরুর কাঁধে যেমন দাগ হয়। পশুদের মেটাফর-এ লেখক যেন কৃষিজীবী মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। পশুদের মতোই পরাধীন জীবন। যাদের অতি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অন্যদিকে ক্ষমতাধর নাটা তরফদারের তেজ কমে না কিছুতেই। নানাভাবে তারা চৌধুরী পরিবারকে ‘হাইজ্যাক’ করতে চায়। গান্ধীবাদ ও ইসলাম, শান্তি ও অহিংসাকে এক সুতোয় গেঁথে নাটা তার কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছে। চন্দ্রিমা যেন নাটার বাড়িতে ঔষধের বাক্স নিয়ে বসে। গ্রামীণ ‘ক্ষমতার রাজনীতি’

চূড়ান্তভাবে উঠে এসেছে এই প্রসঙ্গে। সাদা চৌধুরীর পরিবারটাই যেন আস্ত একটা ভারতবর্ষ, যা একদল স্বৈরাচারী শাসক গোত্রাসে গিলতে চায়। মণির স্বপ্নের ভারতবর্ষ শশাঙ্ক-ললিত-শরম-নাটাদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে বারংবার। গ্রামীণ অবৈধ যৌনতা, বহুগামিতা, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক— এসব দেখে কিশোর মণির আত্মবিক্ষোভ শুরু হয়। ধীরে ধীরে কিশোর মণির উত্তরণ ঘটে কৃষি বিপ্লবের যোদ্ধা রূপে। নাট্য একপাক্ষিক বিচারে জরিমানা ও নাকখত দিতে বাধ্য করলেও মণির তেজ কমাতে পারেনি। রাষ্ট্র-গ্রাম-সমাজ সর্বত্রই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এমার্জেন্সি। মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করে তার উপর চলেছে নানাবিধ উৎপীড়ন। আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে চাওয়া একটি পরিবার, মাথা নোয়াতে না চাওয়া একটি পরিবার— তাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে শশাঙ্ক-নাটার দলবল। জেলের ভেতরে সাদা চৌধুরীকে পীড়ন করছে রাষ্ট্রযন্ত্র, আর বাইরে সন্তানদের পীড়ন করছে দেশ-গাঁ-সমাজ, জোতদার, ধর্ম এবং অদ্ভুত নীতিবান মানুষ। একটি পরিবারের মধ্যে দিয়ে একটি দেশের চরিত্র ফুটে উঠেছে।

নকশালপন্থীদের বেপরোয়া গেরিলা বাহিনী যেভাবে অতীতে প্রতিক্রিয়াশীল জোতদারদের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে ভয়াবহভাবে ফেটে পড়েছিল, ঠিক তেমন ভাবেই রাহুলদের গেরিলা স্কোয়াড ‘আমানির মৃত্যুর জবাব চাই, প্রদীপ ডাক্তারের বদলি চাই, ললিতের বন্দুক বাজেয়াপ্ত করতে হবে, গেটের চাবি ফেলে দাও, মাহেফরাস জিন্দাবাদ’— ইত্যাকার স্লোগানে আকাশ মথিত করে দেয়। ললিতের সঙ্গে বাদানুবাদ হবার পরে ব্যথা তরফদারের কাছে থেকে তারা গেটের চাবি আদায় করে নিয়ে আসে। নামাজে মগ্ন ব্যথাকে দেখে চাবি তুলে নেয় মাহেফরাসদের দল। গেট পাহারায় ছিল ললিতের খাস প্রহরী লক্ষণ দাস। কবিদের দেখতে পেয়ে লক্ষণ মনিবের কথামতো তার বাড়ির দিকে ছুট দিতে চাইলেও পারে না। লক্ষণের দেহকে কুপিয়ে কেটে নদীর বেগবান স্রোতের মধ্যে ফেলে

দেয় কবি এবং মাহেফরাসরা। নিরীহ লক্ষণের মৃত্যু অতীতের বহু রাজনৈতিক প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে। শ্রেণিশত্রু খতমের পথে যে বা যারা আন্দোলনে বাধা দিয়েছে তাদেরকেও শ্রেণিশত্রু হিসাবে গণ্য করেছে নকশালপন্থীরা। শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতি শুরু হবার পর অন্যমাত্রা পেয়েছিল। সেইসঙ্গে নকশাল রাজনীতিতে লুপ্তদের অনুপ্রবেশ এবং পরে একাধিপত্য শুরু হয়। রবীন্দ্র রায় লিখেছেন:

শ্রেণিশত্রু কারা? কলকাতার বুকে সন্ত্রাসের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়াল— সাধারণ পুলিশকর্মী, সি পি এম ক্যাডার, ছুটকো ছাটকা অসৎ ব্যবসাদার বা সুদখোর এবং বিরোধী রাজনীতির লোক। তাদের খতম করা হবে কেন? না, তারা বিপ্লবের পথ আটকাচ্ছে^{৫৫}

গরিব নিরীহ লক্ষণ দাসের মৃত্যু অতীতের সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ছয়ের দশকের মুক্তির ডাক যে অগ্নিপ্রবাহ সৃষ্টি করেছিল, দুঃসাহসী যুবাদের যোগদানে তা দাবানলে পরিণত হয়েছিল। আর এই দাবানলে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদেরই নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল নকশালবাদীরা। সাতের দশকের শুরুতে পার্টির নামকরা কর্মীদের মৃত্যু হওয়ায় এ আন্দোলন অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে যায়, অথচ আগুনের যে স্ফুলিঙ্গটুকু বেঁচে রইল তার দাহের ‘প্যাটার্ন’ বদলায়নি। সেই একই ধাঁচে ও একই পদ্ধতি এবং আদর্শ অনুসরণ করে কবি-রাহুলরা প্রতিবাদ করেছে। লক্ষণের মৃত্যু নিয়ে বুলবনের সঙ্গে রাহুলের চূড়ান্ত বাদানুবাদ হয়েছে। রাহুলের যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য শোনার পর তার পার্টির কর্মসূচি বুঝতে অসুবিধা হয় না আমাদের:

ইতিহাসের পথটাই এরকম রক্তাক্ত বুলবন। ঠিক আর ভুল মৃত্যুর পরম্পরা। এ সিরিজ অফ ডেথ— রং অ্যান্ড রাইট। আমি এই রকম বুঝেছি। হ্যাঁ, চীন এবং রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে এমনও দেখা গেছে, সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য পার্টি-কমরেডকে পার্টি-নেতৃত্ব বাধ্য হয়ে হত্যার নির্দেশ দিচ্ছে, কারণ সেই ওয়ার্কার শোধনবাদী হয়ে গেছে, পার্টি-বিরোধী হয়ে পড়েছে, সে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড়িয়েও পার্টি-

নেতৃত্বের নামেই জ্লোগান দিচ্ছে কারণ সে পার্টি-আদর্শকেই সত্য বলে জেনেছিল। কিন্তু তাকে বিনাশ করা ছাড়া পার্টির উপায় নেই।^{৫৬}

একদিকে জরুরি অবস্থা এবং অন্যদিকে জোতদারদের আক্রোশ— এই দুইয়ের মাঝে রাহুল-কবিরাজ অতীতের মতোই বিপ্লবী তত্ত্ব কবচে লড়াইয়ে নেমেছে। ছয়ের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ একথা উপলব্ধি করছিলেন যে, আসলে রাষ্ট্রযন্ত্র যতদিন না পরিবর্তিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কৃষকসহ ব্যাপক মেহনতি জনগণের কোনো মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কাজেই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিবর্তনের রাজনৈতিক সংগ্রামই হল আসল সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের পথেই জনগণকে চালনা করা দরকার। জনগণের চেতনার উন্মেষ ঘটলেই সংগ্রাম সফল হবে। কিন্তু তাত্ত্বিক মতভেদের কারণে পার্টির অভ্যন্তরেই গোলযোগ শুরু হয়। অসীম চট্টোপাধ্যায় এবং সন্তোষ রাণাদের মতো প্রথম সারির নেতাদের দলত্যাগ তা প্রমাণ করে দেয়। দেশের চরম দুর্দিনে সেই ব্যর্থ আন্দোলনকে সফল করতে রাহুলরা পুনরায় বিরাট ঝাঁকুনি দেবার চেষ্টা করে। এস.ইউ.সি.আই-এর প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষ অর্থাৎ চন্দ্রিমাদের কমরেডও নকশালপন্থীদের গেরিলা যুদ্ধের বহু নীতির তাত্ত্বিকভাবে সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, সবচেয়ে বড়ো ভুল হয়েছিল, গেরিলা যুদ্ধের নীতি গ্রহণ করার সঙ্গে গ্রামে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করে শহর ঘিরে ফেলার সংগ্রাম কৌশলকে ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বকে নকশালপন্থীরা এক করে ফেলেছেন। অথচ গেরিলা যুদ্ধের নীতি অনুসরণের জন্য চিনে নয়া ‘নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের’ তত্ত্ব ও গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা সৃষ্টি করে করে শহর দখল করার সংগ্রাম কৌশল গৃহীত হয়নি।^{৫৭} চন্দ্রিমা তার পার্টির আদর্শের সঙ্গেই একাত্মতা বোধ করেছিল। বস্তুত তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে রাহুলদের মতাদর্শ মেলাতে পারেনি কোনোভাবেই। চন্দ্রিমার ব্যক্তি অনুভূতিতে উঠে এসেছে সে কথা:

রাহুলের রাজনীতির কোনো প্রচ্ছদপট নেই। মাহেফরাসের আগ্নেয় আন্দোলনটির মলাট চাই। সুগৃহীত করা চাই এর প্রতিটি পৃষ্ঠা, প্রতিটি অক্ষরকে। প্রচ্ছদে সে একটি ডাক্তারি ব্যাগ ঐঁকে লিখে দিতে চায় কোলাজের সাঁটে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছবি। যথা, ছবিটির একটি টুকরো এক প্রৌঢ়ের, তিনি সাদা চৌধুরী, হাতে তাঁর ডাক্তারি ব্যাগ, একটি বাঁধ পথের উপর দিয়ে চলেছেন তিনি। তাঁর স্টেথোটি অন্য ছিন্ন কাগজে জড়িয়ে রয়েছে। ঠিক সেই নলটির কাছেই আধখানা ডোঙার মাথাটি এসে পড়েছে খাড়া হয়ে, ঠিক একটি উচ্ছ্রিত জলোচ্ছ্বাসের চূড়ায়। খুব সাবধানে শরৎচন্দ্রের মুখটিও ধরা থাকে একটি কোণে। মাহেফরাসের জালের ঘর প্রচ্ছদকে সার্বিক আলিঙ্গনে জড়িয়ে থাকে, দেখে মনে হয়, এ যেন প্রতিরোধের মত শক্ত সুতোয় বোনা। প্রচ্ছদে জলের উচ্ছ্বাস আবেগঘন তীব্রতায় বিদীর্ণ হয়েছে।^{৫৮}

বাবার মুক্তি উপলক্ষ্যে ঝড়ের গতিতে রাহুলের লড়াই শুরু হলেও শেষপর্যন্ত রাহুলের পথ বদলে যায়। সি.এম-এর রাজনৈতিক পথেই তার জয়যাত্রা। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই তারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। অথচ ক্ষমতা দখলের এই সর্বোচ্চ লড়াইয়ের জন্য যে তাত্ত্বিক সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজন হয় তার কোনো ব্যবস্থাই প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির মধ্যে ছিল না। তাঁরা শুধু মাও সে তুং-এর লাল বইকেই সর্বজ্ঞানের আধার বলে ধরে নিয়ে সেটাই মুখস্থ করার ঝোঁক সৃষ্টি করেন এবং মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন ও মাও-এর মূল রচনাগুলি অধ্যয়নের উপর গুরুত্ব আরোপে কোনো অপ্রয়োজনীয়তাই বোধ করেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই ‘জনে জনে চক্রান্ত’ ও শ্রেণি শত্রুদের খতমের উদ্দেশ্যে ফুস ফুস আলাপের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং মুখে অধ্যয়নের কথা বলা হলেও কার্যত তার প্রতি চরম ঔদাসীন্য এমন কি অবজ্ঞাও তাঁরা প্রদর্শন করেন।^{৫৯} আখ্যানে রাহুলদের কর্মকাণ্ডে সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয়। লক্ষণ দাস খুনের পর দুটি বিক্ষত দেহ জলে ভেসে ওঠে। প্রতিবাদ প্রতিরোধ কী পরিমাণ নৃশংস হয়ে উঠেছে তা লেখকের বয়ানে প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে চন্দ্রিমা-বুলবনদের পার্টি শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের কল্পিত চরিত্রদের মতো করে গ্রামীণ

জনসমাজকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যেমন ঘুণধরা পঙ্কিল সমাজকে মুক্ত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়, তেমনটাই চেয়েছিল তারা। অথচ অসুস্থ ভারতবর্ষের অচলাবস্থার মাঝে জি.এস-এর রাজনৈতিক আদর্শকে পাথেয় করতে চায়নি সি.এম পক্ষের কমরেডরা। ক্যান্সারে আক্রান্ত কবির মায়ের উসকোখুসকো হতশ্রদ্ধ, বিমলিন, নিঃস্ব, করুণ চাহনি ‘সমকালীন ভারতবর্ষ’র প্রতীক হয়ে ওঠে। মা বেঁচে আছে কি নেই কবির জানা নেই। আর এই ভারতবর্ষের দুরবস্থার হোতা তিমিরদের মতো মধ্যপন্থার নেতারা কবিকে ধরিয়ে দেয় পুলিশের হাতে। তিতিরের শ্রেণি চেতনা এবং রাজনীতি কিছুতেই সংসদীয় গণতন্ত্রের বাইরে কিছু ভাববার সাহস পায় না। সমকালীন সময়ে তিমিরদের মতো মানুষ, যারা শাসকের ছত্রছায়ায় বসে ছড়ি ঘোরাত, তাদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পুলিশের কণ্ঠস্বর মিলে যায়। যারা মূলত ‘শেয়াল-বৃত্তির পোষকতা’ করে প্রশাসনের গুপ্তচরের মতো সি.এম-এর রাজনৈতিক কার্যকলাপকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। কবির গ্রেফতারের পর চন্দ্রিমার মনে প্রবল সংশয় তৈরি হয়। জি.এস এবং সি.এম-এর রাজনীতিকে পৃথক করতে বড়ো দো-টানায় পড়ে। স্বামী বুলবন এবং দেবর রাহুল কারোর পথকেই সর্বাত্মে গ্রহণ কিংবা ত্যাগ কোনোটাই করতে পারে না। রাহুলদের আত্মত্যাগের রাজনীতির বৈপরীত্যে দাঁড়িয়ে বুলবন বাস্তবকে উপেক্ষা করতে পারেনি। যথার্থ সংগঠন ছাড়া এবং আচমকা আঘাতে নাটা-ললিতদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায় না তা অক্ষরে অক্ষরে বুঝেছে বুলবন। তাই সে স্ট্রং ইন্টেলেকচুয়াল সমর্থনের অপেক্ষায় দিন গুনেছে, শরৎ সেন্টিনারি প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে তা কিছুটা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছে। জরুরি অবস্থার অভিঘাতে বামপন্থী সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের লক্ষ্য এক হলেও পন্থা বদলে গেছে। যেমন— প্রাণকিশোর, আদিত্য সিংহ, সমীর চৌধুরী, বুলবন সকলেই এই দলের কর্মী। এঁরা সকলেই কমরেড জি.এস-এর সমর্থক এবং অহিংসাবাদী ও বেশিরভাগই

কমরেড সি.এম-এর ঘোষিত আদর্শের বিরোধিতা করেছে। চন্দ্রিমার পার্টির সেক্রেটারি হলেন প্রাণকিশোর। পক্ষান্তরে, কবি তিলক, রাহুল, বিশ্বরঞ্জন ডাক্তার, মুমতাজ, দেবপ্রতিম, হরবোলা খতিব এবং অসংখ্য মাহেফরাস এরা সকলেই সশস্ত্র গণ আন্দোলনের কর্মী। আখ্যানে ‘সিস্টেম’কে ‘অ্যাডজাস্ট’ করার চেষ্টা করেছে চন্দ্রিমা ও বুলবন। চন্দ্রিমা দুই পার্টির কার্যাবলী দেখে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি, যেন পরোক্ষভাবে কোথাও রাহুলদের সমর্থন করেছে। বুলবন খুনের বিরোধী হলেও তার অনুভূতির তলদেশে যে কথা ভেসে ওঠে তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না বুলবনের দ্বন্দ্ববিদীর্ণ মনের করুণ অবস্থা:

সাঁতার জানে না যে, সে কী করে ডাঙায় ভেসেছিল? তিমিরাবৃত হিম ইগলুর উপমহাদেশে তার অন্তর কী উপায়ে অগ্নি উৎপন্ন করে? তেভাগার আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নৌ-বিদ্রোহ, নুরুল ইসলাম আনন্দ হাইতের খাদ্য আন্দোলন কবির বিপ্লবী হৃদয়কে তাপিত করেছে, জিইয়ে রেখেছে তাকে— এই উৎপন্ন অগ্নি কী বিষম উদ্বেলতা! তার রাজনীতি যদি কখনও তার সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে বসে তবু এই অগ্নিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না। আগুন জ্বালানোর মানুষের অভাব কখনও হয়নি, একজন তিতুমীরই কি যথেষ্ট ছিল না? ফের, আগুন নেভানোর মানুষও কম নেই সংসারে। কিন্তু বিশ্ব অবলুপ্ত হওয়ার পর অগ্নি-কণিকা থেকে যায়, তাই আবার উৎপন্ন করে আর এক নবীন পৃথিবী। গোড়া থেকে।^{৬০}

ছয় দশকের আর্থ-সামাজিক সংকট থেকে উদ্ধৃত রাজনৈতিক সংকট ও অস্থিরতা যখন ধীরে ধীরে সত্তরের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছাল, তখন ভারতবর্ষ শোষণ অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি-যজ্ঞে ছটফট করছিল। সত্তর দশকের সূচনায় ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় মুক্তির আহ্বান। একদিকে উঠেছিল ‘সত্তর দশকে মুক্তির দশকে পরিণত’ করার উদাত্ত আহ্বান, আর একদিকে বেজেছিল এশিয়ার মুক্তি সূর্যের মার্চ সংগীত। একদিকে বিপ্লবী আত্মত্যাগ, বীরত্ব ও শৌর্যের অমর কাহিনি, অন্যদিকে কাপুরুষতা, ভণ্ডামি ও নীচতার জঘন্য নির্দশন। একদিকে মানুষের প্রতি আন্তরিক

মমত্ববোধ, আর একদিকে মানবতার প্রতি চরম অবজ্ঞা। একদিকে প্রগতি, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়া। একদিকে রক্তিম বিপ্লবের পতাকা, আর একদিকে শ্বেত-সজ্জাসের পতাকা— দুই-ই বহন করেছে যুব সম্প্রদায়— দৃঢ়, প্রত্যয়ী, স্বপ্নদেখা চোখের বিপরীতে ক্রুর, ভয়ঙ্কর, স্বার্থান্বেষী দৃষ্টি। এই দুই মেরুর রাজনীতি ও জীবনদর্শনে কোথাও মিল নেই— তবু কী আশ্চর্য, দু-পক্ষই রেখেছিল মুক্তির আহ্বান। আর দু-পক্ষই এই সত্তর দশকেই হারিয়ে ফেলল তার প্রাথমিক উন্মাদনা ও চমক। ক্রমল তলিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল তার আকর্ষণী শক্তি। আর ইতিহাসের কী করুণ পরিহাস, এই সত্তর দশকই প্রত্যক্ষ করল স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের সবচেয়ে দমবন্ধ করা পরিবেশ, মুক্তির দশকের ব্যর্থতাকে সরবে ঘোষণা করার জন্যই হয়তো তার আবির্ভাব।^{৬১}

রাহুল-কবির দেশের এই দমবন্ধ পরিস্থিতিরই সন্তান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের শুধু বাংলায় নয়, ভারতবর্ষের বহু শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন সরকার কঠোরভাবে দমন করতে চেয়েছে বারংবার। কবির উপর অকথ্য অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে লেখক সেই অসুস্থ সময়ের প্রশাসনের অমানবিক উৎপীড়ন এবং ‘থার্ড ডিগ্রি’র যন্ত্রণাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। থানার মেজবাবু সমীর পুরকাইতের বেধড়ক ঠ্যাঙানিতে কবি একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। শেষপর্যন্ত বিপ্লবের কিছু গোপন তথ্য সে প্রকাশ করে দেয় পুলিশের কাছে। তবুও প্রহার থামে না, নিরন্তর চলতেই থাকে। একসময় পুলিশ আর ঠাহর করতে পারে না কবি জীবিত না মৃত! পুলিশি অত্যাচারের নিদারুণ আঘাতে কবিকে মৃত ঘোষণা করে ছোটবাবু সমীর ভট্ট। চুনাখালির পার্কের এক ঝোপের আড়ালে মুমূর্ষু কবির দেহ ফেলে দেয় পুলিশ, সাহায্য করে কদম আলী ও রসুল। সরকারি আদেশে পুলিশ দমননীতি চালিয়েছে এবং পুলিশের শাগরেদ হয়ে কাজ করেছে কবিদের বিরোধী পক্ষ ও কদম-রসুলদের মতো সুবিধাবাদী মানুষেরা। আসলে অতীতেও যখনই নকশালপন্থীদের উপর

নির্মম রাষ্ট্রীয় আক্রমণ চলেছে, তখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদত জুগিয়েছে এদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টি। যখন শত শত যুবককে বিপ্লবের দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়ার অপরাধে জেলের মধ্যে ও বাইরে ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল, যখন কাশীপুর বরাহনগরের মতো একের পর এক গণহত্যাভিযান পরিচালিত হয়েছিল, পরিবারের লোকজনকেও নির্মম পুলিশী দাওয়াই-এর হাত থেকে রেহাই দেওয়া হচ্ছিল না, পুলিশের সঙ্গে ‘সংঘর্ষে’ রোজ নকশালপন্থী যুবক নিহত হচ্ছিল, শত শত মানুষকে দিনের পর দিন বিনাবিচারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। দক্ষিণপন্থীদের কথা বাদ দিলেও বামপন্থীদের কেউ বা নিশ্চিত নিরুপদ্রব দিন কাটিয়েছিলেন। কেউ বা সরকার গড়ার খেলায় মত্ত ছিলেন। তখন কেউ কেউ মন্তব্য করেছিলেন, ‘পুলিশের গুলিতে কি নিরোধ লাগানো আছে, ওরা পুলিশের গুলিতে মরছে না কেন?’ কেউ বা ‘সমাজবিরোধী’ আখ্যা দিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন— এই জঙ্গুলে রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন তো দূরের কথা, সংগঠিত প্রতিবাদও ধ্বনিত হয়নি।^{৬২} ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বৈরতান্ত্রিক চেহারা সেদিন সকলকে ভাবিয়ে তোলেনি, অথচ ১৯৭৫-এ ইন্দিরা গান্ধী সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক থাবা যখন গগণভেদী আক্রোশে মানুষের মৌলিক অধিকারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করল, তখন সবার টনক নড়ল। কিন্তু সি.এম.-এর রেখে যাওয়া স্বপ্নকে যাঁরা বয়ে বেড়াচ্ছিলেন তাঁরা থামেননি, আবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশরক্ষার কাজে। আর অতীতের মতোই শাসকের অধীনস্থ লোকের হাতে চলল ধরপাকড়, অমানবিক নির্যাতন। তার ফলে আন্দোলনকারীদের মনে তৈরি হয়েছিল বহুবিধ জিজ্ঞাসা। মুমূর্ষু কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে উঠে এসেছে সে কথা। চন্দ্রিমার উদ্দেশ্যে বলা কথাগুলিতে কবির অন্তরাআর গোষ্ঠানির স্বর পরিস্ফুট হয়েছে:

বউদি! সবই তো এখন আমার মনে আসে। তোমার হৃদয়কে আমি আজ স্পষ্ট বুঝতে পারি। তোমার রাজনীতি আলাদা, তোমরা যেভাবে বিপ্লবের কথা ভাব, আমরা তা ভাবি না! এমনকি তোমরা আদৌও কোনো বিপ্লবী শক্তি কিনা বুঝে পাই না। কখনও মনে হয় তোমরাই হয়ত ঠিক। কখনও মনে হয়, তোমরা আর পাঁচটা সোসাল ডেমোক্র্যাট দলের মতই পেটি-বুর্জোয়া দল। অথচ তোমার দল সংসদীয় রাজনীতির সেবাও যে করে, তা-ও কিন্তু মনে হয় না। তোমার দলে রাজা উজির দেখি না। সৎ ছেলেমেয়েদের দেখি।^{৬৩}

‘আত্মত্যাগের’ রাজনীতির অলিন্দে ঢোকান পর চন্দ্রিমার দলের প্রতি কবির সংশয় বেড়েছে, কখনও নিজের দলের কর্মকাণ্ডের প্রতিও তৈরি হয়েছে আত্মবিক্ষোভ। রাহুলদের আত্মগোপন করে কার্যাবলী পরিচালনা এবং আর একদিকে চন্দ্রিমাদের শরৎ জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পার্টির আভ্যন্তরীণ অনুষ্ঠান— দুই দলের মতাদর্শগত তফাৎটি প্রকট হয়ে উঠেছে আখ্যানে। চন্দ্রিমার বক্তব্যে উঠে এসেছে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে নানান কথা। অতীতের বিপ্লবীরা কীভাবে শরৎচন্দ্রের পথের দাবী বুকে নিয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তারা বুকের এক পাশে গীতা এবং অন্য পাশে পথের দাবী রাখত। সাহিত্য জুগিয়েছিল তাদের শৌর্য ও আত্মত্যাগের জোর এবং শত অত্যাচার সইবার অক্লান্ত ক্ষমতা। উল্টোদিকে জরুরি অবস্থা পীড়িত বহরমপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে চিনের মতো মুক্তাঞ্চল তৈরির প্রচেষ্টা এবং সবশেষে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার লড়াই খুব একটা সাফল্য পায়নি। কবির মতো সাহসী বিপ্লবীও পুলিশের অত্যাচারের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। মুমূর্ষু কবিকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায় সমীর চৌধুরী। পার্টিগত দ্বন্দ্ব থাকলেও সমীর চৌধুরী কবির প্রাণ বাঁচিয়েছিল। জরুরি অবস্থার অভিঘাত এবং তার জিঘাংসার ঢেউ প্রথম এসে পড়েছিল সাদা চৌধুরীর উঠোনে। তারপর থেকে গ্রামের ভেতরেও তা সঞ্চারিত হয়ে যায়। ‘গণতন্ত্রের ঠাটবাট’ থাকলেও তা সাধারণ মানুষের জীবনে কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসেনি, সাধারণের মৌলিক অধিকার প্রতিমুহূর্তে

পদদলিত হয়েছে জোতদারদের হাতে। শশাঙ্কের দলবল এসে চিৎপুর, প্রণামপুরে এবং তেরোঘরায় মেয়েদের ধর্ষণ করে তাদের দেহ ফেলে দেয় জলে। এ ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল শশাঙ্কের শাগরেদ শরম। অথচ সরকারের পুলিশ তখন নির্বিকার। চন্দ্রিমারা প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের দলের কর্মীদেরকে ‘কংশাল’ বলে দাগিয়ে দেয় উত্তেজিত শশাঙ্কের দল। কংগ্রেস এবং নকশালদের মিলিত প্রোডাক্ট হল কংশাল। সমকালীন সময়ে যারা সরকারের ধ্বজাধারী হয়ে পার্টি পরিচালনা করত তাদেরকে এই নামে ব্যঙ্গ করত বিরোধীরা। ভিড়ের মাঝে ইকবাল ভুঁইয়া খেপে যায়। ইকবালকে দেখে আমাদের মনে পড়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের গ্রামের প্রতিবাদী ছেলে চেংটু পরামাণিককে। জোতদার খয়বার গাজীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ ও বিধ্বস্ত মানুষেরা যখন একজোট হয় এবং ‘গণ আদালত’ বসিয়ে খয়বার গাজীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। জালাল মাস্টারের মতো সুবিধাবাদী মানুষেরা খয়বার গাজীকে বাঁচাতে চাইলে চেংটু এগিয়ে এসেছিল খয়বার গাজীর কাছে এবং আলীবক্সকে বলেছিল— ‘ভাইজান আসামীকে ক্যামন কইরা কোপ দেওয়া লাগবো কয়া দ্যান’। তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল খয়বার গাজী, সে নামাজ পড়ার বায়না করে এবং পালিয়ে যায়। আর পরিণতি স্বরূপ গাবগাছের পাশে ধান কাটা জমিতে চেংটুকে লাশ হতে হয়। আলীবক্স যায় জেলে। গ্রামের আন্দোলন, শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্ন, শোষিত হয়ে বেঁচে না থাকার বাসনা— মুখ খুবড়ে পড়ে। গ্রামের আন্দোলনের অনেক সম্ভাবনা অধরাই রয়ে যায়, পূর্ণতা পায় না। আবুল বাশারের আখ্যানের ইকবাল ভুঁইয়াও শশাঙ্ককে সরাসরি বলেছিল, ‘অ্যাট ফাস্ট আপনাকেই জবাই করা যাক। গুলি নয়। হেঁসোর কোপ মারব।’ অবস্থা বুঝে শশাঙ্ক দেয় ছুট। তার পেছনে ছুটে আসে উন্মত্ত জনতা। শশাঙ্ক দৌলতডিহার কাছে এসে একটি মসজিদে ঢুকে পড়ে। মসজিদের চয়ন খতিব (ইমামের অনুপস্থিতিতে যিনি নামাজ পড়ান বা ইমামতি

সম্পাদন করেন) শশাঙ্ককে আশ্রয় দেয়। আমানির বাবা কদম আলী ছিল মসজিদে। এরাই ক্রোধাশ্বিত জনতার হাত শশাঙ্ককে বাঁচায়। যে আমানিকে পিটিয়ে হত্যা করেছিল শশাঙ্ক, তারই প্রাণ বাঁচায় কদম। ‘এভাবে ছদ্মবেশী ধর্ম রাজনৈতিক শ্রেণিঘৃণাকে আড়াল করে, ধার্মিক কোনো এক মহাপাপকে শেতলপাটিরূপী জায়নামাজে জড়িয়ে রাখে। ধর্মের আশ্রয় মানুষ এভাবেও রচনা করতে পারে’— কদম আলীর এই ভাবনা এবং পরে পুনরায় নামাজরত অবস্থায় একরাশ অপরাধবোধ নিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অঝোরে কান্না— সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে লেখক জোতদারদের ব্যবহৃত গরিবগুর্বো শ্রমজীবী মানুষ এবং বকধার্মিকদের ধর্মের অসারতাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

দেবপ্রতিম ওরফে হরবোলা খতিব রাহুলদের পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী ছিল। স্ত্রী সবিতাকে ছেড়ে দেবপ্রতিম সময় কাটাত তার পরকীয়া প্রেমের নারী রুকসানার সঙ্গে। রাত্রে কদম আলীকে সঙ্গে হরবোলা খতিব বেরিয়েছিল। ডোঙায় ওঠার পর তারা দূর থেকে দেখে পুলিশের ভয়ঙ্কর তাণ্ডব। আন্দোলনকারীদের তালাশে উন্মত্ত পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। এসব দেখে হরবোলা ভয় পায়। হরবোলা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক নকশালপস্থীদের অনুভূতি প্রদেশের অন্ধকারময় দিকটিকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। লক্ষ্য এবং মৃত্যু কীভাবে পাশাপাশি রেখে তারা এগিয়ে যেত লক্ষ্য নিয়ে। অতিবামপস্থা রাজনীতির বৃত্তে ঢুকে হরবোলার অস্তিত্বে যেন টানা-হেঁচড়া শুরু হয়। মৃত্যুভয় তাকে কিছুটা সময়ের জন্য গ্রাস করলেও মৃত্যু তার কাছে রোমান্টিক হিসাবে ধরা দেয়। তার হৃদয়ে ভেসে ওঠে কমরেড সরোজ দত্তের মৃত্যুদৃশ্য:

এক আশ্চর্য রোমান্টিক মৃত্যু, সরোজদা দ্যাখো, এই জীবনটা এই রাতে তোমারই কবিতার মতো সুন্দর। মনে পড়ে তোমাকে, তোমার মৃত্যুর দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। জেল থেকে বার করে আনা হল, পুলিশ ভ্যানে করে কলকাতার পার্কে। তখনও সূর্যের আলো ফুটে ওঠেনি।

গাড়ির পাশ্লা খুলে তোমাকে ছেড়ে দিলে পুলিশ, বলল— যাও, চলে যাও, তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হল!

তুমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলে না। এই পার্ক থেকে তুমি তাহলে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে। বাড়ি তো নয়, ভেবেছিলে সেই গোপন আস্তানায় ফিরে গিয়ে আবার তুমি কবিতা লিখবে, কড়া সম্পাদকীয় লিখবে একটা, তোমার কলম এই রিভলবারের চেয়ে শতগুণ শক্তিশালী ছিল—

এই দৃশ্য দেখলে তুমি অবাক হতে! তোমার মাথায় নির্ঘাত কবিতা এসে যেত। তুমি ভ্যান থেকে নেমে অনেকটা দ্বিধার সঙ্গে পার্কের ঘাসের উপর দিয়ে ছুটে গেলো। পিছন থেকে গুলি করে দিল পুলিশ। অতর্কিতে তুমি মুখ খুবড়ে ঘাসের উপর পড়ে গেলো। একজন অভিনেতা তোমার এই মৃত্যুর দৃশ্য দেখেছিলেন, তিনি খুব সম্ভব মর্নিং ওয়াকে বার হয়েছিলেন সেই প্রত্যুষে।^{৬৪}

নকশালপন্থীরা বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুকে বাদ দিয়ে বিজয়ের ইতিহাস কখনও লেখা যায় না। তাই তাদের ‘আত্মত্যাগের রাজনীতি’ শেষমেশ ‘আত্মহত্যার রাজনীতি’তে পরিণত হয়েছিল। সরোজ দত্ত ছিলেন নকশাল আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। ১৯৭১ সালের ৫ আগস্ট কাকভোরে পুলিশের এনকাউন্টারে সরোজ দত্তের মৃত্যু হয়েছে বলে শোনা যায়। প্রশাসনের তরফ থেকে আজ অবধি খুনের ঘটনা স্বীকার করা হয়নি। ঘটনার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে যাবার পরেও কোনো সরকারই কোনো তদন্ত কমিশন বসায়নি। সরোজ দত্ত মৃত না জীবিত কিংবা আচমকা তিনি পুলিশের লকআপ থেকে কোথায় হারিয়ে গেলেন! এসব প্রশ্নের প্রাতিষ্ঠানিক উত্তর আজও অধরা। পুলিশের খাতায় বা সরকারি নথিতে তিনি আজও নিখোঁজ!

১৯৭০-এ বাংলার বাতাস যখন বারুদের গন্ধে ভরে গেছে। সেই সময় চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত সহ বহু নেতাই পুলিশের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্ট’ বা ‘এনকাউন্টার’-এর ‘হিটলিস্টে’ ঢুকে গেছিলেন। পুলিশ হন্য হয়ে খুঁজত তাঁদের। জরুরি অবস্থার সময়ে যেভাবে রাহুল-মুমতাজদের খোঁজে নাজেহাল পুলিশ। শেষমেশ ১৯৭১ সালের ৫ আগস্ট

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে পুলিশ সরোজ দত্তকে গ্রেফতার করে। পরে ময়দানে নিয়ে আসা হয় ‘এনকাউন্টার’-এর জন্য। আর শাসকের এই স্বৈরাচারী শাসনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বাংলার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ম্যাটিনি আইডল মহানায়ক উত্তমকুমার। এ ব্যাপারে উত্তমকুমার তাঁর জীবিতাবস্থায় প্রকাশ্যে কখনও কোনো মন্তব্য করেননি, টলিপাড়ার তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠদের বয়ান থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় ভিক্তিম আর কেউ নন, তিনি সরোজ দত্ত।^{৬৫} সত্য কিংবা গুজব এ বিষয়ে তর্ক থাকলেও বাঙালির মনে এ ঘটনার রেশ ছিল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে অনেক কবিতা রচিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু পালিতের *সহযোদ্ধা* উপন্যাসের আখ্যান এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। সমকালীন সময়ে বাম মনোভাবাপন্ন কবি বিমল দেব এই নিয়ে একটি জ্বালাময় কবিতাও লিখেছিলেন। কবিতার নাম ‘উত্তমকুমারের মর্নিং ওয়াক’। ‘অনলাইন পোর্টাল’-এ এ বিষয়ে একটি লেখা থেকে কবিতাটি উদ্ধৃত করছি আমরা:

কলকাতায় তখন ব্রাহ্মমুহূর্ত
পরবাস্তব আলোয় জেগে উঠেছিলো
রূপকথার পৃথিবী
সবুজ ঘাসে মন্দাক্রান্তা ছন্দে
হেঁটে যাচ্ছিলেন বাঙালীর মহানায়ক
তার পা ফেলার ছন্দে হেসে উঠেছিলো
ময়দানের ব্যাকুল হাওয়া
লঞ্চের সিটি গঙ্গার ওপারে হাওড়া ব্রীজের বিভ্রম
ধীরে উদাসীন হয়ে যাচ্ছিলেন
শহরের ম্যাটিনি আইডল
হঠাৎ দেখলেন, তিনটি মানুষ
একজন কবিকে হত্যা করলো, শব্দ নেই
এক অদ্ভুত তাৎপর্যময় নীরবতা চূড়ান্ত খুন
অদূরে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের গাড়ী

সত্তর দশকের সেই সকালে
জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত দাঁড়িয়ে রইলেন উত্তমকুমার
তার প্রাতঃভ্রমণের ছন্দ কেটে যাচ্ছিলো ক্রমশ
ব্রাহ্মমূর্ত্তে ব্রাহ্মণের কৌলীন্য
গায়ত্রীমন্ত্রের চিরকালীন লাবণ্য, পরম অমরতা
সব— সব ছন্দহীন মনে হচ্ছিলো এই
ভয়ংকর হত্যার কাছে
তিনজন মানুষ অর্থাৎ তিনটি সংখ্যা
এগিয়ে এলো মহানায়কের চোখের সামনে
এনটারটিকা থেকে যেন ভেসে এল কণ্ঠস্বর:
আপনি, দাদা, কিছুই কিন্তু দেখেননি
মহানায়কের ভুবনজয়ী হাসিতে এল নিকেল— মূঢ়তা
— না কিছুই দেখিনি...
তারপর কেটে গেছে দীর্ঘদিন
বহুতা গঙ্গার মতই চলে গেছে সেই সকাল
নির্বাচনের উৎসবে উল্লাসে ভেসেছে সাম্পান
উত্তমকুমারের মতই আমরাও কোনদিন
কিছু দেখিনি, আমরা কিছুই দেখতে চাইনি কখনো^{৬৬}

কবিতার শেষ দু পঙ্ক্তি ইদানীং সময়কেও স্পর্শ করে। সরোজ দত্তের মৃত্যুর
পরেও জোতদার খতম হয়নি, জরুরি অবস্থা বিধবস্ত বাংলার বুকে পুনরায় জেগে উঠেছে
সি.এম-এর গেরিলা বাহিনী। নেতৃত্বের মৃত্যু হলেও লড়াই থামে না। রাহুল-বিশ্বরঞ্জন-
কবি-হরবোলাসহ সকলেই জানে— নাট্য, ললিত এবং শশাঙ্ককে খতম করতে পারলেই
সে ঘটনা হত তাদের সংগঠনশক্তির এক উচ্চ সাফল্য। আর তার ফলে তাদের চিৎপুরে
দীর্ঘকাল জোতদারদের অত্যাচার বন্ধ হত। চৌধুরী পরিবার হয়ে উঠত সংগ্রামের প্রতীক।
যেভাবে সি.এম একটি বিন্দু ভেঙে অজস্র বিন্দু গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু কদম আলী
এবং প্রশাসনের অধীনে থাকা লোকেদের কারণে রাহুলরা তা পারছে না কোনোভাবেই।
এ কবিতার শেষ দুই পঙ্ক্তি কদম আলী, শরম আলী, চয়ন খতিবের মতো মানুষদের

সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। যারা বরাবর ‘সিস্টেম’কে ‘অ্যাডজাস্ট’ করার চেষ্টা করেছে। শাসকের তৎপরতায় বাংলার বুকে হাজারো তরতাজা প্রাণ নিরবধি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেলেও তার পাশে ছিন্নমস্তা সময়ের একটি হাইপোথিটিকাল দলিল হয়ে থেকে গেছে যেন বিমল দেবের এই কবিতা।^{৬৭} রাহুলের এই সহিংস রাজনীতি মেনে নিতে পারেনি দাদা বুলবন। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে বুলবন। মা আয়েষা এবং স্ত্রী চন্দ্ৰিমাকে জানিয়ে দেয় ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদের কথা। অসুস্থ সময়ে রাহুলও হারিয়ে ফেলে পরিবারের আশ্রয়। দেবরের প্রতি চন্দ্ৰিমার স্নেহ মেনে নিতে পারে না বুলবন। জরুরি অবস্থার অভিঘাত কেবল দেশ-গাঁ-সমাজ-পরিবারে নয়, দাম্পত্য সম্পর্ককেও করে তুলেছে বিড়ম্বিত। সি.এম-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাহুলদের ‘সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করা’র আন্দোলন পরিবারের সুতো ছিন্ন করে দিয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে দুর্বল করার জন্য কবির মতো ‘ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও আত্মত্যাগের রাজনীতি’ই রাহুলের ভবিতব্য। তরুণ রাহুলের এই অবস্থা দেখে মনে পড়ে আশুতোষ মজুমদারের কথা। চারু মজুমদারের হাজারো তরুণ অনুগামীদের অন্যতম ছিলেন আশুতোষ মজুমদার। তিনি সি.পি.আই (এম.এল)-এ যোগ দেবার কারণ জানিয়ে তাঁর দাদা অরুণ মজুমদারকে লিখেছিলেন:

আমরাই ভারতবর্ষের প্রথম সংগঠিত ও সার্বিক নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী। আমাদের সবই যে ঠিক তা বলি না। তবে আমাদের সঙ্গে অন্যদের তফাৎ এই যে আমরা বিপ্লবে শুধু বিশ্বাসী নই, হাতে কলমে বিপ্লব করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভুল আমাদের কোনো কৌশলগত দিকে থাকতে পারে, কিন্তু হাতে কলমে কাজ না করলে ভুল ধরা পড়বে না, হয়তো ভুলের জন্য নিদারুণ মাশুল দিতে হবে। আমাদের মত হাজার যুবকের রক্তের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবেই কোনটা ভুল বা কোনটা সঠিক। আমার জন্য মাকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করবেন, আপনি দেখবেন মাকে^{৬৮}

ছয়ের দশকের যে আন্দোলন সি.এম, সরোজ দত্তরা শুরু করেছিলেন সাতের দশকের জরুরি অবস্থা পীড়িত মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাহুল-কবিদের সাংগঠনিক শলাকায় সেই ধারা বহমান। মোহরের সঙ্গে রাহুলের সম্পর্ক উপন্যাসে বহুবার উঠে এসেছে, অথচ রাজনীতির জটিল জীবনে পা বাড়ানোর পর রাহুল মোহরের প্রেমেও এসেছে বিচ্ছিন্নতা। কবির কথা বড়ো মনে পড়ে রাহুলের। পার্টির প্রতিটি কমরেডই কবির অভাববোধ করে। কবিই রাহুলকে একদিন শুনিয়েছিল মার্কস ও জেনি মার্কসের কাহিনি। জেনির সঙ্গে মার্কসের বিবাহ পূর্ব প্রেম ছিল। মার্কসের মননবিকাশে জেনির বাবার ভূমিকা ছিল অফুরন্ত। এমনকি মার্কস যখন তাঁর ডক্টরেট থিসিস প্রকাশ করেন তখন তা জেনির পিতা ওয়েস্টফ্যালেনের নামেই উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু মার্কসের বিপ্লবের পথ জেনির বাবা পছন্দ করতেন না। রাহুলের জীবনের নানান সম্পর্কের টানাপোড়েন যেন মার্কসের জীবনেরই নব রূপায়ণ।

মোহর চন্দ্রিমার সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে এস.ইউ.সি.আই(সি)-এর প্রতি অনুরক্ত হয়। রাহুলের সঙ্গে তার পার্টিগত দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। প্রেম এবং রাজনীতির টানাপোড়েন ভীষণভাবে গ্রাস করে রাহুল ও মোহরকে। মোহরের কাছেই রাহুল প্রথম জানতে পারে কবির খবর। সমীর চৌধুরী হাসানপুরে কবিকে রেখেছিল এবং রাহুলের বোন নাতাশার শুশ্রুষায় সে সুস্থ হয়ে কোথায় গেছে মোহররা কেউ জানে না। কবির খবর শোনার পর রাহুলের ভেতরে বেজে ওঠে বিপ্লবের দামামা। মোহরকে সে সরাসরি জানিয়ে দেয় তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের বিভাজনরেখার বিশদ বিবরণ:

তোমার আর আমার পথ কোনো দিনই এক নয়। তোমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অর্থাৎ অক্টোবর বিপ্লব করতে চাও। আমার দল চায় ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব। ভালোবাসার গান গেয়ে সেই পথ এক করা যায় না।^{৬৯}

১৯১৭ সালে রাশিয়ার দুটি বিপ্লব হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল সশস্ত্র আন্দোলন। সরকারের পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যেখানে ঘা দিয়েছিল তার কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথেছিল নভেম্বর বিপ্লব। দেশের একচেটিয়া শিল্পের পুঁজিবাদ জনগণকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, বলশেভিক পার্টি বিচ্ছিন্ন শিল্প শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করে, এর ফলে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব দেশকে দুর্বল করে দিয়েছিল। এবং অক্টোবর বিপ্লব দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ভেঙে দেয়, যার ফলে রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়। এই দুই বিপ্লব নিয়ে সি.এম এবং জি.এস-এর রাজনৈতিক মতাদর্শগত তফাতের প্রসঙ্গই তুলেছেন লেখক। এস.ইউ.সি.আই (সি) পার্টি মনে করে, ১৯১৭ সালে রাশিয়ার ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর একদল মার্কসবাদী পণ্ডিত লেনিনের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, রাশিয়ায় এখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দেওয়া চলে না, কারণ পুঁজিবাদ অনুন্নত এবং কৃষিতে সামন্ততন্ত্র রয়েছে। লেনিন তাঁদের জবাবে বিখ্যাত ‘এপ্রিল থিসিস’-এ বলেছিলেন— State power in Russia has passed into the hands of a new class, namely the bourgeoisie and landowners who had become bourgeois. To this extent the bourgeois democratic revolution in Russia is completed. অর্থাৎ রাশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা একটি নতুন শ্রেণির হাতে, যথা বুর্জোয়াদের হাতে ও বুর্জোয়াতে রূপান্তরিত জমিদারদের হাতে চলে গেছে। এই অর্থে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়ায় সম্পূর্ণ হয়েছে। এবং এরই ভিত্তিতে, রাশিয়ায় তখন পুঁজিবাদ খুবই অনুন্নত ও কৃষিতে সামন্ততন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব ও বিদেশি পুঁজির প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও লেনিন পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করে ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব সংগঠিত

করেছিলেন। লেনিন-স্ট্যালিনের শিক্ষা হচ্ছে, কোন শ্রেণি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আছে, তার হাত থেকে কোন শ্রেণি ক্ষমতা দখল করবে, এটার দ্বারাই বিপ্লবের স্তর নির্ধারিত হয়। ফলে বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে সি.পি.আই (এম) ও সি.পি.আই (এম.এল) ও মাওবাদীদের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী।^{৭০}

রাহুলদের মতাদর্শের সঙ্গে তাই আদিত্যদের মতবাদ মেলে না। দুটি পার্টির লক্ষ্য এক হলেও পথ আলাদা। আদিত্য-চন্দ্রিমাদের পার্টি শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব আয়োজন করে তাঁর আদর্শে গ্রাম জীবনের সংস্কার করতে চেয়েছে। শরতের লেখনীতে গ্রামীণ অন্ধকার, অত্যাচারী জমিদার, দুস্থ পরিবারের খোঁজ পাওয়া যায়। বস্ত্রত গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার লড়াইয়ে চন্দ্রিমা শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী, বৃন্দাবন, রমেশের মতো চরিত্রদের আদর্শ করেই সমাজের সংস্কার চায়। রাহুলরা সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সবকিছু তছনছ করতে চায়। একটা জোরালো ঘা, একটা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ না করলে পরিবর্তন আসবে না— এই বিশ্বাস সি.এম-এর সমর্থকদের। গ্রামীণ ডাক্তার থেকে জোতদারদের দুর্নীতি খতম করার জন্য একটা অপ্রতিরোধ্য বাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছে রাহুলরা। আর সেই পথে আংশিক সাফল্য এলেই তাদের মনে জেগেছে আশাবাদী প্রত্যয়:

দেশে সত্যিকার আন্দোলন না থাকলে মানুষ জীব হিসেবে খুব ছোট হয়ে যায়।
আন্দোলনের চাপে রেখে কতক মানুষকে সিধে রাখতে না পারলে, মানুষ যে মহৎ
প্রাণী প্রমাণ করা খুবই কঠিন হয়।^{৭১}

জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর প্রকাশ্য আন্দোলন নিষিদ্ধ হয়েছে, এমার্জেন্সির দাপটে রাজনীতির প্রাণ ওষ্ঠাগত। এই সময় রাহুল তার আন্দোলনের সঙ্গী কবির সাক্ষাৎ পায় দীর্ঘদিন পর। বুলবনদের পার্টি অফিসে নাতাশার হাত ধরে কবি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে আসে। এ দৃশ্য দেখে রাহুলের মনে নানান ভাবনা হয়। নাতাশার স্কুল, লেখাপড়ার জীবন,

অথচ তার পরিবারের কেউই যেন এমার্জেন্সির ঘেরাটোপ থেকে বেরোতে পারল না, একে একে সকলকেই গ্রাস করল সরকারের স্বৈরাচারী শাসন। পাশাপাশি বামপন্থী আন্দোলনের শৈত্যপ্রবাহ চলছে। কেউ শরণ সাহিত্য নিয়ে উদ্দীপনা লাভ করছে এবং কেউ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশের মেঘাচ্ছন্ন গুমোটকে ভাঙার প্রবল চেষ্টা করেছে। রাহুলের মনে হয়, আন্দোলন কোথাও নেই, কিন্তু প্রশাসন ঘুমোতে পারছে না। দেশমাতৃকার দেহ নিষ্পন্দ কিন্তু গর্ভে যেন দাপিয়ে উঠছে একটি ভ্রূণ, যাকে গর্ভেই হত্যা করার জন্য তৎপরতার শেষ নেই। মাঝে মাঝে সেই গর্ভস্থ প্রাণপিণ্ড অসম্ভব মৃতবত লাগে, যেন নেই, অথচ ফের আচমকা নড়ে উঠেছে। কবিকে দেখে এ কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। ভারতবর্ষের দুরবস্থার প্রেক্ষিতে তরুণ-তরুণীদের রাজনীতির পথে অগ্রসর হওয়া আদিত্য সিংহদের মনেও প্রভূত আশার সঞ্চার করেছে। বস্তুত ভারতবর্ষ বহু কাল প্রকৃত বিপ্লব বঞ্চিত ভূমি, কিন্তু বিপ্লব প্রয়াসে তার কখনও সোনার ছেলেমেয়ের অভাব হয়নি। তাই শত ব্যর্থতার মধ্যেও এই ঘটনা আদিত্যর চোখকে সার্থক করে তোলে। আর এখানেই শুরু হয় কবিকে নিয়ে সি.এম এবং জি.এস-এর রাজনীতির মতানৈক্য। পুলিশের অত্যাচার কবিকে কিছুটা নকশালদের রাজনীতি বিমুখ করে তুলেছিল, সেইসঙ্গে আদিত্যদের মগজ ধোলাই কবির অসুস্থ শরীর-মনকে করে তুলেছিল সীমাহীন বিপন্নতা। সবটা না জেনেই রাহুলের মনে দুশ্চিন্তার ভাঁজ তৈরি হয়। বুলবনের সঙ্গে বনিবনা না হবার কারণে চন্দ্রিমার গৃহত্যাগ, কবির ভোলবদল— যা রাহুলের দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে দেয়। জেলে যাবার পর থেকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি আজও। কদমের মতো সুবিধাবাদী মানুষ অপরাধবোধে দগ্ধ হতে হতে হয়ে উধাও হয়ে যায় অতর্কিতে। এতগুলি ঘটনার চাপ রাহুলকে ছিন্নভিন্ন করে তুলেছিল। আমানির মতো এক অবোধ কিশোরের নৃশংস মৃত্যুর পর থেকেই রাহুলের ভেতরে আগুন জ্বলে উঠেছিল তা বয়ে নিয়েই রাহুল সি.এম-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে

বিন্দু বিন্দু আগুন দিয়ে দাবানল বানাতে চেয়েছিল। কবি এসেছিল তার কাছে রহস্যময় মানুষের বেশে। আজ কেন্দ্রচ্যুত কবির পলায়নী মনোবৃত্তি রাহুলের মনে আন্দোলন সম্পর্কে বহু দার্শনিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এই সময় রাহুল জানতে পারে পুলিশের গুলিতে কদম আলীর মৃত্যুর খবর। ধর্মীয় বিধানের পাপবোধ নিয়ে ছুটে বেড়াতে বেড়াতে কদমের হারিয়ে যাওয়া রাহুলকে মুষড়ে দেয়। আখ্যানে কমরেডদের অন্তর্ধান, বিশ্বাসঘাতকতা, পুলিশের তৎপরতায় ভয়ঙ্কর গুণ্ডহত্যা, সাধারণ মানুষের আচমকা মৃত্যু— এ সবই সাতের দশকের বিরামহীন গণসংগ্রামের খতিয়ান।

উপন্যাসে জুড়ে নকশালপন্থী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে উঠে এসেছিল মাহেফরাসদের জন্য পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করা। আর সেই জলগেটের চাবি ছিল কবির কাছে। পুলিশের হাতে কবি ধরা পড়ার পর থেকেই পার্টির মধ্যে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠে এসেছিল। অতীতের আন্দোলনে যেমনটা হয়েছিল। পুলিশ কোনো বিপ্লবীকে যদি পুরোপুরি ব্যবহার করে নিত তখন সে বিপ্লবী নয়, বিরোধী শিবিরের লোক বলেই চিহ্নিত হত। আর এই চাবির জন্যেই ব্যথা তরফদারের দাস্তিকতা, নিরীহ মানুষের মৃত্যু। চাবিই হল ললিত-শশাঙ্কদের জেদ, তাদের স্বার্থের, শক্তির মুঠি। নাটা তরফদারের জোতদারি দম্ভের চিহ্ন, আধিপত্যের মুখ ও শাসানি। চাবি খুঁজে না পেয়ে কবির উদ্বেগ বেড়ে যায়। রাহুলদের একজোট হয়ে লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিল জলগেটের চাবি। এই সময় কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় রাহুল-মুমতাজ-দেবপ্রতিমদের। দেবপ্রতিমসহ পার্টির একাংশ কবিকে সন্দেহের চোখে দেখে। কবিকে শোনাতে চায় জোসেফ স্টালিনের ছেলের পরিণতির কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্টালিনের ছেলে ইয়াকভ জুগাশভিলি জার্মানদের হাতে বন্দি হয়। এবং জার্মান কর্তৃপক্ষ এই সুযোগ নিয়ে স্টালিনকে তার ছেলের জন্য কিছু প্রধান জার্মান জেনারেলকে বিনিময় করার প্রস্তাব

দিয়েছিল, স্ট্যালিন উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমার কোন ছেলে নেই।’ পরবর্তীকালে ইয়াকভকে আর মুক্তি দেয়নি জার্মান কর্তৃপক্ষ। জেলের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।^{৭২}

দেশ এবং আদর্শের সম্মান সেদিন পুত্রের চেয়েও বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছিল স্ট্যালিনের কাছে। এই গল্পকে আধেয় করে কৌশলে কবিকে ঘায়েল করতে চেয়েছিল দেবপ্রতিম। অথচ কবির শরীর-মন ছিল চূড়ান্ত অসুস্থতায় রক্তাক্ত। জেলে পুলিশের পিটুনি, ক্যাসারে আক্রান্ত মায়ের মৃত্যু, সহযোদ্ধাদের সন্দেহের দৃষ্টি— কবির বিপ্লবী জীবনের কেন্দ্রে লেগেছিল টালমাটাল স্রোত। কবি হারিয়ে ফেলেছিল জীবনের খেই। তীব্র অপরাধবোধ এবং অভিমানের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে কবি নিজের হাতেই সমাপ্ত করে তার বিপ্লব জীবনের অভিযাত্রা। কবির আত্মহত্যা রাহুলসহ সমস্ত কমরেডদের মধ্যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। সাতের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার মন্ত্বে ব্রতী হয়ে কবিদের রাজনীতি ছিল আত্মহত্যার সামিল। অথচ তার হঠকারী সিদ্ধান্ত এবং আত্মহনন সমকালীন পার্টির অভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের দিকটি স্পষ্ট করে দেয়।

উপন্যাসের ৩৯-তম অধ্যায়ে রাহুলকে লেখা চন্দ্রিমার চিঠিতে তার অসফল দাম্পত্য, পার্টির আদর্শ-মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব, রাহুলকে ঘিরে বুলবনের ভুল বোঝাবুঝি, আন্তঃধর্ম বিবাহ, দুই ধর্মের সাংস্কৃতিক দূরত্ব ও বিভাজন এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি ও মৃত্যু— এত বিচিত্র ঘটনার অভিঘাত রাহুলকে আরও ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তার সংগ্রামমুখী জীবন এবং পারিবারিক টানাপোড়েন সবই তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুক্ত হয়ে যায়। এই সময় সাদা চৌধুরীকে জেল থেকে হাসপাতালে স্থানান্তর আখ্যানের গতিপথ পাল্টে দেয়। রাহুল এবং আদিত্যদের পার্টির লোকজন একজোট হয়ে সাদা চৌধুরীর মুক্তি দাবি করে। একগুচ্ছ মানুষের তেজ ও সমবেত স্বর বহরমপুরের

আকাশ মথিত করে তোলে। বিপ্লবীদের সঙ্গে শুরু হয় পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ। লেখকের বয়ানে নিরপেক্ষভাবে উঠে এসেছে সমকালীন জরুরি অবস্থার ভয়ঙ্কর চিত্র। একদিকে তিমির-ললিতের বাহিনী ও পুলিশ এবং উল্টোদিকে বিপ্লবীরা। দুরন্ত ক্ষিপ্ৰতায় লাঠি, গুলি, বোমার ব্যবহার চলে এবং মুহূর্তের আকস্মিকতায় ছুরিবিদ্ধ হয় মুমতাজ আলী। জনৈক ডাক্তারের বক্তব্যে উঠে এসেছে জরুরি অবস্থা জর্জরিত ভারতবর্ষের ছবি:

আছেন কোথায়? ভারতবর্ষ দেশটাকে চেনেন আপনি? আসুন, একটু নরক-দর্শন করে যান।^{৭৩}

স্বৈরাচারী কিছু মানুষের হাতে সাধারণের জীবন বিপন্ন তা বর্তমান সময়কেও ছুঁয়ে যায়। ক্ষমতামালা দলের সঙ্গে বিরুদ্ধ শক্তির লড়াই, বাকবিতণ্ডা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। জরুরি অবস্থা চলাকালীন বহরমপুরের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অবলোকন করলে বামপন্থীদের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধের জায়গাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের সমর্থকদের সঙ্গে সাধারণ বামপন্থী বা অতিবাম সমর্থকদের মতামত ঘিরে উত্তেজনা এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের কোণঠাসা করার সর্বাত্মক প্রয়াস ছিল। আখ্যানের কল্পিত চরিত্রদের মধ্যে দিয়ে লেখক সেই প্রবণতাটিকে চিহ্নিত করেছেন। নির্বাচনের নিরিখে বহরমপুর বিধানসভা ও লোকসভা কেন্দ্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, মূলত R.S.P (Revolutionary Socialist Party)-এর সঙ্গে সংঘাত জাতীয় কংগ্রেসের। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৮৪- পর্যন্ত বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল হিসাবে আর.এস.পি অধিষ্ঠিত ছিল। অন্যদিকে বহরমপুর বিধানসভা গণ্ডির মধ্যে ১৯৭৭-পর্যন্ত জাতির কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলেও জরুরি অবস্থার ঝটকায় ১৯৭৭-এ আর.এস.পি বিধানসভা ছিনিয়ে নেয় কংগ্রেসের থেকে। অতিবামদের ভোট রাজনীতির প্রতি অবিশ্বাস থাকলেও রাহুলদের ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম এবং এমার্জেন্সির প্রভাব বিরোধী দল যথেষ্ট

ফায়দা তুলতে চেয়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলির নানা অভিমুখ লেখকের জবানিতে ফ্রেমবন্দি হয়েছে। অধীর-চিতের মতো গুণ্ঠাদের ব্যবহার করে একদল ভোটের রাজনীতি করে এবং পুলিশ-প্রশাসনও তাদের পাশে দাঁড়ায়। রাহুলদের আত্মত্যাগ রূপান্তরিত হয় আত্মক্ষয়ে। তামাম শহরটাই চলে যায় ক্রমশ সমাজ-বিরোধী গুণ্ঠা-মস্তানদের দখলে। রাহুল চন্দ্রিমাকে ব্যর্থতার স্বরে জানিয়েছিল, ‘আমরা আর কিছুই করতে পারব না! ভারতবর্ষ আমার দেশ নয়। আমি একে চিনি না!’ গলির মধ্যে এবং হাসপাতাল চত্বরে লাশের স্তূপ দেখে রাহুলদের ক্ষোভ দ্বিগুণ হয়েছে। ‘এ মৃত্যু উপত্যকা, আমার দেশ নয়’—রাহুলদের চোখের সামনে তাদের স্বপ্নিল ভারতবর্ষ শেষ হয়ে যায়। ‘ভারতবর্ষ এক বধ্যভূমি, গণতন্ত্র একটা প্রেত-নৃত্য। এখানে মৃত্যু স্বাভাবিক, জীবন অস্বাভাবিক।’ প্রফেসর বোলারকে বলা রাহুলের মন্তব্যে সেই সত্য উন্মোচিত হয়েছে:

মানুষ একমাত্র জীব, যে আপন প্রজাতিকে হত্যা করে বারবার। বাপুর অহিংসা অর্থহীন স্যার! হিংসা অনিবার্য। আমরা না মারতে পারলে, ওরা আমাদের শেষ করে দেবে। আমানি মরবে, হিসেব হবে না। কদম ব্যবহৃত হবে, তাকে খেয়ে ফেলবে ভারতবর্ষ। আমি জানি স্যার, মানুষ শান্তি চাইলেও পাবে না; সাধের গণতন্ত্র শান্তি দেবে মৃত্যুর মধ্যে। মরা ছাড়া শান্তি নেই। মার্কসবাদ যদি সভ্যতার কাজে না লাগে স্যার, তবু রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়ন মনে করিয়ে দেবে, সমাজের দুটি ভাগ, ন্যালা একটা ভাগ, শশাঙ্ক আর একটা ভাগ। এই দুটি আলাদা জীবন আলাদাই থেকে যাবে। হিংসাই কি সভ্যতার শেষ সত্য স্যার!^{৭৪}

গান্ধীজির সুরই অনুরণিত হয়েছে রাহুলের কণ্ঠস্বরে। অথচ অহিংসার বাণীতে ভারতবর্ষকে যিনি একসূত্রে গাঁথতে চেয়েছিলেন নাথুরামের মতো হিংস্রশক্তি এসে তাঁকে গ্রাস করল। প্রফেসর বোলার গান্ধীর পাশাপাশি যীশু, বুদ্ধ এমনকি কারবালার যুদ্ধ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রাহুলকে। হিংসার মৃত্যু হয়নি, তার ব্যবহার বদলেছে। রাষ্ট্রযুদ্ধে হিংসার ব্যবহার কী নির্মম ও মারাত্মক হয় তার প্রমাণ হিরোশিমা-নাগাসাকি। ভারতবর্ষের

নিচুতলার হিংসা যে আরও মারাত্মক তা এমার্জেন্সির সন্ধিক্ষণে রাহুলরা টের পেয়েছে। দেবপ্রতিমদের মতো পার্টির সক্রিয় কর্মীর উলটপুরাণ পার্টি-নেতৃত্ব ভালোভাবে নেয়নি। কবির আত্মহননের জন্য যাকে পরোক্ষভাবে দায়ী করেছে অনেকেই সেই মানুষটা হঠাৎ আন্দোলন বিমুখ হয়ে যায়। সাতের দশকের শুরুতেও এমনটা দেখা গিয়েছিল। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট ক্যাডারদের বিরামহীন বৈপ্লবিক প্রয়াস থাকলেও তার পাশাপাশি ছিল সংশোধনবাদী নেতৃত্বে লাগাতার বেইমানি।^{৭৫}

আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করার পরেও অতর্কিতে অনেকেই দলত্যাগ করেছিলেন। সেই ধারাই অনুবর্তন হয়েছে এমার্জেন্সি পিরিয়ডে। তবুও রাহুলদের ‘ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও আত্মত্যাগের রাজনীতি’ খেমে থাকেনি। রাহুলদের বক্তব্যে সে কথা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ‘বিনা যুদ্ধে মানুষ সূচ্যগ্র মেদিনীও ছেড়ে দেয় না। এই তবে ইতিহাসের সত্য, মহাভারতের সত্যসার, শ্রেণি-সংগ্রামের মৌলবিশ্বাস, মার্কসবাদের মৃত্যুর পরও সত্যই থাকে; যদি তার মৃত্যু হয় কখনও। রাশিয়ার সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র মার্কসবাদের শোধনাগার প্রতিষ্ঠা করেছে, তবু শত পতনের মধ্যে, অভ্যুদয়ের বিবর্তনে, সূচ্যগ্র মেদিনীর ওই প্রশ্নটি সহস্রবার উত্থিত হয়। ভিয়েতনাম প্রমাণ করে, সাম্রাজ্যবাদী আত্মসনেও সূচ্যগ্র ভূমি মানুষ ছাড়ে না, অধিকার উগরে দিতে বাধ্য হয় আমেরিকা।’ দেশের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের গণবিদ্রোহ ইতিহাস রচনা করেছে। সমকালীন সময়ের পৃথিবীর নানান দেশের ঘটনাবলীই রাহুলদের আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী ও মানসিকভাবে চাঙ্গা করে তুলেছে:

অসাম্যের পৃথিবী বারংবার সাম্যের স্বপ্ন দেখবে। সাম্যে অবিশ্বাসী মানুষ সাম্যেই যেতে চাইবে সংশয়-সঙ্কুল উন্মত্ত হিংসার পারাবার পেরিয়ে, শত ভিয়েতনাম শতবার জেগে উঠবে এই পৃথিবীতে। এবং বিশ্বাস করি, এই ধরনের একটি চাবি এবং এই ধরনের

লুক্কায়িত একটি বন্দুক বারবার জমা হবে কোথাও কোন গৃহকোণে, তড়াগে, প্রাঙ্গণে
এবং মোহড়া গ্রামের মত গ্রামে এবং নগরে। এবং বুকুর কাছে^{৭৬}

আখ্যানে বহুবার উঠে এসেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গত মনে পড়ে
সত্যজিৎ রায়ের ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ সিনেমার ইন্টারভিউ ঘরের দৃশ্য। টেবিলের এক দিকে সিদ্ধার্থ,
অন্য দিকে কোম্পানির তিন কর্তাব্যক্তি। তারা সবাই কোম্পানির প্রতিমূর্তি— ক্ষমতার থান
কেটে তৈরি করা এক একটি ইউনিফর্ম। কর্তাব্যক্তিদের এক জন সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞাসা
করেছিলেন ‘গত দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোনটি?’ ১৯৭০-এর ছবি। অর্থাৎ
‘গত দশক’ মানে ছয়ের দশক। সিদ্ধার্থ শান্ত ও স্পষ্ট স্বরে জবাব দিয়েছিল, ‘ভিয়েতনামের
যুদ্ধ।’ টেবিলের ও-পার থেকে তখন জানতে চাওয়া হয়েছিল: ‘মানুষের চাঁদে পা-রাখার
চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা?’ তখন তরুণ সিদ্ধার্থ সুগঠিত যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলেছিল,
চন্দ্রাবতরণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রত্যাশিত একটি ঘটনা, আজ না হোক কাল ওটা হতই,
কিন্তু ভিয়েতনামের গুরুত্ব অন্য মাত্রার, কারণ সেটা দেখিয়েছে একটা ছোট্ট এবং গরিব
দেশের মানুষ কীভাবে মহাশক্তির আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে, কী অসীম সাহস
আর প্রত্যয় নিয়ে লড়তে পারে এমন অসম লড়াই।^{৭৭} এই আত্মবিশ্বাস ও দুঃসাহস নিয়েই
রাহুলরা সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখেছে। সাদা চৌধুরীকে পুনরায় জেলে স্থানান্তরিত করা
হলেও বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের বন্দি কমরেডরা চৌধুরীকে নিয়ে পালানোর ফন্দি আঁটে।
কিছু বিপ্লবী পালানোর চেষ্টা করলেও সাদা চৌধুরী ব্যর্থ হন, শেষপর্যন্ত একজন নিরীহ
অহিংস মানুষ বিপ্লবী হতে পারেন না, যদিও তাঁর পুরো পরিবারটাই বিপ্লবের ছোঁয়ায়
আক্রান্ত। জেল থেকে পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গোরা। পুলিশের পাশবিক
হিংসার বলি হয় সে। মৃত গোরার পাশে সদ্যমৃত মুমতাজ আলী শুয়ে থাকে। এইভাবে
সরকারি পেয়াদাদের নির্মম অত্যাচারে কত শত প্রাণ ঝরে যায়। রাশিয়া, চীন বা

ভিয়েতনামের দীর্ঘকালীন সংগ্রামে বিপ্লবের সাফল্যের মূল কারণ নেতৃত্ব কর্তৃক ঠিক সময় উপযুক্ত রণকৌশলের পরিকল্পনা এবং এই রণকৌশল অনেক সময়ই বিশুদ্ধ তত্ত্ব নির্দেশিত পথ থেকে প্রস্থান করে পারিপার্শ্বিক বাস্তবের আশু প্রয়োজনীয় দাবির আলোকেই পরিকল্পিত হয়— যেমন ১৯১৭-এর নভেম্বরে লেনিনের অভ্যুত্থানের ডাক, বা ১৯২৭-২৮ সালে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অধিকাংশের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মাও-এর হুনানে প্রত্যাবর্তন ও এতদিনের প্রথাগত মার্কসবাদী রণকৌশল (শহরভিত্তিক শ্রমিকশ্রেণির সশস্ত্র উত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল)-এর পরিবর্তে কৃষকদের সশস্ত্র করে গ্রামে মুক্তাঞ্চল কায়েমের যুগান্তকারী রণকৌশলের প্রবর্তন। ভারতবর্ষেও তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্মুক্ত রণকৌশলের উদ্ভাবনার প্রয়োজন ছিল ষাট ও সত্তর দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের গতিপথে। চীন বা ভিয়েতনামের সংগ্রামে অনুসৃত কর্মসূচিকে ‘কপিবুক’ বানিয়ে তার হুবহু প্রয়োগ এদেশে করতে যাওয়াটা আহাম্মুকির নামান্তর।^{৭৮} সত্তর দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তা প্রমাণ করে দিয়েছিল। অথচ এমার্জেন্সির জোরালো আঘাত সেই তছনছ হয়ে যাওয়া পার্টিকে বহু স্থানে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করল। দেশের স্বার্থে, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে এ ছিল বেপরোয়া নকশালপন্থীদের শেষ কামড়।

নকশালপন্থীদের পার্টির মধ্যকার বিরোধ আন্দোলনকে বহুলাংশে দুর্বল করে দিয়েছিল। ১৯৭২-এর গোড়ায় ‘চারু মজুমদার যুগ যুগ জিও’ স্লোগান মুছে ফেলে দেয়ালে দেয়ালে লেখা হয়েছিল ‘ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও’। তখন কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ, দিশেহারা। ঘাতকেরা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের প্রতিহিংসার লালসায়। পুলিশ সন্ত্রাস, মিসা ও মস্তান-গুণ্ডাদের রক্তচক্ষুর সামনে তখন সাধারণ মানুষ ভয়ে বোবা। পাশাপাশি সীমান্তে পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশে রূপান্তরিত করে প্রতিক্রিয়ার জয় ষোলকলায় পূর্ণ।

‘পাকিস্তান খতম কর’ আওয়াজে দিগ্বিদিক মুখরিত। চারিদিকে একটাই জিগির এবং ইন্দিরা গান্ধী তখন এশিয়ার মুক্তিসূর্য হিসাবে জনতার কাছে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৭০-এর মার্চে চারু মজুমদার লিখেছিলেন, ‘তোমরা যদি এই কাজগুলি আন্তরিকভাবে কর, তাহলে আমি জোর গলায় বলছি ১৯৭০ সালে নয়তো বড়ো জোর ১৯৭১-এর গোড়াতে দেখবে বাংলার মাটিতে মুক্তিফৌজ মার্চ করছে। অথচ খোদ সি.পি.আই (এম.এল)-এর পার্টিগত অস্তিত্ব নিয়ে তখন টানাটানি চলছে। পার্টির মধ্যে মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। পুলিশ ও মিলিটারির ভয়াবহ অত্যাচারের মুখোমুখি পার্টির লোকজন খড়কুটোর মতো অসহায় হয়ে পড়েছে। শেষমেশ, ১৯৭২-এর জুনে চারু মজুমদারকে স্বীকার করতে হল, আমাদের দেশের সশস্ত্র লড়াই একটা স্তর পর্যন্ত ওঠার পর আমাদের অগ্রগতি থেমে গিয়েছে। আমরা জোর ধাক্কা খেয়েছি।^{৭৬} এই ঘটনারই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটেছে রাহুলদের সংগ্রামে। যে দেবপ্রতিম ‘সিস্টেম’কে প্রবলভাবে ঘেন্না করত একটা সময়ের পর সে নিজেই হয়ে যায় ‘সিস্টেমের’ অংশ। দেবপ্রতিম কবিকে অবিশ্বাস করেছিল, অভিমানে যন্ত্রণায় কবি আত্মহত্যা করল। সেই দেবপ্রতিম এখন বিশ্বাস হস্তারকের কাজ করেছে। রাহুল এ ঘটনায় সোচ্চার হয়েছে। দেবপ্রতিমের প্রতি সে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছে:

ক্ষুদিরাম আর কবি, এরা কি এতই আলাদা, কোথাও কি একফোঁটাও মিল নেই এদের মৃত্যুর স্বভাবে? দেবপ্রতিম তাহলে কে? এরা কি সেনসিটিভ নয়, এরা স্বার্থপর? মনে হল, গান্ধীকে মেরেছিল নাথুরাম, দেবপ্রতিমকে মেরে ফেললে কী ক্ষতি হয়? আমি কি কুখ্যাত হব ইতিহাসে? ওঁকে ব্যবহার করবে পুলিশ-প্রশাসন এবং ললিত, এমনকি ভবিষ্যতে কাস্তে হাতুড়ি তারার ভোটদল তিমিরের পার্টিও ব্যবহার করবে, দেবপ্রতিম বোধ হয় ভোটে দাঁড়াবেন একদিন? কী করবেন দেবপ্রতিম!

... যৌথ পরিবার ভেঙেছে, তাদের দলও কি একই ভাবে ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে? তারা কখনও কি আর উত্তীর্ণ হবে না? কমিউনিজম কি মানুষকে, দেশকে ক্রমান্বয়ে বিভক্ত করতে থাকবে? বউদি আর বুলবন কি আর কখনও মিলিত হবে না? অধীর, চিতে, গুঞ্জই কি ভারতবর্ষ শাসন করবে? জরুরি অবস্থার তমসা কি ভারতের

বুক থেকে কখনও তার ম্লান ছায়া গুটিয়ে নিয়ে ফুটন্ত সকাল উপহার দেবে না? ক্রমশ তার কালো ছায়া আরও বিস্তীর্ণ হবে? একজন নারায়ণী কি গোর্কির মায়ের মতন হবে না কখনও, তারও চেয়ে আরও উন্নত মাতৃহের দিকে যাবে না কোনো সূর্যোদয়ের পথে!^{৮০}

দীর্ঘ একুশ মাসের অন্ধকারতম দিনগুলির বিশদ খতিয়ান রাহুলের জবানিতে প্রকাশিত। সি.এম-এর অভিপ্রায় বা মতাদর্শ নিয়ে বহু তর্ক থাকলেও নকশালপন্থীরা সমকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা এবং সরকার বিরোধী গণআন্দোলনের যে উৎস মুখ খুলে দিয়েছিলেন তা পরবর্তী বছরগুলিতেও বহু জায়গায় ক্রিয়াশীল ছিল। অথচ দেবপ্রতিমদের স্বার্থাশ্রয়ী মানুষদের লাগাতার বেইমানি আন্দোলনের ভিত্তি দুর্বল করে দিয়েছিল। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি দেখে ছাত্র-যুবারা ভবিষ্যৎ, ক্যারিয়ার না ভেবে বৃহৎ গণআন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। ইতিহাস খুঁড়লেই দেখা যায়, রাজনীতি ছাড়াও সামাজিক, মানবিক এবং সাংস্কৃতিক— এমন নানা বিষয়ে ছাত্রদের আগ্রহ এবং আকুলতা তাদের স্বাভাবিক চারিত্র ধর্ম। যে কোনো ইতিবাচক, গঠনমূলক কাজে সব দেশেই ছাত্র এবং তরুণেরা দুর্বিনীত চেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেশের রাষ্ট্রীয়, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোয় থরহরি কাঁপন জাগায়, ধর্ম, বর্ণ, দল, মতের পরোয়া করে না। অসম্ভব তেজ, উদারতা আর নিষ্ঠায় দল, উপদলের সংকীর্ণ সীমানা তারা ভেঙে দেয়। তারা প্রমাণ করে, তারা তথাকথিত পার্টিজান, দলতান্ত্রিক, মতান্ধ নয়। তারা বিশাল, ব্যাপ্ত, নমনীয়, সর্বজনীন। মহত্ত্ব আদর্শ আর ত্যাগের প্রতিমূর্তি। অসহায়, আর্ত মানুষের জন্যে প্রমিথিউসের মতো তারা স্বর্গ থেকে আগুন ছিনিয়ে আনার দুঃসাহস দেখায়, তারপর নির্ভয়ে, বুক ফুলিয়ে দেবরাজ জিউসের শাস্তি মাথা পেতে নেয়। নতজানু হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সম্রাটকে ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে বীরের মৃত্যু বরণ করে। ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলন, বিশেষত

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনও সেই ধারা জিইয়ে রেখেছিল।^{৮১} ছয়ের দশক থেকেই যে ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, আর যাঁরা এই আন্দোলনে সরাসরি জড়িয়ে ছিলেন তাঁরা সকলেই যে মার্কসমারা দলীয় কর্মী বা সাংগঠনিক কর্মী ছিলেন, এমন নয়। আর পাঁচজন সাধারণ ছাত্রদের মতো তাঁদের জীবন শুরু হলেও চারপাশের অরাজকতা প্রত্যক্ষ করে এবং মানবিকতার খাতিরে তারা অনায়াসে যোগ দিয়েছিলেন এই আন্দোলনে। কারও ব্যক্তিগত জীবনে আচমকা আছড়ে পড়েছিল ঘুণধরা সমাজের বিষবাম্প, এবং সেখান থেকে তারা আর ফিরতে পারেনি জীবনের মূলস্রোতে। সাধারণ ছাত্র গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেছে সাধারণ জীবন থেকে বহুদূরে। রাহুলের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সমকালীন ছাত্র সমাজের ব্যতিক্রমী ‘জার্নি’কে ঔপন্যাসিক নিদারুণভাবে প্রকটিত করছেন:

আমি কবির ডাকে এ পথে আসি। বাবাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করল, যদি না করত, হয়তো এ পথ আমার হত না। সোভান আলী যদি মারা না যেত, এ পথ আমার হত না। শশাঙ্ক যদি ন্যালাকে মেরে না ফেলত, এ পথ কিছুতেই আমার হত না। চাবিটা যদি এভাবে আমার কাছে থেকে না যেত, আমি আজ গুডবয় হয়ে যেতাম। তাজ যদি বন্দুক ফেলে না আসত, আমি তাহলে সুবোধ বালকের মত অনার্স পড়তাম।^{৮২}

দেশের অন্তর্ভর্তী সন্ধিক্ষণ এতটাই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, সাধারণ ছাত্র সমাজ তাদের কেতাবি লক্ষ্য থেকে চ্যুত হয়ে দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ব্যক্তিগত জীবন বা পরিবারের কল্যাণ নয়, আপামর সমাজের পঙ্কিলতা তাদের ভাবিয়ে তুলেছিল। সভ্যতার ইতিহাসে যে কোনো রাজনৈতিক মতবাদ, দলীয় বা সাংগঠনিক কর্মসূচির চেয়ে মানবিকতার বয়স অনেক বেশি। শুধু আত্মরক্ষা নয়, মানবিক তাগিদেও বিচ্ছিন্ন মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল। ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস তাই কোনো দল বা কোনো সংগঠনের ক্ষমতালাভ, মারামারি, খেয়োখেয়ির ইতিহাস নয়— সমগ্র ছাত্র সমাজের মানবিক বিকাশের

সচেতন কাহিনি। বিকাশের ধারায় একজন মানবতাবাদী ছাত্র গণতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, তারপর তার রাজনৈতিক দীক্ষা হয়। এভাবেই গণআন্দোলন থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব উঠে আসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিকাশের এই প্রক্রিয়াকে মাঝপথে থামিয়ে দেবার জন্যে ওপর থেকে নেতৃত্ব চাপিয়ে দেয়। পশ্চিমবাংলার ছাত্র আন্দোলনে বারবার এই ঘটনা ঘটেছে, আজও ঘটছে। ফলে ছাত্র সমাজের আবেগ, স্বপ্ন কয়েকটি রাজনৈতিক দলের মাতব্বরিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এ অপচয় এখনও শেষ হয়নি। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া দলীয় নলজাতক নেতার দাপটে গণআন্দোলনের গর্ভ থেকে স্বাভাবিক নেতার জন্ম বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু ছাত্র আন্দোলন নয়, শ্রমিক, কৃষকদের সংগঠন এবং আন্দোলনেও আজ এই একই বন্ধ্যাত্ব।^{৮৩} জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রায় পাঁচ দশক কেটে গেছে, বিচ্ছিন্নভাবে নানান অচলাবস্থা তৈরি হলেও ছয়-সাতের দশকের মতো ছাত্র গণআন্দোলন আর এমনভাবে তৈরি হয়নি। বস্তুত এই কারণেই রাহুলরা সি.এম-এর কথামতো ভোট রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। চন্দ্রিমার সঙ্গে বহুবার তর্ক হয়েছে তার। সাতের দশকের বিক্ষুব্ধ সময়ের বহরমপুরের নকশালপন্থীদের সঙ্গে এস.ইউ.সি.আই (সি)-র মতাদর্শগত ফারাকটি লেখক তাঁর কল্পিত চরিত্রদের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন:

একদিন রাহুল বলেছিল— বউদি! তোমার দলের সব ভালো। কিন্তু ভোট বিশ্বাস করে। ভোটে দাঁড়ায়, মন্ত্রী এম.এল.এ হওয়ার চেষ্টা করে। শুয়োরের খোঁয়াড়ে ঢুকে মানুষ কী করে মানুষ থাকে বুঝে পাই না।

চন্দ্রিমা বলেছিল— জনগণের সঙ্গে সংযোগ রাখতে গেলে ভোটে না দাঁড়িয়ে উপায় নেই। তুমি ভোটে না দাঁড়ালেও ভোট কিন্তু হবে। জনগণও অংশগ্রহণ করবে। ভোটকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে দেখি আমরা। মন্ত্রী সভার ভেতরে এবং মাঠে প্রান্তরে মাসের মধ্যে একটা সংযুক্ত পরিপূরক আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে ইলেকশনে যেতে হবে।^{৮৪}

এই উক্তি পরম্পরা উদ্গত হয়েছে নিজস্ব রাজনৈতিক সচেতনতার বোধ এবং তার প্রতি গভীর বিশ্বাস থেকে। সি.এম-এর আদর্শকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করার পর রাহুল ভোট রাজনীতিকে কখনই ক্ষমতাদারদের তপোবন মনে করেনি। কেননা তার যুক্তি অনুযায়ী ক্ষমতাবোধীরা কোনো কালে গণতন্ত্রের উদার মহৎ কল্পনাকে প্রশ্ন দেবে না। পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তৈরি করবে, ভোটে রিগিং করবে, মস্তান পুষবে এবং শেষমেশ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা এ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। চন্দ্রিমা যা জানিয়েছিল, তার সঙ্গে জি.এস-এর রাজনীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়। ভোট রাজনীতি বিষয়ক এই প্রশ্নে এবং তদানীন্তন জার্মানির একদল অতিবাম নেতার সমালোচনা করে লেনিন ‘লেফট উইং কমিউনিজম— অ্যান ইনফ্যান্টাইল ডিসঅর্ডার’ লেখাতে বলেছিলেন:

For the communists in Germany, parliamentarism is of course ‘politically obsolete’, but... we must not regard what is obsolete for us as being obsolete for the class, as being obsolete for the masses... that participation in Parliamentary elections and in the struggle in Parliament is obligatory for the party of the revolutionary proletariat precisely for the purpose of educating the backward strata of its own class, precisely for the purpose of awakening and enlightening the undeveloped, downtrodden, ignorant peasant masses. As long as you are unable to disperse the bourgeois parliament and every other type of reactionary institution, you must work inside them.^{৮৫}

লেনিন বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে অস্বীকার করলেও বিপ্লবের আগে রাশিয়ার পার্লামেন্ট ডুমায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এমনকি বিপ্লবের পরেও ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। এস.ইউ.সি.আই(সি)-এর সমর্থক প্রভাষ ঘোষ যা বলেছিলেন তা চন্দ্রিমার বক্তব্যের সঙ্গে ছবছ মিলে যায়। তাঁর মতে, ক্ষমতা দখলের পূর্বে জনগণকে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের মোহ সম্পর্কে সচেতন করা কত প্রয়োজন, এটা লেনিন নিজেই রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের প্রাক্কালে হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন।

নভেম্বর বিপ্লবের প্রাক্কালে রাশিয়ার কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে বলশেভিক পার্টি শুধু অংশগ্রহণই করেনি, এমনকি ক্ষমতা দখলের পর ১৯১৮ সালের ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ওই বুর্জোয়া কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিকে টিকিয়ে রেখেছিল।^{৮৬}

উল্টোদিকে রাহুলের যুক্তি ছিল, ভোটের রাজনীতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভকে দানা বাঁধতে দেয় না। ক্ষোভ যখন বৃহৎ আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যায় একটা সঠিক নেতৃত্ব পেয়ে, তখনই একটা ভোট ডিক্লেয়ার করে ক্ষমতাওয়ালারা ব্যালট-বাক্সে ক্ষোভকে ঢুকিয়ে দেয়। যেমন বিষাক্ত সাপ ছোবল হানবার জন্য যখন উদ্যত হয় ঠিক তখনই সাপুড়ে সেটাকে ঝাঁপিতে পুরে নেয়। রাহুলের এ সমস্ত কথা শুনে চন্দ্রিমা একসময় যুক্তি খুঁজে পায় না। একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে রাহুলকে দেখে। রাহুলদের পথ ও তাদের পথ আলাদা হলেও সে পথকে অশ্রদ্ধা করেনি চন্দ্রিমা। উল্টোদিকে বুলবন এসব বোঝার কখনও চেষ্টা করেনি, এমনটাই মনে করেছে চন্দ্রিমা।

জেলের লকআপ-এ সাদা চৌধুরীর চেহারায়ে এসেছে অদ্ভুত পরিবর্তন। মাথার চুল সাদা, পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। পোশাকের জীর্ণ অবস্থা। শরীরের ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক যেন সমকালীন ভারতবর্ষের ক্ষত। সাদা সোচ্চারে জানিয়েছিলেন বুলবনকে, ‘আই অ্যাম এ নেকেড ফকির অফ ইন্ডিয়া’। পরাধীন দেশের জাতির বিবেক গান্ধীজীর কথা মনে করিয়ে দেয় এ উচ্চারণ। শিশুপুত্রের বিয়োগের পরে নাকি কার্ল মার্কসের চুল রাতারাতি সাদা হয়ে গেছিল— একথা নিয়ে আলোচনা করে চন্দ্রিমা ও আদিত্য। চন্দ্রিমার অস্থায়ী চাকরির খবর শুনে বুলবুল কিছুটা হকচকিয়ে যায়। বেকারত্বের গোঙানি উভয়কেই গ্রাস করছে। দুজনেরই প্রাণ হাহাকার করে কেঁদে ওঠে অতলান্ত সমুদ্রের তলে, বিপন্নতায়। যে সমুদ্রের তলদেশ ভারতরক্ষা আইনের দ্বারা তমিস্র। সাদা চৌধুরীর জেলবন্দি জীবন

এবং রাহুলের গোপন রাজনীতি, সাধারণ ছাত্র থেকে পুলিশের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্ট’-এ ঢুকে পড়া— এসবই চন্দ্রিমাকে আহত করেছে বারবার। তার অনুভূতিতে উঠে এসেছে সিদ্ধার্থ গৌতমের কথা। স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর ছেলের নাম ছিল রাহুল। ভারতবর্ষের এমার্জেন্সি এবং বাবার গ্রেফতার যেন রাহুলের সুস্থ জীবনে এক আকাশ অন্ধকার ছড়িয়ে দিল। এস.পি. অম্বরীশ এবং রাহুলের কথোপকথনে সমকালীন সমাজ প্রেক্ষিতের বিবিধ বয়ান উঠে এসেছে। নিম্নবর্ণীয় প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল রাহুল, সে কথাই এস.পি.-কে সে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছে বারবার। এক সাধারণ পড়ুয়া থেকে পুলিশের মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্ট-এর যুবক হয়ে ওঠা— রাহুলের এই ‘জার্নি’ তৎকালীন সময়ের রাজনীতি ও সমাজিক অচলাবস্থার যেন প্রামাণ্য দলিল। রাহুলের নিজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে ভেবেছে এ সমস্ত কথা:

প্রাণ গেছে বলে, জীবন নষ্ট হয়েছে, ভাবছ কেন রাহুল? এই জলের প্রকৃতির মধ্যে কর্মজীবী নিঃস্ব বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামের কোনো সত্যই কি নিহিত নেই? জল নেমে গেলেই কি আন্দোলন ফুরিয়ে যায়! জলে কি আবার পূর্ণ হয় না নদী, খাল, বিল? জলগেটের নিয়ন্ত্রণ তাহলে ছাড়ে না কেন ললিত-নাটা-তিমিরের রাজনীতি! জমি যার জলও তারই, এই আকাশ এবং প্রকৃতি তারই, সেই স্বত্বাধিকারী মানুষ কি চিরজয়ী এই দেশে? ন্যালার মৃত্যুই কি অবশ্যম্ভাবী পরিণাম? হাওয়া বিবির কান্নাই কি শেষ কথা? বাপুর নির্যাতনেই কি কালো ভারতবর্ষ চির-আহ্লাদিত সুখি এক সভ্যতার নাম? কবি-মুমতাজের আত্মত্যাগ কি জীবনের প্রহসন মাত্র? পাহাড়-কন্দরে জেগে ওঠা চারু-সুফলিঙ্গ কি এই জলের বুকে শত সহস্র মশালের আলো ছড়িয়ে এই সেদিন কোনো স্বপ্নই রচনা করেনি? স্টিমবোট নেমেছিল এই জলে, কালোগাড়ি এসেছিল এই ভূমিতে, এই গাঁয়ে— সত্য বটে, এসেছিল— মশালের আলোও কি সত্য ছিল না?^{৮৭}

সভ্যতার আদি থেকেই জমি দখলের লড়াইয়ে মানুষ দক্ষ ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

ইতিহাসের পথ ধরে এসেছে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের দল। আর সাধারণ খেটে খাওয়া

শ্রমজীবী মানুষ অত্যাচারিত হয়েছে যুগে যুগে। ক্ষমতার এই রাজনীতিকেই খতম করতে চেয়েছিল রাহুলরা। সাতের দশকের অস্থির প্রেক্ষাপটে রাহুলদের মতো যুবকদের নিজস্ব স্বপ্নের মূল্য থাকলেও তা উপলব্ধি করার মতো মোক্ষম সময় ছিল না তাদের হাতে। বিপ্লবী জীবনের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে তারা ভুলে যায় আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো ব্যক্তিগত জীবন, সংসার ও প্রবৃত্তির হরেকরকম খিদের কথা। মোহরের সঙ্গে রাহুলের সম্পর্কে এসে লেগেছে এমার্জেন্সির উত্তাল ঢেউ। চৌধুরী পরিবার ছেড়ে চন্দ্রিমার চলে যাওয়া এবং সেই সুযোগে ধর্মাত্মক ব্যাথা তরফদার বুলবনের সঙ্গে মোহরের বিয়ের সম্বন্ধ তৈরির প্রচেষ্টা চালায়। লেখকের হাতে গল্প এখানে সিনেম্যাটিক হয়ে ওঠে। ব্যাথা তরফদারের এই আহ্বানকে বুলবনের মনে হয়েছে আজরাইলের ডাক। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, মৃত্যুর দূত হলেন আজরাইল। যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রাণ হরণ করে থাকেন। ব্যাথা তরফদারের বিবাহ প্রস্তাব বুলবনের কাছে নিশির ডাকের মতো ভয়াবহ এবং আচমকা প্রলয়ংকরী ঝড়ের মতো তীব্র মনে হয়েছে:

এই আহ্বান আজরাইলের মত; মৃত্যুবাণ হিম, তীব্র। ভ্যাম্পায়ার পাখির শিস, পক্ষ-
সঞ্চালন, মধুর বিষেভরা মধু এবং বিষ। এ প্রস্তাব আজ যেন কুপ্রস্তাব নয়, অপমান
নয়, এ যেন জীবন-সম্মত। মরুভূমির উদ্যানে সেই একটা দীর্ঘচঞ্চু পাখির নিঃশব্দ
আক্রমণ, সুদীর্ঘ ক্লান্ত মরুপথে প্রশান্তি কেবল।^{৮৮}

এমার্জেন্সি বিক্ষুব্ধ সময় কেবল সামাজিক জীবনেই আঘাত হানেনি, সরাসরি মানুষের ব্যক্তিজীবনকেও করে তুলেছে তোলপাড়। কেউ নেহাতই বাঁচার নামে বেঁচেছিল, কারোর মৃত্যুর পর শরীরের সন্ধানটুকুও পাওয়া যায়নি। মুমতাজ আলীসহ বহু ছেলের লাশ পুলিশ গঙ্গার ঘাটে পুড়িয়ে দেয়। যারা একদিন সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখত, যাদের পরিবার-প্রেমিকা ছিল, তাদের অস্তিত্ব চিরতরে নির্মূল করেছিল শাসকের পুলিশবাহিনী।

তিমিরদের মতো বামপন্থী নেতারা (সি.পি.আই বা সি.পি.আই.এম) চারু মজুমদারের পার্টির বিরোধিতা করেছে, ললিত-শশাঙ্কের সঙ্গে যোগ দিয়ে শ্রেণিশত্রুতে পরিণত হয়েছে। লেখক সমকালীন বামপন্থী রাজনীতির মধ্যকার সংকটকে এখানে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। মণির মতো কিশোরের ক্ষুদ্র বুদ্ধি এই জটিল রাজনৈতিক বিন্যাসের রহস্য ভেদ করতে পারেনি। একসময় মণি এবং কয়েকজন মিলে তিমিরকে খতম করার ফন্দি আঁটে। সিনেমার দৃশ্যকে মণিদের ক্ষুদ্র ভারতভূমিকে কী অনায়াসে মিলিয়ে দিয়েছেন লেখক। রাহুলদের রাজনীতি নদীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। তাদের রাজনীতির দৃষ্টিটা সঠিক স্থানেই পড়েছিল। নদীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই ইতিহাসকে মুঠোয় ধরা যেত এবং তখন নদীর উৎপন্ন শস্যে সমাজতান্ত্রিক মানুষের অধিকার কায়েম করা যেত। নাট্য-ললিত আজও জলগেট খুলতে দেয়নি। নদীকে প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞানের কলাকৌশল, সেই বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করে একটি চাবি, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা সেই চাবির অধিকার দিয়ে রেখেছে ব্যক্তি-মালিক নাটাকে। আর সেই চাবিকে পাহারা দেওয়ার জন্য এই রাষ্ট্রই বন্দুকের লাইসেন্স দিয়েছে নাটার নামে। মাহেফরাসরা এ ইতিহাস সবটাই জানে। কিন্তু নাটার বন্দুককে রক্ষা করেছে পুলিশ-প্রশাসন এবং ললিতের রাজনীতি। রাহুলদের রাজনীতি সরাসরি নাটার বন্দুক এবং চাবির উপর হস্তক্ষেপ করেছিল। রাজনীতির কার্যকারিতার বিচারে প্রয়োগক্ষেত্র অনুযায়ী রাহুলদের মতে তাদের কর্মসূচি ভুল ছিল না। অথচ সমকালীন ভারতবর্ষের চাবিটা যে প্রবল শক্তির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তাকে হটানোর সামগ্রিক উদ্যোগ রাহুলদের জানা ছিল না। রাহুলদের কখনও মনে হয়েছে, এলাকাভিত্তিক তাদের সংগ্রামগুলি সঠিকভাবে দানা বাঁধলে তার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে ভারতবর্ষব্যাপী একটি সামগ্রিক কর্মপন্থা হয়তো বা বার হত। অথচ

তাদের ছোট্ট বলয়ে এত আন্দোলনের পরেও মাহেফরাসদের তেমন পরিবর্তন হয়নি।
কবি-মুমতাজের মৃত্যুর পর বিপ্লবের বহু স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেছে, পূর্ণতা পায়নি।

ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে শ্রেণিশত্রু খতমের হিড়িকে হাজারো যুবাদের
ব্যক্তিগত শখ-আহ্লাদ বিসর্জিত হয়েছিল রাজনীতির ঘোলাজলে। দেশ এবং বিশেষত
বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি যুবকদের ব্যক্তিস্বার্থ ছেড়ে ব্যাপক জনজীবনে মিশে
যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। পাশাপাশি দেশের সাধারণ মানুষের পাশে থাকার
আবেগতড়িত মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল ছাত্রদের বিপুলভাবে। সাতের দশকের মুক্তির দশকের
স্বপ্নে সেই মন্ত্র জারি ছিল। রাহুলরা এই মন্ত্রের অংশীদার। মোহরের সঙ্গে মুকুল নামের
এক যুবকের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হলে রাহুলের অন্তরাত্তা নাড়া দেয় প্রবলভাবে। মোহরের
লেখা চিঠি পেয়ে রাহুলের আন্দোলনভরা জীবনে আসে নস্টালজিয়ার স্রোত। এমার্জেন্সি
সাধারণ মানুষের সুস্থ জীবন কীভাবে ভেঙেছে, তছনছ করেছে, ধূলিসাৎ করেছে তার
খতিয়ান যেন লেখকের এই উপন্যাস। স্বাভাবিক জীবন বিচ্ছিন্ন একজন বিপ্লবীর অবস্থা
কত দ্রুত বদলে যায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। মোহর লিখেছিল, রাহুল যে পথে
নিজেকে চালিত করেছে সে পথ ছেড়ে কখনও রাহুল স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে
না। একজন সাধারণ ছাত্র থেকে পুলিশের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্ট’-এর তালিকায় স্থান
করে নেওয়া রাহুলের ব্যক্তিগত অনুভবে প্রতিফলিত হয়েছে সে কথা। একজন যুবকের
চোখের সামনে কীভাবে একটি দেশের সার্বিক চরিত্র বদলে যাচ্ছে তা সে দেখতে পাচ্ছে।
‘ভারতবর্ষ পুলিশের দেশ, সংগঠিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দেশ, এখানে পূর্ণিমার রাতে অজস্র
শূকর, গুধিনী, সারমেয়, ফাল-লাগা গরু আর্তনাদ করে। এখানে প্রেম একটা শিশিরজলে
ভেজানো মেহেদিপাতা, আর কিছু নয়— এখানে সেই প্রেম একটা কল্পনার বিষয়।’^{৮৯}
মানুষের হাতেই মানুষের জীবন কীভাবে রক্তাক্ত হয়, সামাজিক অচলাবস্থার যুপকাটে বলি

হয়ে যুবকদের পথ কীভাবে বদলে যায়, রাজনীতির জটিল আবর্তে পা ডুবিয়ে কেউ তীর খুঁজে পায়, কেউবা তলিয়ে যায় অতলান্ত গভীরে— উপন্যাসের কল্পিত চরিত্রদের মধ্যে দিয়ে লেখক তা স্পষ্ট করে তুলেছেন। স্বাভাবিক জীবন বিচ্ছিন্ন এবং পুলিশের ভয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড-এ থাকা রাহুলের কল্পনায় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মিলেমিশে একাকার।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *ঘুণপোকা* উপন্যাসের শ্যামের ভাবনা:

হয়তো একদিন পৃথিবীতে খুব সুসময় এসেছিল। তখন শ্যাম ছিল না। হয়তো একদিন পৃথিবীতে খুব সুসময় এসে যাবে। তখন শ্যাম থাকবে না। কেমন ছিল সেই সুসময় কে জানে! কিংবা কে জানে কেমন হবে সেই সুসময়! শ্যাম জানে না। মাঝে মাঝে সে কেবল তার চারধারে দেখতে পায় সেইসব সুসময়ের অনেক চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। যেমন পাখির মুখ থেকে খসে পড়া ফসলের বীজ দেখে বোঝা যায় যে, কাছাকাছি এইখানে কোথাও ফসল ফলেছিল, যেমন আকাশের মেঘ দেখলে বোঝা যায় আমাদের বীজক্ষেত্রে বৃষ্টি হবে।

কিংবা কে জানে এইটাই সেই সবচেয়ে সুসময় কি না যা শ্যাম পেরিয়ে যাচ্ছে!^{৯০}

সময় ও পরিস্থিতি আলাদা হলেও তুলনামূলক আলোচনায় শ্যামের সঙ্গে রাহুলদের মানসিক টানাপোড়েন একসূত্রে গেঁথে যায়। এমার্জেন্সি পূর্ব-ভারতবর্ষের এক অস্থির রূপ প্রত্যক্ষ করেছিল শ্যাম চক্রবর্তী। রাহুলরাও আর এক অস্থির পরিস্থিতিরই সন্তান। আর এই পথেই ‘নারীচরিত্র বর্জিত এক পুরুষ-জীবন অতিবাহিত’ করতে হবে রাহুলদের। ‘কোনো রাজনৈতিক দলের রাষ্ট্র-চরিত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিপ্লবের স্তরই শুধু নির্ধারণ করে না, মানুষের চলার গতিপথও নিয়ন্ত্রণ করে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব নাকি নভেম্বর বিপ্লব— দুটি আলাদা স্মরণি প্রস্তুত করে দিয়েছিল। জনগণতান্ত্রিক বা নয়া গণতান্ত্রিক কিংবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর মানুষের হৃদয়ের কাঠামো, সম্বন্ধের সূত্র রচনা করে। পার্টির চোখে রাষ্ট্রটি কী, কোন জাতীয় রাষ্ট্র-কাঠামো তাই-ই ঠিক করে দিতে থাকে মোহর কার, কে তার!’^{৯১} ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে পার্টির আদর্শের দ্বন্দ্বিক বৈপরীত্য প্রকট হয়ে উঠেছে।

প্রেম যে এক স্বাধীন সত্তা একথাই চিরদিন অনুভব করেছে রাহুল। অথচ ‘কমরেড জি.এস অথবা কমরেড সি.এম— দুটি চিহ্নিত নাম, দুটি আলাদা পথ, কিন্তু লক্ষ্য একই। পাশাপাশি রাষ্ট্র-চরিত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা আলাদা দুজনের। বিপ্লবের স্তর সম্বন্ধে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি, তাই দুজনের কর্মপন্থা ভিন্ন। আক্রমণের বর্ষামুখ ভিন্নমুখী। পন্থা আলাদা হলে কখনও লক্ষ্য বিচ্যুত হয় এবং সেইসঙ্গে লক্ষ্য ভুল হয়ে যায়।’ যেখানে পথ খুঁজতেই একটা গোটা জীবন অতিবাহিত হয়ে যায়, কক্ষপথ ভুল হলেই কক্ষচ্যুত হয় জীবন, সেখানে রাহুলের সমগ্র জীবনটাই যেন কক্ষহীন। সে জানে কোন পথে তার মুক্তি!

রাহুল চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ছয় ও সাতের দশকের ‘জোতদার খতমের’ রাজনীতির প্রতিটি ছাত্রদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পারিবারিক টানাপোড়েন, দাম্পত্যে বনিবনার অভাব, প্রেমে জটিলতা ইত্যাদি সমস্যা তৈরি হয়েছিল আন্দোলনকারী ছাত্রদের জীবনে। আখ্যানে মোহরের সিদ্ধান্তে রাহুলের তেজি মনেও তৈরি হয়েছে প্রেম-বিচ্ছেদের হাহাকার। আন্দোলনের পথে কোনো মৃত্যুই যেমন ব্যর্থ হয় না, একটা ঘা দিয়ে যায়। লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলে মানুষের দৌড়ের একটা মূল্য থাকে— এভাবেই ভাবতে থাকে রাহুল। ১৯৬৭-এর বসন্তের নির্ঘোষের মর্মার্থ চারু মজুমদার বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সত্তায় ধারণ করেছিলেন। ‘চিনের পথই আমাদের পথ— দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ— গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা’র লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই বিপ্লবের অগ্রগতি সম্ভব। বাস্তবিক গান্ধী, জয়প্রকাশের পর তৃতীয় ব্যক্তি যাঁর আহ্বানে ভূ-ভারত সাড়া দিয়েছিল তিনি হলেন চারু মজুমদার।^{১২} রাহুলরা সেই পথেরই সহযাত্রী। অথচ নয়ের দশকের পরবর্তী সময় থেকে পৃথিবী যে বদলে যাচ্ছে, বিশ্বায়ন ও ডিজিটালাইজেশন-এর হরেকরকম ডেউ এসে সরাসরি আঘাত করেছে মানুষের মস্তিষ্কের বহু কোষে— এ যেন দূরদর্শী লেখকের এক টুকরো ইতিহাসের ভবিষ্যতের রূপায়ণ। মানুষের ভাবনায় বিচিত্র তথ্যের আনাগোনা তাকে

আন্দোলনবিমুখ করে তুলেছে। সেই ভবিষ্যতের বাস্তবতাকেই লেখক নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পরখ করেছেন:

আত্মত্যাগের প্রাণধর্ম ফুরালে সংসারে পাপ বাড়ে। মার্কসবাদীরা হয়ে পড়ে আত্মস্বার্থপর
নীচ প্রাণী, ধার্মিকরা হয়ে পড়ে আরও হীনমতি, ভোগবাদীরা হয়ে ওঠে আত্মপরায়ণ,
আরও তেজিয়ান, শোষক হয়ে ওঠে আরও সুকৌশলী, পুলিশ-প্রশাসন হয়ে ওঠে আরও
ক্রুর, আরও ভয়াল। দেশে নামে চরিত্রহীন মন্ত্রিমণ্ডলের হিংস্র প্রচ্ছায়া, সাংবাদিক হয়
নপুংসক, লেখক হয় গোনাহগার, গায়ক হয় এলেবলে ভুয়াভঙ্গমান, ব্যবসায়ীরা হয়ে
যায় মুদ্রাস্ফীতি বিষ-প্রস্তুতকারী পশু, মানুষ হয় সম্পূর্ণ দাস, আপোস হয় নেতার
আদর্শ।

আর কী হয়? সিনেমার পর্দায় নগ্ন মেয়েরা নাচে, ভূতপ্রেত সংগম করে, সাহিত্যের গা
বেয়ে নামে পুঁজ, পচা লাশ ভাসে মানুষের থিয়েটারে, ধর্মস্থানে ধর্ষণ চলে— মোহান্ত-
মৌলবি হয় মানুষের উপদেষ্টা, পলিটিক্যাল ক্যাডার হয়ে যায় দিব্যজ্ঞানী মনীষী-মস্তান।
এই হয়, এই হতে থাকে^{৯০}

লেখকের দূরদর্শিতা মানুষের মরচে পড়া বিস্মৃত হৃদয়ের উপরিসৌধে প্রবল ঘা
দেয়। বিশেষত, ২০১১-পরবর্তী পশ্চিমবাংলা এবং ভারতবর্ষের বহু ঘটনা লেখকের
সমকালীন ভাবনাকে স্পর্শ করে যায়। আখ্যানের শেষে দেখা যায়, পুলিশ শেষমেশ সাদা
চৌধুরীকে মুক্তি দেয়। সাদা চৌধুরীকে ত্রেফতার করার মধ্যে দিয়ে আখ্যানের সূচনা
হয়েছিল, এখান থেকেই রাহুলের সশস্ত্র বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া, চন্দ্রিমা-বুলবনের
দাম্পত্যে জটিলতা থেকে শুরু করে চৌধুরী পরিবারের ভাঙাগড়া ভারতবর্ষের এমার্জেন্সির
সঙ্গে একত্রীভূত হয়ে গেছে। সাদা চৌধুরীকে লেখক এমার্জেন্সি পীড়িত ভারতবর্ষের
সাধারণ মানুষের প্রতীক করে তুলেছেন। রাষ্ট্রীয় আইনের ঘেরাটোপে সাদা এখন বাকরুদ্ধ,
বোবা। কথা বলার স্বাভাবিক শক্তি ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। মানুষের বাক-
স্বাধীনতার পরিপন্থী জরুরি অবস্থা সমকালীন ভারতবর্ষে কী বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল তার
জ্যাক্ত দলিল হয়ে ওঠে সাদা চৌধুরী চরিত্রটি। বাড়ির কাছে আসতেই সাদা চৌধুরী

মসজিদে আজানের সুর শুনতে পান, এস.পি অম্বরীশকে তিনি মসজিদে যাবার আর্জি জানান। সিনয় পাহাড়ে যেভাবে নবি মুসা ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, মসজিদে যাবার পথে ইসলামি পুরাণের সেই গল্প মনে পড়ে সাদা চৌধুরীর। নামাজ শেষে বেরিয়ে আসতেই উন্মত্ত জনগণের অজস্র কণ্ঠ ‘বাবু’ সম্বোধনে গুঞ্জনিত হতে থাকে। ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থা যেন একটি মানুষের ‘আইডেন্টিটি’ মুছে নতুন ‘আইডেন্টিটি’ তৈরি করে দিয়েছে। মুসার ঈশ্বর দর্শন এবং জ্ঞানের উদয় কিংবা হেরা গুহায় হজরত মুহম্মদের নবিত্বে উন্নীত হওয়া— পরবর্তীকালে মানুষের পথ প্রদর্শক হয়ে ওঠা। সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠা। অস্তিত্বের এই চিরবদল যেন সাদা চৌধুরীর জীবনেও ঘটে যায়। চয়ন খতিব চন্দ্রিমার নাম বদলের প্রস্তাব দেয় সাদা চৌধুরীকে। চন্দ্রিমার জায়গায় ফতিমা নাম দিতে চায়। সাদা চৌধুরী এর জবাবে বলেছিলেন:

যাঁরা এই নাম রেখেছেন, ‘চন্দ্রিমা’, তাঁরা ওই মা-টুকুর জন্যেই রেখেছিলেন, ওটির মানে আকাশের চাঁদ। একটিই আকাশ, চাঁদও একটা। বাপ-মায়ের রাখা নাম কেড়ে নেওয়ার সাধ্য আমার নেই। ওটা থাকবে^{৯৪}

সাদা চৌধুরীর বক্তব্যে ভারতবর্ষের বহুত্ববাদের চেহারাটি পরিস্ফুট হয়েছে। ১৯৭৬-এ জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময়েই ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটি সংযুক্ত করা হয়। অথচ সেই অস্তিত্ব পর্বে ধর্মবদল ও নাম পরিবর্তনই নয়, পাড়াপড়শি এবং নাটা-ললিত-শশাঙ্ক বাহিনী সর্বদা টার্গেট করেছে চন্দ্রিমাকে। চন্দ্রিমার সংকট কেবল বাইরে নয়, অসফল দাম্পত্য এবং শেষ পর্যন্ত বুলবনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা— সমস্ত কিছু সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রিমা পার্টির কর্মী হয়ে লড়াই করেছে। সে বামপন্থী আদর্শে দীক্ষিত, অথচ মা তাকে সিঁথিতে সিঁদুর দেবার কথা বলে। পুরুষের অধিকার ও বলপ্রয়োগের চিহ্নকে নির্দিধায় অস্বীকার করেছে চন্দ্রিমা। একরৈখিক একপাক্ষিক প্রতীকী সংকেতকে গ্রহণ করতে চায়নি। তবুও

সমাজ-রাষ্ট্র তার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিচয়ের দ্বন্দ্ব। বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী বহু মানুষ সহজে ধর্ম এবং রাজনীতিকে পৃথক করেছিলেন। কেউ বলতেন, আমি একজন হিন্দু কমিউনিস্ট। কোনো নেতা বলেছিলেন, আমি আগে মুসলমান, তারপর কমিউনিস্ট। বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী, রাজনৈতিক ‘ইজম’-এ দায়বদ্ধ ব্যক্তির সংশয় ও স্ববিরোধিতা অনেক গভীরে। কারণ আদর্শের সাজানো ছকে ফেলে তাঁরা সবকিছু ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন।^{৯৫} কমিউনিস্টপন্থী বহু মানুষের দ্বি-চারিতা চন্দ্রিমা চরিত্রের মধ্যে কখনও দেখা যায়নি। চন্দ্রিমা ছিল দৃঢ়, আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীনচেতা নারী। রাহুলের সঙ্গে তার স্নেহের তীব্রতা ভালোবাসার রঙে রূপান্তরিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ‘নষ্টনীড়’ গল্পে অমলের সাহিত্যচর্চা এবং তার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সাহচর্যে চারুলতা পেয়েছিল ক্ষণিক শান্তির নিশানা। চন্দ্রিমা-রাহুলের মাঝেও তেমন একটি অন্তরঙ্গতার বাতাবরণ লক্ষ করা যায়। চারুলতার একাকিত্ব ছিল, সে ছিল নিঃসন্তান। বয়সে ছোটো দেবরের প্রতি তার স্নেহের প্রাবল্য চন্দ্রিমার মধ্যেও দেখা যায়। স্বামীর ভেতরে যেমন বহু স্ত্রী তার পিতার প্রতিচ্ছায়া খোঁজে, ঠিক তেমনিভাবেই বুলবনের মধ্যে চন্দ্রিমা রাহুলকে পেয়েছে, মন্থথকে পেয়েছে। এ তার নিতান্তই নিজের আকাঙ্ক্ষার মানুষ, যে ভালোবাসার কোনো নির্দিষ্ট ছক নেই, ‘বর্ডার’-সীমা বা ‘ফ্রেম’ নেই। বুলবনের সঙ্গে প্রেম এবং তারপর বিয়ে— এরপরেও তার দাম্পত্য সুখকর হয়নি। বুলবন কখনও তাকে তার মতো করে বুঝতে পারেনি। হয়তো এই একাকিত্বই বুলবনের মধ্যে অন্য পুরুষকে ভালোবাসার তীব্রতায় খুঁজতে চেয়েছে চন্দ্রিমা। স্বপ্নের ঘোরে রাহুলকে ডেকে উঠেছিল চন্দ্রিমা আর সে ডাক শোনার পর নিরীহ বুলবনের ঈর্ষান্বিত হৃদয়ে জেগে উঠেছিল পিতৃত্বের গাজোয়ারি দাপট। স্বপ্ন এবং ঘুম থেকে ছিন্ন করে তুলে আঘাত করেছিল চন্দ্রিমাকে। জরুরি অবস্থার উন্মাদনা যত বেড়েছে বুলবনের তেজ ও ব্যক্তিত্ব ততই মুষড়ে পড়েছে। রাহুলদের আত্মত্যাগের

সংগ্রামের সামনে বুলবনের ভীৰুতা ছিটকে বেরিয়ে এসেছে বহুবার। ভয়ঙ্কর বেকারত্বের অপমান বুলবনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। ললিত-শশাঙ্কের ত্রাস তাকে অকেজো যন্ত্রের মতো করে তুলেছিল দিশেহারা। বুলবন যুবা থেকে হয়ে উঠেছিল ক্রমশ ঈর্ষান্বিত বালক। চন্দ্রিমাকে ঘেন্না করতে শুরু করে বুলবন, তার স্পর্শও তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। ‘গ্রাম্য ভদ্রতা’ মিশ্রিত নিঃসঙ্গতার তলে তলিয়ে যায় বুলবন। গ্রাম তার কাছে নিষ্ঠুর সত্তা হিসাবে প্রতিফলিত হলেও তার দুয়ার ভেঙে ভেতরে ঢোকান সংসাহস তার ছিল না। তার প্রেক্ষাভূমিতে বসত করত এক জরুরি অঙ্ককার, যার কারণে চন্দ্রিমার বিপ্লব মানসের রহস্যাবৃত জটিল আকাঙ্ক্ষা ‘গ্রাম্য ভদ্র’ বুলবন বুঝতে পারেনি। উল্টোদিকে রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্তে চন্দ্রিমার জীবনও একরকম তছনছ হয়ে যায়। সাধারণত বাঙালি সমাজ ও মানসিকতায় মেয়েদের বিবাহ পরবর্তী জীবন এবং পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর বাড়িতে বসবাস, দেবর-ননদ নিয়ে সুখী পরিবারের স্বপ্ন— এমার্জেন্সির বিকৃত উদ্দামতার ঘোলাটে দাপটে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। অতীতের আন্দোলনের বহু নারীদের জীবনেও একইরকম আঘাত এসেছিল। নকশালবাড়ি আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী জয়শ্রী ভট্টাচার্যের বক্তব্য চন্দ্রিমার জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। ১৯৭৭-এর ২৫ মার্চ জয়শ্রী ভট্টাচার্য একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন:

যে ভুল করেছি তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। কিন্তু এই ভুলের মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা পেলাম তাকে আমি সযত্নে রক্ষা করব... অনেক কিছু করার আছে... না ঘরকা, না ঘটকা... জানি অনেক দায়িত্ব আছে, তা পালন করার ক্ষমতা আমার উপস্থিত নেই। জীবনধারণের সংগ্রামে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত^{৯৬}

আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হলেও পুনরায় সমাজের মূলস্রোতে আন্দোলনকারীরা ফিরতে পারে না। জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির পর, আবার পুরানো জীবনে ফিরে গিয়ে এই

‘না ঘরকা, না ঘটকা’— মানসিক অবস্থা চন্দ্রিমা চরিত্রের মধ্যেও প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে।
চন্দ্রিমাও অতীত-বর্তমানকে একসূত্রে মেলাতে পারনি।

নাটা-ললিত-শশাঙ্ক— ক্ষমতার ত্রিভুজকে রাহুলরা বহুবার ভাঙার চেষ্টা করলেও শেষমেশ খতম করতে পারেনি। ক্ষমতার কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেয় মণি। কিশোর মণি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক ছয় ও সাতের দশকের ছাত্র আন্দোলনের আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের ইতিহাসকে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আখতারজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের সঙ্গে আবুল বাশারের আখ্যানের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সময়টা কাছাকাছি, পরিস্থিতি আলাদা অথচ লক্ষ্য এক। দুটো আখ্যানেই রয়েছে নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের লড়াইয়ের কথা। ক্ষমতাস্বার্থীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের লড়াই। লক্ষ্য ‘মুক্তি’। *চিলেকোঠার সেপাই*-তে খিজির এবং জুস্মন চরিত্রের সঙ্গে কিশোর মণি চরিত্রের সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। খিজির বালক অবস্থায় অনুভব করেছিল, কীভাবে মহাজন রহমতুল্লাহর কামনার শিকার হয়েছিল তার মা। মায়ের অবসেশন্ খিজির আলীকে আমৃত্যু তাড়া করেছে, তার মগ্নস্মৃতিতে বারবার ফিরে এসেছিল ধর্ষিতা মায়ের দেহ রক্তমাখা দেহ। এ উপন্যাসে গ্রামের জোতদার শশাঙ্ক গরিব চাষি কদম আলীর বৌকে ধর্ষণ করে এবং মণি সেই দৃশ্য দেখতে পায়। কদম আলীর বৌয়ের গোঙানির স্বর কিশোর মণিকে ভয়ানকভাবে পীড়িত করে। যে আমানিকে শশাঙ্ক পিটিয়ে হত্যা করেছিল তার মায়ের সঙ্গে শশাঙ্কের অবৈধ সঙ্গম মণির সরল মস্তিষ্কে তীব্র জিজ্ঞাসা তৈরি করে। সন্তান হারানো হাওয়া বিবি এবং খুনি শশাঙ্ক— দুটি দেহকে কখনও কল্পনাতেও এক জায়গায় টেনে আনতে পারেনি মণি। ক্ষমতা ও লালসার স্রোতে শ্রেণিঘৃণার উবে যাওয়া দেখে বাস্তব আর কল্পনা গুলিয়ে ফেলে মণি। এমার্জেন্সির আচমকা আঘাতে কদম মরেছে, মণির বাবা সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন,

রাহুলের আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন, মোহর-রাহুলের অপূর্ণ প্রেম, চন্দ্রিমা-বুলবনের দাম্পত্যে ভাঙন, মণির পরিবার ছিন্নভিন্ন— অথচ আমানির হত্যাকারী শশাঙ্ক কী সহজেই আমানির মা হাওয়া বিবির কাছে পৌঁছে যায়। আন্দোলনের ঘূর্ণিপাকে বিপ্লবীদের জীবন বিচ্ছেদে ভরে যায়, আর জোতদার-মহাজন শ্রেণিশত্রুর খোলস পরে গায়ে জড়ায়। ‘মানুষের লালসার শেষ নেই;/ উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ/ অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ/ অপরের মুখ স্নান ক’রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই।’^{৯৭} মণির সরল মনে বিপ্লবী জীবনের বৈপরীত্যে জোতদার-মহাজনদের বিলাসপ্রিয় জীবনের বিদ্যুৎ ঝলক খেলে যায়। শশাঙ্ক-হাওয়া বিবি-আমানি-অন্ধ ফুফু যেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।

শশাঙ্ক— জোতদার বা শোষক শ্রেণি

আমানি— শ্রেণিশত্রুর বলি হওয়া যুবাদের প্রতিনিধি

হাওয়া বিবি— এক টুকরো ভারতবর্ষ

অন্ধ ফুফু— মণির মতো কিশোরদের গণসংগ্রামের প্রতীক

জোতদারদের হাতে ভারতবর্ষ বেআব্রু হচ্ছে এবং অন্ধ ফুফু ঠিক ঠাইর করতে পারে না, কেবল গন্ধ পায়। যে গন্ধ অতীতের বহু মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ‘শ্রেণি-মিলনের বাতাসে ফুলের গন্ধ ভরে যায়, ফুল্ল কুসুমিত এই গ্রাম পূর্ণ হয় সুখে। একজন অন্ধ দৃষ্টিহীনা প্রহরী আমানির মাকে কী অসহায়ভাবে পাহারা দিয়ে চলেছে। স্পর্শভিক্ষা চাইছে কিরাকসমের মতন।’ ভারতবর্ষের আত্মার গোঙানি যেন থামতেই চায় না, বেড়েই চলে নিরন্তর। ভারতবর্ষের মতো আধাসামন্তান্ত্রিক দেশে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণিসংগ্রামের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল জমি রক্ষার লড়াই। নকশালবাড়ি আন্দোলন তৈরি হয়েছিল এই জমি রক্ষার তাগিদেই। আখ্যানে সংযুক্ত হয়েছে জমির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আত্মমর্যাদা প্রসঙ্গ। পৃথিবীর বহু দেশেরই প্রত্যন্ত অঞ্চলের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের লড়াইয়ে ইতিহাসে ঘাঁটলে দেখা

যায়, জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে উঠেছে। যুবা-ছাত্ররা অনায়াসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমস্ত নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে। এমার্জেন্সির ধাক্কায় মণির মতো নিতান্ত এক কিশোরের রাতারাতি ‘পরিণত’ হয়ে ওঠা— এসবই সাতের দশকের ছাত্র আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা, অভিপ্রায় ও বিপ্লবের ‘স্পিরিট’-এর যুগান্তকারী সংকেত:

প্রলম্ব দীর্ঘ পা ফেলে দৌড়তে থাকে বাঘের পাল্লায় এক কিশোর। তার রক্তের মধ্যে গর্জে ওঠে অদম্য অশিক্ষা, অন্ধ বেগবান বিদ্যুৎ লাফিয়ে ওঠে পায়ে পায়ে, পেশীতে তার বিপুল হিংসা আর মানবিকতা মিশ্রণ ঘটায় আদিম ভালোবাসা আর নিষ্ঠুরতার। সে বড় দাস্তিক কিশোর, উদ্ধত তার মূর্খবুদ্ধি।
যেদিন কাল মার্কস ছিলেন না এই পৃথিবীতে সেদিনও এই সহিংস নিষ্ঠুর কিশোর জন্মেছিল অরণ্যকোড়ে। তার মাতৃভূমি ছিল না, দেশ ছিল না। তার ছিল এক জীবগোষ্ঠী, তার ছিল শস্যগর্ভ মাটি আর পশুদল। সে বার বার ধ্বংস হয়েছিল। বারংবার জন্মেছিল মাতৃভূমির দয়ায়, গর্ভ-চিৎকারে। তাকে কেউ দীক্ষা দেয়নি, শুধু কেউ অস্ত্র তুলে দিয়েছিল হাতে^{৯৮}

এই মণিকে দেখে *চিলেকোঠার সেপাই*-এর খিজিরের ছেলে জুন্মনের কথা মনে পড়ে। খিজির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার একটা বীজ বপন করে গেছিল জুন্মনের মধ্যে, *চিলেকোঠার সেপাই*-এর শেষে তার রূপায়ণ আমরা প্রত্যক্ষ করিনি, সেই রূপায়ণের আংশিক রূপ আমরা দেখতে পেলাম মণির মধ্যে। ‘তাকে কেউ দীক্ষা দেয়নি, শুধু কেউ অস্ত্র তুলে দিয়েছিল হাতে।’— যে বন্দুক মুমতাজ আলী রেখেছিল মণিদের বাড়িতে, যে বন্দুকের কারণে সাদা চৌধুরীর জেলজীবনের সূচনা, রাহুলের জীবন হয়ে যায় বেপরোয়া, পরিবারের প্রচ্ছদ বদলে যায়— সেই বন্দুক নিয়েই মণি হয়ে উঠেছে সশস্ত্র বিপ্লবী। খিজিরের প্ল্যায়ার স্কু ড্রাইভার নিয়ে যেমন জুন্মন হয়ে উঠতে চেয়েছিল আগামী দিনের যোদ্ধা। এই অস্ত্র বা যন্ত্রাংশের মধ্যেই তো জন্মে থাকে মেহনতি মানুষের ক্ষোভ, বিক্ষোভ, প্রত্যয়, বিশ্বাস, ঘাম ও অশ্রু। কোদাল-কাস্তে ছেড়ে মণি বন্দুক হাতে এগিয়ে যায় এবং অনায়াসে গুলি গেঁথে দেয় শশাঙ্কের বুকে।

শেষমেশ দেখিয়ে দেয়, একটা গুলিতে হয়তো সময় বদলায় না, কিন্তু একটা গ্রাম বদলে যায়। কিশোর মণির মনে হয়েছে, ‘আজ তার পাপমুক্তি ঘটল। খুব পবিত্র লাগছে নিজেকে।’ বাবা জেল থেকে ঘরে ফেরে। কিশোর মণি জেলে যায়। যাবার আগে মণি ব্যথাকে তার বন্দুক ফেরত দিয়ে আসে, তালগাছের চূড়া থেকে নামিয়ে এনেছিল মুমতাজের বন্দুক। কবি-রাহুলদের রেখে যাওয়া স্বপ্নের সংগ্রামী বিন্দুটি মণি আরও অজস্র বিন্দুতে ছড়িয়ে দিয়ে যায়। চারু মজুমদারের আদর্শে রাহুলদের ‘বিন্দু ভাঙার রাজনীতি’ এবং ‘জোতদার খতম’-এর পরে মণির বন্দুকের গুলি ছিল নকশালপন্থীদের শেষ কামড়। মণি পুলিশের ভ্যানে ওঠার আগে মাকে জানিয়েছিল, ‘আবার আসবো! যেন সে আবার জন্ম নেবে তাঁর কোলে। উচ্ছেদ-বিচ্ছেদের গ্রাম-ভুঁইয়ে জন্মাবে বারবার, আয়েষা মা হয়ে আসবেন ধরিদ্রীর বুকে’— এমনই ইঙ্গিতই দিয়েছেন লেখক। এমার্জেন্সির বাঁধভাঙা দাপটে সাদা চৌধুরীর দুই ছেলের পরিবার-বিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে দিয়ে লেখক আরও এক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, শাসক কিংবা তাদের ক্ষমতাপুষ্ট অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কিশোর-যুবাদের হাড়ে মজ্জায়, রক্তে, নিঃশ্বাসে, অভিমানে যে ক্ষোভ ও বারুদ জন্ম নেয়, তা একসময় ভয়ানক ও উন্মত্ত বিস্ফোরণ আকারে মথিত করে দেশ-গাঁ-সমাজের তামাম প্রেক্ষাপট। বস্তুত সাধারণ মানুষের রগটি-রুজির লড়াই কখনও থেমে থাকে না, তাদের কণ্ঠরোধ করলে জেগে ওঠে আরও শতকণ্ঠ, চক্রবৃহৎ রচনা করলে ক্ষমতাস্বার্থীদের চক্রবৃহৎ ভেদ করে বেরিয়ে আসে হাজার হাজার অভিমন্যু। বিপ্লবীর মৃত্যু হয়, তবু বিপ্লব থেমে থাকে না।

উপন্যাসের শেষ পাতায় দেখা যায়, রাহুল জেগে ওঠে, সে তখনও আন্ডারগ্রাউন্ড-এ। সে নাম বদলে আত্মগোপন করে আছে, তার নতুন নাম সঞ্জয়। ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন মাসের বর্ষায় জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল। সেই মেঘ সরে যায়। ১৯৭৭ সালের

২১ মার্চ একটি ট্রানজিস্টর রেডিও-তে রাহুল শুনতে পায়, জরুরি অবস্থার অবসান হয়েছে। তখন তার গ্রামের কথা মনে পড়ে, জেলবন্দি মণির কথা মনে পড়ে। ছোটো ভাইয়ের উদ্দেশ্যে রাহুল মনে মনে বলে, ‘আমি আছি ভয় কী তোর! ভাই, তোকে যে বেঁচে থাকতে হবে।’— শেষমেশ আত্মপ্রত্যয়ী রাহুল গ্রামের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। রাহুলের পথ থেমে থাকে না, জরুরি অবস্থা শেষ হলেও তার আন্দোলনের কন্টিনিউশন্ বজায় থাকে। ছয়ের দশকের শেষদিকে ছাত্র-যুবারা চারু মজুমদারের ডাকে গরিব ও ভূমিহীন কৃষককে উদ্ধৃত্ত জমি দখল করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। সাধারণ যুবাদের সশস্ত্র প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবাদী চেতনা পরখ করে ‘আনন্দে আত্মহারা’ হয়েছিলেন চারু মজুমদার। কিন্তু নকশালপন্থী চারু মজুমদারের এই উদ্বেল মুহূর্ত ছিল নিতান্তই তাৎক্ষণিক— কার্যক্রমে তা প্রতিফলিত হয়নি।^{৯৯} ছয়ের দশকের শেষ এবং সাতের দশকের শুরুতে নকশালপন্থীদের সঙ্গে জোতদার এবং শাসকপক্ষের যে ঘাত-প্রতিঘাত তৈরি হয়েছিল, তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আন্দোলনের লক্ষ্য ঠিক থাকলেও পদ্ধতিগত ত্রুটি আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। বিশেষত, ১৯৭১-এ সুশীতল রায়চৌধুরী ও সরোজ দত্তের মৃত্যু। ১৯৭২-এ চারু মজুমদারের মৃত্যু। অসীম চট্টোপাধ্যায় ও সন্তোষ রাণাদের দলত্যাগ, এরপর ধীরে ধীরে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। বাংলার রাজনৈতিক পালাবদল, রাজনৈতিক জীবনের গতিধারা এবং সত্তরের রক্তাক্ত বধ্যভূমির প্রতিক্রিয়াশীল একদল মানুষের গর্জনকে আখ্যানে চিত্রিত করেছেন বহু কথাকার। সেই ধারারই সংযোজন হল আবুল বাশারের *অগ্নিবলকা*।

সমকালীন ঘটনা নিয়ে বহু উপন্যাস রচিত হলেও আবুল বাশারের এই উপন্যাসের ন্যারেশন-এ রয়েছে অভিনবত্ব। সাতের দশকের ঘটনাকেন্দ্রিক বেশিরভাগ বাংলা উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের ক্রিয়াশীলতা এবং তার ব্যর্থতা সমানভাবে উঠে এসেছে।

সমরেশ বসুর *মহাকালের রথের ঘোড়া* উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, রুহিতন কুরমি জেল থেকে ফিরে ডাবল ব্যারেল বন্দুকে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে। ‘বন্দুকটা রইল তার বুকের পাশে মাটিতে। কাত হয়ে মাথাটা রাখল জোড়া ব্যারেলের ওপর। পুচ্ছহীন লাল চোখের পাতা বুজে এল। তার মনে এখন একটি মাত্র সাক্ষ্যনা, সে অপমান আর অভিশপ্ত আশ্রয় থেকে নিজের যথার্থ জায়গায় ফিরে এসেছে, সে বুঝতে পারছে, গভীর ঘুম আসছে তার।’^{১০০} নবাবুণ ভট্টাচার্যের *হারবার্ট* উপন্যাসে, হারবার্ট হাতে র্লড চালানোর পর যখন হাতটি বালতির জলে ডুবিয়ে ঘুমিয়ে যায়, তখন হারবার্টের বন্ধুরা বলে, ‘ভালো করে ঘুমোক। ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে।’^{১০১} (যদিও হারবার্টের দেহ পোড়ার সময় চুল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছিল।) কিন্তু *অগ্নিবল্যাকা*-র শেষে দেখা যায়, রাহুল জেগে উঠেছে এবং সে বাড়ির উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। রাহুলের এই জেগে ওঠা, গ্রামে যাত্রা, ভাই মণির জন্য প্রত্যাবর্তন— এসবের মধ্যে দিয়ে লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন, জরুরি অবস্থা শেষ হলেও রাহুলদের আন্দোলনের ‘কন্টিনিউশন্’ বজায় রয়েছে। একটা শশাঙ্ককে ‘খতম’ করলেই আগুনে পুড়ে সব ভস্ম হয়ে যায় না, ছাইয়ের ভেতরে জমা থাকে জ্বলন্ত অঙ্গার। যা পুনরায় জ্বলে ওঠে নতুন কোনো রাজনৈতিক চরিত্র ও ঘটনার বিস্ফোরণে।

অগ্নিবল্যাকা ধারণ করে আছে সেই ইতিহাস ও অতীতকে— যার ভেতরে লেখকের ব্যক্তি-জীবনও সম্পৃক্ত। একটি বিশেষ পটের সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন লেখকের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার আধারে রূপায়িত। লেখক যখন *অগ্নিবল্যাকা* লিখেছেন তখন আখ্যানের ঘটনাক্রম তাঁর কাছে এমন এক স্মৃতি, যাকে সদর্থক বা সুখের নস্টালজিয়া বলতে পারি না আমরা। তাঁর আখ্যানের চরিত্র যেন তাঁরই খণ্ড-বিখণ্ড আত্মতা এবং আখ্যানের ঘটনাবলী সমকালীন সময়ের রাজনৈতিক সংকট ও মানুষের নিরবচ্ছিন্ন অধিকার রক্ষারই আলেখ্য। ছয়ের দশকে ‘কৃষিবিপ্লব সফল করতে ছাত্র-যুবকদের মধ্যে

গ্রামে গ্রামে থাকার ধুম পড়ে গেছিল। গ্রামের গরিব কৃষক, খেতমজুরকে গুরু মানার উপদেশ দিয়েছিলেন চারু মজুমদার। গরিব মানুষের উদ্যোগের দরজা খুলে দিতে বলেছিলেন তিনি। নাগরিক নেতৃত্বের জায়গায় গুরুত্ব পেয়েছিল গ্রামীণ নেতৃত্ব। গ্রামীণ নেতৃত্ব অর্থে গ্রামের দরিদ্রতম মানুষের কর্তৃত্ব। এ কর্তৃত্ব মেনে নিতে শহরের ছাত্র-যুবকরা যে পরিমাণ সাড়া দিল, গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-যুবকদের ভেতরে তা দেখা যায়নি। গ্রামাঞ্চলের বৃহত্তর ছাত্র সমাজের বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার কিছু কারণ ছিল। শহরের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেশিরভাগ যেমন মধ্যবিত্ত শ্রেণির নানা স্তর থেকে আসে, গ্রামের কলেজ ছাত্রদের সিংহভাগই তেমন ধনীকৃষক, ভূস্বামীর সন্তান। তারুণ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি চরিত্রে থাকলেও তারা গ্রামীণ রাজবৃত্তের শরিক। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের স্থিতিবস্থা বাঁচাতে চায়। শৈশব থেকেই তাদের মাথাতে থাকে নাগরিক অনুকল্পে शामिल হবার লুক্কিততা। ফলে ভূমিসম্পর্ক রূপান্তরের প্রশ্নে তাদের অনাগ্রহ স্বাভাবিক। ছয়ের দশকের গ্রামবাংলার ছাত্ররা এই রক্ষণশীল মানসিকতার উদাহরণ। পাশাপাশি মেজাজ, মর্জিতে গ্রামের তরুণ খেতমজুর, নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেরা ছিল ষোলআনা বিপরীত। লেখাপড়া না শিখেও পারিবারিক এবং পেশাগত তিক্ত অভিজ্ঞতায় তারা বুঝেছিল, কঠিন রুঢ় বাস্তব জীবনে স্বপ্নের জায়গা নেই। লোকবৃত্তের অসহায়তার কেন্দ্রে থেকে বেরোতে হলে স্থিতিবস্থার ভাঙচুর দরকার। বিপ্লবী রাজনীতি তাই আঁকড়ে ধরেছিল তারা।^{১০২} অথচ ১৯৭২ সালে গ্রেফতার ও মৃত্যুর কিছু পূর্বে চারু মজুমদার স্বীকার করতে বাধ্য হন— ‘শ্রেণিসংগ্রামের মূল প্রশ্ন ক্ষমতা দখল— খতম নয়। (অপ্রকাশিত লেখা) তাঁর শেষ প্রকাশিত লেখা ‘জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ’— (৯ জুন, ১৯৭২) যাঁদের একদা ‘মধ্যপন্থী’ বলে অভিযুক্ত করেছিলেন, তাদের সঙ্গেও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে নামতে ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন— ‘যারা একসময় আমাদের প্রতি শত্রুতা করেছে বিশেষ পরিস্থিতিতে তারাও

আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসবে। এইসব শত্রুর সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মতো মনের প্রসারতা রাখতে হবে। মৃত্যুর পূর্বে চারু মজুমদারের এই মত পরিবর্তনের কারণ একাধিক। সাতের দশকের প্রথম দুই বছর নকশালবাড়ি আন্দোলনের ইতিহাসের এক জটিল মুহূর্ত। একদিকে কলকাতা ও শহরতলিতে পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে যুব-ছাত্রদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই, অন্যদিকে সি.পি.আই (এম.এল) পার্টিতে ক্রমবর্ধমান ভাঙন। একে একে প্রাজ্ঞ নেতৃবৃন্দের দলত্যাগ ও পাঁচটা দল গঠনের সূত্রপাত। ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা থেকে চারু মজুমদারের যে স্থির বিশ্বাস— এই কৃষকরাই সংগ্রামের নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত নেতাদের হাত থেকে নিজেদের হাতে তুলে নেবেন। কিন্তু তার নিজের হাতে গড়া দলটি তখন পারস্পরিক ঘৃণার আওনে পুড়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় আতর্নাদী। এ পরিণাম হল কেন? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে আত্মানুসন্ধানের যে যাত্রার সূত্রপাত তাঁর শেষ লেখায় পাওয়া যায়, সে যাত্রার শুরুতেই ছেদ পড়ল ১৯৭২-এর ২৮ জুলাই পুলিশ হাজতে।^{১০০} যে চারু মজুমদার জোতদার খতমের উপর জোর দিয়েছিলেন, তিনিই শেষমেশ সে রাজনীতি থেকে সরে আসতে বললেন পার্টি কমরেডদের। এই বাইনারি এবং স্ব-বিরোধিতা আন্দোলনকে আরও দুর্বল করে দিয়েছিল। অথচ তাঁর মৃত্যুর পরেও তার ঘোষিত আদর্শের মৃত্যু হয়নি। আন্দোলনের ঝাঁক কমে গেলেও বাংলার বহু অঞ্চলে সক্রিয় ছিল নকশালকর্মীরা। আলোচ্য আখ্যানে এমার্জেন্সির ছকভাঙা দৌরাণ্ডা, মাহেফরাসদের দৈনন্দিন বেদনা, কৃষকদের খাদ্য-সুরক্ষার সংকট এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বৈরাচারী নিপীড়ন পন্থা— ছাত্র-যুবসমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে আন্দোলনমুখী করে তুলেছিল। এস.ইউ.সি.আই (এম)- এর মতো বামপন্থী সংগঠন যাঁরা আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে ন্যায় ও নীতির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে। অন্যদিকে কবি-রাহুলদের মতো যুবারা বিপ্লবের স্মৃতি ও বিপ্লবের নস্টালজিয়াকে পাথেয়

করে জোতদার খতমের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। উপন্যাস জুড়ে জরুরি অবস্থা চলাকালীন বহরমপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দু'বছর ব্যাপী সময়ের যে আন্দোলন তার আগুনের তাপ-উত্তাপ থাকলেও সম্পূর্ণ পরিণতি নেই। খেটে খাওয়া কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী মানুষের প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রাম, ধর্ম ও রাজনীতির মেরুকরণ, সামাজিক প্রেক্ষাপটে জোতদার শ্রেণির সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির সংঘাত এসব যেমন আছে, তেমনি বিপ্লবের কলাকৌশল না-জানা একগাদা তরুণদের অতীতের মতোই আগুনে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো হঠকারিতা, উন্মাদনাও রয়েছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নৃশংস ছাপ ছাত্র-যুবাদের এতটাই পীড়িত করেছিল, যে নিতান্ত সাধারণ ছাত্র থেকে তারা রাতারাতি সশস্ত্র বিপ্লবী হয়ে উঠেছিল। বিশ শতকের শেষে হারবার্ট, যে নিজে কখনও প্রত্যক্ষ বিপ্লবী ছিল না, অথচ অতর্কিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সবকিছু তছনছ করে দিয়েছিল। শাসকের হৃদযন্ত্র নাড়িয়ে দিয়েছিল। 'প্ল্যানচেট চলাকালীন হারবার্ট দেখেছিল, এক বিশাল পাহাড়ের উপর শোয়ানো বিনুর মৃতদেহ বলছে— ...আমার চোখের সামনে, আমার এতকালের দেখা পুরানো দুনিয়াটা পাণ্টে যাচ্ছে, ভেঙেচুরে, তছনছ হয়ে, গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে পুরানো দিনগুলো। ঝড় আসছে একটা... 'মৃত বিনুর শব যখন কথা বলে আমাদের বোঝা ভার এই অতীতের ভেঙে পড়ার বর্ণনা হাহাকার নাকি উদ্‌যাপন। নকশালরা চেনা-জানা পৃথিবীর আমূল পরিবর্তন চেয়েছিল সন্দেহ নেই। তারা চেয়েছিল সংশোধন নয়, বিপ্লব— যে বিপ্লব বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোকে সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে সর্বহারার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করবে। তারা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, নেহেরু ইত্যাদি তথাকথিত নবজাগরণ ও জাতীয়তাবাদী নায়কদের মূর্তি ভাঙার মধ্যে দিয়ে এবং বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা ও চিন্তা-কাঠামোর সমালোচনার মাধ্যমে ধ্বংস করতে চেয়েছিল সেই অতীতকে— তার গৌরব গাথাকে যা প্রধানত মধ্যবিত্ত ও ঔপনিবেশিক মতাদর্শজাত।

আসলে যে কোনো মতাদর্শই, অতীত ও তাকে ভাবার প্রক্রিয়ার মাঝখানে, মধ্যস্থতাকারী। অতীতকে ভাঙা মানে তাকে দেখার যে উপায়— যে ভঙ্গি— তাকে ভাঙা।^{১০৪} এই কাজটাই পুনরায় সংগঠিত করার প্রচেষ্টা দেখা যায় উপন্যাসে। পাশাপাশি ‘নকশালপঙ্খীরা একটা পর্যায়ে জোতদার, পুলিশ তো বটেই এমনকি সন্দেহের বশে নিজের দলের কর্মীদের বা ভেঙে যাওয়া দলের ভিন্নমতের অনুসারীদেরও হত্যার যত্রতত্র নিদান দিয়েছিল। মৃত্যু হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিক, আর শরীর অপ্রাসঙ্গিক অথবা মারণের উদ্দেশ্য কেবল। এই যান্ত্রিক নির্ধারণ আসলে অচিরেই রাষ্ট্রীয় পুলিশি খতমের উল্টো দিক হয়ে উঠেছিল।^{১০৫} আখ্যানে নকশালপঙ্খীদের হাতে জলগেটের প্রহরী নিরীহ লক্ষণ দাসের মৃত্যু এবং পার্টির কমরেড কবির প্রতি হরবোলা খতিবের সন্দেহ ও অভিমানে কবির আত্মহত্যা— অতীতের পদ্ধতি ও ঘটনার নব্য-রূপান্তর। লেখকের কল্পিত চরিত্রদের আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা, সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ও অপ্রাপ্তি— অতীতের রাজনীতির মূলস্রোতের ইতিহাসের চরিত্রদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

আজ একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পৌঁছে অতীতের ছাত্র-যুবকদের আন্দোলন আলোচনা করতে গিয়ে কিছুটা অবাকই হতে হয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বৈরাচারী দৌরাণ্য অস্বীকার করে ছাত্র-যুবারা শাসকের রাজনীতির মুখে যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, তা বহুলাংশে আজ স্তিমিত। সময়ের বদল, বিশ্বায়ন ও ডিজিটাইলিজেশন-এর ধাক্কাধাক্কিতে মানুষ হয়ে উঠেছে আরও বেশি আত্মকেন্দ্রিক। পাশাপাশি রাজনীতির অবনমন এবং রাজনীতির বেনোজলের দাপাদাপিতে শিক্ষিত মেধা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের করে তুলেছে রাজনীতি বিমুখ। তাদের একটা বৃহৎ অংশ মত্ত এখন সোশ্যাল মিডিয়ার চটকদার বুলিতে, ‘মিম-শেয়ারে’র মধ্যে দিয়ে তাদের প্রতিবাদী ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সেইসঙ্গে রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্ম এবং রাজনীতি গা ভাসিয়ে চলে অথচ প্রতিবাদী মুখ নেই, থাকলেও রাজনীতির

নোংরা পরিবেশে টিকতে পারছে না কিংবা কণ্ঠরোধ হচ্ছে। শাসকের দলে নাম লিখিয়ে ‘আখের গোছানো’, মানুষের বোধের অবনমন— এমন মৌখিক গোলাগুলিও রয়েছে। ভারতবর্ষ যেন পুনরায় পিছিয়ে যাচ্ছে অতীতে। বৃদ্ধ বিপ্লবী সাধক, বিপ্লবী ভাবাপন্ন মানুষদের নস্টালজিয়া, পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের দৌলতে নতুন প্রজন্মের (সর্বাংশে নয়) প্রবল আত্মকেন্দ্রিকতা, ধর্মনৈতিক মন্ত্রমুগ্ধ মন ও সাম্প্রতিক অতীতে বামপন্থী নেতৃত্বগণের ভরাডুবি, মাত্রাতিরিক্ত হারে ভোট সংখ্যা হ্রাস, পাশাপাশি অন্য কোনো আনকোরা রাজনৈতিক সংগঠন নতুন কোনো বিপ্লবের ডাক দেবে কিনা— শাসকের বিরুদ্ধে নতুন কোনো আন্দোলনের সূচনা বা বিপ্লবের ডাক দেবার মতো পরিস্থিতি আদৌও কখনও তৈরি হবে কিনা— তার সম্ভাবনা বিশাঁও জলে। অতএব যে ইতিহাস নিয়ে লেখক এই আখ্যান নির্মাণ করেছেন এবং আখ্যানের নায়ক রাহুলের প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে যে নতুন আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন— সে ইতিহাসের একরকম পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ‘যেমন ১৯৬০-৭০-এর দশকে আমরা দেখি পাশ্চাত্য আলোকায়ন প্রভাবিত বঙ্গীয় রেনেসাঁস সম্বলিত জ্ঞান প্রবলভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। নানান অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা, যে জ্ঞানকে এতদিন আমরা আঁকড়ে রেখেছিলাম বড়ো সাধের ধন মনে করে, তার অসম্পূর্ণতাকে বেহাট করে দেয়। শুধু তাই নয় স্মৃতি ও ইতিহাসের পথ ধরেই অতীতেরও হয় পুনর্বিচার। যেসব মানুষকে আমরা হৃদয়াসনে বসিয়েছিলাম সেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী-র মতো মানুষের কেবল মূর্তি ভাঙাই হয় না, তাঁদের কর্মকাণ্ডের মহত্ত্বও প্রশ্নের মুখে পড়ে।... এভাবেই সত্যাসত্যের মধ্যে, মান্য জ্ঞান ও অবদমিত জ্ঞানসমূহের মধ্যে শুরু হয় প্রবল চাপানউতোর। আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য বোঝা কী করে এই ক্রমাগত তথ্য ও প্রতি-তথ্যের আদানপ্রদানে সত্য ও জ্ঞানের বিষয়টিকে ভাবব বিশ-একুশ শতকের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বিশেষত যখন

ষাট-সত্তরের সময়কার ইতিহাস, তার স্মৃতিচারণ ও জ্ঞানচর্চার আকারপ্রকার ধীরে ধীরে ঢুকে পড়েছে মান্য বিদ্যায়তনিক পাঠে। বামপন্থার আপাত পিছু হটার বিশ্বব্যাপী পরিস্থিতিতে, বাম রাজনীতিজাত জ্ঞানের প্রতি বৌদ্ধিক সমাজের প্রবল আনুগত্য ও নস্টালজিয়া তৈরি হয়েছে। অবদমিত জ্ঞানগুলিকে ইতিহাসের মহাফেজখানায় ব্রাত্য লৌকিক চর্চা, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার মৌখিক ইতিহাসের মধ্যে যেভাবে পাওয়া গিয়েছিল তা যেন ক্রমশ জঙ্গমতা খুইয়ে মিউজিয়ামের সামগ্রীতে পরিণত হচ্ছে।^{১০৬}

ধর্ম আর রাজনীতি, যা বিশেষত ভারতবর্ষের মানুষদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যার কারণে একটি দেশ দু টুকরো হয়ে গেছে, সেই রাজনীতি এবং ধর্ম আজও ভারতীয়দের পিছু ছাড়েনি। প্রতিমুহূর্তে মানবতাবাদ সেখানে হোঁচট খায়, পা পিছলে পড়ে। কথাকার আবুল বাশার *অগ্নিবলকা*-র মধ্যে দিয়ে সেই সত্যেরও উন্মোচন করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছিলেন:

ধর্ম আর রাজনীতিই তো জীবন। এটাকে ফেস করতে চাইছেন না লেখকেরা। এর থেকে পালাতে চাইছেন। সবাই একটা সেফ জোন বেছে নিতে চাইছেন। কিন্তু ওভাবে তো গোটা সমাজের বাস্তব রূপটা ফুটে উঠছে না। সাহিত্য সবসময় কন্ট্রাডিকশন অফ লাইফ। ইনার কন্ট্রাডিকশন অফ লাইফ। মানুষের মনোজাগতিক, মনের অন্তঃস্থলে, হৃদয়ের খুব গভীরে যে দ্বন্দ্ব-জটিলতা, সেটাই কিন্তু আত্মপ্রকাশ করে গল্প-উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। সেটাকে এড়িয়ে গিয়ে তো হবে না। আমাদের জীবনে প্রেম নিয়ে কতটুকু সমস্যা হয়? প্রেমের মধ্যে যখন রাজনীতি এসে ঢোকে, তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়।^{১০৭}

আখ্যানে বুলবন-চন্দ্রিমা কিংবা রাহুল-মোহর— সম্পর্কের ভেতরে রাজনীতির সংক্রমণ চারজনেরই জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে। বুলবন-চন্দ্রিমার দাম্পত্যে জটিলতা ও রাহুল-মোহরের প্রেমের ভাঙন সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটেরই চিহ্ন বহন করে। সময়ের দলিলীকরণে বিশ্বাসী লেখকের এই উপন্যাস সাতের দশকের জরুরি অবস্থা পীড়িত উত্তাল সময়ের নিষ্ঠ দলিল, সমকালীন রাজনৈতিক

সংকটের স্মৃতিকথা, অস্থির সময়পর্বে শত শত যুবার বদলে যাওয়া জীবন ও তাদের মেটামরফোসিসের গল্প।

১৯৯২-র ৬-ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর মানুষের জীবন কীভাবে হিন্দু-মুসলিম, মন্দির-মসজিদে পরিণত হয় এবং মানুষ কীভাবে জাতধর্ম ও ধর্মাত্মতার কবলে পড়ে তার পরিচয়কে ভাঙে, ধূলিসাৎ করে *আকাশলীনা* (১৯৯৪) উপন্যাসে তা দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

বিশ শতকের নয়ের দশক উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কেননা এই দশকের সবচেয়ে বড়ো ঘটনাই হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের অভুত্থান।^{১০৮} ১৯৭৬ সালের ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশে ভারতবর্ষকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ হিসাবে ঘোষণা করলেও ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর আর.এস.এস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মদতপুষ্ট করসেবকদের হাতে ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদের ধ্বংস ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার সাদা খাতায় একদলা কালি ছিটিয়ে দেয়। অযোধ্যার বাবরি মসজিদের অমানবিক ঘটনার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলেছিল। আর ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ, বিশেষত কয়েকটি রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনে নেমে এসেছিল নিরাপত্তাহীনতার ঘোর অন্ধকার। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের বহু জায়গায় দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। এবং এর রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দীর্ঘদিনের বন্ধনে বিশ্বাসভঙ্গের তীব্র ঘেন্না আছড়ে পড়েছিল, কার্যত হিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নতুন করে নির্ধারিত হচ্ছিল। বস্তুত, হিন্দু-মুসলমান উভয়

সম্প্রদায়ের কটর মৌলবাদীদের মধ্যে প্রতিশোধের এক বীভৎস খেলা শুরু হয়েছিল। বাবরি মসজিদের ধ্বংস এবং তার প্রেক্ষিতে দাঙ্গা, মুসলমানদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, এরফলে ১৯৯৩ সালের মার্চে বোম্বাই (অধুনা মুম্বই) শহর বিস্ফোরণের এলোপাতাড়ি শব্দে কেঁপে উঠেছিল। পাশাপাশি ভারতের উত্তর সীমান্ত কাশ্মীরে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট কিছু জঙ্গি সংগঠন এবং মুসলিম মৌলবাদীদের দাপটে কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের উপর শুরু হয়েছিল অকথ্য অত্যাচার। অথচ ‘অতীতে কাশ্মীরে হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে অর্থনৈতিক রেষারেষি ছিল। যেমন, চাষের জমির ওপর এবং রাজ্যের প্রশাসনের ওপর পণ্ডিত নিয়ন্ত্রণ শেখ আবদুল্লাহকে অখুশি করেছিল, তিনি এর অবসান ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি মোটের ওপর অটুটই ছিল। এমনকি ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়কার দাঙ্গাও কাশ্মীরকে স্পর্শ করেনি। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী কাশ্মীরকে ‘শান্তির মরুদ্যান’ বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।^{১০৯} এছাড়াও পরবর্তীকালে ২০০২ সালে গোধরার ঘটনার পর গুজরাট দাঙ্গা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার শিকড়ে দিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার কদর্য কামড়। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বিতর্কিত বাবরি মসজিদের জমিটি রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ভারত সরকার দ্বারা গঠিত একটি ট্রাস্টের কাছে হস্তান্তর করা হবে।^{১১০} ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধন হয়।

আকাশলীনা উপন্যাসে আছে বিশ শতকের নয়ের দশকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও অস্থির সময়ের চিত্র। দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কীভাবে গ্রামবাংলার মানুষদের জীবনে হিংসাত্মক অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল তার হদিশ পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক নকশাল কর্মীর পরিবারকে ঘিরে

আবর্তিত হয়েছে এই উপন্যাসের আখ্যান। আহসান ইমাম, যে বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সাতের দশকের নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে দু’দশক জেল খেটেছে। জেলের লৌহশলাকার মজবুত ঘর ইমামের স্বপ্ন ও শরীরের তেজ স্তিমিত করে দিয়েছিল। পরবর্তী জীবনে ইমাম চলত লাঠিই ভর দিয়ে। অন্ধের ছাত্র ফরহাদ, যে আবার ইমামের মেয়ে আকাশলীনার অন্ধের মাস্টার এবং সেইসঙ্গে ইমামের বিশেষ অনুগত। ফরহাদ থাকলে ইমামের লাঠির প্রয়োজন হয় না। ইমাম ভালোবেসে বিয়ে করেছিল হিন্দু পরিবারের মেয়ে স্বর্ণদীপাকে। ইমামের মায়ের ‘জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুঃখ তিনি স্বর্ণদীপাকে মুসলমান করতে পারেননি’। ইসলামি শাস্ত্রে ভিন্নধর্মী পরিবারের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ অবৈধ— কেবলমাত্র একেশ্বরবাদী মেয়ের সঙ্গে বিবাহ ইসলাম বৈধতা দিলেও বিশেষত, হিন্দু পরিবারের মেয়ের সঙ্গে ইসলামি শরিয়ত মান্য করে না। স্বর্ণদীপা কখনও ধর্মের আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিল না। স্বর্ণদীপা শাশুড়ি মাকে জানিয়েছিল:

কোনো ধর্মচার আমি করি না। আপনার ছেলেও করে না। তাহলে এ প্রশ্ন কেন তুলছেন! আমরা পরলোক, স্বর্গ-নরক, ঈশ্বর বিশ্বাস করি না। এমনকি ধর্মকে মানবতার শত্রু এবং কুসংস্কার মনে করি। আমি চাইব, আমার ছেলেমেয়ে যেন কোনো ধর্ম পালন না করে।^{১১১}

একেশ্বরবাদী ও ধর্মপ্রাণ মানুষ দাদিমা দিনের বেশিরভাগ সময়টা এংকাফে (ধ্যানমগ্ন উপাসনা) থাকেন, দাদিমায়ের মনে প্রশ্ন জাগে— ‘ধর্মছাড়া মানুষ হয়!’- এই প্রশ্ন এই জিজ্ঞাসা বারবার তাড়িত করে ধর্মচারী দাদিমাকে। দাদিমা একরকম জোর করে আকাশলীনার নামের সঙ্গে ‘সৈয়দা’ পদবী জুড়ে দেন। আকাশলীনাকে দাদিমা ডাকেন আসমানতারা ব’লে। দাদিমা বাবাকে আব্বা, জলকে পানি, স্নানকে গোসল বলা পছন্দ করেন এবং তিনি সেই শিক্ষা আকাশলীনার মধ্যে সঞ্চারিত করতে চান। ইসলামী রীতি রেওয়াজের বাইরে দাদিমা কিছু ভাবতে নারাজ। ছেলে ইমাম ধর্মের ব্যাপারে পুরোপুরি

উদাসীন। স্বর্ণদীপা বলে— জলকে পানি বা পানিকে জল বলার ধর্মকে ঘৃণা করি। এই ঠেলাঠেলির নাম সাম্প্রদায়িকতা, এটা ব্যাধি। এটা রোগ। ধর্ম নয়।^{১১২}

একই পরিবারের প্রতিটি মানুষের ধর্ম সম্পর্কে এই পৃথক বোধ সনাতনপন্থী দাদিমাকে অবাক করে। আকাশলীনা পড়ে দো-টানায়। সে দাদিমা এবং দিদিমা— দুই মানুষের ভিন্ন ধর্মমতের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়। মানুষে মানুষে এত প্রভেদ আকাশলীনীর মনে অনেক প্রশ্ন ও অনেক জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। যার সুরাহা করতে পারে না আকাশলীনা। আকাশলীনীর এই দ্বন্দ্বময় জীবনে উদয় হয় ফরহাদের। যে ম্যাথের টিচার এবং যার বাবা বাউল। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের রাতে ফরহাদের বাবা শেখর আনসারীকে পিটিয়ে মেরে দেয় শরিয়তপন্থী মৌলবাদী মাস্কেটবাহিনী। যারা বিশ্বাস করে— বাউল মারলে সওয়াব হয়।^{১১৩}

মুসলিম হয়ে আনসারী বাউল গান করত। অযোধ্যার ঘটনার পর ধর্মের বাতাসে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাপ্প জমতে শুরু করেছিল। শেখর আনসারীকে মারার সময় শরিয়তপন্থী মাস্কেটবাহিনীর মনে হয়েছে তারা অযোধ্যার বদলা নিচ্ছে। শেখরের দেহটা যেন ‘হিন্দু মন্দির’, যা ভাঙতে পারলে শরিয়তপন্থী মৌলবাদী মুসলিমের গায়ের আঁশ মেটে। জাতধর্মের হানাহানিতে মানুষের দেহের কাঠামো পরিণত হয়েছে মন্দির-মসজিদে।

ইমাম আহসান ছিলেন বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী। তিনি মানবতাবাদে বিশ্বাসী। ধর্মের নামে মানুষ হত্যা, মন্দির-মসজিদ ধূলিসাৎ করাকে তিনি ঘৃণা করেন। নারী-পুরুষের ভেদাভেদকে ইমাম আহসান বলেছেন মৌলবাদ। ইমাম তার মেয়ে আকাশলীনাকে বলেছিলেন নারীজীবনের অধিকার ও সেই উপলব্ধির কথা:

পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই যাতে নারী আর পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলেছে। পুরুষের বাঁ পাশের বাঁকা হাড় দিয়ে নারী গঠিত— এই কথাটি কোরানেও পাবে তুমি। এইরকম একটা অতি অবৈজ্ঞানিক ধারণা, একটা অলৌকিক কেচ্ছা, সত্যি বলতে কি আধুনিক মানুষ মেনে নিতেই পারে না। ধর্মও মানুষের একটি স্পিরিচুয়াল প্রোডাকশন— মানুষের মাথা থেকেই যুগে যুগে নানান ধর্মের উৎপত্তি। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করলেন, নাম আদম। এমনকি ‘কুন’ উচ্চারণ করলেন খোদা, অর্থাৎ বললেন হোক, তাই হল। কী হল? সাত দিনে জগৎ সৃষ্টি হয়ে গেল। লেট দেয়ার বি লাইট, দেয়ার ওয়াজ লাইট। আলো হোক, তাই হল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের বাসনা দ্বারা উদ্ভূত। কী বিস্ময়কর ঘটনা!''^{১৪}

ধর্ম মানুষকে কত বড়ো পাপবুদ্ধির অধিকারী করে তোলে তার জ্বলন্ত উদাহরণ অযোধ্যা। অযোধ্যার উত্তপ্ত সাম্প্রদায়িক হাওয়া গ্রামে-গঞ্জে মানুষদের ভেতরের হিন্দুত্ব ও মুসলমানিত্ব জাগিয়ে দিয়েছিল। ইমামের ছেলে রুদ্রকে উলঙ্গ করে দেখতে চেয়েছিল শরিয়তপন্থীরা। যে রুদ্র ‘হিন্দু মায়ের সন্তান’ না ‘মুসলিম বাবার সন্তান’! আসলে ‘মানুষের ধর্ম এবং জাত যৌনতা-সম্বন্ধিত। মানুষকে উলঙ্গ করে দেখা হয় মানুষের জাত কী! রুদ্র সেকথা ভোলেনি। মা সেই অপমানে কেঁদেছেন। দাঙ্গায় শোনা যায়, মানুষের যৌনাঙ্গ দেখে ধর্ম নির্ণয় করা, সম্প্রদায় শনাক্ত করা এবং অতঃপর ছুরি বসানো— এইভাবে চলে হিংসার ঐতিহাসিক উৎপাদন। একটা মানুষকে মস্তানি হত্যালীলায় মাস্কেট বিদ্ধ করে বোঝানো হয়, অন্ত্যজ হত্যায় পাপ নেই।''^{১৫}

দাঙ্গা বিধ্বস্ত এক অস্থির সময়ের অসুখকে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। সেই অসুখে আক্রান্ত মানুষগুলির ছটফটানি, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দোলাচলতার অস্থিরতারকে চিত্রিত করেছেন লেখক। অযোধ্যার ঘটনার পর স্বর্ণদীপা আর চায়নি ফরহাদের সঙ্গে আকাশলীনার বিয়ে হোক। স্বর্ণদীপা মেয়েকে উপদেশ দিয়েছে— ‘তুমি প্রভাস, নির্মল, অঞ্জন, সত্যব্রত এরকম কাউকে বিয়ে করবে, কথা দাও।''^{১৬} যে স্বর্ণদীপা একদিন বিশ্বাস করত, ‘সবার ওপরে

মানুষ সত্য’। এই অস্থির সময়ে সেও মানুষের প্রতি হারিয়েছে বিশ্বাস। দাঙ্গাপীড়িত সময়ে মানুষের ধর্ম-পরিচয়ই মুখ্য হয়ে উঠেছে। পক্ষান্তরে, আকাশলীনার জীবনটা হয়ে উঠেছে টসের খেলা। তাকে হেড অথবা টেল যে কোনো একটা বেছে নিতে হবে। দাদিমার ধর্ম, বাবার ধর্ম, মায়ের ধর্ম, দিদিমার ধর্ম— ঈশ্বরের ধর্মের এত জাত এত ভেদাভেদ আকাশলীনার হৃদয়কে আন্দোলিত করে। শেষপর্যন্ত আকাশলীনা ফরহাদের কাছে ছুটে যায়। ফরহাদ আকাশলীনাকে গুনিয়েছিল ধর্মের আচার কত বড়ো ভগ্নামি এবং নারী হয়ে জন্মানো কত গৌরবের সেই কথা। নারীর মধ্যেই রয়েছে মানুষের সম্পূর্ণতা, নারীর কোনো জাত নেই। এসবই কল্পনা করেছেন লালন ফকির। বেদ ও ধর্মাচারে শূদ্র ও নারীর অধিকার নেই। বিয়ে হলে নারীর গোত্র ও ধর্ম বদল হয়। পুরুষের হয় না। নারীর মুসলমানি হয় না। পৈতে হয় না। উচ্চবর্ণে বিয়ে হলে নারী উচ্চবর্ণ লাভ করে। বস্তুত নারীর নিজস্ব কোনো জাত নেই। কারণ নারীর রজঃবীজের, ঋতুচন্দ্রিমায় জাত হয় না। লালন নিজেকে নারী হিসাবে কল্পনা করতেন।^{১১৭}

পৃথিবীতে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই নারীকে তার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করেনি। নারীরা আদিকাল থেকেই সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। ধর্মের প্রতিভূ পুরুষ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গড়ে নারীকে করেছে বাতিল, অপাঙ্ক্তেয়। সংসারের যৌনতার দাসত্ববৃত্তি করেও নারী রয়ে গেছে কোণঠাসা। সামাজিক যৌন শোষণের অংশীদার হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে নারী। আজও সমাজে রজঃশীলা নারীকে মন্দিরে ঢোকান প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না। পর্দা-বোরখার ঘেরাটোপে বন্দি হয়েই অন্তরমহলে কেটে যায় নারীর জীবন। সুফিতত্ত্বে বিশ্বাসী ফরহাদ সেই কথাই বুঝিয়েছে আকাশলীনাকে।

কোনো কেতাবি ধর্মই সত্য নয়। সব মানুষের লেখা। মানুষের মিথ্যা কল্পনা দিয়ে ধর্মের
বয়াত রচিত। সব অনুমান। নারীর উন্মুক্ত দেহই তার সামনে খোলা ধর্মগ্রন্থ। যে দেহে
জাতের চিহ্ন আছে যে দেহ অপবিত্র। নারীকে জাত দিলে তাকে অপবিত্র করা হয়।”^{১৮}

ফরহাদ ছিল সুফি সাধনায় বিশ্বাসী। সে আত্মোপলব্ধির মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে
খোঁজার কথা বলেছে। সুফিতত্ত্বের মূল কথাই তো ‘ফানাফিল্লাহ’- অর্থাৎ ঈশ্বরের (ফিল্লাহ)
সঙ্গে নিজেকে বিলীন (ফানা) করে দেওয়া। এই বিশ্বাস এই বোধ নিয়েই ফরহাদ জাতধর্ম
ও ধর্মাত্মতার প্রতিবাদ করেছিল বলে শরিয়তপন্থী মাস্কেটবাহিনী তাকে বলেছিল ‘কাফের’,
‘ফেরাউন’। মাস্কেটবাহিনী গান বোঝে না, বাউল বোঝে না। শুধু ধর্ম বোঝে, নামাজ
বোঝে, কোরান বোঝে। আর বোঝাবুঝির কারণেই ‘জাতিদাঙ্গায় রাজনীতির সড়ক তৈরি
হয়’। সেই সড়কে মুক্তবুদ্ধিবৃত্তির মানুষদের জায়গা নেই। সেই সড়কে যুক্তির স্থান নেই।
মুক্তবুদ্ধি সেখানে পদে পদে ঠোঁকর খায়, পা পিছলে পড়ে।

ঋষি ও খুকুর উপাখ্যান উপন্যাসে ঋষির আত্মপরিচয়ের সংকটকে লেখক
বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। আখ্যানের ঘটনাক্রম-এ ইতিহাসের সাল-
তারিখের উল্লেখ নেই। কথাকার স্বাধীনতা পরবর্তী অদ্যাবধি সময়ের সংকটকে বিধৃত
করেছেন এ উপন্যাসে। আখ্যানে ঋষির বাবা সুমন্ত চক্রবর্তী, মা জুবুদা পারভিন। ঋষি
চক্রবর্তী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়ান। ঋষির ঘরে আছে
রবীন্দ্রনাথের ছবি আর ছবির তলায় বড়ো করে লেখা রয়েছে:

কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রিস্টান এক ভাই মুসলমান এক ভাই বৈষ্ণব এক
পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে, এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে
বরঞ্চ সহজ — কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর।”^{১৯}

ধর্মের এই সহাবস্থান, এমন মিলনক্ষেত্র— এই ভারতবর্ষের স্বপ্নই দেখেছিল ঋষির
মা জুবুদা পারভিন। ঋষির প্রিয় উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের *গোরা*। ধর্মের জাত্যাভিমান নিয়ে

গোরাও একদিন বুঝেছিল, সে হিন্দু নয়, সে আইরিশ সন্তান। সেদিন গোরার সব ভুল ভেঙে গেছিল। এবং গোরা খুঁজে পেয়েছিল ‘ভারতবর্ষের দেবতা’কে। আনন্দময়ীর কাছে এসে গোরা বলেছিল— ‘মা তুমিই আমার ভারতবর্ষ।’ গোরা তিল তিল করে জীবনের যে ভিত্তি স্থাপন করেছিল, নিজের জন্মবৃত্তান্ত, নিজের আত্মপরিচয় জানার পরে সে ভিত্তিমূল ভেঙে তছনছ হয়ে গেছিল। দেশ-জাতি-নাম-গোত্র-দেবতা— সব এক লহমায় মুছে গেছিল। আলোচ্য উপন্যাসে ঋষিও আত্মপরিচয়ের সংকট নিয়ে ছটফট করেছে। মা মুসলিম, বাবা হিন্দু— ঋষি কী! এই উত্তর ঋষি খুঁজে পায় না। ঋষি চায় মানুষ হয়ে মানুষের মতো বাঁচতে। মা জুবেদা পারভিন ছেলের বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজে পান না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বলে, মা মুসলিম তাই সে পরিবারে মেয়ের বিয়ে দেবে না। মুসলিম পরিবারের দাবি, ছেলেকে কনভার্ট হতে হবে।

ধর্মে ধর্মে এই বিচ্ছিন্নতার দিনে ঋষি পাশে পেয়েছিল মামাতো বোন নাজমাকে। যার ডাক নাম খুকু। যে খুকু ধর্মীয় ভেদাভেদের বেড়া ভেঙে সহজে মিশে গিয়েছিল চক্রবর্তী পরিবারের সঙ্গে। মামার কন্যার সঙ্গে বিবাহ ইসলামি শাস্ত্রে বৈধ। তবু, হিন্দু বাবার সন্তান ঋষি পারেনি নাজমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে। ঋষির বাবা সুমন্ত চক্রবর্তী নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী। ঈশ্বর বা খোদায় বিশ্বাস করেন না। সমাজে নাস্তিকের বিশ্বাসের, আদর্শের কোনো মূল্য নেই। এদেশে নাস্তিকের ধর্ম নেই। কিন্তু সম্প্রদায় বা জাতি রয়েছে। নাস্তিক হিন্দু হোক বা মুসলিম হোক— তাকে ধর্মহীন করে কেউ দেখে না। জুবেদা পারভিনের কথাই উঠে এসেছে সেই প্রসঙ্গ:

নাস্তিক মুসলমান তো হয়ই। যদিও মুসলমান নাস্তিক হলে সমস্যা গুরুতর। নাস্তিক হয়েও হিন্দুর ক্ষমা আছে। মুসলমানের নেই। এই দেশে নাস্তিক জানলে মুসলমানের কবর পর্যন্ত দিতে চায় না সমাজ। অথচ সেই মুসলমানেরই বৃহৎ একাংশ পাকিস্তান তৈরি করবার সময় জিন্নার নেতৃত্বে পাকিস্তানি মুভমেন্ট করেছে, অথচ কায়দে-আজম-

জিন্মা ছিলেন নাস্তিক। অন্তত ধার্মিক ছিলেন না। পাকিস্তান ছিল মুসলিম লিগের পলিটিক্যাল অ্যাগেন্ডা। মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, ইসলাম ভিত্তিক দেশ, এই পরিকল্পনা কোরান-সম্মত নয়। কারণ ইসলামের জন্য আলাদা করে দেশ হলে যে দেশে মুসলমান সংখ্যালঘু বা দুর্বল, সেখানে কী হবে? সেখানেও তো ইসলাম তার জায়গা চাইবে, বলবে না যে, ওই দেশ আমার নয়। ইসলাম তো জন্মেছেই অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে। বস্তুত ইসলামের জন্য আলাদা করে দেশ বা দার-উল-ইসলাম—রাজনীতির ভাষা, এটা কোরান বা ধর্মের ভাষা নয় দেখো বাবা।...কিন্তু মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, সম্প্রদায় আর ধর্ম, জাতি আর ধর্ম এক কথা নয়। পাকিস্তানে ইসলাম আছে, ভারতে নেই এ কথা আমি মানি না।^{১২০}

সাম্প্রতিক সময়ের কেন্দ্রীয় রাজনীতি এবং ধর্মের তর্ক-বিতর্কের কথা উঠে এসেছে শিক্ষিকা জুবেদা পারভিনের কথায়। মুসলমান সমাজের গোঁড়ামি-কুসংস্কারের শিকড়কে বোঝাতে চেয়েছেন জুবেদা পারভিন। ছেলেকে বলেছেন জুবেদা পারভিন— ‘দেখো, আমি ধর্ম মানি। সম্প্রদায় মানি না। কোরানে কোথাও সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়নি। সব কথা মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। একজন হিন্দু কী খ্রিস্টান কী বৌদ্ধ কোরান পড়তে পারে। তুমিও পারো ঋষি।’^{১২১}

আজকের সময়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ, সেই বিভেদের কারণেই মানুষ মানুষের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন। ঋষি নিজেও আত্মপরিচয়ের সংকটে বিধ্বস্ত। মা-বাবার বিশ্বাসের মাঝে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি। মানুষের ধর্ম আর ধর্মের মানুষদের দ্বন্দ্বের সুরাহা করতে পারেননি অধ্যাপক ঋষি চক্রবর্তী। ঋষির মা জুবেদা পারভিন হিন্দু পুত্রের জননী হয়েও মুসলিম। মা জুবেদা পারভিন মুসলিম হয়েও ইসলাম ধর্মের শরিয়তি আইনকানূনের নিন্দায় মুখর হয়েছেন। হিন্দু বাবা ও মুসলিম মায়ের সন্তান ঋষি বিশ্বাস করেন— যেখানে এসে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রিস্টান, সেখানেই ভারতবর্ষকে খুঁজতে হবে।^{১২২}

আজ একুশ শতকের সমাজেও ধর্মীয় দলাদলি ও সম্প্রদায়ের লড়াই অব্যাহত। ইদানীং কালে বারংবার যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তার চর্চা স্তব্ধ করে দিচ্ছে বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠন। আবুল বাশার মূলত এক অসুস্থ সময় ও সময়ের অসুখের ওপর আলো ফেলতে চেয়েছেন, সেই কঠিন সময়ের মানুষগুলির মধ্যে মুক্তবুদ্ধি এবং জড়বুদ্ধির দ্বন্দ্বকে বোঝানোই লেখকের অভিপ্রায়। ধর্ম দিয়ে, সম্প্রদায় দিয়ে যুক্তিবাদী মানুষগুলিকে ক্রমশ কোণঠাসা করে দেয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের দল। অথচ এই সংস্কারাগ্রস্ত মানুষগুলি সময়ের অসুখের উপশম করতে জানে না। মানুষের সৃষ্ট ধর্মই তারা মেনে চলে নির্দিধায়। তারা ধর্মের মানুষ হয়েই শান্তি পায়। নিজের ‘আমি’কে অশ্বেষণ করে তার সাধনা করতে জানে না। যা কিছু যুক্তিহীন, প্রথা-সর্বস্ব কল্পনা— এগুলিই ধর্মের মানুষদের বাঁচার আয়ুধ। এই মানুষেরা গান বোঝে না। গানের সমস্ত তো হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে। যুক্তির প্রতি যুক্তি দিতে অক্ষম এই মানুষেরা শেখর আনসারী বাউলকে পিটিয়ে হত্যা করে। ইমাম আহসান বলেছিলেন— পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো অযুক্তির নাম ধর্ম, পদে পদে আমাদের সে কথা বুঝিয়ে চলেছে।^{১২৩} প্রতিটি ধর্মের মূল্যবোধ এক হলেও শাস্ত্রের অনুশাসন ভেদে ধর্মে ধর্মে ঘোর বিরোধ। আর এখানেই মূল সমস্যা। ‘সবার ওপরে মানুষ সত্য’— এই বোধই হয়তো পারে মানুষকে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দিতে। ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহৎ মানবসমাজের কল্পনাও মানুষকে স্বস্তি দিতে পারে। কেননা কবির ভাষায়— ‘মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো’। ‘মান’ ও ‘হুঁশ’ সহযোগে আত্মাকে জীবনদেবতার সঙ্গে একত্রীভূত করে দেওয়া। জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।^{১২৪}— একথাই প্রকারান্তরে বলেছেন আধুনিক কথাকার আবুল বাশার।

সঙ্গীদা বাঈ (১৯৮৯) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ইতিহাসের মূলস্রোত থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন এবং ইতিহাসের উত্তরাধিকার হিসাবে দাবিদার— এমন মানুষদের জীবনের দ্বন্দ্বিকতা, ঐতিহ্যের প্রতি পিছুটান ও সমকালীন সময়ের সঙ্গে সংঘাত, আরবীয় যৌন প্রথা ও আরবের সংস্কৃতিমনস্ক নবাবদের উত্তরাধিকারীদের জীবনের বিচিত্র দিকগুলি তুলে ধরেছেন। আখ্যানে কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নেই, কিন্তু ইতিহাসের উত্তরাধিকার হিসাবে ক্ষয়িষ্ণু নবাবতন্ত্রের যন্ত্রণা আততি এবং আত্মপরিচিতির সংকট উপন্যাসে দারুণভাবে উঠে এসেছে।

কথাকার আবুল বাশার তাঁর ইতিহাস আশ্রিত আখ্যানগুলিতে যেমন সাতের দশকের পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্রকে বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে তুলে এনেছেন, তেমনি নয়ের দশকের ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনমন লেখকের মানবতাবাদী দৃষ্টিতে রূপায়িত হয়েছে। জন্মসূত্রে মুর্শিদাবাদের নবাবদের অঞ্চলেই লেখকের বেড়ে ওঠা— নবাবদের ধুলি ধূসরিত ঐতিহাসিক পথের ফুটপ্রিন্ট ঔপন্যাসিক নিরাসক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস মূলত কোনো সুদূর অতীতের দিকে যাত্রা নয়— এ ইতিহাস লেখকের ‘টাইটকা স্মৃতি’, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বয়ান।

২. খ. ছোটোগল্পে ইতিহাস প্রসঙ্গ:

আবুল বাশার তাঁর ছোটোগল্পেও ইতিহাসের উপাদানকে ব্যবহার করেছেন। গল্পকার ব্যক্তিজীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ছয় ও সাতের দশকের বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতাকে, পাশাপাশি ইসলামি ইতিহাসের ‘কারবালা’ নামক যুদ্ধের মহাকাব্যিক গল্পকথা তিনি পেয়েছিলেন পারিবারিক পরিমণ্ডলে। আধুনিক কথাকার আবুল বাশার তাঁর ‘সিয়ার’, ‘কাসীদ’ ও ‘পথ’ এই তিনটি ছোটোগল্পে অতীতের কারবালার ঐতিহাসিক পরিবেশ ও পরিসরকে ব্যবহার করেছেন গল্পের সূত্র হিসাবে। গল্পগুলি পড়লেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কারবালার ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লেখকের অভিপ্রায় নয়, ইতিহাসের ঘটনা পুরাণের কাহিনির সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে কীভাবে অন্ধ-ধার্মিকদের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে তখন তারা কী পরিমাণ পাপবুদ্ধির অধিকারী হয়ে ওঠে— এ গল্প তিনটি সেই ঐতিহাসিক যন্ত্রণা-আততির করুণ দৃশ্যরূপ।

ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করেও মানুষের সনাতন ধর্ম-প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা-বামপন্থী চেতনা— এই তিনের দ্বন্দ্ব আবুল বাশারের গল্পের পর গল্পে ফিরে এসেছে। তাঁর গল্পের চরিত্ররা কেউই তাদের সামাজিক ও পারিবারিক সংকটকে পশ্চিম যুক্তিবাদ দিয়ে সমাধান করতে চায়নি, উদারবাদী বামপন্থী মানুষও শেষ পর্যন্ত বামপন্থা থেকে সরে এসে ধর্মীয় বা শাস্ত্রের মধ্যে থেকেই সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে। আলোচ্য গল্প তিনটিতে দেড় হাজার বছর পূর্বের প্রাচীন পৃথিবীর ঐতিহাসিক পরিবেশকে সামনে রেখে গল্পকারের কল্পিত চরিত্রদের বিশ্বাস, সংস্কার, আধুনিকপন্থা ও শরীয়তীপন্থার বিরোধ ও দ্বন্দ্ব, মুসলিম নারীর জীবনের অসহায়তার দিকগুলি প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে।

কারবালার যুদ্ধ ইসলামিক পঞ্জিকা অনুসারে মহরম মাসের দশ তারিখ ৬১-হিজরিতে (ইংরেজি ১০-অক্টোবর, ৬৮০-খ্রিস্টাব্দ) বর্তমান ইরাকের কারবালা নামক প্রান্তরে সংগঠিত হয়েছিল। হজরত মুহম্মদের নাতি হোসেন এবং তার অল্প কিছু সমর্থক-আত্মীয়, উমাইয়া খলিফা প্রথম ইয়াজিদের বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে হোসেনসহ তার সকল সমর্থক নিহত হয় এবং নারী ও শিশুরা বন্দি হয়। ইতিহাসের ঘটনা মাত্রই সর্বজনীনতার দাবি করে। কারবালা এক অর্থে যেহেতু ধর্মযুদ্ধ (জেহাদ) — বস্তুত এই ঘটনা সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মিথের আকার নিয়েছে। ইতিহাস পুনঃপ্রোথিত হতে হতে মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস সত্যের আকার ধারণ করে। আজও প্রতি বছর মহরম মাসের ১০-তারিখ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ ‘মহরম’ উৎসব পালন করে।

শিয়াপন্থী মুসলিমরা প্রতি বছর মহরমের প্রথম দশ দিন ‘অনুতাপের দিন’ হিসাবে পালন করার রীতি চালু করেছে। এছাড়া তার বীরোচিত সংগ্রাম ও যুদ্ধক্ষেত্রে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গভীর আবেগময় পুনরাবিনয় করা হয়। প্রতি বছর এই পুনরাবিনয় দুটি ভাগে দেখানো হয়। যুদ্ধের স্মরণে একটি অংশ দেখানো হয়, তার নাম ‘আশুরা’ (দশম দিবস)। মহরমের দশ দিন থেকে আরও চল্লিশ দিন পরে কারবালা প্রান্তরে দেখানো হয় আর একটি অংশ তার নাম ‘মস্তকের প্রত্যাবর্তন’ (মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলা হয় ‘চাল্লিশা’)। হযরত আলীর পুত্র হোসেনের এই রক্তদান আলাদা মতবাদ গড়ার ব্যাপারে শিয়া সম্প্রদায়কে অনেক বেশি প্রেরণা দিয়েছিল। মহরমের দশম দিনে শিয়া মতবাদের জন্ম হয়েছিল।^{১২৫}

ঐতিহাসিকভাবে দেখলে সিমার ছিল এজিদের সেনাপতি। কারবালার মরুপ্রান্তরে যখন হোসেন ও তার দুগ্ধপোষ্য শিশু জলের জন্য কাতরাচ্ছে, হোসেনের কণ্ঠনালি শুকিয়ে গেছে। তখন এজিদ জলের বদলে অস্ত্র হাতে সিমারকে পাঠিয়ে ছিল। কারবালার যুদ্ধে সিমার হোসেনকে হত্যা করেছিল। বড়ো নির্দয় ও নৃশংসভাবে হোসেনের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিল সিমার। সিমারের বুকে কোনো লোম ছিল না। এই ঘটনায় সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মিথের আকার নিয়েছে। ইসলামি ধর্মাবলম্বী বহু মানুষের বিশ্বাস, যে পুরুষের বুকে লোম নেই, সে নির্দয়, নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়। এই যুক্তিহীন প্রথা ও সংস্কার নিয়েই আবুল বাশারের ‘সিমার’ গল্প। এ গল্পের নায়ক সুখবাসের বুকো লোম নেই। ‘লোহা দিয়ে ঢালাই করা তবীয়ত। ইস্পাতে ঘাস গজায় না। সুখবাসের বুকো লোম গজানোর নরম ভেজা শ্যামলী মৃত্তিকা খোদা দেয়নি। সুখবাসের বুকখানাই বুঝি বা এক উষর কারবালা। হেথায় সিমার এক আশ্চর্য অধিপতি।’— মিথের মানুষ, ইতিহাসের মানুষ, যুদ্ধ, হত্যা, নিষ্ঠুর কিংবদন্তি সমস্ত কিছুই ভর করে সুখবাসের মন ও মননে। চারপাশের মানুষজন সুখবাসকে সিমার বলে সম্বোধন করলে সুখবাসের অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। অস্তিত্বের অস্থিরতা, টানাপোড়েন, ছটফটানি নিয়ে এই দ্বন্দ্বিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে না সুখবাস। ‘আইডেন্টিটি ক্রাইসিস’ তার অন্তর্গৃহে তোলপাড় করে। সে আত্ম-পরিচিতির বিদেহী সত্তা নিয়ে জীবনের তালগোল হারিয়ে ফেলে এবং ডুকরে কেঁদে ওঠে প্রতিবার।

কারবালার যুদ্ধ এবং তার চরিত্রের ঐতিহাসিক হলেও এতে জড়িয়ে আছে ধর্মীয় পুরাণের অনুষঙ্গ— স্বয়ং হজরত মুহম্মদ তাঁর ধর্ম রক্ষার তাগিদে একাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ধর্মীয় ব্যাখ্যা অনুসারে, মূলত ইসলাম প্রচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য। কিন্তু কারবালার যুদ্ধের পটভূমি অবলোকন করলে

দেখা যায়, এ যুদ্ধের আগেই ইসলাম বহু জায়গায় সবলে এবং অনায়াসে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কারবালার যুদ্ধ মূলত ‘গভীর ষড়যন্ত্রমূলক’ জীবনের রক্তাক্ত ইতিহাস। পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের বহুবিবাহ, তালাক ও পুনর্বিবাহ— মুহম্মদের সময় থেকেই বলবৎ রয়েছে। কারবালার যুদ্ধের শুরুতেও রয়েছে নারীকে নিয়ে জবরদখলের লড়াই। আবদুল জব্বারের স্ত্রী জয়নবকে নিয়ে শুরু হয়েছিল এজিদ এবং হাসানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অর্থের লোভ দেখিয়ে কৌশলে আবদুল জব্বারের সঙ্গে জয়নবের তালাক করিয়ে দেয় এজিদ। অথচ জয়নব পয়গম্বর হজরত মুহম্মদের নাতি হাসানকেই পুনরায় বিবাহ করতে মনস্থির করে। নারী-যৌনতা-নারীর হস্তান্তর- মুসলিম নারীর সামাজিক যৌন শোষণ— এতে নারী কেবলই ভোগ্যপণ্য। এ গল্পে মুসলিম নারীর সামাজিক যৌন শোষণের এই দিকটিই স্পষ্ট করে দিয়েছেন গল্পকার। পাশাপাশি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ মৌলবী সাহবের উপদেশবলী জাহেদার জীবনকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর অন্ধকারে। বিয়ের রাতে সুখবাস জাহেদাকে ধর্ষণ করে এবং জাহেদা মারা যায়। ইসলামি পুরাণে নারীর শরীরকে খেতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেখানে নারীকে তার স্বামী ইচ্ছেমতো গমন করতে পারে।^{১২৬} অর্থাৎ নারী সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। ভারতীয় পুরাণেও বলা হয়েছে, ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা’— অর্থাৎ পুত্র উৎপাদনের জন্যেই ভার্যা গ্রহণ করা হত। মহাভারত থেকে মনুসংহিতা পর্যন্ত সর্বত্র পুরুষ পরিণত হয়েছে দেবতায়, কিন্তু নারী সেখানে মিথ্যা পদার্থ। কেননা বিবাহের পরেই নারীর কোনো স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য ছিল না। নারী হয়ে যেত স্বাতন্ত্র্যহীন। নারীর দেহ ও মন সবই হবে পুরুষের অধিকৃত। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম খ্রিস্টাব্দ থেকে দেড় হাজার বছর পর্যন্ত যে সব শাস্ত্র রচিত হয়েছিল, তাতে নারীকে নিজের দেহের বা সম্পত্তির ওপর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বারবার বলা হয়েছে, শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্ররা নারীরা রক্ষাকর্তা, নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়; ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহর্তি।^{১২৭} কিন্তু

বর্তমানের আলোকবর্তিকার যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের প্রভাবে ভারতীয় হিন্দু সমাজের নারী-পুরুষদের চিন্তাধারা, প্রত্যাশা ও মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটলেও মুসলিম সমাজের নারীদের জীবন আজও শাস্ত্রের নিয়মাধীন। তাদের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাধীন জগৎ উন্মুক্ত হয়ে গেলেও গ্রামবাংলার মুসলিম সমাজে মোল্লাতন্ত্রের ফতোয়াই শেষ কথা বলে। ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিশ্বাসের বৃত্তের বাইরে এসে নারী-পুরুষ কেউই যুক্তির আলোকে জগৎ ও জীবনকে দেখতে পারে না। বস্তুত অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, তালাকপ্রথা অন্ধকার যুগের (আইহামে জাহেলিয়া) মতোই সেখানে প্রকট। গল্পকার সেই তমসাস্ফন্ন নারী-পুরুষের অসহায় জীবনের ওপরই আলোকপাত করেছেন।

জাহেদার মৃত্যুর পর সুখবাসের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়। সে নিজেকে আরও বেশি করে সিমার ভাবতে শুরু করে। অথচ অচিরেই সেই ঘায়ে প্রলেপ দেন স্বয়ং মৌলবী গিয়াসুদ্দিন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পরাকাষ্ঠা গিয়াস মৌলবী সুখবাসকে খোদার কাছে মাফ চাও ইত্যাদি উপদেশ দিয়েছিলেন। সুখবাসও ক্রমশ অনুভব করেছে ‘জাহেদা এক তুচ্ছ জীব। অমন মৃত্যু কখনো ঘটে না এমন নয়’। এই ঘটনার সাত মাস পর সুখবাসের দ্বিতীয় বিয়ে হয়। দ্বিতীয় বউ ‘মদিনা ছিল জাঁহাবাজ মেয়ে। তাগড়া। তাজা। পুরুষ্টু আর ভয়ানক যুবতী’। সুখবাসের খালি গা, ফাঁকা বুক দেখে চমকে উঠেছিল মদিনা। সুখবাসের বুক হাত রেখে মদিনা বলেছিল:

লোকে বলে তুমি সিমার। আমার বেহাল কোরো না। মেরো না। পাষাণের তলায় পানি থাকে। আমি জানি। আমি ভালোবাসব তোমাকে। ঘেন্না করব না। সিমারও তো মুসলমান।... তুমি আমাকে ভালোবাসবে তো?^{১২৮}

মদিনা সুখবাসের বুক আঙুলের তুলিতে লিখে দিয়েছিল আলিফ লাম মিম। কোরান শরীফের প্রথম বাক্য ‘আলিফ লাম মিম’। অথচ মদিনার কথা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে যায়

সুখবাসের। সিমারও যে মুসলমান একথা প্রথম শুনল সে। শুনল পাষাণের তলায় পানি থাকে। এক নারীর কণ্ঠে ভালোবাসার কথা শুনে সুখবাসের অন্তর্গহ তোলপাড় করে। সিমারের সত্তার গভীরে হারিয়ে যাওয়া তার সুখবাস সত্তা জেগে ওঠে। তার মনে অপরাধবোধ জাগ্রত হয়:

আমি সিমার ঠিক কথা মদিনা। লোকের বচন আমাকে সিমারই করেছে। আমি জাহেদার মুখে কাপড় ঠেসে দিনু, কী একটা যে ভর করল গায়ে। একিন হয় তুমার? লরম পাখির পারা মেয়েলোকের পরাণ আমি ঠুকরে খেয়েছি, হয় গো! একিন হয় মদিনা? কাপড় ঠেসে দিনু।^{১২৯}

চারপাশের মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কার সুখবাসের ভেতরের অন্তর্দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র করে দেয়। সে আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগতে ভুগতে ‘আপন বুক সজোরে কিল মারতে থাকে। বুকের ভেতর কে যেন হয় হুসেন হয় হুসেন করছে। সান্ত্বনাহীন আত্নানাদ করছে।’ সুখবাসের সারা শরীরে, মন ও মননে, চিন্তা-চেতনায় সিমার আর কারবালার মরুপ্রান্তর জেগে ওঠে। সুখবাসের সমস্ত চৈতন্যকে গ্রাস করে নিষ্ঠুর সিমার। সুখবাস বারবার তার ভেতরে জেগে ওঠা সিমার সত্তাকে মুছে সুখবাস হয়েই বাঁচতে চেয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ মানুষের ঠাট্টা, মস্করার ছোবল সুখবাসের হৃদয়ে পুনরায় সিমার সত্তাই জেগে উঠেছে। অন্যদিকে মদিনার বাবা গফুর জোলা অসহনীয় দারিদ্রকে সঙ্গী করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে পরম সন্তোষ আর শান্তি পেয়েছিল। ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ গফুর জোলা একদিন খেয়ালবশে স্ত্রীকে নিয়ে ওপার বাংলায় চলে যায়, আর ফিরে আসেনি। তিনকূলে কেউ ছিল না মদিনার। মদিনা সুখবাসকে বলেছিল, ‘ইহজন্মে আমার আর কেউ নেই গো, তুমি ছাড়া। তুমি ফেলে দিলে কোথাও যাওয়ার ঠাই নাই। আমায় ফেলে দিও না। তুমি যখন যা চাও, যত কষ্টই হোক, আমি দেব’। একথা শুনে সুখবাসের মগ্নস্মৃতিতে মদিনা জাহেদার কল্পরূপে মিশে যায়। কিছুতেই জাহেদার মুখ মনে করতে পারে না সুখবাস। সংসারের

‘তুচ্ছ জীব’ জাহেদা মৃত্যুর পর ঘরে বাইরে মুছে গিয়েছে। এক সময় সুখবাস বুঝতে পারে তার অন্তরালে, আড়ালে আবডালে দাদিমা এবং মদিনা ‘তাকে সিমারই মনে করে। সিমার বলে ডাকে। তাকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করে। গল্প করে। মনে হতো, ভালোবাসে। আসলে ঘৃণা করে। ছোটলোক ভাবে। সহ্য হয় না সুখবাসের। বুকের মধ্যে সত্যিই সেই সিমার, নির্বোধ সিমার জেগে ওঠে।’ আর এরপরেই ক্ষণিকের উন্মাদনায় হঠকারিতার বশে সুখবাস স্ত্রী মদিনাকে ‘তালাক’ দেয়। মিথের চরিত্র ভর করে সুখবাসের চৈতন্যে, সে ক্রমশ তলিয়ে যায় সিমার নামের তলদেশে। মানুষের সংস্কার, বিশ্বাস তার ভেতরের মায়া, প্রেম, স্নেহের সত্তা লুপ্ত করে দেয়। জেগে থাকে শুধু নিষ্ঠুর নির্দয় সিমার। শাস্ত্র বলশালী, আর তার কাছে ধর্মাত্মক মানুষ বড়োই অসহায়। সুখবাসের মুখে ‘তালাক’ উচ্চারণের অব্যবহিত পরেই মদিনা পরনারীতে পরিণত হয়েছে। এখন ‘মদিনার চোখে চোখ পড়লে পাপ হবে। মদিনার কোথাও যাওয়ার ঠাই নাই। মদিনা থাকবে বাড়িতে, সুখবাসের ঘরে। সুখবাস থাকবে জঙ্গলে, অন্যের ঠেকে বা কোথাও। মদিনা আর সুখবাস সামনা সামনি হওয়া ধর্ম বিরুদ্ধ। তালাকের সাথে সাথেই মদিনার উচিত ছিল বাপের বাড়ি যাওয়া। মদিনা কোথায় যাবে? বাপ কোথায়! মদিনা সুখবাসের ঘরেই আছে’। এদিকে সুখবাস তার হতবুদ্ধির পীড়নে শাস্ত্রজ্ঞান ভুলে যায়, সে পুনরায় মদিনার সঙ্গে সংসার করতে চায়। সুখবাসের বাবা ছেলের কষ্টে সমব্যথী হয়ে ছেলেকে ঘরে ফিরে আনতে চেয়েছে:

ছেলে জঙ্গল থেকে ফিরে এসে ঘরে থাক। মদিনার দায়িত্ব খোদার। যেথা খুশি সে চলে যাক। ভিখিরি হয়ে যাক। বেশ্যা হয়ে যাক। মদিনাকে বাড়ির কেউই আর তেমন আর সহ্য করতে পারে না।^{১০০}

সুখবাস ও মদিনার বিচ্ছেদের পর সুখবাসের বাবা নিজের সন্তানের জন্যে উদ্বিগ্ন হলেও মদিনার প্রতি তার কোনোরকম দয়ার উদ্রেক হয়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চেহারাটা

কাচের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে এখানে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হলেও একদিন গভীর রাতে মদিনা সুখবাসের মাচায় এসে ওঠে। দেহদান করে। কেউ কোনো কথা বলে না। দেহদানের মধ্যেই তো থাকে মানুষের আর এক ধর্মশক্তি। যা কেতাবি ধর্মের চেয়ে গূঢ়। এ কথা মদিনা জীবন ও জৈব প্রাণে অনুভব করে। সে রাত্রির অন্ধকারে পর্দা-হাদিস-কোরান-ঈমান সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে অদ্ভুতভাবে নিঃশব্দে পাগলের মতো হেসে ওঠে। মদিনার কোনো গত্যান্তর ছিল না। তার প্রবৃত্তির কাছে সমাজ ও শাস্ত্রের অনুশাসন মূল্যহীন হয়ে যায়। ‘কোনো বিচার থাকে না। সমাজ থাকে না। সে ভাবে, সে তো সিমারের ছেড়ে দেওয়া বউ। বড়ো জোর দোষখের জ্বালানি বই নয়’। এইভাবে তিন মাস কেটে যায়। গিয়াস মৌলবী তার ভাইপো ঈশার সঙ্গে মদিনার বিয়ে দিয়ে মদিনাকে ‘হালাল’ করিয়ে সুখবাসের কাছে ফিরিয়ে দিতে চান। ইসলামি শাস্ত্রে ‘তালাক’ দেওয়ার পর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে চাইলে অন্য পুরুষের সঙ্গে সেই নারীর বিবাহ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।^{১৩১} নচেৎ সেই স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সহবাস ইসলামি শাস্ত্রে অবৈধ, হারাম। গিয়াস মৌলবীর দৌলতে ঈশার সঙ্গে মদিনার বিবাহ হয়। পুরুষের হাতে নারীর হস্তান্তর হয়। মদিনার ইচ্ছা-অনিচ্ছা মূল্য হেরে যায় শাস্ত্রের অমানবিক যুক্তির কাছে। আর যৌন লাঞ্ছনার ভাগীদার হয় পুরুষ। বিয়ের পর ঈশা মদিনাকে তালাক দিতে অসম্মত হয়। মৌলবী গিয়াসজী পড়েন দো-টানায়। সাইফুল্লা তার দলবল নিয়ে গিয়াসজী ও নবদম্পতিকে গাড়িতে তুলে দেয়। শুরু হয় নতুন স্বামী ঈশা ও মৌলবী গিয়াসজীকে নিয়ে মদিনার ‘অলৌকিক অপার্থিব মোহগন্ধহীন সুখকর দেশান্তর। এক অদ্ভুত অভিযাত্রা’। এই অভিযাত্রার পথেই গিয়াসজীর নির্দেশে ঈশা মদিনাকে দু’বার তালাক দেবার পরেই হাজির হয় সুখবাস। সিমার ও সুখবাস— এই দ্বৈত সত্তা খুইয়ে সুখবাস তখন পাগল, উন্মাদ। গিয়াসজী বারবার তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেই সুখবাস উত্তর দিয়েছে, ‘আই

ডোন্ট নো’। সমস্ত সত্তা ও চৈতন্য হারিয়ে সুখবাস ট্রাজিক নায়ক হয়েই বেঁচে রইল। অন্যদিকে মদিনা সুখবাসকে ভালোবাসলেও নতুন স্বামী ঈশার জীবনের সঙ্গেই নিজের জীবনকে গেঁথে শোকের চলমান পথে যাত্রা করল। মদিনার এই করুণ পরিণতি মানবী থেকে তাকে রপান্তর করেছে জড়পদার্থে। দৈহিক কামনার দস্তুর এই অযৌক্তিক রীতি রেওয়াজের কবলে পড়ে নারীর জীবনে কী শোচনীয় অন্ধকার নেমে আসে তা পরিস্ফুট করেছেন গল্পকার। সুখবাসের মুখে ‘তালাক’ উচ্চারণ শোনার পরেই মদিনা বলেছিল, ‘তালাক আসলে পুরুষের হাদীসী অসুখ। হিস্টিরিয়া। দাঁত-খিচুনি বদ-হওয়ার দোষ।’— একজন গ্রাম্য মহিলার এমন শব্দচয়নের দক্ষতা আমাদের অবাক করে। গল্পকার জানিয়েছিলেন, মদিনা লেখাপড়া শিখেছিল স্কুলে। মদিনার স্পর্ধিত ‘হিস্টিরিয়া’ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে নারীর প্রতিবাদী স্বর। এরপরেও অবৈজ্ঞানিক প্রথা ও যুক্তিহীন মিথের বলি হয়ে নারী-পুরুষ উভয়েরই জীবন এসে ঠেকেছে অন্ধকারের তলানিতে। সেখানে থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পায়নি কেউই।

ইতিহাস যখন ধর্মীয় বিশ্বাসের বৃত্তে বড়ো হতে হতে মিথের আকার নেয় এবং সেই মিথনির্ভর সংস্কৃতি ধর্মভীরু জনমানসের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তৈরি হয় বিড়ম্বনা। মানুষ লজিক বা যুক্তির তোয়াক্কা না করে অন্ধবিশ্বাস ও গডডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে বিজ্ঞান ও ইতিহাসকে অস্বীকার করে ক্রমশ তলিয়ে যায় অসত্যের অন্ধকারে। সেই কঠিন সত্যকেই এই গল্পে প্রতিষ্ঠিত করেছেন গল্পকার।

‘কাসীদ’ গল্পে আছে কারবালা, মহরম ও শিয়া-সুন্নির দ্বৈরথ-এর প্রসঙ্গ। কারবালা ইতিহাস হলেও, কারবালার ইতিহাসের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি কিংবদন্তি-মিথ রূপে মুসলিম সমাজের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে। কাসীদ শব্দের অর্থ হল— বার্তাবাহক বা পিয়ন।

গঙ্গা ওরফে ভাগীরথীর দু'পারে এক অদ্ভুত শিয়া-সুন্নির বিভেদ-মিলনের পারাপার। ওপার থেকে পালিয়ে আসে খুনের আসামি কাশেম। কাশেম ফেরারি। এ পারের নৈনিহাল কাশেমের বন্ধু। নৈনিহাল শিয়া এবং কাশেম কোরেশী। কাশেমের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় সকিনার। এই গল্পে শিয়া-সুন্নির সেই বিভেদ-সংঘর্ষের ছবি আছে। গল্পকার অতীত ইতিহাস ও পুরাণকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে নির্মাণ করেছেন। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, হাসানের পুত্র কাশেম ও হোসেনের কন্যা সখিনার বিবাহ হয় এবং বিয়ের দিনই কারবালার যুদ্ধে কাশেম শহীদ হয়। এই গল্পেও অতীতের সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ইতিহাসের জীবন উঠে এসেছে বাস্তবের ভিটায়।

এ গল্পের কাশেম নিজের জ্ঞাতি ভাইকে খুন করে পালিয়ে আসে এপার বাংলায়। তার শরীরে-মনে ছিল খুন করার নেশা। 'নিজেকে খুন করার, রক্ত ঝরানোর নেশা'। আর এই নেশার ঘোরেই কাশেম হজরতকে পায়, ফতিমাকে পায়, এজিদকে দেখতে পায়। এখন কাশেম লহর নিশানায় দেখতে পাচ্ছে সকিনাকে। কাশেমের মুখে খুনের ঘটনা শুনে ভয় পায় সকিনা। সকিনার মনে পড়ে অতীত ইতিহাসের সেই বিষাদ গাঁথা। 'কারবালার যুদ্ধের গোড়ায় তো সেই নারী। জ্ঞাতি দ্বন্দ্বের নামই তো জিহাদ'— সেই কথা স্মরণ করে ব্যথিত হয় সকিনা। এজিদের পিতা মোয়াবিয়া ছিলেন হজরত মহম্মদের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। হাসানের স্ত্রী জয়নবের রূপজমোহে মুগ্ধ হয়ে এজিদ কৌশলে হাসানের দ্বিতীয় স্ত্রী জাহেদাকে দিয়ে বিষপান করিয়ে হাসানকে হত্যা করে। এরপরেই হাসানের ভাই হোসেনের দলের সঙ্গে এজিদের যুদ্ধ বাঁধে কারবালার প্রান্তরে। এক সপ্তাহ আগে মহরম ছিল। সেখানে লাঠি খেলেছিল কাশেম কোরেশী। তা দেখে কাশেমের বন্ধু নৈনিহাল কাশেমকে বলেছিল:

শিয়ারা লাঠি খেলে না। মাতম করে। মর্সিয়া গায়। কালো পোশাক পরে। মহরম মাসে খালি পায়ে হাঁটে। এই মাসে বিয়ে শাদী করে না। তুই কি সুন্নীর বাচ্চা রে কাশিম? সন্দ হয়, তুই কোরেশী না। তুই ভড়ের বাঙাল। নশীপুরের ছেলে বলেছিলি, এখন দেখছি সেইডে বুঠবাত। তুই রাঙা জামা পিন্দিছিস, পাট্টা পাজামা, পায়ে সস্তা নাগরা, গলায় বেঁধেছিস রঙিলা রুমাল, আহা! পারিস তো গা কেটে দেখা, তুই শিয়ার ঝাড়। মাতম দে উন্নত। মাতম দে। শালা শোগে মরে না ভোগে মরে, বাধেগৎ সুন্নীর পোনা! মহরম মাসে শাদীর আলমতলায় গাঁট বাঁধবি শালা। আমি ঘোড়া নাচব বলেছিলাম, দুলাদুলির নাচ, তোর শাদীর বাসরে, ছেঃ! আমি থুথু মারি তোর ইয়েতে! শালা ছলিয়াবাজ এজিদ। লাগা লাগা, লাঠি খেলে যা, কী করবি দোস্তু! দুঃখু হয়!^{১৩২}

এই লাঠি খেলাও যেন ইতিহাসের কারবালার মতোই নারীঘটিত। সকিনার কাছে হিরো সাজার বাসনা। সকিনাও কাশেমের বানা পাটায় বিজলিঘাত দেখে বুক ফুলিয়ে মঞ্জিল মাটি দিচ্ছে। কারবালার যুদ্ধ থেকেই মঞ্জিল মাটির উৎসবের সূচনা হয়েছে। মহরমের দিন শিয়ারা নকল কবর দেওয়ার অভিনয় করে, কারবালার যুদ্ধের শেষে যেমনভাবে শহীদদের কবরস্থ করা হত। একে গোর-পর্ব বলা হয়। প্রতীকী শোলা-কাগজের টুকরো গুলো কবরে পুঁতে দেয় শিয়ারা। এই কবর অনুষ্ঠানকেই বলে মঞ্জিল মাটি।^{১৩৩} কাশেম সকিনার মঞ্জিল মাটি দেওয়া দেখে বীরোচিত উল্লাস ও শোকের বিকারে ছোরা লাঠি খেলতে খেলতে নিজেকে রক্তাক্ত করে ক্রমশ। শেষে অসাবধানে এমনভাবে সে ছোরা মেরেছিল বুক, তা আর বের করতে পারেনি। এমতাবস্থায় আহত তৃষ্ণার্ত কাশেম জল চেয়েছিল বন্ধু নৈনিহালের কাছে। নৈনিহাল জল দেয়নি। কারবালার যুদ্ধে জলের অভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল হোসেনের সন্তান ও তার সমর্থকদের। এ গল্পে কাশেম পৌঁছে যায় প্রেমের কারবালায়:

এ-কেমন কাফেরার দেশ গো। জহর মিলে পানি মিলে না।

সুন্নীদের জারিকণ্ঠ পেছনে শোনা যায় ভাসছে। কাশেমের তেষ্ঠা পায়। ধীরে ধীরে জুলুস ভাগীরথীর মঞ্জিল মাটির গোরস্থানের দিকে এগিয়ে যায়। তেষ্ঠায় বুকের ছাতি ফেটে যায় কাশেমের। দোস্তুকে বলে— এক ফোঁটা পানি দোস্তু, আর পারছি না!

- এই জুলুসে পানি কোথায় দোস্তু। তিয়াসা লাগলেও পানি তো পাবে না। পানি হারাম।
- না। আমাকে এক জরা দাও নৈনিহাল।
- পাবে না। এ হ'ল মরুভূমি। সামনে ফোরাতে চলো।
- জুলুসের মানুষ তো কাফের নয় নৈনিহাল।
- কে বলেছে কাফের নয়। এই জুলুসে সব আছে। সব রকম। এখন আমরা কুফা নগরী পার হচ্ছি ভাই। এই যে লাঠি খেলা খেলছে সুন্নীরা দ্যাখো দ্যাখো। কার সাথে কার খেলা বল তো? কে এজিদ আর কে হোসেন লেখাজোখা আছে?
- পানি দাও ভাই নৈনিহাল, ছোরা চালাতে পারছি না।
- শহীদের দর্জা কি সহজ? চালাও। সামনে তো ইউফ্রেটিস টাইগ্রিস। হা হা হেসে ওঠে নৈনিহাল মির্জা। সেই হাসি কি বিষাক্ত। সকিনা কিছুই দেখছে না।^{১৩৪}

জীবনের তাড়া খেয়ে কাশেমের প্রাণ প্রেমের কারবালায় ছটফট করে। কার সঙ্গে কার খেলা— গুলিয়ে ফেলে সে। অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে এক ধাঁধা ও অস্বস্তির অতলান্তে তলিয়ে যায় কাশেম। সে অনুভব করে আত্মকামের বশে নিজের সঙ্গে নিজেরই খেলা চলছে তার। প্রেম ও হত্যার কারবালার ইতিহাস বর্তমানের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। ফেরারি কাশেম লিজেন্ডের চরিত্রের মতো প্রতিভাত হয় বর্তমান পটে। ইতিহাস ও মিথ-পুরাণের কারবালা মিশে যায় ভাগীরথীর মোহনায়।

গল্পকার ইতিহাসের বাস্তবতা ও কারবালা থেকে উৎসারিত মিথ-কিংবদন্তি-উৎসব-অনুষ্ঠানকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে নির্মাণ করে কোন বার্তা দিতে চাইলেন! এ গল্পের শিয়া নৈনিহাল যেন এজিদ ও কোরেশী কাশেম যেন হোসেন। এবং জয়নবের মতো সাকিনার ট্রাজিক পরিণতি!— প্রেমের বা কামনার ত্রিভুজের এই আখ্যান বিন্যাসে গল্পকার কি কাশেমকে অ্যান্টিহিরো হিসাবে দেখছেন? এজিদের পক্ষকেই সমর্থন করছেন? সময়ের স্রোতে ইরাকের মরুপ্রান্তর থেকে ভেসে আসা জ্ঞাতি-নিধনের আখ্যানকে অন্য চোখে

দেখতে প্রণোদিত করছেন আমাদের! আর আদিমজীবনের ধারা বেয়ে সেই নারীর জীবন-
ই হয়ে উঠছে একাকিত্ব ও স্বজনহারা কারবালার ধ্রুপদি সংগীত!

মুর্শিদাবাদের লালবাগ অঞ্চলকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে ‘পথ’ গল্পের ঘটনা। এ গল্পের
মুখ্য চরিত্র খোদাদিল টাঙাঅলা। সবাই তাকে ঘোড়াদিল বলে ডাকে। সভ্যতার অগ্রগতির
সঙ্গে মানুষের জীবন ও পরিবেশ বদলে যায়। স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী শক্তির
দৌলতে-আধিপত্যে ঘোড়ার গাড়ির প্রয়োজন একসময় কমে যায়। অন্যদিকে লাল রাস্তা
কালো হয়। মোরাম থেকে পিচ হয়। আর সে রাস্তার বুকে বয়ে যায় নতুন নতুন যানবাহন।
খোদাদিলের বাড়ির উপর দিয়ে বয়ে যায় পিচের রাস্তা। এই ঘোড়াতে করেই তো হোসেন
এজিদের বিপক্ষে কারবালার যুদ্ধ করেছিল। ‘প্রকাণ্ড জং-এর কারবালা তিয়াসা আর লহু,
রক্ত আর পিপাসা, আসমানের নিহরে ভিজে গেছে অশ্বের কেশর, ঘামে ভিজে উঠেছে
ঘোড়ার পেট, ঘোড়ার নিঃশ্বাসে-শ্বাসে ঝরছে জরিণা কি আসগরের শোক!’— এই পথই
তো খোদাদিলের জীবন। পথ আছে বলেই তার ঘোড়া আছে, সে আছে। পথটা কাঁচা
ছিল, মোরাম পড়ে হটরমটর লাল হল তাতে খোদাদিলের সুবিধাই হয়েছিল। অথচ এই
লাল রাস্তাও একদিন কালো হয় প্রগতির হাত ধরে কালের নিয়মে। খোদাদিল, তার ঘোড়া
ও পথ— সমস্ত কিছুর রঙই কালো। যেন অন্ধকারময় এক উষর কারবালা। খেটে খাওয়া
টাঙাঅলা মানুষের জীবনটা এক অর্থে যুদ্ধক্ষেত্র। খোদাদিল প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে প্রবৃত্তির
সঙ্গে, সংসারের সঙ্গে।

এইভাবে লাল পথ কালো হয়ে এগিয়ে আসতেই খোদাদিলের আঙিনায় ঘোড়ার
গাড়ি-রিকশা পেরিয়ে সে পথে নামে মজুমদার বাবুদের আর্মি জিপ। সেইসঙ্গে নন্দবাবুদের
ট্রেকার। খোদাদিল কাজ হারায়। বেকার অর্থনৈতিক অসচ্ছল জীবনের দুর্বিপাকে জড়িয়ে

পড়ে সে। রাস্তার উন্নয়নের সঙ্গে খোদাদিলের রোজগারে ভাটা পড়ে। সে প্যাসেঞ্জার পায় না। এ পথেই আর্মির জিপে চাপা পড়ে মারা যায় খোদাদিলের ছোট মেয়ে নুরি। নুরির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খোদাদিলের জীবনযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে— ‘কারবালা খতম’ হয়। যুদ্ধের শেষে চিহ্নায়ক হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিন্নভিন্ন দেহ এবং রক্তাক্ত লাল পথের চিত্র ফুটে ওঠে। খোদাদিলের উঠোন ভিজে যায় নুরির রক্তে। ‘এখন আর পথটাকে উঠোন মনে হয় না। উঠোনকে পুরোপুরি পথ ঠাহর হয়। সংসারকেও মনে হয় পথ। পথকে মনে হয় অজগর। নুরির কচি মুখটা বারবার মনে পড়ে যায়’। কারবালার যুদ্ধে ঘোড়াই ছিল কাসীদ (বার্তাবাহক)। আর এ গল্পে টাঙাঅলার কাজ ছেড়ে খোদাদিলের মনে হল:

জীবন এই পথের উপর একটি চমৎকার ঘোড়া নাচ। নুরির সঙ্গে নাচত বাঘমগ্ন। চারিদিকে তারই ছায়া তাকে ঘিরে ধরেছে। রাস্তার উপর কোমরে দুলদুলির ঘণ্টা বেঁধে দাঁড়াল খোদাদিল। পায়ে বাঁধল ঘোড়ার ঘুঙুর। হাতের তাগায় ছোট ছোট ঘণ্টা, গলায় পরল গাঁদার মালা। মসজিদে সিজদা দিল মুনশি। পথের উপর দাঁড়িয়ে ভাবল, পথের শেষ কোথায়? কোথায় বা শুরু? তার পথটা কি কারবালায় গিয়ে শেষ হয়েছে?^{১৩৫}

গ্রামের বিভিন্ন লোকের মানত মাথায় নিয়ে কাসীদ চলে যায় লালবাগের কারবালায়। সঙ্গে মেহেদি আর জুলুয়ার (শুভদৃষ্টি) বার্তা— কাশেম-সকিনার মতো আজই যেন বিয়ে হয়েছে তার সোনাভানের সঙ্গে। কারবালার সংবাদবাহক অশ্বের মতো খোদাদিল তার গতি শিথিল করে না। এ যেন কারবালার হোসেনের নাছোড় লড়াইয়ের অন্তিম ইঙ্গিত। দুর্বল দেহ নিয়ে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় খোদাদিল এগিয়ে চলে কারবালার পথে— খোদাদিলের ‘চোখে পথের একটি আশ্চর্য ক্ষুধা জ্বলতে থাকে’। খোদাদিল টাঙাঅলার জীবনের সঙ্গে মরুভূমির কারবালা একাকার হয়ে যায়। হোসেনের মতো বীরের আত্মহুতি মিলে যায় খোদাদিলের যাত্রায়। আবুল বাশার এই গল্পে ইতিহাস ও মিথ-পুরাণের

কারবালার সঙ্গে সাম্প্রতিক প্রেক্ষিত ও গ্রামীণ জনমানসের ব্যক্তিজীবনের সমস্যা-সংকটকে মিশিয়ে দিয়েছেন অপূর্ব শৈল্পিক দক্ষতায়।

‘চন্দ্রদীপ’ গল্পের প্রেক্ষাপট বিশ শতকের সাতের দশকের নকশাল আন্দোলন। ১৯৬৭-তে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি এলাকায় জমি নিয়ে দেশজ ভাগচাষিদের সঙ্গে মহাজন-জমিদারদের বিবাদ আন্দোলনের রূপ নেয়। প্রথমদিকে কানু সান্যালের নেতৃত্বে এ আন্দোলন গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে চারু মজুমদার হয়ে উঠেছিলেন এ আন্দোলনের প্রধান নেতা। বহু যুবক এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন অগুপ্তি যুবা।

নকশালদের এই স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনের ডাক, কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জোতদারদের রাজত্ব খতম করার সশস্ত্র রাজনীতি, জোটবদ্ধ গণসংগ্রাম, শোষক শ্রেণির প্রতি বিমোদগার, জোতদারশ্রেণির পদচ্যুতির আশু দাবি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শেষমেশ ১৯৬৯-তে নকশালকর্মীরা (নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন হয়েছিল এবং যাঁরা এর প্রত্যক্ষ সমর্থক ছিলেন) নতুন পার্টি গঠন করলেন। যার নাম হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) অর্থাৎ সিপিআইএমএল। একের পর এক জেলায় ক্যাডাররা মূল পার্টি ছেড়ে এই নবজাত পার্টিতে যোগ দিতে লাগল। ঠিক যেভাবে ১৯৬৩-৬৪-তে তারা দলে দলে সিপিআই ছেড়ে সিপিআইএম-এ যোগ দিয়েছিল। সিপিআইএম এবং সিপিআই(এমএল) এর মধ্যে প্রবল রেষারেষি শুরু হল, যা অনেক সময়ে সহিংস রূপ নিল। এই সময় সিপিআইএমএল-এর নেতা চারু মজুমদার ‘শ্রেণিশত্রু’ আখ্যা দিয়ে জমিদারদের এবং ‘দক্ষিণপন্থী সংশোধনপন্থী’ আখ্যা দিয়ে সিপিআইএম ক্যাডারদের খতম করার ডাক দিলেন। এর জবাবে সিপিআইএম-ও নিজস্ব বাহিনী গড়ে তুলে (তার নিরীহ

পোশাকি নাম অবশ্য স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী) তাদের ভাষ্যমায়িক জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব-এর পথ প্রশস্ত করতে লাগল।^{১৩৬} কংগ্রেস বা অন্যান্য পার্টির সঙ্গে কোনওরকম সমঝোতা না করে স্বতন্ত্র দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সিপিআইএমএল। পৃথিবীর নানান দেশে তখন সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন আলোড়ন তুলেছিল। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে তারা ‘গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার লড়াই’-এই আদর্শের পথে এগোতে চাইল। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারিয়ে শ্রেণিশত্রু খতমের উপর দিল জোর। পাশাপাশি মণীষীদের মূর্তি ভাঙা এবং স্কুল-কলেজ পোড়ানো কর্মকাণ্ডও ছিল তাদের বিপ্লবের অংশ। আসলে ‘তৃতীয় বিশ্বে বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল গ্রাম— এই তত্ত্বকে আরও একধাপ প্রসারিত করে লিন পিয়াও ষাট দশকেই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে পশ্চিম ইউরোপ-আমেরিকা প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলি পৃথিবীর শহর স্বরূপ এবং তৃতীয় বিশ্ব পৃথিবীর গ্রামাঞ্চল এবং গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার সেই সুপরিচিত তত্ত্বকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকায় গণমুক্তি সংগ্রামগুলিকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ...চিনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিণাম ও সত্তর দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের অবস্থান্তর প্রাপ্তি অনেকটা এই জাতীয়।^{১৩৭} যদিও নকশালদের এই আন্দোলন শেষমেশ ব্যর্থ হয়েছিল। সরকার কঠোরভাবে দমন করেছিল। নকশালদের পুলিশ খতম এবং সরকারের দমননীতি নিয়েও বিস্তর তর্ক-বিতর্ক আছে। মূলত ১৯৭১-এ সুশীতল রায়চৌধুরী ও সরোজ দত্তের মৃত্যু এবং ১৯৭২-তে চারু মজুমদারের মৃত্যুর পরে এ আন্দোলনের ঢেউ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অসীম চট্টোপাধ্যায় ও সন্তোষ রাণার মতো নেতারাও দলত্যাগ করেছিলেন। ছয়ের দশকের শেষে নকশালপন্থীরা অতর্কিত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শাসকশ্রেণির খলনলচে নাড়িয়ে দিয়েছিল এ নিয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু নকশালপন্থীদের আদর্শগত দ্বন্দ্বিকতা তাদের সাফল্যের পথে অন্তরায় হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। ‘আশঙ্কার অশুভ লক্ষণ হিসাবে ধরলে দেখা যায়— নেতৃবৃন্দের অধিকাংশের মধ্যে একধরনের উৎকট সংকীর্ণ মনোভাববশত শ্রমিক আন্দোলন সংগঠন করার প্রয়োজনীয়তার ঔদাসীন্য, সৈন্যবাহিনীর ভেতরে গোপন সংগঠন গড়ে তোলার গুরুত্বকে অবহেলা, অন্যান্য বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির প্রতি সন্দেহপ্রবণতা ও বিরোধিতা, অতীতের ভুল সংশোধন করতে প্রচণ্ড অনিচ্ছা এবং সর্বোপরি একজন নেতাকে (চারু মজুমদার) প্রায় অব্রান্ত দেবতার আসনে উত্তোলিত করার প্রবণতা’^{১৩৮}— এসব নানাবিধ কারণে অচিরেই এ আন্দোলন ভেঙে পড়ে। সন্তোষ রাণা তাঁর *রাজনীতির এক জীবন* বইতে লিখেছেন:

যে চারু মজুমদার বিপ্লবী ছাত্রদের গ্রামে যাওয়ার সময় অস্ত্র নিয়ে যেতে বারণ করেছিলেন, তিনিই অস্ত্র-নির্ভর শ্রেণিশত্রু খতমের উপর এত জোর দিলেন। এই দ্বন্দ্বের ফল, সবাই জানে, ভালো হয়নি।^{১৩৯}

১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নকশালপন্থী সমস্ত বন্দিদের মুক্ত করে দেয়। যদিও সিপিআইএমএল-রা সিপিআইএম-নামক দলটাকেই অস্বীকার করে। সিপিআইএম-এর সঙ্গে এদের মূলত ঘেন্নার সম্পর্ক। কারণ তারা মনে করে ভোট অংশগ্রহণ করে সিপিআইএম বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কংগ্রেস ছিল তাদের শত্রু, কংগ্রেসের হাত ধরেই একদিন নকশাল আন্দোলন খতম হয়েছে। এছাড়াও কমিউনিস্ট দল বা গ্রুপ রয়েছে, যেমন আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক। এদের সঙ্গে বাকিদের সমঝোতা বা সহযোগিতার সম্পর্ক থাকলেও তাদের ঘোষিত আদর্শের সঙ্গে সবটা মেলে না। চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর নকশালদের দাপট ক্রমশ কমে গিয়েছিল। বলা যায়, এ আন্দোলনের একরকম ভাটা পড়ল।

‘চন্দ্রদীপ’ গল্প তথাকথিত ‘ভাটায় স্তিমিত হয়ে যাওয়া সময়ের’ই আখ্যান। চন্দ্রদীপ বিচ্ছিন্ন একজন নকশাল কর্মী। বিপ্লবীদের সঙ্গে সমূহ প্রত্যক্ষ যোগ তার ছিল হয়ে গেছে।

পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা বা লোকাল কমিটির সঙ্গেও তার কোনো যোগাযোগ নেই। পার্টি তখন দর্পণ চূর্ণের মতো শতধা বিভক্ত, সহকর্মীরা ছত্রভঙ্গ। এই খণ্ডচিত্রে নিজের আত্মকৃতিকে পরখ করার চেষ্টা করে চন্দ্রদীপ। নকশালদের কাছে তাদের লড়াই ছিল— আত্মরক্ষার নামে আত্মহত্যার নামান্তর। আন্দোলন থেমে গেলেও চন্দ্রদীপ আত্মগোপন করে থাকে। সে রসুল মিঞা, মুরারি, জয়দেব প্রভৃতি নাম নিয়ে শ্রমজীবী প্রলেতারিয়েত মানুষদের সঙ্গে মিশে থাকে। চন্দ্রদীপ বিপ্লবী জীবনের একটি গল্প আত্মস্থ করেছিল যে, একজন বিপ্লবী শাসকের কাছে এতটাই ভয়াবহ, যার মাথার দাম শাসক ঠিক করে দেয়। যে তাকে ধরিয়ে দেবে তাকে দেওয়া হবে বড়ো অঙ্কের পুরস্কার। চন্দ্রদীপের অনুভূতিতে উঠে এসেছে সে কথা। একজন বিপ্লবী তার সারাজীবন একটি আশ্চর্য উন্নত মস্তিষ্ক বহন করে। চন্দ্রদীপের নিরন্তর ছুটে চলা সাতের দশকের রক্তাক্ত আন্দোলনেরই ব্যর্থ বিপ্লবী জীবনের উৎসারণ। চন্দ্রদীপের দ্বন্দ্ববিদীর্ণ অনুভূতির তলদেশে উঠে এসেছে সে প্রসঙ্গ:

ইতিহাসে লেখা হয়, এ দেশের এইসব বিপ্লবীরা জনসাধারণের মধ্যে কখনও মিশে যেতে পারেনি। মাছ যেমন জলের ভিতর থাকে, বিপ্লবী থাকবে জনগণের ভিতর।
মাও-জে-দঙ-এর এই উপমা বিফল হয়েছে, কিন্তু সর্বত্র নয়।^{১৪০}

নকশালপন্থীরা একজোট হয়ে লড়াই করার চেষ্টা করলেও তারা তৃণমূল-স্তরের নাড়ি-নক্ষত্র পুরোপুরিভাবে চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল। গ্রামের সাধারণ কৃষকের মতো ছাত্র-যুবারাও ছিল আবেগপ্রবণ ও অদূরদর্শী। হঠকারিতার বশে খুন-জখম, নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন— প্রবল উৎসাহে এসব শুরু হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সর্বস্তরের মানুষ সাড়াও দেয়নি। অথচ এই ‘গ্রাসরুট’ মানুষদের দ্বারাই মূলত নির্ধারিত হয় শাসকের জয়-পরাজয়। অতীতের ব্যর্থতা মেনে নিতে পারে না চন্দ্রদীপ। প্রিয়নাথ নামের এক নেতা তাকে বুঝিয়েছিল, নাম বদল করে লুকিয়ে থাকলেও তার পূর্ব নাম ধরে কেউ ডাকলে যেন সাড়া না দেয়। রসুল যেন মুরারি বা জয়দেব শুনে অনড় থাকে, কিংবা চন্দ্রদীপ ডাক শুনলে

নিরন্তর থাকে। পার্টির ভাঙনের মতো যেন চন্দ্রদীপ নানান নামে নিজেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সে যেন আরও বিচ্ছিন্ন, আরও একা। এমন মানসিক উদ্বেলতার মাঝেও নিজেকে তাজা রাখার চেষ্টা করে চন্দ্রদীপ। তার অনাগত জীবন নিয়ে ভাবনা হয়।

চন্দ্রদীপ তার ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছিল। বাড়ি ফিরতে পারবে না। মায়ের সঙ্গে দেখা হবে না। পুরনো বন্ধুদের আড্ডায় গেলে ওরা হয়ত ওকে চিনতেই চাইবে না। এর পর জীবন কেমন হবে? চাকরি-বাকরি হবে না। পুলিশে ধরলে কত বছর শ্রীঘরে থাকতে হবে ঠিক নেই। কিছুই ঠিক নেই। না জীবন, না মৃত্যু।... আচ্ছা, চন্দনা কেমন আছে? চন্দনার আর এক নাম ছিল বুড়ি। কেমন আছে সেই সালংকারা চন্দন-বিন্দু-শোভিত মুখ?

আত্মগোপনে ওস্তাদ, পুলিশের চোখে ফাঁকি বারংবার পালাতে পারদর্শী মি. জেড-এর মতোই চিরতরে নিরুদ্দেশ হতে চায় চন্দ্রদীপ। এমন একটি সংকেতের সাহায্যে সে জনসমুদ্রে হারিয়ে যাবে যে তার পরম শত্রুও তা নির্ধারণ করতে পারবে না। স্টেশনে এসে ট্রেনের অপেক্ষা করছিল সে, ট্রেনে উঠতে পারলেই সীমান্ত অতিক্রম করে যাবে। ট্রেনে ঢুকছে প্লাটফর্মে, এমন সময় পেছনে দীপ'দা স্বরে নারী কণ্ঠ ডেকে ওঠে। শেষপর্যন্ত মুহূর্তের দুর্বলতায় চন্দনার ডাকে সাড়া দিয়ে চন্দ্রদীপ ধরা পড়ে পুলিশের হাতে।

এছাড়াও 'নিশিকাজল', 'মাঠখসড়া', 'বড়জোর দুই মাইল' প্রভৃতি গল্পে উঠে এসেছে বামপন্থার সঙ্গে শরিয়তি ইসলামের দ্বন্দ্ব। আখ্যানে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ না থাকলেও আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গল্পগুলি নয়ের দশকের পশ্চিমবাংলার বামপন্থী শাসনের সময়কে নির্দেশ করে। মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতার সঙ্গে আধুনিকতার বিরোধ আজও বিদ্যমান। মুসলিম না নাস্তিক (বামপন্থী) এ তর্ক সমকালীনতাকে স্পর্শ করেছে। গল্পকার মূলত সাম্প্রতিক অতীতের সঙ্গে বর্তমানের

যোগসূত্র রচনা করেছেন। ‘নিশিকাজল’ গল্পের বামপন্থী কর্মী ইমরান আক্ষেপের সুরে বলেছিল:

আমরা কি কমিউনিস্ট হতে পেরেছি? ভোট করতে করতে শেষ হয়ে গেলাম। আমি হিন্দু, না কমিউনিস্ট, নাকি মুসলমান, এই দ্বন্দের যে কবে শেষ হবে!^{১৪১}

এ যেন গল্পকারের খণ্ড-বিখণ্ড আত্মতা— তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনের রূপরেখা। একটি সাক্ষাৎকারে আবুল বাশার জানিয়েছিলেন:

আমি বামপন্থী হয়েও বামপন্থীদের সমালোচনা করেছি। এটা তো প্রতিটি বামপন্থী দল জানে আমি কোন দলে ছিলাম, কতদিন সক্রিয় রাজনীতি করেছি। কিন্তু এখন আমি বাম আমলের সমালোচনা করছি। এখনও করে যাচ্ছি। আমার মনে হয়, ওদের সমালোচনা করে আমার কথা কিছুটাও যদি ধরাতে পারি, তা হলে তো বামপন্থারই লাভ।^{১৪২}

বামপন্থী নেতৃবর্গের দুর্নীতি, দলীয় রাজনীতির বিচিত্র ফাঁকফোকর, স্বজনপোষণ, সেইসঙ্গে ইতিহাসের সঙ্গে ধর্ম-পুরাণ-মিথের দ্বন্দ্বিক বৈপরীত্য তাঁর গল্পে অন্যমাত্রা নিয়ে উঠে এসেছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

-
১. কার, ই এইচ; *কাকে বলে ইতিহাস*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ. ৭
 ২. থাপার, রোমিলা; *আখ্যানাবলি এবং ইতিহাসের নির্মাণ* (অনুবাদ নূপুর দাশগুপ্ত), প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ১৩
 ৩. দত্ত, বিজিতকুমার; *বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২
 ৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু; *গ্রন্থ পরিচয়, ঐতিহাসিক কাহিনি সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩৭৭

৫. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_India, তথ্য
গ্রহণের তারিখ: ২৪.০১.২০২৪, সময়: ৮: ০২ pm

৬. <https://www.britannica.com/topic/Communist-Party-of-India>, তথ্য
গ্রহণের তারিখ: ২৪.০১.২০২৪, সময়: ১০: ২৭ pm

৭. গুহ, রামচন্দ্র; *গান্ধী-উত্তর ভারতবর্ষ*, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ
লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ জুন ২০২২, পৃ. ৩৮০

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৩

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত; ‘নকশালবাড়ি আন্দোলন ও সত্তর দশক’, অনিল আচার্য
(সম্পাদিত); *সত্তর দশক* - প্রথম খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩১

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

১৭. রাণা, সন্তোষ; *রাজনীতির এক জীবন*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ
মুদ্রণ মে ২০২২, পৃ. ১৭০

১৮. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম
প্রকাশ মে ১৯৯৭, পৃ. ২৭৫

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬

২১. গুহ, রামচন্দ্র; *গান্ধী-উত্তর ভারতবর্ষ*, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ জুন ২০২২, পৃ. ৪৪৮

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৯

২৩. Mukherjee, Pranab; *The Dramatic Decade: The Indira Gandhi Years*, First published by Rupa publication India pvt. Ltd. New Delhi, India, 2015, Page. 45

২৪. পূর্বোক্ত, Page. 45

২৫. দাস, অরুণকুমার (সম্পাদিত) *গণযুগের দিনপঞ্জি* (১৯৬০-১৯৭৯), প্রথেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০২, পৃ. ৮১

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

২৯. বসু, সজল; *জরুরি অবস্থা আন্দোলন ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতি*, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ২০২২, পৃ. ২৫

৩০. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৪৩

৩১. https://en.m.wikipedia.org/wiki/2015_Dadri_lynching, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ২০.০৩.২০২৪, সময়: ১১: ৩৫ pm

৩২. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৪৩

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

৩৫. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৭, পৃ. ২০১

৩৬. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ১৭৭-১৭৮

৩৭. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৭, পৃ. ১৭৬

৩৮. ঘোষ, প্রভাস; *ভারতের বিপ্লবের স্তর নির্ধারণে সি পি এম, সি পি আই ও নকশালপন্থী-মাওবাদীদের সাথে এস ইউ সি আই (সি)-র পার্থক্য কোথায় এবং কেন*, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট), কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০২১, পৃ. ১০

৩৯. মিত্র, শৈবাল; ‘চারু মজুমদার, যেমন চিনেছি’, স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত), *এবং জলার্ক* (চারু মজুমদার সংখ্যা-২, পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৯-মার্চ ২০১০, পৃ. ১৫২

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

৪১. রায়, অমিত (সম্পাদিত), ‘সৌরেনের কথা’, *অন্তরঙ্গ চারু মজুমদার*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, চতুর্থ প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২৭

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮ ৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৪৩. মিত্র, শৈবাল; ‘চারু মজুমদার, যেমন চিনেছি’, স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত), *এবং জলার্ক* (চারু মজুমদার সংখ্যা-২, পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৯-মার্চ ২০১০, পৃ. ১৫৩

৪৪. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ২২৪

৪৫. Darwish, Mahmoud; ‘The War Will End’, *Unfortunately, It was Paradise*, (Translated by Munim Akash and Carolyn Forche), University of California Press, 2003, Page. 142

৪৬. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ২২৮

৪৭. দাস, অরুণকুমার (সম্পাদিত) *গণযুগের দিনপঞ্জি* (১৯৬০-১৯৭৯), প্রথেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০২, পৃ. ৮১
৪৮. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ২৩২-২৩৩
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪
৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭
৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭
৫২. রায়, অমিত (সম্পাদিত), 'সৌরেনের কথা', *অন্তরঙ্গ চারু মজুমদার*, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, চতুর্থ প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২৬
৫৩. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ২৫৮-৫৯
৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
৫৫. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৭, পৃ. ১৯৬
৫৬. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ২৭৮
৫৭. ঘোষ, শিবদাস; 'গেরিলা যুদ্ধের কৌশলের সাথে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন সম্পর্ক নেই',
কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল, এস ইউ সি আই (সি) অফিস, কলকাতা, মে ২০১৬, পৃ. ৫২
৫৮. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ২৭৮
৫৯. উমর, বদরুদ্দিন; 'সত্তর দশকের কৃষক আন্দোলন', অনিল আচার্য (সম্পাদিত); *সত্তর দশক - প্রথম খণ্ড*, অনুষ্ঠাপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৮০-৮১

৬০. বাশার, আবুল; *অগ্নিবল্লাকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৩০৮

৬১. সেন, গৌতম; 'সত্তর দশকের রাজনীতি', অনিল আচার্য (সম্পাদিত); *সত্তর দশক -* প্রথম খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১১৪

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

৬৩. বাশার, আবুল; *অগ্নিবল্লাকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৩২৮

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭

৬৫. https://www.milansagar.com/kobi/saroj_dutta/kobi-sarojdutta.html, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ১৭.০৩.২০২৪, সময়: ২: ১৫ am

৬৬. <https://www.sillypoint.co.in/post/Saroj/-Dutt's-Encounters,-Uttamkumar-and-a/-Forgotten/Poem/id/>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ১৭.০৩.২০২৪, সময়: ২: ৫৫ am

৬৭. <https://www.sillypoint.co.in/post/Saroj/-Dutt's-Encounters,-Uttamkumar-and-a/-Forgotten/Poem/id/>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ১৭.০৩.২০২৪, সময়: ৩: ০৭ am

৬৮. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৭, পৃ. ১৯৪

৬৯. বাশার, আবুল; *অগ্নিবল্লাকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৩৮৪

৭০. ঘোষ, প্রভাস; *ভারতের বিপ্লবের স্তর নির্ধারণে সি পি এম, সি পি আই ও নকশালপন্থী-মাওবাদীদের সাথে এস ইউ সি আই (সি)-র পার্থক্য কোথায় এবং কেন*, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট), কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০২১, পৃ. ১২

৭১. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৩৮৫

৭২. <https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,941216,00.html>, Historical Notes: The Death of Stalin's Son - তথ্য গ্রহণের তারিখ: ০২.০৪.২০২৪

৭৩. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৪৩২

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫১

৭৫. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৭, পৃ. ১৪৮

৭৬. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৪৫৩

৭৭. চট্টোপাধ্যায়, অনিবার্ণ; 'তুমি কি কমিউনিস্ট?', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৮ আগস্ট, ২০২০

৭৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত; 'নকশালবাড়ি আন্দোলন ও সত্তর দশক', অনিল আচার্য (সম্পাদিত); *সত্তর দশক* - প্রথম খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪০

৭৯. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৭, পৃ. ২৪২

৮০. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৪৭৯-৪৮০

৮১. মিত্র, শৈবাল; 'ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন: পশ্চিমবঙ্গ', অনিল আচার্য (সম্পাদিত); *সত্তর দশক* - তৃতীয় খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৩

৮২. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৪৭৭

৮৩. মিত্র, শৈবাল; 'ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন: পশ্চিমবঙ্গ', অনিল আচার্য (সম্পাদিত);
সত্তর দশক - তৃতীয় খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৩-৩৪

৮৪. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪,
পৃ. ৫১৪-৫১৫

৮৫. ঘোষ, প্রভাস; *ভারতের বিপ্লবের স্তর নির্ধারণে সি পি এম, সি পি আই ও
নকশালপন্থী-মাওবাদীদের সাথে এস ইউ সি আই (সি)-র পার্থক্য কোথায় এবং কেন,*
সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট), কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, অক্টোবর,
২০২১, পৃ. ১৪

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৮৭. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪,
পৃ. ৫৩৩

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৫

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৬

৯০. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু; *ঘুণপোকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ডিসেম্বর
২০১২, পৃ. ৬৭

৯১. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪,
পৃ. ৫৫৯

৯২. চট্টোপাধ্যায়, একলব্য; 'একটা চারু মজুমদার চাই', স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত),
এবং জলার্ক (চারু মজুমদার সংখ্যা (২), পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, অক্টোবর
২০০৯-মার্চ ২০১০, পৃ. ১২২-১২৩

৯৩. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪,
পৃ. ৫৬৩

৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৪

৯৫. বসু, সজল; *জরুরি অবস্থা আন্দোলন ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতি*, বুকপোস্ট
পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ২০২২, পৃ. ২০০

৯৬. সেন, কল্পনা; (সংকলন ও সম্পাদনা), *নকশালবাড়ির মেয়েরা*, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, বইমেলা ২০২৪, পৃ. ১০
৯৭. দাশ, জীবনানন্দ; 'এইসব দিনরাত্রি', *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ভারবি, কলকাতা, চতুর্দশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ১০৪
৯৮. বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৫৮৩
৯৯. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৭, পৃ. ১৬৬
১০০. বসু, সমরেশ; *মহাকালের রথের ঘোড়া*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৬, পৃ. ১৩২
১০১. ভট্টাচার্য, নবাবু; *হারবার্ট, উপন্যাস সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১
১০২. মিত্র, শৈবাল; 'ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন: পশ্চিমবঙ্গ', অনিল আচার্য (সম্পাদিত); *সত্তর দশক - তৃতীয় খণ্ড*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১১৫
১০৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত; 'নকশালবাড়ি আন্দোলন ও সত্তর দশক', অনিল আচার্য (সম্পাদিত); *সত্তর দশক - প্রথম খণ্ড*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৫
১০৪. সেনগুপ্ত, সম্রাট; *প্রতিবাদের পাঠ্যক্রম— বাঙালির নকশালবাড়ি-উত্তর প্রতিবাদ ভাবনা ও পার্শ্বের রাজনীতি*, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২২, পৃ. ১২৫
১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১
১০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
১০৭. আবুল বাশারের মুখোমুখি সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, *বইয়ের দেশ* জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯, পৃ. ১২৩
১০৮. গুহ, রামচন্দ্র; *গান্ধী-উত্তর ভারতবর্ষ*, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ জুন ২০২২, পৃ. ৫৮০

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৬

১১০. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ram_Mandir, তথ্য গ্রহণের তারিখ:
০৪.০৫.২০২৪, সময়: ২: ৩৫ am

১১১. বাশার, আবুল; *আকাশলীনা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, জানুয়ারি
২০১৫, পৃ. ২০

১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

১১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

১১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

১১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

১১৯. বাশার, আবুল; *ঋষি ও খকুর উপাখ্যান ও অন্যান্য*, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা,
জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৯

১২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

১২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

১২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

১২৩. বাশার, আবুল; *আকাশলীনা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, জানুয়ারি
২০১৫, পৃ. ১৩২

১২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; 'মানুষের ধর্ম', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, বৈশাখ
১৩৭৪, পৃ. ৪৩১

১২৫. হিট্রি, কে ফিলিপ; *আরব জাতির ইতিহাস*, আদি মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯, পৃ. ১৮২

১২৬. *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ*, ড. ওসমান গনী (অনুদিত); (২ সংখ্যক সুরা বাকারাহ্, আয়াত সংখ্যা ২২৩), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২৯

১২৭. দত্তভৌমিক, গোপা; 'সুকুমারী ভট্টাচার্যের দৃষ্টিতে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান এবং কিছু ভাবনা', ফুয়াদ, আফিফ (সম্পাদিত), *দিবারাত্রির কাব্য*, (সুকুমারী ভট্টাচার্য সংখ্যা), ত্রয়োবিংশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ১৪৯

১২৮. বাশার, আবুল; 'সিমার', *সিমার*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০১, পৃ. ১৮

১২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

১৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১৩১. দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ*, ড. ওসমান গনী (অনুদিত); (২ সংখ্যক সুরা বাকারাহ্, আয়াত সংখ্যা ২৩০), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৩০

১৩২. বাশার, আবুল; 'কাসীদ', *একই বৃত্তে*, প্রজ্ঞা, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১১০

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

১৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

১৩৪. বাশার, আবুল; 'পথ', *আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২ পৃ. ১২৪

১৩৫. গুহ, রামচন্দ্র; *গান্ধী-উত্তর ভারতবর্ষ*, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ জুন ২০২২, পৃ. ৩৮৩

১৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত; 'নকশালবাড়ি আন্দোলন ও সত্তর দশক', অনিল আচার্য (সম্পাদিত); *সত্তর দশক* - প্রথম খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩১

১৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

১৩৮. রাণা, সন্তোষ; *রাজনীতির এক জীবন*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ মে ২০২২, পৃ. ১৭০

১৩৯. বাশার, আবুল; 'চন্দ্রদীপ', *আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২ পৃ. ৭২

১৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১৪১. বাশার, আবুল; 'নিশি কাজল', *মাটি ছেড়ে যায়*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১২৩

১৪২. আবুল বাশারের মুখোমুখি সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, *বইয়ের দেশ*, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯, পৃ. ১১৬

তৃতীয় অধ্যায়

আবুল বাশারের উপন্যাসে ইসলামিক মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ

তৃতীয় অধ্যায়

আবুল বাশারের উপন্যাসে ইসলামিক মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ

‘পুরাণ’ শব্দটি ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হলেও ‘ইসলামি পুরাণ’ বলতে মূলত শাস্ত্রীয় ইসলাম ও লোকায়ত ইসলামের কাহিনিকে বোঝানো হয়েছে। ইসলামি পুরাণের মূল উৎস হল প্রধান চারটি ঐশ্বরিক গ্রন্থ, যাকে ইসলামি পরিভাষায় ‘আসমানি কিতাব’ বলা হয়। অর্থাৎ কোনো মহামানবের বাণী বা রচনা নয়, এ গ্রন্থ এসেছে স্বয়ং আল্লাহর কাছে থেকে। ইসলাম ধর্মের প্রধান চারটি ঐশ্বরিক গ্রন্থ হল— ১. নবি দাউদের সময়কালের ‘যাবুর’। ইহুদিদের *হিব্রু বাইবেল* ও খ্রিস্টীয় পুরাণে দাউদ হলেন ডেভিড, যিনি একাধারে রাজা এবং নবি। ২. মুসার সময়কালের ‘তাওরাত’। ইহুদি পুরাণে মুসা হলেন মোশি বা মোজেস। পবিত্র বাইবেলের ‘পুরাতন নিয়ম’ (Old Testament)-এর অন্তর্গত প্রথম পাঁচটি পুস্তককে ইহুদিরা ‘তোরাহ’ বলে। ৩. ঈশার সময়কালে ইঞ্জিল শরীফ। যার সঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মের ‘নিউ টেস্টামেন্ট’-এর বেশকিছু মিল রয়েছে। ৪. হজরত মুহম্মদের সময়কালের *কোরান শরীফ*। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিশ্বাস গ্রন্থগুলি সবই আল্লাহর বাণী ও রচনা। এরমধ্যে হজরত মুহম্মদের হাতে ইসলাম ধর্মের বৈচিত্র্য ও বিকাশের পর ইসলামি পুরাণ হিসাবে একমাত্র *কোরান* মান্য। অতীতের ধর্মগ্রন্থকে হজরত মুহম্মদ বাতিল করেছিলেন তাঁর নবি জীবনের শুরুতে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ঐশ্বরিক গ্রন্থ হিসাবে *পবিত্র বাইবেল*-কে স্বীকার করলেও মান্য করে না। মুসলমান সমাজের মানুষদের বিশ্বাস মুসা নবীর ‘তাওরাত’ হল ‘আদিপুস্তক’ এবং যিশুর ‘নিউ টেস্টামেন্ট’ হল ঈশা নবির ‘ইঞ্জিল শরীফ’। নানান বিচ্যুতি ও বিকৃতি ঘটিয়ে ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্ম তা অধিকার করেছে। হজরত মুহম্মদ পরবর্তী সময়ে ইসলামি পুরাণের আকরগ্রন্থ হল *কোরান* ও

হাদিস-সমূহ। ইসলামি পুরাণের অন্যান্য উৎসগুলি হল— ইসলামি ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি, নবিদের জীবনীমূলক গ্রন্থ বা ‘কাসাসুল আশিয়া’। ‘কাসাসুল বা কিসাস উল-আশিয়া হল’— ইসলামি পুরাণে নবি এবং রসুল হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিদের জীবনের গল্পের একটি সংকলন যা তাফসির (কোরানের ব্যাখ্যা)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ‘কাসাসুল’ শব্দের আরবি অর্থ গল্প এবং ‘আশিয়া’ হল নবি শব্দের বহুবচন। যার অর্থ নবিগণ। ইসলাম ধর্ম মতে মতে, ইসলাম পৃথিবীর আদিধর্ম, ইহুদি-খ্রিস্টসহ একাধিক ধর্মের উৎসস্থল ইসলাম। ধর্মীয় পুস্তকগুলিতে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার (মতান্তরে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার) নবি-রসুলের আগমনের কথা বলা হয়েছে। যে সব মহামানবদের হাত দিয়ে আল্লাহ তাঁর বাণীকে গ্রন্থবদ্ধ রূপ (ঐশী গ্রন্থ) দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের রসুল নামে অভিহিত করা হয়েছে। নবিদের পক্ষ থেকে কোনো ঐশ্বরিক গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ হয়নি। সমস্ত রসুলই নবি, কিন্তু সকল নবি রসুল নন। ইহুদি-গ্রন্থ *হিব্রু বাইবেল*-এর সঙ্গে *কোরান*-এর আন্তঃসংযোগ এবং বিরোধের জায়গাটি মজাদার। দুই ঐশ্বরিক গ্রন্থে দ্বন্দ্বিকতার সৃষ্টি হয়েছে ‘শিশুবধ্য’ ও ‘পশুবধ্য’ মরুতে আব্রাহামের শিশুপুত্র ইস্রায়েলকে ‘উৎসর্গ’-এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ইসলামি পুরাণে উল্লেখিত অন্যান্য প্রধান কাহিনিগুলি হল— আদম সৃষ্টির ইতিহাস, ইবলিশের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপ, আদম-হাওয়া বিবির মর্ত্যে নির্বাসন, মহাপ্লাবন ও নোহের কিস্তি নির্মাণ, মুসার নির্গমন ও ফেরাউনের পতন, দাউদ ও তাঁর পুত্র সুলাইমানের রাজত্ব, ঈশার রহস্যময় জন্ম ও ধর্মীয় বাণী প্রচার, এবং ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ হজরত মুহম্মদের সম্পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত (যার মধ্যে নবুয়ত প্রাপ্তি, হিজরত, বিবাহ, একাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ ইত্যাদি)। ধর্মপ্রাণ মুসলমান মুহম্মদের নীতি ও আদর্শ ও ইসলামি বিধিনিষেধকে জীবনের আধেয় করে সমগ্র জীবন-পরিচালনা করে। ইসলামি অনুসারীদের দৈনন্দিন জীবনে যেসব বিধান মেনে চলতে হয়

তার উৎস মূলত কোরান এবং হাদিস। ইসলামি পরিভাষায় যাকে ‘শরিয়ত’ বলা হয়। মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের কাছে কোরান এবং হাদিস প্রামাণিক গ্রন্থ। আল্লাহ প্রেরিত বার্তা বা প্রত্যাদেশ ফেরেশতা (জিবরাইল) মারফত হজরত মুহম্মদ শোনার পর তা সঙ্গীদের (সাহাবি) দিয়ে লিখিয়ে নিতেন, এইভাবে ২২ বছর ধরে কোরান সংকলিত হয়েছিল। ইসলাম অনুসারীদের মতে, কোরান স্বয়ং আল্লাহর বাণী এবং হাদিস নবি-পয়গম্বর হজরত মুহম্মদের বাণী ও উপদেশ। ইসলাম ধর্মের প্রধান ও অপ্রধান হাদিসগুলির মধ্যে প্রধান ৬-টি বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থগুলি হল— ‘সহি বুখারি’, ‘সহি মুসলিম’, ‘সুনানে আবু দাউদ’, ‘সুনানে তিরমিজি’, ‘সুনানে নাসাই’, ‘সুনানে ইবনে মাজাহ্’। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ হাদিস গ্রন্থগুলি হল— ‘মুসনাদে আহমাদ’, ‘মুসনাদে আবু হানিফা’ ইত্যাদি। অধিকাংশ হাদিসই হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পরে সংকলিত হয়েছিল। এরফলে আসল ও নকল হাদিসের বিভাজনরেখা হাদিস অনুসরণকারীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে প্রায়শই। বহু ‘জাল হাদিস’ যা হজরত মুহম্মদের বাণী বলে প্রচার করা হয়, শরিয়তি ইসলাম এ হাদিসগুলিকে মান্য করে না। লোকায়ত ইসলামের সঙ্গে সংযুক্ত পির-পূজা, কবর-পূজা, ফকিরপন্থা শরিয়তি ইসলাম মান্য করে না। উপরিউক্ত পৌরাণিক ও বস্তু-ইতিহাসকে অনুসরণ করেই কথাকার আবুল বাশারের ইসলামি পুরাণ বিষয়ক গল্প-উপন্যাসের আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. ক. উপন্যাসে ইসলামিক মিথ-পুরাণ:

আবুল বাশারের প্রথম উপন্যাস ফুলবউ। শারদীয়া দেশ পত্রিকায় ১৯৮৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ফুলবউ। এই উপন্যাসকে ঘিরেই শুরু হয় সাহিত্যিক আবুল বাশারের পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা। মুসলমান সমাজের বহুবিবাহ ও তালাক প্রথার অসরতাকে ধূলিসাৎ

করে দিয়েছিল এ উপন্যাস। যুক্তিঠাসা বারুদ নিয়ে মুসলিম গোঁড়া সমাজের রক্তে রক্তে ঘটিয়েছিল অতর্কিত বিস্ফোরণ। নিজের প্রকাশিত প্রথম বই নিয়ে স্মৃতিচারণ করার প্রসঙ্গে লেখক বলেছিলেন:

আমার গদ্য-লেখা প্রথম বই ‘ফুলবউ’। তার আগে ১৯ বছর বয়সে প্রকাশ পেয়েছিল ‘জড় উপড়ানো ডালপালা-ভাঙা আর এক ঋতু’ নামে একটি কবিতার বই। ‘ফুলবউ’ একটি উপন্যাস। উপন্যাসটি বার ছয় লিখেছি। অর্থাৎ, ছয় বার এর লিখন-পুনর্লিখন হয়েছে; একটা খসড়া থেকে আর এক খসড়ায় চলে গেছি। শুরুতে এটি ছিল একটি গল্প ধরনের পদার্থ। একটা এলেবেলে ধরনেরই নাম ছিল সেটার। ‘খালাস’।’

মিথ-পুরাণ কেন্দ্রিক নির্ভর জীবনে ‘জাতিগত সংস্কৃতি’র সঙ্গে ধর্মের নিরন্তর দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। ‘বাঙালি’ এবং ‘মুসলমান’— এই দুই পরিচিতি একসূত্রে গাঁথতে পারে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। বাঙালিত্বকে খাটো করে যদি মুসলমানিত্ব বা হিন্দুত্ব বড়ো হয়ে ওঠে, তখন বাধে দ্বন্দ্ব। ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুসারে, ইসলামি সংস্কার এবং পুরাণের যাবতীয় কেছাকাহিনি সবটাই মধ্যপ্রাচ্যের আরব মরুভূমির ধূলিধুসরিত পথ বেয়ে ভারতবর্ষে এসেছে। কালে কালান্তরে তা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশেছে। আরব উপদ্বীপের ভাষা-সংস্কৃতি-আচার এসবই ভারতীয় বহুত্ববাদী সংস্কৃতির শাখা-প্রশাখা পেরিয়ে তা বাঙালিদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে। বিশেষত আজকের বাংলার মুসলমান সমাজ যুগপৎ ‘আরবীয় ধর্ম’ ও ‘ভারতীয় সংস্কৃতি’র মিশ্রিত আচারের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, যোগীদের মিশ্রণ ঘটেছে, ইসলামের মধ্যেও প্রবেশ করেছে লৌকিক ইসলামের বিভিন্ন আচার-আচরণ। বাংলার অধিকাংশ মুসলমান নিম্নবর্গীয় হিন্দু, উচ্চবর্ণের অত্যাচারে ধর্মান্তরিত হওয়া মানুষ। বস্তুত ইসলামি পুরাণ মিশ্রিত কাহিনির পাশাপাশি বাঙালি মুসলমানের রক্তে

মিশে থাকা প্রচলিত সংস্কৃতিকে সবসময় অগ্রাহ্যও করতে পারেনি, যেখানেই বাঙালিয়ানা ভুলে ধর্মকে বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে সেখানেই ঘটেছে গলদ।

বহুবিবাহ প্রথা মধ্যযুগে বাংলায় ছিল না এমন নয়, কিন্তু আরবীয় সংস্কারে, বিশেষত প্রাক-মুহম্মদ পর্বে আরবের অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। যাকে ইসলামি পরিভাষায় বলা হয়, ‘আইহামে জাহেলিয়াত’ বা অন্ধকার যুগ। এ ব্যাপারে কোরানেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। জাহিলিয়া শব্দটি সাধারণত ‘অজ্ঞতার যুগ’কে বা ‘বর্বরতা’কে বোঝায়, কিন্তু বাস্তবে এই শব্দটি এমন একটি সময়কালকে বোঝায়, যখন আরবে কোনো বিধিবিধান ছিল না, কোনো অনুপ্রাণিত ধর্মপ্রচারক ছিল না, ছিল না প্রত্যাдиষ্ট কোনো ধর্মগ্রন্থ।

প্রাক-ইসলামি আদর্শ, বিশেষত পৌত্তলিকতা থেকে তাঁর অনুসারীদের মুক্ত করার জন্য একত্ববাদী হজরত মুহম্মদ ঘোষণা করেছিলেন, যে নতুন ধর্মটি পূর্বকার সমস্ত ধর্মীয় প্রভাবকে বিলোপ করে দেবে।^১ সেই অন্ধকার সমাজে পুরুষের বহুগামিতা ছিল প্রকট। মুহম্মদ চার বিবাহের অধিকার দিয়েছিলেন পুরুষকে, যা আজও ভারতের সংহতি বিপন্ন করছে। অথচ ইতিহাস বলে মুহম্মদের পক্ষে সেটাই ছিল যথেষ্ট সংশোধন। যে সমাজকে তিনি গুছিয়ে তোলেন সেখানে তখন নারীভোগের কোনো সীমা ছিল না পুরুষের, উপরন্তু লুটতরাজ, শিশুহত্যা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের নিত্যকর্ম। মুহম্মদ সেই অবাধ নারীভোগ সংযত করার জন্যই চারটি মাত্র বিবাহের গণ্ডিতে বেঁধেছিলেন মুসলমান পুরুষকে।^২ বহুবিবাহ প্রসঙ্গে কুরআনের ৪ সংখ্যক সূরা নিসা-র ৩ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে:

আর যদি তোমাদের এ আশঙ্কা থাকে, যে তোমরা এতিম বা মহিলাদের সাথে ন্যায় বিচার করতে পারবে না, তাহলে সাধারণ নারীদের মাঝ থেকে তোমাদের যাঁদের ভালো লাগে, তাঁদের দুইজন, তিনজন কিংবা চারজনকে বিয়ে করে নাও। কিন্তু যদি তোমাদের এই ভয় হয়, যে তোমরা ন্যায় বিচার করতে পারবে না, তাহলে তোমাদের জন্য একজনই যথেষ্ট। কিংবা যে তোমাদের ডান হাতের অধিকারভুক্ত; তাঁকেই যথেষ্ট মনে করে নাও। সীমালঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য এটাই হচ্ছে সহজতর পন্থা।^৪

এই সুরাটি প্রথম রচিত হয় উহুদের যুদ্ধের (৬২৫ খ্রিঃ) পর, সেই সময় অনেক পুরুষ যুদ্ধে শহীদ হয়। ফলে বহু নারী— বিধবা এবং অনাথা (এতিম) হয়ে যায়। ইসলামি পুরাণের অন্য এক ভাষ্য অনুযায়ী, এই আয়াত রচিত হওয়ার অন্যতম কারণ, নবি ও ইসলামের জন্য মৃত্যুবরণ করা স্বামী হারানো বিধবা নারী ও পিতা হারানো অনাথ সন্তানের জন্য আল্লাহ্ উদ্বিগ্ন হওয়ায় এই আয়াত রচনা করেছেন। যাতে করে অনাথ সন্তান বা বিধবা নারীরা একটা আশ্রয় পায়। এখানে যৌনতা বা পুরুষশাসিত সমাজ সংক্রান্ত কিছু নেই বললেই চলে।^৫

পৃথিবীর যে কোনো দেশের সংস্কৃতি তৈরি হয় সেই দেশের অন্তর্ভুক্ত সন্ধিক্ষণের উপর নির্ভর ক’রে। প্রায় ১৪০০ বছর আগের আগের আরব মরুভূমির সমাজের সঙ্গে বিশ শতকের সমাজের তুলনা অর্থহীনতা ও নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। অথচ সেই বোকামির বশবর্তী হয়েই মুসলিম শাস্ত্রের একাধিক নিয়মকানুন আজও বলবৎ রয়েছে। প্রাচীন সংস্কার এবং পুরুষবাদী প্রথা নারীর জীবনকে কীভাবে তছনছ করে, ভাঙে, মচকায়, ধূলিসাৎ করে সেই অনাশ্রিত, পরাধীন, নিরাবলম্বন নারীর অসহায়ত্বের নানান দিক উন্মোচিত করেছে ফুলবউ।

উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে রাজিয়া এবং মিল্লাত। এবং তাদের ঘিরে নবিনা, মবিন ও রিয়াজদের মতো মানুষ। প্রতিটি চরিত্রই নিজেদের বোধ ও বিশ্বাসের পীড়নে পীড়িত,

কেউ কেউ সমাজের অচলায়তন ভেঙে মুক্তজীবনের স্বপ্ন দেখেছে, কেউবা আরও তলিয়ে গেছে জাহিলিয়া যুগের অতলান্ত গভীরে, কেউবা শাস্ত্রের ভেতরেই খুঁজেছে মুক্তির আশ্রয়।

মিল্লাতের বাবা হাজী নিসার হোসেনের চার নম্বর স্ত্রী হল রিজিয়া। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন রিজিয়ার বয়স ১৯-২০ বছর। যে মেয়ের সঙ্গে মিল্লাতের দাদিমা নাতি মিল্লাতের বিয়ে দিতে চাইতেন। নিয়তির এমনই রহস্যময় খেলা! হাজী উপাধিধারী (যাঁরা মক্কা মদিনা তীর্থ দর্শন করেন তাঁদের হাজী বলা হয়, অর্থাৎ যাঁরা হজ্জ সম্পন্ন করেন।) নিসার হোসেন চার নম্বর বিয়ে করে নবীর সুনাত পূরণ করতে চেয়েছেন।^৬ রাজিয়ার পিসতুতো দাদা আনোয়ারকে বশ করে রাজিয়াকে বিয়ে করে সুনাত সম্পন্ন করেন নিসার হোসেন। শাস্ত্রের একতরফা আইনের কোপে পড়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে রাজিয়া নিসার হোসেনের স্ত্রী হতে বাধ্য হয়।

উপন্যাসের চলন পাল্টে যায় হাজীর মৃত্যুর পর। হাজীর পরিবারের একমাত্র শিক্ষিত যুবক মিল্লাত পৈতৃক বাড়ি সীতাহাটি ছেড়ে শহরের বাড়িতে বসবাস শুরু করে। একরকম ঘৃণার বশেই মিল্লাত শহরে এসেছিল। একটা আলাদা আবাস, নিজস্ব পরিসর, নিজস্ব সভ্যতার খোঁজে। হাজীর মৃত্যুর আগে থেকেই মিল্লাত জানত, পৈতৃক সূত্রে এ বাড়ি তারই প্রাপ্য। অথচ হাজীর মৃত্যুর পর রাজিয়া সে বাড়িতে বাস করতে শুরু করে এবং লোকমুখে মিল্লাত জানতে পারে, এ বাড়ি তার নয়, এ বাড়ির মালকিন তার সৎ মা রাজিয়া।

রাজিয়া শিক্ষিতা। সে বই পড়তে ভালোবাসে। গ্রাম্য সংস্কারকে অতিক্রম করে বাংলা ভাষার প্রতি রাজিয়ার অনুরাগী মনোভাব মিল্লাতকে অবাক করে দিয়েছিল। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায়, রাজিয়ার প্রতি মিল্লাতের কোনোরকম আগ্রহ ছিল না,

একটা উদাসীনতা বিরাজ করত সর্বক্ষণ। অথচ এরপর একই বাড়িতে দুজন মানুষের সৎ মা- সৎ ছেলে কিংবা মালকিন-ভাড়াটিয়া সম্পর্ক ছাড়িয়ে নতুন একটা সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে, তা হল বন্ধুত্বের। মিল্লাতের অনিয়মিত খাওয়া দাওয়া এবং অগোছালো জীবন সম্পর্কে ভাবিত রাজিয়া। তার চিঠিতে উঠে এসেছে, মিল্লাতের প্রতি তার উদ্বেগ ও যত্নশীলতার নমুনা।

‘তালাক’ এবং ‘খালাস’— এই দুই শব্দ ঘুরে ফিরে এসেছে এ আখ্যানে। তালাক মানে বিচ্ছেদ এবং খালাস মানে মুক্তি। অর্থাৎ তালাক হল সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া এবং খালাস হল সম্পর্ককে মেনে নিয়েই মুক্তি দাবি করা। খালাস হল ইহলৌকিক মুক্তি, পারলৌকিক বিচ্ছেদ নয়। তালাক কিন্তু ইহলোক পরলোক সবখান থেকে বিচ্ছেদ। চির-বিচ্ছেদ।^৭ মুসলিম পরিবারে আজও বিবাহিতা নারী মৃত্যুপথযাত্রী তার স্বামীর কাছে থেকে খালাস নেন। শরিয়ত অনুসারে, স্বামীর মৃত্যুর পর জীবিত স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহে বাধা রইল না। আর এখান থেকেই উপন্যাসের গতি এবং গতিপথ বদলে যায়। মবিন, মিল্লাত এবং রিয়াজ তিন পুরুষ এবং সেইসঙ্গে মিল্লাতের বোন নবীনা রাজিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত হয়। শাস্ত্রীয় যুক্তি বনাম ব্যবহারিক যুক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশেষত রিয়াজ, সে সংস্কারপন্থী, আধুনিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে ধর্মীয় আইনকানুনকে বিচারের পক্ষপাতী। রিয়াজের যুক্তিবাদ কিন্তু ধর্মবিরোধী যুক্তিবাদ নয়, সে হাদিস-কোরানের ভেতর থেকেই সমাধান খুঁজতে চেয়েছে।

বৃদ্ধ নিসার আলী রাজিয়াকে জোরপূর্বক বিয়ে করে যে চড়া নাটক তৈরি করে গেলেন, সেই নাট্যমঞ্চ ছেড়ে কেউই বেরোতে পারল না। হাজী নিসার আলী আদৌও তালাক-খালাস কোনোটাই দেননি রাজিয়াকে। অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা নিয়ে রাজিয়াও

পারেনি কোরান-হাদিসের সব নিয়ম ভেঙে ইচ্ছেমতো জীবনকে পরিচালিত করতে। মিল্লাত এবং রিয়াজ চেষ্টা করেছিল মবিনের সঙ্গে পুনরায় রাজিয়ার বিয়ে দিতে। কিন্তু দৈহিক হতাশাপীড়িত যুবক মবিন ‘ফ্রেশ’ মেয়ে চায়। গ্রামবাংলার সমাজে কুমারী মেয়েকেই ‘সতী’ হিসাবে গণ্য করা হয়। এটা যুগ যুগ ধরে সামাজিক নির্মাণের ফসল। ‘পুরুষ বিবাহ করে’ এবং ‘নারীর বিবাহ হয়’— অতএব নারীর দেহ ও মন হবে পুরুষের অধিকৃত। পুরুষের প্রয়োজন ও তাগিদেই নারীর জীবন নির্বাহ হবে। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে যৌন সম্পর্ক হল একতরফা, একরৈখিক। সেখানেও পুরুষের জয়জয়কার, নারী ভোগের বস্তু। প্রচলিত ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়েই মবিন রাজিয়াকে বিয়ে করতে চায়নি, কারণ রাজিয়া কুমারী নয়, সে বিবাহিতা এবং বিধবা।

হাজীর পায়ের তলায় দলিত হওয়া কৃষক, তার জোত-জমির আগলদার, বাঁধা চাষি ছিল মাবুদ। জমি-নারী একাকার হয়ে যায় মেটাফরিক্যাল নির্মাণে। আর্থিক টানা পোড়েনের জ্বালায় অস্থির মাবুদকে প্রলুদ্ধ করে হাজী নিসার আলী।

হাজেরাকে তুই তালুক দে মাবুদ। খেতে দিতে পারিস না, মুই তারে শাদী বসাই।
তালুক দিলে তোকে দু’বিঘা ধানী জমি দিব।^৮

হাজী নিসার আলীকে রোখে কে! সে নবীর সুন্নত পূর্ণ করতে উদ্যত ও অস্থির। চারটি বিবাহ ইসলামি শাস্ত্র-সম্মত। অমোঘ শাস্ত্রের আইন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করেছে হাজী নিসার আলী। আখ্যানের মাবুদ-হাজেরা-নিসার আলীর উপকাহিনিতে লেখক বহুবিবাহের মতো কুপ্রথার তীব্র সমালোচনা করেছেন। মাবুদের সঙ্গে ছিল হাজী নিসার আলীর দোস্তের সম্পর্ক। মনিবের সঙ্গে মাবুদের সম্পর্ক ছিল খোদার সঙ্গে বান্দার অতিপ্রাকৃত সম্পর্কের মতন নিবিড়। আপাত চোখে সেটাকে বন্ধুত্ব বলে মনে হত। বাড়ির লোক ভাবত, ওরা দু’জন বন্ধু। ‘অবিশ্যি বন্ধুত্বই বটে। খোদার সঙ্গে হজরত নবীর যেমন

বন্ধুত্ব। পূর্ণ সমর্পণের সম্পর্ক-সিদ্ধ বন্ধুত্ব। আল্লাহ্ হজরতের দোস্ত। নবীই বলেছিলেন, খোদা তাঁর দোস্ত। অতএব দোস্তের কাছে সব কিছুই সম্পূর্ণ সমর্পণ করা যায়।^৯ খোদার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সুফি-প্রবণতা থেকে সৃষ্ট, আল্লাহ্র সঙ্গে সুফি সাধকরা বন্ধুত্বের বাঁধনেই নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। আখ্যানে কথাকার সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন।

লেখক শরিয়তের একাধিক বিবাহকে যেন কটাক্ষ করেছেন! ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ নবি হজরত মুহম্মদ বাহান্ন বছরে বয়সে আবুবকরের কন্যা আয়েশাকে বিবাহ করেন। মহানবীর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র কুমারী অবস্থায় বিবাহ হয় আয়েশার, বাকি সকলেই ছিলেন বিধবা। প্রায় দেড় হাজার বছর পরেও গোঁড়াপন্থী মুসলমান একাধিক বিবাহকে নবির সুন্নত বলে গণ্য করে এবং পরিবারের মধ্যে গড়ে তোলে অশান্তির বাতাবরণ। হাজী নিসার আলী যখন মাবুদকে বশ করতে পারল না, তখন খবর পেল রাজিয়ার। হাজীর যৌনবিকার ছিল ভয়াবহ। কিশোরী রাজিয়াকে যৌনতার দাসত্বে পরিণত করতে চেয়েছিল হাজী নিসার আলী। অপারগ হয়ে শেষে রাগে, ক্রোধে, হিংসায় রাজিয়ার কনুই পুড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধের যৌনবিকার ছিল উন্মত্ত প্রকৃতির। হাজীর কন্যা নবীনা ব্যবহারিক জীবনে একাধিক বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত। নবীনা বলেছিল:

আমি কারোর কাছে যুক্তি শিখে আসিনি। আমি নিজেই জানি, এ-যুগে চার চারটি বিয়ে কিছুতেই চলে না। একা একটি মানুষ চার চারটি মনকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সেটা অসম্ভব।^{১০}

আবুল বাশারের *আকাশলীনা* উপন্যাসে ইমাম আহসান বলেছিল, ‘পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো অযুক্তির নাম ধর্ম, পদে পদে আমাদের সে কথা বুঝিয়ে চলেছে।’^{১১} প্রকারান্তরে সেই কথাই নবীনা যেন আর একবার স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ সংস্কারপন্থী রিয়াজও সব শোনার পরে রাজিয়াকেই অভিশপ্ত বলে দাবি করতে থাকে। রিয়াজ ছিল

সেই ব্যক্তি যে হাদিস ও কোরানের কথাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। রিয়াজ জানিয়েছিল হাদিসের কথা। কোনো রমণীকে তার স্বামী যদি শয্যায় আহ্বান করে এবং স্ত্রী অস্বীকার করে ও স্বামী ক্ষোভে রাত কাটায়— তাহলে সেই রমণীকে সেই অবস্থা থেকে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা অভিশাপ দেয়।^{১২}

একজন পুরুষের যৌন-কাতরতা ও যৌন-আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল যে তাবৎ ফেরেশতামণ্ডলীরা পুরুষের পক্ষ নিয়ে নারীকে অভিশাপ দেয়, অথচ ইসলামি পুরাণ অনুসারে ফেরেশতারা লিঙ্গহীন, তারা স্ত্রী-পুরুষ কোনোটাই নয়, ঈশ্বরের আদেশ পালন করাই তাদের প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ। হাজীর উদগ্র যৌনকামনা চরিতার্থ না হওয়ার কারণে রাজিয়াকে বৃদ্ধ স্বামীর কাছে থেকে অত্যাচারিত হতে হয়। নিষ্ঠুরভাবে রাজিয়াকে প্রহার করে হাজী নিসার আলী। এই ঘটনা শুনে রিয়াজ বলেছিল:

স্বামী তার স্ত্রীকে কী জন্য প্রহার করেছে তা যেন কেউ জিজ্ঞাসা না করে। আবু দাউদ।
বর্ণনায়- ওমর (রাঃ)। অতএব বোন রাজিয়া, তুমি অভিশপ্ত।^{১৩}

কোরান শরীফ-এ ৪ সংখ্যক সূরা নিসা-র ৩৪ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে:

পুরুষগণ নারীদিগের প্রতি সুপ্রতিষ্ঠিত (কর্তা)। যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সেহেতু যে তারা স্থায়ী ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে। এইজন্য সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগত হয়, আল্লাহর সংরক্ষিত প্রাচল্য অঙ্গ সংরক্ষণ করে, এবং যদি নারীগণের অবাধ্যতার আশঙ্কা হয় তবে তাদের সং-উপদেশ দান কর, এবং তাদের শয্যা থেকে পৃথক কর, এবং তাদের প্রহার কর, অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের জন্য অন্য পস্থা অবলম্বন কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত মহীয়ান।^{১৪}

স্বয়ং ঐশ্বরিক গ্রন্থই আদেশ দিয়েছে, স্ত্রীকে বশে রাখার জন্য দৈহিক নির্যাতন করার অধিকার রয়েছে স্বামীর। পাশাপাশি বিবাহের জন্য অভিভাবকের সম্মতি জরুরি,

নারীর ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষা সেখানে মান্যতা পায় না। শাস্ত্রীয় আইনে নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বর খুব বেশি প্রকট নয়। শরিয়ত অনুসারে, প্রাপ্তবয়স্ক বলতে রজস্বলা নারীদের বোঝায়, অর্থাৎ যে নারীর ঋতুচক্র আরম্ভ হয়েছে তার বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে— এটাই শাস্ত্রের আইন। এবং বয়ঃসন্ধির পরেও অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া নারীর বিবাহ অবৈধ। আনোয়ার জোর করে বিয়ে দিয়েছিল রাজিয়ার। মুসলমানদের হাদিসে এ ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে:

যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল।^{১৫}

গোঁড়াপন্থী মুসলিম নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি আরাম আয়েশের জন্য নির্বাচিত কিছু হাদিসের অবতারণা করে এবং কাজ হাসিল করে। রিয়াজ গুনিয়েছিল অন্য কথা, শাস্ত্রের যে আইনের ফাঁকে লুকিয়ে আছে রিজিয়ার মুক্তির চাবিকাঠি।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক বালিকা (প্রাপ্তবয়স্ক বালিকা ব্যাকরণসিদ্ধ নয়, কিন্তু হাদীস-সিদ্ধ। হায়েজ অর্থাৎ মুসলমান বালিকার বয়ঃপ্রাপ্তির সম্বন্ধ আছে।) রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এসে বলল যে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিতা তাকে বিবাহ দিয়েছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বিবাহ বাতিল করার স্বাধীনতা দান করলেন। আবু দাউদ। বর্ণনায়— ইবনে আব্বাস(রাঃ)। বুখারী শরিফেও অনুরূপ ঘটনা আছে। তার মানে এই বিয়ে হয়নি। দ্বিতীয়ত আবু হোরাইরা খুব কড়া করে বর্ণনা করেছেন, বুখারী বা মুসলিম যেখানে খুশি দেখতে পারো— কোনো ব্যক্তি কোনো স্থানে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে ব্যক্তি উক্ত প্রস্তাব ত্যাগ না করা পর্যন্ত যেন তার কোনো মুসলমান ভাই সেখানে বিবাহের প্রস্তাব না করে। অতএব এ বিয়ে হয়নি।^{১৬}

‘বিবাহ বাতিলের স্বাধীনতা’, ‘বিবাহের প্রস্তাব’, ‘বিবাহের প্রস্তাব বাতিলের স্বাধীনতা’— কোথাও নারীর নিজস্ব বক্তব্য নেই, সর্বত্রই পুরুষদের জয়জয়কার। রিজিয়া ক্যারম-বোর্ডের ছন্নছাড়া গুটি, যাকে চারিদিকে স্ট্রাইকার দিয়ে খেলছে শরিয়তের অযৌক্তিক নিয়মতন্ত্র। হাজীর সঙ্গে রাজিয়ার বিবাহ যে অবৈধ তা প্রমাণ করার জন্য

রিয়াজের প্রাণান্তকর দৌরাণ্য নিরন্তর বেড়ে চলে। আর এই কুৎসিত সংস্কারের ছত্রছায়ায় মিল্লাতের নানী (দিদিমা) বসবাস করলেও তিনি নারীর স্বাধিকার লড়াইয়ের পথে ইন্ধন জুগিয়েছেন রাজিয়াকে। নানী ধর্মভীরু এবং নারীত্বের বৃত্তে অবস্থান করলেও অনুভব করেছেন রাজিয়ার যন্ত্রণা ও বিষাদের আততিকে। হাজীর পাপ যেন তার সন্তান নবীনা-মিল্লাতদের তাড়া করছে। নবীনার উপলব্ধি নানীকে স্পর্শ করে, নানীর মুখে ভেসে আসে— ‘জীবনটা যে পাপ থেকেই সৃষ্টি মা!’— ইহুদি পুরাণের মতো ইসলামি পুরাণের শুরুতেও রয়েছে আদমের পাপ ও অবাধ্যতার কাহিনি। আল্লাহর আদেশ অমান্য করে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিল আদম ও হাওয়া বিবি (ইহুদি পুরাণে ইভ)। পৃথিবীর প্রথম পাপী মানুষের তকমা নিয়ে স্বর্গচ্যুত হয়েছিল আদম। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে আদম তাঁর ‘চয়েস’, তাঁর স্বাধীনতার বীজ বপন করতে চেয়েছিল। তাই সে হয়ে গেছিল বিচ্ছেদের অনিবার্য অংশীদার। পাপের শাস্তি স্বরূপ আদম ও হাওয়া বিবি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে পতিত হয়েছিল। সৃষ্টির আদিতেই এই পাপ সঞ্চারিত হয়ে আছে আদম ও হাওয়া বিবির সন্তানদের শরীরে, অস্থি-মজ্জায়। নারীকে কেন্দ্রকে এক ভাই আর একভাইকে হত্যা করে। ইসলামিক পুরাণ অনুসারে পৃথিবীর প্রথম হত্যাকারী কাবিল এবং প্রথম শহীদ হাবিল।^{১৭}

আদিকালেই নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। আকলিমা নামক রমণীকে পাওয়ার লোভে রাগে হিংসায় উন্মত্ত হয়ে হাবিলকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল কাবিল। পুরাণের এই কাহিনিকেই আখ্যানকার যুক্ত করেছেন সমকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে। মানুষের মাংসেই গেঁথে আছে সেই পাপ। মনুষ্যজন্ম বংশপরম্পরায় সেই পাপ রক্তে বয়ে চলেছে অনাগত সময়ের দিকে। উপন্যাসে আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় হাজীর একাধিক বিবাহ এবং জোরপূর্বক রাজিয়াকে বলাৎকারের মধ্যে দিয়ে ‘আদিম পাপ’ একাকার হয়ে যায়। আখ্যানের রিয়াজ হল সংবেদনশীল মানুষ। সে আর্টিস্টের মন নিয়ে

শিল্প-সৌন্দর্য নিয়ে লেখা পড়ে আত্মস্থ করতে পেরেছে সৌন্দর্য এবং নগ্নতাকে, পাশাপাশি নগ্নতার মধ্যে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করার দক্ষতা অর্জন করেছে। হাজীর সঙ্গে রাজিয়ার বিবাহকে রিয়াজের মনে হয়েছে, নগ্ন, অসুন্দর। মিল্লাত-রাজিয়ার সম্পর্ককে যে সমাজ প্রতিষ্ঠা দিতে চায় না, নগ্ন বলে বহিষ্কার করে, তার মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে পায় রিয়াজ। মুসলমান সমাজের একজন হয়ে রিয়াজ অনুভব করেছে সমাজ-জীবনে নারীর অসহায়তার কথা। উনিশ শতকের নবজাগরণ বাংলার সমাজে-সাহিত্যে প্রভূত আলোড়ন তুললেও তাতে মুসলিম সমাজের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের হাত ধরে যেভাবে হিন্দু সমাজের সংস্কার হয়েছিল, মুসলিম সমাজের গায়ে নবজাগরণের তেমন আঁচ একফোঁটাও লাগেনি। একদিকে ঐতিহ্যের প্রতি পিছুটান, অন্যদিকে আধুনিকতার হাতছানি। সনাতন বুদ্ধিজাত মানুষদের সঙ্গে প্রগতিশীল মানুষদের তর্ক। হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যকার বিরোধ, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর উদ্ভব, খ্রিস্টান মিশনারীদের দৌরাত্ম, বাংলা গদ্যের সূচনা, ছাপাখানা বা মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা— এতকিছুর মাঝেও মুসলিম পরিবারের নারীদের সামাজিক অবস্থান বদলায়নি। উনিশ শতকের সমাজ ছিল মূলত পিতৃতান্ত্রিক। শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্ররা ছিল নারীর রক্ষাকর্তা। নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা ব্যক্তিত্বের বোধ গঠন করতে দেয়নি সমাজ। জন্মের পরেই বিবাহ, স্বামী মারা গেলে সহমরণ। কৌলীন্য প্রথার কুপ্রভাব বাংলার সমাজে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল তা থেকে নারীদের মুক্তি পেতে কেটে গেছে কয়েক শতাব্দী। উনিশ শতকের সমাজে নারীদের লেখাপড়া তো দূরে থাক, লেখাপড়া শিখতে চাওয়াটাই ছিল প্রবল অপরাধের। গোটা উনিশ শতক জুড়ে যে সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল মূলত নারীশিক্ষা ও নারী সমাজের সার্বিক প্রগতি। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বঞ্চিত নারীর অবস্থান ছিল পরিবারের অন্তরমহলে। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতোই নারী বাইরের আকাশে পাখা মেলায় জন্যে ডানা

ঝাপটাত, নারী পায়নি মুক্তির স্বাদ। সমাজের সংস্কার ও নানান অযৌক্তিক প্রথার বিরোধিতা করে কেউ কেউ নারীদের অন্তরমহল থেকে বের করে এনেছিলেন। নারী নির্মাণ করতে পেরেছিল তার নিজস্ব চিন্তা ভাবনার পরিসর। অথচ সেই পরিবর্তনের ঢেউ মুসলিম সমাজে ততটা জোয়ার আনতে পারেনি। বিশ শতকের শুরুতে বেগম রোকেয়ার মতো নারীরা মুসলিম সমাজের গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজের গায়ে আঘাত হানার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক ভাবনার বিস্তার মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের উন্নতি হয়নি। কেননা মুসলমান সমাজের জ্ঞানচর্চা মিথ-পুরাণ নির্ভর সংস্কৃতি ও ধর্মকেন্দ্রিক পুস্তকের মধ্যেই আনাগোনা ছিল। ধর্ম পরিচয়কে গৌণ করে বাঙালিসত্তার জাগরণ ঘটেনি। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অসম্মত হওয়ার ফলে ধর্মীয় জাত্যাভিমান ও ধর্মীয় গোঁড়ামিই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি শাস্ত্রের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে জীবনকে পরিচালিত করতে গিয়ে নারীর জীবন হয়ে উঠেছিল বিপন্ন। আর সেই ধারা বয়ে চলেছে বর্তমান সময়েও। আজও গ্রামবাংলার সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মৌলবীরা। ইসলামি শাস্ত্র ও মোল্লাতন্ত্রের দাপটে নারীর জীবনে কোনো সদর্থক পরিবর্তন আসেনি। এই রক্ষণশীল গোঁড়াপন্থী সমাজেরই বহুমাত্রিক সমস্যাকেই প্রতিফলিত করেছেন ঔপন্যাসিক আবুল বাশার।

আকবর মৌলবীর সঙ্গে রিয়াজের কথোপকথনে উঠে এসেছে শরিয়তের হরেকরকম নিয়মকানুন। হাদিসে রয়েছে, পিতা যে নারীর প্রতি যৌনতা অনুভব করেছে কিংবা কামপরবশ হয়ে যৌন দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখেছে তাহলে সেই মেয়ের সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে অবৈধ।^{১৮} শরিয়তের যুক্তির কাছে হার মানতে হয় রিয়াজকে। রিয়াজ মুক্তমনা হলেও সে ধর্মকে গৌণ করে জগৎ-জীবনকে দেখতে চায়নি। পাশ্চাত্য যুক্তির কণ্ঠিপাথরে সত্য-মিথ্যা যাচাই করার সংসাহসও তার ছিল না। ইসলামি শাস্ত্র এবং

শরিয়তের মধ্যে অবস্থান করেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে রিয়াজ। আকবর মৌলবীর বক্তব্য অনুযায়ী হাজী নিসার হোসেন মূলত হজরত মুহম্মদকে অনুসরণ করে তার মতো মহৎ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। হজরত মুহম্মদ একাধিক বিবাহ করলেও তার স্ত্রীর মধ্যে হজরত আয়েশা ব্যতীত সকলেই ছিলেন বিধবা নারী। একমাত্র কুমারী অবস্থায় বিবাহ হয়েছিল আয়েশার। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, হজরত মুহম্মদ ছিলেন ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ নবি এবং আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় প্রতিনিধি। ধর্ম এবং শাস্ত্রের অপব্যবহার করে হাজী নিসার তার কামনা পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। ইসলামি শাস্ত্রে সর্বাধিক চারটি বিবাহের নির্দেশ রয়েছে। উপন্যাসের হাজী নিসার হোসেন শাস্ত্রের সেই নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেয়েছে। অথচ ইসলামি পুরাণের আকরগ্রন্থ কোরান শরীফ-এর চার সংখ্যক সূরা নিসা-র তিন সংখ্যক আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

আর যদি তোমাদের এ আশঙ্কা থাকে, যে তোমরা এতিম (পিতৃহীন)-দের সঙ্গে ন্যায়-বিচার করতে পারবে না, তাহলে সাধারণ নারীদের মধ্যে থেকে তোমাদের যাঁদের ভালো লাগে, তাঁদের দুইজন, তিনজন কিংবা চারজনকে বিয়ে করে নাও। কিন্তু যদি তোমাদের এই ভয় হয়, যে তোমরা ন্যায়-বিচার করতে পারবে না, তাহলে তোমাদের জন্য একজনই যথেষ্ট। কিংবা যে তোমাদের ডান হাতের অধিকারভূক্ত; তাঁকেই যথেষ্ট মনে করে নাও। সীমালঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য এটাই হচ্ছে সহজতর পন্থা।^{১৯}

প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বের মধ্যপ্রাচ্য থেকে উদ্ভূত আইনকে দক্ষিণ এশিয়ার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ তার ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে গিয়ে দুজন মানুষকে ঠেলে দিয়েছে অসুরক্ষিত অন্ধকারে। ধর্ম স্বাধীনতার চেয়ে ধর্মীয় অস্তিত্বই যখন বড়ো হয়ে ওঠে মানুষের কাছে তখন মানুষ কেমন পাপবুদ্ধির গোলোকধাঁধায় নিমজ্জিত হয় সেই কাহিনিই গুনিয়েছেন আখ্যানকার।

আখ্যানে বহুবার উঠে এসেছে মিল্লাত ও রাজিয়ার পারস্পরিক আকর্ষণ-অভিমানের চিত্র। পুরাণের জটিল কুটিল নিয়ম তাদের সৎ মা-সন্তানের পরিচিতি গড়ে তুললেও অতীতের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পদে পদে ভয় আর নিষেধের দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে অনবরত। শাস্ত্রের হুকুমের বিরুদ্ধে মিল্লাত দাঁড়াতে পারেনি। রাজিয়াকে বারংবার উপদেশ দিয়েছে, অনুরোধ করেছে মবিনকে বিয়ে করার জন্য। মুসলিম গোঁড়া সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছে মিল্লাত। উল্টোদিকে রাজিয়ার অনুভূতিতে ধরা পড়েছে বিবাহ-বিচ্ছিন্না নারীর হাহাকার:

আমার যে কোন বাড়তি ভালোবাসার ক্ষমতা নেই মিল্লাত। আমায় ক্ষমা করে দিও। আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি। নতুন করে ভালোবাসার জন্য আমি কোন আলাদা নতুন জীবন পাব না। আমার পুনর্জন্ম নেই। আমি হিন্দু নই। মুসলমানকে একবারই ভালোবাসতে হয়, এই ক্ষুদ্র জীবনে যা পাওয়ার আদায় করে নিতে হয়। যত পাপ, যত পুণ্য একখানা ক্ষুদ্র জীবনের জন্য। আবার এই মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসার কোন বিধান নেই। বেহেস্তের ভালোবাসা আমি কী করব? পৃথিবীর ভালোবাসা পৃথিবীতেই রেখে যেতে হবে। বেহেস্তে কখনও পৃথিবীকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। রোজ কেয়ামতের দিন আমি মিল্লাতকে চিনতে পারব না। মিল্লাত আমায় চিনবে না। এই দুনিয়ার ভালোবাসার শক্তি বেহেস্তে অন্ধি পৌঁছয় না। কারণ বেহেস্তে গিয়ে মানুষ এই মাটির পৃথিবীকে ভুলে যায়। এখানকার ভালোবাসার পাপে মানুষের দোজখ হবে। কিন্তু সেই পাপ করতে আর একবার যদি মন চায়, মন সেই সুযোগ পাবে না। এখানকার মতন সেখানকার জীবনও অসহায়। সেখানে গিয়েও আমাকে নিসার হোসেন বা মবিনের সেবা করতে হবে। আমার জন্য আমার ভালোবাসার হৃদয় সেখানে অপেক্ষা করবে না। এই জীবনের সব পুরস্কার সেখানে পাওয়া যায়, কিন্তু মিল্লাতকে পাওয়া যায় না। খোদা যদি আমার জন্য একটি মাত্র পুরস্কার ঘোষণা করতেন, আমি তাহলে মিল্লাতকে চাইতাম। বলতাম, যে-সুযোগ দুনিয়ায় ছিল না, সেই সুযোগ দাও। পাপ করার সুখ আমাকে দাও। শুনেছি, সেখানে সব সম্ভব। কিন্তু মনের মতন পৃথিবী সেখানে নেই। মানুষ এত বোকা যে বেহেস্তে পৌঁছে একবারও এই মাটির পৃথিবীর জন্য কাঁদে না। হায়! কাঁদে না কেন?^{২০}

হিন্দু শাস্ত্রে পুনর্জন্মের বর্ণনা থাকলেও ইসলামি শাস্ত্রে পুনর্জন্মের কোনো উল্লেখ নেই। কোরান ও হাদিসে, পৃথিবীর জীবনকে অস্থায়ী এবং মৃত্যু পরবর্তী স্বর্গ-নরকের জীবনকে চিরস্থায়ী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রোজ-কেয়ামত অর্থ শেষ বিচারের দিন। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, শেষ বিচারের সময় সকলেই নিজের চিন্তায় অস্থির থাকবে। কারণ পাপ-পুণ্যের হিসাবের পর স্বর্গ-নরকে স্থায়ীভাবে বসবাসের ‘সার্টিফিকেট’ দেওয়া হবে। স্বর্গের সুখ এবং নরকের শাস্তি বিষয়ে মুসলমানদের কোরান-হাদিসে প্রভূত বর্ণনা রয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থে বা ইসলামি শরিয়তে মর্ত্যে যা কিছু নিষিদ্ধ স্বর্গে তার পূর্ণ ছাড়পত্র রয়েছে। ধর্মীয় কঠোর আইনের বলি হয়ে রাজিয়া তার পাপ-পুণ্যের প্রতিদানে মিল্লাতকে প্রার্থনা করেছে। শিক্ষিতা রাজিয়ার উক্তির মধ্যে দিয়ে যেন ইহকাল অপেক্ষা পরকালকে শ্রেষ্ঠ মনে করে ইহকালকে হেলায় নষ্ট করার মানসিকতার প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ পেয়েছে। আবুল বাশারের ‘নাস্তিক’ গল্পের কথক মামুন খতিব সাহেবকে বলেছিল:

একজন জান্নাতবাসীর জন্যে কী অঢেল আয়োজন, ভাবলেই তাক লাগে। পরকালে সত্তরজন হরী আর ইহলোকে স্বামীর পদতলে লুপ্তিত হচ্ছে স্ত্রীর বেহেশ্ত। একজন পুরুষের বিস্ময়কর সেক্স-অ্যাবিলিটি, পশুর চেয়ে বীভৎস। সত্তরজন হরী। অঙ্গরী। ভয়াবহ কামবিকার, মাফ করবেন খতিব, এত অশ্লীল কথা।^{২১}

মামুনের মতো শাস্ত্রের অযৌক্তিক নিয়মের শিকার রাজিয়ার অন্তঃকরণেও যেন অলৌকিক অবাস্তব পৌরাণিক যুক্তিবোধে চমক লাগে। মামুনের মতো রাজিয়ার উপলব্ধিতে উঠে এসেছে শরিয়তি আইনের কবলে পড়া নারীর সামাজিক যৌন শোষণের কথা ফুটে উঠেছে। পর্দা-বোরখার ঘেরাটোপে নারীকে বন্দি করে পুরুষ তার ক্ষমতা ও ঐশী গ্রন্থের দোহাই দিয়ে সমাজকে করে তুলেছে পিতৃতান্ত্রিক। পৃথিবীতে কোনো ধর্মই নারীকে তার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করেনি। নারীরা আদিকাল থেকেই সমাজে অসহায়। ধর্মের প্রতিভূ পুরুষ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গড়ে নারীকে করেছে বাতিল, অপাণ্ডিত্য।

সংসারে যৌনতার দাসত্ববৃত্তি করে নারী রয়ে যায় কোণঠাসা। বস্তুত, এই বোধ ও বিশ্বাস থেকেই ধর্মের ঐশ্বরিক গ্রন্থগুলিতে স্বামীর পায়ের তলে নারীর জ্ঞানাত রয়েছে ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ নারীকে আজীবন স্বামীর মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। নারীর ব্যক্তিগত সুখ-আহ্লাদ সেখানে মিথ্যে। ইসলামি পুরাণেও 'হ্র' নিয়ে একগাদা আয়াত রচিত হয়েছে, সেখানে শুধুই পুরুষের জয়জয়কার ও পরকালের পুরস্কারের বৃত্তান্ত।^{২২} সেই বৃত্তান্তের পরতে পরতে নারী যে ভোগের সামগ্রী সেই বীজ নিহিত। অন্যদিকে 'ধার্মিক তো সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করে না। কারণ, ধর্ম আর শাস্ত্রীয় ব্যাপার নিয়ে বিচার করাটাই তার কাছে অধর্ম। তার একমাত্র অবলম্বন অন্ধ বিশ্বাস আর অন্ধ অনুসরণ। একজনের জন্যে সত্তর হাজার হ্র সম্ভব কি অসম্ভব, সম্ভব হলেও একত্রে অতগুলি হ্র দিয়ে সে কী করবে এ সব অতি স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রশ্নও তার মনে উদয় হয় না— হলেও উত্তর সন্ধান সে নিষ্পৃহ অথবা শঙ্কিত। সে উত্তর যতই লজিক্যাল বা যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, তার কাল্পনিক পরিণাম ভেবে সে আরও বেশি ভীত। যে মানুষ লজিক বা যুক্তির সম্মুখীন হতে ভয় পায়, তার কাছে মননশীলতা বা মুক্তবুদ্ধির চর্চা এক নিষিদ্ধ ব্যাপার। এমন মানুষকে সত্তর হাজারের পরিবর্তে সত্তর লক্ষ বললেও সে বিশ্বাস করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। হয়তো ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে আরও বেশি উৎফুল্ল, আরও বেশি বেপরোয়া ধার্মিক হয়ে উঠবে। যে মানুষ জীবনে একটা হ্র সামলাতেই গলদঘর্ম, মৃত্যুর পর সে সত্তর হাজার সামলাবার অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবে— এমনতর অদ্ভুত বিশ্বাসই সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ ও সম্মোহিত করে রাখে'।^{২৩} প্রায় সব ধর্মেরই ঐশ্বরিক গ্রন্থগুলিতেও ঈশ্বর বলেছেন, আমার সৃষ্টিরহস্য নিয়ে ভেবো না, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও প্রকৃতি, পাহাড়-পর্বত ও তাবৎ বালুকারাশি নিয়ে ভাবো। ভাবো আকাশকে আমি চাদর এবং ভূমিকে আমি বিছানা বানিয়ে দিয়েছি।— এসব পড়লেও মনে হয়, ১৩৮০- কোটি

বহুর আগে ঘটে যাওয়া মহাবিস্ফোরণের পরেও ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির দিকে যেন বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রয়েছেন। ঈশ্বরের উপলব্ধি থেকেই জন্ম হয়েছে ধর্মের। ধর্ম মানুষকে বেঁধে দিয়েছে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বৃত্তে, কেড়ে নিয়েছে নিজেকে আবিষ্কার করার সমস্ত ক্ষমতা। সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে অদৃশ্য ঈশ্বর এবং তাঁর স্বর্গের শান্তিসৌধ কিংবা নরকের অগ্নিময় ইমারত। সভ্যতার শুরু থেকেই ধর্ম আর কাঁটাতারই মানুষকে বারংবার দণ্ড, বিচ্ছিন্ন ও যুদ্ধলিপ্ত করেছে।

কেবল হাজীই নয়, মবিন চরিত্র এবং তার মুখ ও মুখোশের মধ্যকার ব্যবধানকে টেনে-হিঁচড়ে প্রকাশ করে দিয়েছেন কথাকার। পাশাপাশি মুসলিম সমাজের নারীর সামাজিক যৌন শোষণের দিকটিও উদ্ঘাটিত হয়েছে। নবীনার প্রতি প্রেম, প্রেম থেকে যৌনতায় আসক্তি এবং সেই যৌনতা ক্রমশ সংক্রামিত হয়ে মবিনের মস্তিষ্ক-বোধ ও বোধির তলদেশে বিপজ্জনকভাবে অবস্থান করে রাজিয়া। রাজিয়ার প্রতি মবিনের শরীরী আকর্ষণ এতটাই প্রবল ছিল তার ব্যক্তিগত ‘ফ্যান্টাসি’-বিশ্বে রাজিয়ার শরীরী আকাঙ্ক্ষা এবং ইন্দ্রিয় মাদকতার কোনো স্তর ছিল না। নবীনার সঙ্গে দৈহিক সংসর্গে লিপ্ত হলেও মবিন ডুবে যায় তার নির্মিত ‘ব্যক্তিগত ডিজায়ার’-এর জগতে। নবীনার শরীরে রাজিয়াকে খোঁজে নিরন্তর। রাজিয়ার প্রতি যৌনতার উদগ্র চোরাশ্রোত নবীনার ভেতরে খুঁজতে থাকে বিকৃত-মস্তিষ্কের অধিকারী মবিন। নিজের সুপ্ত কামনা পূরণ করতে না পারার ব্যর্থতা তাড়িয়ে বেড়ায় মবিনকে। শেষমেশ ক্ষোভে-ক্রোধে রাজিয়াকে ভেবে তার হাদিসের কথা মনে পড়ে। যেখানে নারীকে বলা হয়েছে ‘শয়তানের পাতা ফাঁদ’। ‘রাজিয়ার রূপের মধ্যে সেই ফাঁদ পাতা আছে। নারীকে ধরেই শয়তান মানুষের জীবনে প্রবেশ করে। নারী হচ্ছে ছিদ্র। সীতাহাটিতে হাজী নিসার হোসেনের মৃত্যুর দিন রাজিয়ার দুটি বিষণ্ণ মধুর চোখের ছটায় সজ্জিত সৌন্দর্যে যে করুণঘন রূপ-ন্যাস দেখেছিল মবিন, তা ভোলার নয়। রিয়াজের

লাইব্রেরিতে সেই মেয়েকেই দেখেছে আরও বিপজ্জনক। সংসারে এমন কিছু মেয়ে থাকে, যাদের বেঁচে থাকার মধ্যেই কেমন এক অবৈধতার গন্ধ তৈরি হয়ে আশ্চর্য আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তারা বেশ্যা নয়। বেশ্যা-কল্ল।^{২৪} মবিনের দুর্বোধ্য যৌনতার নিস্তরঙ্গ ভূমিতে রাজিয়ার রূপজ আকর্ষণ এনেছে প্রভূত জোয়ার। যার জেরে সুস্থ সম্পর্কের সুতো ছিন্নভিন্ন হয়ে মবিনের মধ্যে জেগে রয়েছে শুধুমাত্র শরীরী আকাজক্ষার ক্রোধ। তার ‘মনের মধ্যে অকারণ এক উচ্চ অল্লীল অবৈধ ধারণার সঙ্গে মিশে আছে কেমন এক তীব্র কামনা’। এই কামনার বশেই একরাতে রাজিয়াকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে মবিন। রিয়াজ মিল্লাতের সঙ্গে রাজিয়ার বিবাহ স্থাপন করে যে গোঁড়া সমাজের বুকো আঘাত হানতে চেয়েছিল, সেই সমাজের মুরব্বি ছিল মবিন। যারা নারীকে পুরুষের সেবাদাসী এবং ভোগের সামগ্রী ভাবে। ধর্ষিত হবার পরেও রাজিয়ার নির্লিপ্ত মনে ভেসে এসেছে প্রতিবাদী স্বর:

রিয়াজজী! পাগল তো আপনারাই। যা কল্লনা, অবাস্তব, অর্থহীন, তারই উপাসনা করেন। গাওনা করেন। কিসের সভ্যতা আপনাদের? যা প্রাগৈতিহাসিক, ট্রাইবাল, পুরনো, সেইসব? নিসারের সম্পত্তি বলেই আমি মিল্লাতের সম্পত্তি হতে পারি না। আমি কারো নই। আমি আমার। বাপ চেয়েছে পায়নি। ছেলে চেয়েছে, পাবে না। ব্যস। নাটক তো শেষ হয়ে গিয়েছে।... এসব কথা আপনিই বলেছেন বাপের সম্পত্তি মানে ছেলের সম্পত্তি। আরবে এককালে আমাদের মতন মা ছেলের বিয়ে চালু ছিল। তাই না?^{২৫}

রাজিয়ার স্পর্ধিত প্রতিবাদ সমাজের গোঁড়া অংশের বিরুদ্ধে। মবিনদের মতো ধর্মের ধ্বজাধারী মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় জোরপূর্বক ধর্ষণকেও আইনত শুদ্ধ মনে করে। যেন কিছুটা শিক্ষা দেওয়া গেল ‘বেশ্যা-কল্ল’ মেয়েটিকে। নিজের সৌন্দর্যকে ভালোবেসে ও একরাশ সাহস সঞ্চয় করে রাজিয়া মিল্লাতের সঙ্গে তার স্বপ্নের দুর্গম চূড়ায় বসতে চেয়েছিল, অথচ ‘গত রাতে রাজিয়ার দেহে এক পাপ প্রবেশ করেছে, যা শুধু ধর্ষণ নয়। ধর্ষণের সঙ্গে ধর্ম প্রবেশ করেছে। ভয় ঢুকেছে। অথবা যে ভয় ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে মরে

আসছিল, তা ফের পূর্ণোদ্যমে জীবিত হয়ে উঠেছে’। ‘আমি সম্পত্তি হতে পারি না’— কথার মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে বেশি। কখনও মিল্লাতের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব, কখনও মবিনের শারীরিক অত্যাচার এবং সেইসঙ্গে অকাল বৈধব্যের যাতনা— একজন গ্রামীণ মুসলিম নারীর ব্যক্তিগত টানাপোড়েন ও তার প্রতিবাদী সত্তার উন্মীলন দুই-ই লেখক দেখিয়েছেন। সেইসঙ্গে রাজিয়ার বক্তব্যের ক্ষিপ্ততায় মুসলিম সমাজের অন্তরে অন্তরে লালিত হওয়া প্রাচীন যুগের ‘ট্র্যাডিশন’-এ লাগে জোরালো থাপ্পড়।

আখ্যানের রাজিয়া এবং নবীনা দুই নারী চরিত্রের মধ্যে দিয়েই লেখক নিরাবলম্বী গ্রামীণ মুসলিম নারী জীবনের অসহায়ত্বকে তুলে ধরেছেন। রাজিয়া এবং নবীনা একই মুদ্রার দুই পিঠ। নবীনার স্বামী সাদিক দ্বিতীয় বিবাহ করে বাহারপুরে থাকে, সীতাহাটির পথ মাড়ায় না। নিতান্তই সাধারণ গৃহবধূ নবীনা স্বামীর অনুপস্থিতিতে পূর্ব প্রেমিক মবিনের সংস্পর্শে এলেও ভাই মিল্লাতের সঙ্গে রাজিয়ার বিয়ে দেবার নানান চেষ্টা করে। বিকৃতমনস্ক মবিন নবীনার প্রতি শারীরিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করে না। আবুল বাশারের বেশিরভাগ কথাসাহিত্যের মুসলিম নারীরা মিথ-পুরাণ নির্ভর শরিয়তের ছত্রছায়ায় বড়ো হলেও তাদের প্রতিবাদী সত্তার মধ্যে দিয়েই উন্মোচিত হয়েছে সমাজের রক্ষণশীল মানসিকতা এবং চূড়ান্ত গোঁড়ামির প্রসঙ্গ। মবিনকে বলা নবীনার উক্তির মধ্যে দিয়ে সেই সত্যই প্রকাশিত হয়েছে:

মেয়েদের নসীব তো খোদা বানায় না। মানুষ তৈরি করে। সেই বরাত খোদা পুরুষকে দিয়েছেন। তোমরা সব পারো। তোমাদের ঈমান খেলা দেখে মনে হয় খোদার লীলা তো পুরুষেরই হাতে। খোদা একটা পুতুল। তোমরাই বাজিকর।^{২৬}

পুরাণ-নির্ভর ধর্ম-সংস্কৃতির একতরফা আইন, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অনড় বিধিবিধানের বিরুদ্ধে নবীনার তীব্র ধিক্কার তার বিশ্বাস ও অবস্থানের যোগসূত্রটি নির্ণয় করে দিয়েছে। পৃথিবীর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলে না। এমনকি আব্রাহামিক ধর্মগুলির ঈশ্বরের চিহ্নায়কও পুরুষ। বিশেষত, ইসলামি পুরাণের বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ বা তালাক এবং বহুবিবাহ— সবকিছুর মধ্যেই পুরুষকারের প্রাধান্য। এ উপন্যাসেও মবিনের মন ও মননে ফিরে এসেছে ‘আন-নেসাও হাবালাতিস শায়াতিন’— হাদিসের সেই অমোঘ বাণী। অর্থাৎ ‘মেয়েরা হল শয়তানের ফাঁদ’। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, নিকৃষ্টতম প্রাণী যারা মানুষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে থাকে, যারা মূলত দুষ্ট আত্মা এবং মানুষকে খারাপ কাজে নিরন্তর প্রলুব্ধ করে— তারাই হল শয়তান। ইসলামি পুরাণের অন্যতম আকর গ্রন্থ ‘মোসলেম শরীফ হাদিস’-এ রয়েছে, নারীকে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে পুরুষের জন্য কখনই সোজা হবে না। তার দ্বারা কাজ আদায় করতে হলে এই বাঁকা অবস্থায়ই আদায় করতে হবে। সোজা করতে গেলে ভেঙে যাবে। ভাঙার অর্থ হল তালাক (বিবাহ-বিচ্ছেদ) ঘটে যাওয়া।^{২৮} ইসলামি পুরাণে রয়েছে, পৃথিবীর প্রথম মানব আদমের বাঁ পাঁজরের হাড় থেকে হাওয়াকে (ইহুদি ও খ্রিস্টীয় পুরাণে ইভ) সৃষ্টি করেছিলেন।^{২৯} এই কাহিনিই নানা রূপ নিয়ে মুসলিম জনমানসে বহু মিথের জন্ম দিয়েছে। গোঁড়াপন্থীদের মনে বাসা বেঁধেছে হরেকরকম কিসসা। জনপ্রিয় প্রবাদ— ‘সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে’— নারীকে স্বাবলম্বী না করার পেছনে এমন নানান যুক্তি তৈরি হয়েছে গ্রামীণ মুসলিম সমাজে। নবীনা-রাজিয়া তেমন এক সমাজেরই ক্ষুদ্র অংশ। আর মবিন সেই সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে নারীকে ভোগ্য ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। রাজিয়ার রূপজ মোহে মুগ্ধ হয়ে তার শরীরে যৌনতার বিদ্যুৎ ঝিলিক খেলে যায়। কখনও নবীনা কখনও রাজিয়া— দুজনের প্রতিই যৌন ‘অবসেশন’

এবং দুর্মর যৌনতৃষ্ণা মবিনকে তাড়িয়ে বেড়ায়। অন্যদিকে সংস্কারপন্থী মানুষ রিয়াজ শরিয়তের গভীরে প্রবেশ করে ব্যক্তিগত যুক্তি দিয়ে যা কিছু বোঝে বাকিদের বোঝাতে চাইলেও কেউ বোঝে না। শরিয়তের হুকুম এমনই অকাট্য, দৃঢ় ও অপ্রতিরোধ্য। উনিশ শতকের বাংলায় নারী-মুক্তি আন্দোলনে রামমোহন-বিদ্যাসাগর যেভাবে একা হয়ে গেছিলেন। সংখ্যাগুরুদের দাপটে তাঁদের লড়াই থামেনি, রিয়াজ আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে যায়। আকবর মৌলবীকে যেনতেন প্রকারে রাজি করিয়ে মিথ্যাতের সঙ্গে রাজিয়ার বিবাহ সম্পন্ন করতে চেয়েছে রিয়াজ। রিয়াজের মতো মানুষদের গোথাসে গিলে নেয় রক্ষণশীল মৌলবাদী গোষ্ঠী। এ কথা উঠে এসেছে নবীনার অনুভূতিতে:

নবীনা সারারাত ঘুমাতে পারে না। বারংবার মন বলে ওঠে, লোকটি খুন হবে। কেন খুন হবে না? সমাজের চোখে তার মতে অপরাধী আর কে আছে? তার মতো অসহায়ই বা কে? তার লোকবল নেই। তার পেছনে ধর্মশক্তি নেই। সে একা। একঘরে। এমন লোক খুন হলে পৃথিবীর কিছু যায় আসে না। তার জন্য কাঁদবার মতন পৃথিবীর কোথাও কেউ নেই। রাজিয়া কাঁদবে। সে কান্না পৃথিবীর কেউ শুনবে না। চোরের মতন কাঁদতে হবে। বলতে পারবে না কেন সে কাঁদছে। কেন খুন হল সে কথাও কেউ বিচার করবে না। কারণ ঐ জাতের মানুষ খুন হওয়াই যেন রীতি। অতএব তিনি খুন হবেন। নবীনা কিছুতেই ঘুমাতে পারে না। ভাবতে ভাবতে একসময় সে নিঃসন্দেহ হয়ে যায়, খুন অবশ্যম্ভাবী।

রিয়াজের দিন ফুরিয়ে এসেছে। দূষিত ভালোবাসা মরবার আগে পৃথিবীর শুদ্ধ মানুষকে মেরে দিয়ে যায়। ইতিহাসে প্রচুর ঘটনা। সেই ভালোবাসা নারীর কর্দমাক্ত যোনিদেশ থেকে উথিত হয়ে পৃথিবীর তীব্র গাঢ় অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে। নবীনার মনে হয় তার যোনিগহ্বর পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত ক্ষতচিহ্ন। দগদগে ঘা যেন বা। পৃথিবীর তাবৎ অপমান সেইখানে জমা করেছে মানুষ। ভাবতে ভাবতে নবীনার আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়।^{৩০}

মুক্তমনা মানুষ সমাজের গোঁড়া অংশের সংস্কার করতে চাইলেই তার উপর নেমে আসে মৌলবাদীদের নির্মম আক্রমণ। পৃথিবীর ইতিহাসে তা বহুবার ঘটেছে এবং আজও ঘটে চলেছে। সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশের বুগার খুন, কবি-লেখকদের উপর অমানবিক আক্রমণ, ভারতীয় লেখকদের নিগ্রহের ঘটনা মৌলবাদীদের ভয়াবহতাকে ভয়ানকভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। রিয়াজ মুক্তমনা পথের পথিক। সমস্ত সংশয়-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে সে রক্ষণশীল সমাজের গোঁড়া অংশে একটা জোরালো ঘা দিতে চেয়েছিল সে। অথচ ‘সাধারণ মানুষের কাছে আনুষ্ঠানিকতাই ধর্ম’— ফলে যে কোনো অজুহাতে এরা যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে বা এদের উত্তেজিত করে তোলা হয় তখন ধর্মের নামে মানুষ হত্যাও এরা মনের দিক থেকে আর কোনো বাধা পায় না। ধর্মগ্রন্থে যদি নির্দেশ দেওয়া থাকে যে, বিধর্মীকে কতল করলে তোমার জন্য বেহেস্তে সর্বোত্তম কামরাটি খাস রাখা হবে আর দেওয়া হবে তোমাকে সত্তর হাজার হুর, তাহলে ধার্মিক জন সুযোগ পেলে এ নির্দেশ পালন করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবে না। ইতস্তত করার বা পালন না করতে পারার একমাত্র অন্তরায় পার্থিব আইন— অধিকতর পার্থিব ও প্রত্যক্ষ পুলিশ। কিন্তু সাহিত্যিক এমন নির্দেশ শুধু যে, পালন করবেন না তা নয়, বরং অবিশ্বাস্য বলে এমন নির্দেশকে তিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন। মানুষ মেরে বেহেস্তে যাওয়ার কল্পনাই তাঁর কল্পনার বাইরে। স্বয়ং ঈশ্বর নেমে এসেও যদি তাঁকে এমন নির্দেশ দেন, সাহিত্যিক তেমন ঈশ্বরকেও নিজের লেখন কক্ষ থেকে বের করে দিতে দ্বিধা করবেন না। ঈশ্বর নামধেয় কারো পক্ষে এমন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব— এ কথাটাই সাহিত্যিকের কাছে অবিশ্বাস্য। কিন্তু ধার্মিক তো সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করে না। কারণ, ধর্ম আর শাস্ত্রীয় ব্যাপার নিয়ে বিচার করাটাই তার কাছে অধর্ম। তার একমাত্র অবলম্বন অন্ধ বিশ্বাস আর অন্ধ অনুসরণ। একজনের জন্যে সত্তর হাজার হুর সম্ভব কি অসম্ভব, সম্ভব হলেও একত্রে অতগুলি হুর

দিয়ে সে কী করবে এ সব অতি স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রশ্নও তার মনে উদয় হয় না—
হলেও উত্তর সন্ধান সে নিষ্পৃহ অথবা শঙ্কিত। সে উত্তর যতই লজিক্যাল বা যুক্তিসঙ্গত
হোক না কেন, তার কাল্পনিক পরিণাম ভেবে সে আরও বেশি ভীত। যে মানুষ লজিক বা
যুক্তির সম্মুখীন হতে ভয় পায়, তার কাছে মননশীলতা বা মুক্তবুদ্ধির চর্চা এক নিষিদ্ধ
ব্যাপার। এমন মানুষকে সত্তর হাজারের পরিবর্তে সত্তর লক্ষ বললেও সে বিশ্বাস করতে
এতটুকু দ্বিধা করবে না। হয়তো ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে আরও বেশি উৎফুল্ল, আরও বেশি
বেপরোয়া ধার্মিক হয়ে উঠবে। যে মানুষ জীবনে একটা ছর সামলাতেই গলদঘর্ম, মৃত্যুর
পর সে সত্তর হাজার সামলাবার অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবে— এমনতর অদ্ভুত
বিশ্বাসই সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ ও সম্মোহিত করে রাখে।^{৩১} এই গ্রন্থের লেখক স্বয়ং আবুল
বাশার ফুলবট প্রকাশিত হবার পরে নানাভাবে নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হয়েছিলেন। একটি
সাক্ষাৎকারে এ ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন কথাকার।^{৩২}
রিয়াজের চরিত্র যেন লেখকের ব্যক্তি-জীবনের অবক্ষিপণ। ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্যে
যোগসূত্র স্থাপন করতে চেয়েছে রিয়াজ। ধর্মকে নস্যাত করে সে সামাজিক সংস্কার চায়নি।
চেয়েছে শাস্ত্রীয় আইনের হাত ধরেই রাজিয়ার উত্তরণ ঘটুক। ইসলামি শাস্ত্রের আকর গ্রন্থ
কোরানের চার সংখ্যক সূরা নিসা-র ২৩ সংখ্যক আয়াতে ১৪-প্রকার নারীদের সঙ্গে
শরিয়ত মতে, বিবাহ অবৈধ বা নিষিদ্ধ তার বর্ণনা রয়েছে।

১. মাতা, মাতামহী, পিতামহী— যত উর্ধ্বতমা হোক।

২. কন্যা, পুত্রের কন্যা, যত নিম্নবর্তিনী হোক।

৩. ভাগ্নী (সহোদরা, বৈমাত্রেয়, বি-পৈত্রিক)

৪. ফুফু (পিতার দিদি বা বোন), পিতার ফুফু, দাদুর ফুফু, সহোদরা হোক বা
বৈমাত্রেয়।

৫. খালা (মাসি), পিতার খালা, দাদুর খালা, সহোদরা হোক বা বৈমাত্রেয়।

৬. শাশুড়ি— নানী শাশুড়ি হোক বা দাদি শাশুড়ি।

৭. সহবাসকৃত স্ত্রীর কন্যা, দৌহিত্রি ইত্যাদি।

৮. দুগ্ধ মাতা, নানী (মাতার মা), শাশুড়ি, ভগিনী, ননদিনী, কন্যা, পৌত্রী।

৯. পুত্রবধূ, পৌত্রবধূ, দৌহিত্রবধূ।

১০. অবৈধ সহবাসকৃত নারীর মাতা, মাতামহী, পিতামহী, কন্যা, পৌত্রী।

১১. কামপরবশ হয়ে যে নারীর গোপন অঙ্গে দৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে, তার মাতা, মাতামহী, পিতামহী, কন্যা, দৌহিত্রী।

১২. বিধর্মী, অংশবাদিনী, ধর্মত্যাগিনী।

১৩. ভাগ্নেয়ী, ভাইঝি।

১৪. পরস্ত্রী।

হাদিস-কোরানের ছত্রে ছত্রে গমন করে রিয়াজ শেষপর্যন্ত খুঁজে পায় শাস্ত্র মোতাবেক মিল্লাত-রাজিয়ার বিয়ে জায়েজ। কারণ কোরানে যে ১৪-প্রকার নারীর সঙ্গে বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য করা হয়েছে, রাজিয়া তা থেকে মুক্ত। এবং শাস্ত্র মতে, রাজিয়া এবং হাজীর বিবাহ অবৈধ। শামিম ডাক্তারের দেওয়া ডায়েরির পাতায় শরিয়তের নিয়ম-প্রণালীর দিকে তাকিয়ে রিয়াজ ১৪-নম্বর অবৈধ নারীর কথা ভেবেই মুষড়ে পড়ে। তার মনে পড়ে নবীনার কথা। সাদিক নবীনাকে ত্যাগ করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেও শাস্ত্র মতে এখনও তাদের বিচ্ছেদ হয়নি। সমাজ-বিচ্ছিন্ন, স্বামী-বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ মুসলিম নারীর অবহেলিত দুরবস্থা দেখেও শেষমেশ শাস্ত্রের অমোঘ আইনকে খণ্ডাতে পারে না রিয়াজ। সে কলম দিয়ে ১৪-নম্বর নারীকে লালবৃত্তে ঘিরে ফেলে। যে বৃত্ত ভেদ করতে যাওয়া ধর্মীয় কানুনের কাছে বড়ো বিপজ্জনক। মনঃসমীক্ষণের নানান থিওরি দিয়ে সবকিছু

বিচার করে রিয়াজ। আসলে যা কিছু জটিল, দুরূহ তার প্রতিই মানুষের আকর্ষণ বড়ো প্রবল। রাজিয়া মিল্লাতের সম্পর্কও জটিল বলেই বেশি সুন্দর, তার টান গভীরতর। এতকিছু ভাবতে ভাবতে একরাশ জেদ নিয়ে রিয়াজ মৌলবীর খোঁজে বেরিয়ে যায়। উদ্দেশ্য মিল্লাত-রাজিয়ার সম্পর্ককে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া। একা একাই রিয়াজ ভয়ানক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অন্যদিকে নবীনার অস্থির মন রিয়াজের টেবিল ঘাঁটতে গিয়ে শামিম ডাক্তারের ডায়েরি পায়। রিয়াজের অঙ্কিত লালবৃত্ত দেখেই নবীনার অনাগত জীবনে নেমে আসে ঘন অন্ধকার। ‘নবীনা বুঝতে পারে, পৃথিবী থেকে সে সম্পূর্ণ পর হয়ে গেছে। পৃথিবীর বাইরে চলে গেছে যেন সে। একটা অদ্ভুত বৃত্তের শেকলে, একটা বন্দিশালায় সে আটক। সেখানে একা, নিঃসঙ্গ। সে বৃত্ত ভেদ করে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা তার নেই।’ এ বৃত্ত যেন ‘মানুষের জীবনের ট্রাজেডির মতো গোপনচারী, অদৃশ্য, আকস্মিক’। একসময় নবীনা-রিয়াজ দুজনেই মবিনের সঙ্গে রাজিয়ার বিয়ে দেবার চেষ্টা করলেও মবিন শেষপর্যন্ত বেঁকে বসেছিল। আচমকা মবিনের বাবার পছন্দ করা পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ হয় মবিনের। যৌনতা ও ভালোবাসার যুদ্ধে হেরে গিয়ে মবিন স্ত্রীকে শিথিয়ে দেয় ধর্মের একরৈখিক বাণী— ‘স্বামীর পায়ের তলায় স্ত্রীর জান্নাত’। ইসলামি পুরাণে পুরুষের মর্যাদা ও সম্মানের সপক্ষে কোরান-হাদিসে বহু উদ্ধৃত হয়েছে। এমন কথার রেশ ধরেই গ্রামীণ মুসলমান সমাজে একটি মিথ প্রবাদ আকারে প্রচলিত আছে— ‘স্বামীর পায়ের তলায় স্ত্রীর জান্নাত’— অর্থাৎ স্বামীর সেবা, মান-মর্যাদা স্ত্রী রক্ষা করলে এবং স্বামীর প্রতি বাধ্য হয়ে জীবনযাপন করলে তার জান্নাত গমন খুব সহজতর হবে। স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতা হল জান্নাতের সিঁড়ি। বলা বাহুল্য, মবিনের মতো গোঁড়াপন্থী মানুষ এমন মিথকেন্দ্রিক কল্পকাহিনীর আশ্রয় নিয়ে স্ত্রীদের বশে রাখতে চায়। যেমনভাবে অতীতে নবীনাকে ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেহজ কামনা পূর্ণ করেছিল। যৌনতা এবং ভালোবাসার দ্বন্দ্বিক বৈপরীত্য নবীনাকে

পীড়িত করেছে প্রতিমুহূর্তে। স্বামী-বিচ্ছিন্না নবীনা রিয়াজের আশ্রয়ে নতুন করে বেঁচে ওঠার স্বপ্ন দেখেছিল। মবিনের বিকৃত লালসার শিকার দুই নারী— নবীনা ও রাজিয়া। নবীনার সঙ্গে সাদিকের বিচ্ছেদ হয়নি। শাস্ত্রমতে, নবীনা সাদিকের স্ত্রী। রিয়াজের সঙ্গে নবীনার হৃদয়জ নৈকট্য তৈরি হলেও শাস্ত্রের বৈধ বৃত্তের বাইরে চলে যায় নবীনা। বৃত্তের ভেতরে ছিল বৈধ বিবাহ, বাইরে ছিল অবৈধ। পরস্পরকে ইসলামে বিয়ে করা হারাম, অতএব নবীনার সঙ্গে বিবাহ অবৈধ। এইভাবে শাস্ত্রের জটিল পাকে নিমজ্জিত হয়ে তিনটে মানুষ ট্রাজেডির অতলান্তিক গভীরে তলিয়ে যায়। রিয়াজের সংগ্রাম, সমাজ বদলানোর স্বপ্ন মুখ খুবড়ে পড়ে। নবীনার অনাগত সুখের জীবনে ‘পূর্ণচ্ছেদ’ টেনে দেয় শাস্ত্রের পরস্পর সংক্রান্ত তত্ত্ব। নবীনা আত্মহত্যা করে। মিল্লাত অসুস্থ শরীর নিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পৃথিবী এবং তার ধর্মের ঘূর্ণিপাকে দোল খেতে খেতে রাজিয়া নিরুদ্দেশের অন্ধকারে হারিয়ে যায়, তার কুল কিনারা ঠাহর করতে পারে না কেউই। রিয়াজকে রাজিয়ার শেষ চিঠিখানা^{৩৪} পড়লে আঁতকে ওঠে সহৃদয় পাঠকের মন:

প্রিয় রিয়াজজি,

সব রইল। কোনো কিছুই নিইনি। আমি যাবার আগে ও ঘুমিয়ে পড়ল। আমি চলে যাচ্ছি মিলু বুঝতে পারল না। মিলু ভারি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। ওকে জানাবেন না। আমি আসার পর থেকে ও ভাল করে ঘুমোতে পারেনি। এবার আপনার কথা বলি। মৌলবী পান নি। কতদূর গিয়েছিলেন? সে কি পৃথিবীর বাইরে কোথাও? মিলু বহুদূর থেকে মৌলবী আনতে বলেছিল। সেই দূর কতদূর রিয়াজজি? সালাম রইল।

ইতি আপনাদের ফুলবউ

হাজী নিসার আলীর যৌন মাদকতার শিকার এক কিশোরীর চিঠি মিথ-পুরাণ নির্ভর সংস্কৃতির অন্ধকার দিকটি প্রকট করে তুলেছে। শাস্ত্রের গোঁড়া অংশের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মুক্তমনা নিরপরাধ মানুষগুলি কীভাবে একা হয়ে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা প্রতিফলিত হয় আখ্যানের শেষভাগে। রিয়াজের একার লড়াই, নবীনার আত্মহত্যা,

রাজিয়ার নিরুদ্দেশ— শরিয়তের একরৈখিক হুকুমের বলি দুজন নারী গ্রামীণ মুসলিম সমাজ থেকে বিযুক্ত হয়ে যায়। রিয়াজ শেষমেশ বুঝেছিল, পৃথিবীতে কিছু কল্পনা থাকে তা কল্পনাতেই সুন্দর। মানুষের সেই ব্যক্তিগত বিশ্ব কেউ দেখতে পায় না। তা একার, তা একান্ত। তা একটি পৃথিবী বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। তা একটি দুর্গ। তারই বাসিন্দা রাজিয়া, মিল্লাত ও নবীনা। এটি একটি স্বপ্নের ইতিহাস। স্বপ্নেরই যুদ্ধ। সেই দুর্গে যেন শাস্ত্রের গোঁড়া অংশের হাদিস কোরান সম্বলিত মবিনদের মতো ধর্মের ধ্বজাধারীদের একটি অযৌক্তিক মেধা ও প্রতিভাপূর্ণ বোমারু জাহাজ নিঃশব্দে বোমা নিক্ষেপ করে ফিরে আসে। নবীনাও অলীক স্বপ্ন। শরিয়তের হুকুমে কল্পনা, দ্বীপ এবং দুর্গ সমুদ্রের অন্ধকারে ডুবে যায়। মুসলমানের একাধিক বিবাহ এবং তালাক প্রথা নারীর জীবনকে দূষিত করতে থাকে, দুর্বিষহ করে তোলে যুক্তিবাদীদের জীবন।

এরপরেও মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসে সবাই বেঁচে থাকে, কেননা সুন্দর এবং সত্য মৃত্যুহীন। নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই দেশে দেশে ঝড়ের মতো বইতে থাকে। মানুষের মৌখিক বিশ্বাস ও যুক্তিহীন প্রথার ভিত্তিমূলে জোরালো আঘাত আসে। যেমন ইমরানার অসহায়তা ও সাহসিকতা শাস্ত্রের অসারতাকে প্রমাণ করে দিয়েছিল আরও একবার।^{৩৫} নারীদের নানান আন্দোলন ও মৌলবী-মোল্লাদের মতাদর্শগত বিরোধের পরেও ২০১৭ সালে ভারত সরকার কর্তৃক তিন তালাক নিষিদ্ধ করা হয়। সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য (এক দেশ এক আইন) বা বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে তাদের মনোভাব— এ নিয়ে বহুবিধ তর্ক থাকলেও প্রকারান্তরে এ আইন মুসলিম নারীদের কাছে সামাজিক স্বাধিকারের পথে এক নতুন যাত্রা বলা যেতে পারে। ফুলবউ সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে এ আলোচনার উপসংহার টানা যেতে পারে:

এই উপন্যাসের পাঠক-প্রতিক্রিয়া ও স্বীকৃতি প্রথম এসেছিল বাংলাদেশ থেকে। যতগুলি তারিফ-সংবলিত চিঠি সেই সময় হাতে পাই, সবই বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানের লেখা। প্রবলতর উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল বাংলাদেশের মুসলিম মেয়ের মধ্যে। সেই ভাব-প্লাবন লিখে বলা এক ধরনের কুণ্ঠার ব্যাপার। সে আজ থাক। কিন্তু যা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তা হল ‘ইমরানা’ কাণ্ড ঘটান পর, এই আনন্দবাজারেই চিঠিপত্র বিভাগে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পত্র প্রকাশিত হয়। লিখেছিলেন কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত মুসলিম। তাঁরা বলেছিলেন, ইমরানাকে বুঝতে হলে, ইমরানার প্রকৃত দুঃখ স্পর্শ করতে হলে ‘ফুলবউ’ পড়তে হবে।

‘ফুলবউ’ আমার একটি সামাজিক কাজ।^{৩৬}

ইহুদি ও ইসলামি পুরাণ, প্রাচীন পৃথিবীর লোককথা, কিংবদন্তি ও লোককল্পনার বিবিধ উপাদান নিয়ে ঔপন্যাসিক আবুল বাশার মরুস্বর্গ (১৯৯১) নামক আধুনিক আখ্যান নির্মাণ করেছেন। ইহুদি ও ইসলামি পুরাণ-মিশ্রিত এই আখ্যানের পটভূমি খ্রিস্টের জন্মের হাজার বছর আগের এক প্রাচীন পৃথিবী— প্রাচীন পৃথিবীর এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। যে ভূখণ্ডের একদিকে মরুভূমি, অন্যদিকে সমুদ্র তীরবর্তী শস্যশ্যামল ভূমিক্ষেত্র। আরব মরুভূমির বুকে তিনটি প্রধান ধর্মের জন্ম— মোজেসের ধর্ম, যীশুর ধর্ম ও হজরত মুহম্মদের ধর্ম। মরুভূমির বুক থেকে তিনটি প্রধান ধর্মগোষ্ঠীগুলি অর্ধবৃত্তাকার জমির কোলে আশ্রয় পেয়েছিল এবং সেখান থেকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। মরুস্বর্গ-এর আখ্যান পুরাণকথাকে আশ্রয় করে নির্মিত হলেও এ উপন্যাসে সাম্প্রতিক ইতিহাস ও ঘটনাবলীর প্রতিফলন ঘটেছে। ভাষা এবং ধর্ম— এই দুই জৈবনিক উপাদান কেবল প্রাচীন পৃথিবী নয়, আজকের পৃথিবীকেও গোত্রাসে গিলে খাচ্ছে, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্ম ও ভাষা সংকট এবং পরবর্তীকালে অখণ্ড রাষ্ট্র ভেঙে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ক্ষমতাশীল মানুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের লড়াই— সমকালীন বহু ঘটনাবলীকে স্পর্শ করেছে এ উপন্যাস।

আখ্যানের শুরুতেই দেখা যায়, মিশরীয়দের অত্যাচারে এলিফেন্টাইন দুর্গ ধ্বংস হয়। মরুদস্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেড়ায় তামাম মরুতে। রিবিকা ডাকাত দলের হাত থেকে নিস্তার পেতে আশ্রয় নেয় এক মরুকূপের নিচে। আকাশে পূর্ণিমা, চাঁদের আলোয় মরুভূমির বালুকারাশি আলোকিত। এক আচ্ছন্নতা এবং ক্লান্ত অবসাদের মাঝে রিবিকার মনে পড়ে তার অতীতবৃত্তান্ত। তিনটি ভেড়ার লোমের বিনিময়ে দামাস্কাসের এক মরুবণিকের কাছে রিবিকা বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। মরুবণিকের নাম ছিল আক্কাদ, যে কন্যারূপে রিবিকাকে গ্রহণ করে দাসীরূপে ব্যবহার করেছিল। আক্কাদ ছিল নবি সালেহর অনুগামী। সালেহ ছিলেন উটের নবী। আক্কাদ রিবিকাকে প্রথম ধর্ষণ করেছিল উটের পিঠে শুইয়ে। বালিকা রিবিকা কেঁদেছিল, আক্কাদ তাকে বুঝিয়েছিল, উটের পিঠে যৌন আশ্বাদন করলে পুণ্য হয়। উটের কুঁজকে নবি সালেহর কবর বলে বিশ্বাস করত মরুভূমির একাংশ মানুষ। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, উটের নবি ছিলেন সালেহ। সামুদ জাতির লোকেরা নবি সালেহের বাণী বিশ্বাস করত না। এমনকি তারা সালেহকে আল্লাহ্র নবি বলে স্বীকার করেনি। নবি সালেহ তখন আল্লাহ্র সাহায্যে সামুদ জাতির লোকেদের তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা (মোজেজা) দেখিয়েছিলেন। তিনি পাহাড় থেকে একটি উট নির্গত করেন এবং উটটি একটি বাচ্চা প্রসব করে। এই ঘটনা দেখে অনেকেই তাঁকে নবি বলে স্বীকার করলেও অধিকাংশ মানুষ নবি সালেহের কথা বিশ্বাস করেনি। যারা বিশ্বাস করল না, তাদের কয়েকজন একদিন গোপনে উটটিকে হত্যা করে। এর ফলে আল্লাহ্র আদেশে ফেরেশতা জিবরাইল সামুদ জাতিকে ধ্বংস করে দেন। নবি সালেহকে বলা হয় উটের নবি এবং পাহাড় ফেটে বেরিয়ে আসা উটকে বলা হয় আল্লাহ্র উট। এই ঘটনার বর্ণনা বিস্তারিতভাবে কোরানে রয়েছে। যেমন- ৭ সংখ্যক সূরা আরাফ (৭৩-৭৯ সংখ্যক আয়াত), ১১ সংখ্যক সূরা হুদ (৬১-৬৯

সংখ্যক আয়াত), ১৫ সংখ্যক সুরা আল হিজর (৮০-৮৪ সংখ্যক আয়াত), ২৬ সংখ্যক সুরা শোয়ারা (১৪১-১৫৮ সংখ্যক আয়াত), ৫৪ সংখ্যক সুরা ক্বমার (২৩-৩১ সংখ্যক আয়াত), ৮৮ সংখ্যক সুরা গাশিয়াহ্ (৬-১৩ সংখ্যক আয়াত), ৯১ সংখ্যক সুরা শামস্ (১১-১৫ সংখ্যক আয়াত)। এছাড়া মুসলমানদের বুখারি, তিরমিজি, মুসলিম ইত্যাদি হাদিসেও এই ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণিত হয়েছে।

উট নিয়ে ইসলামি লোকায়ত মিথ হল, নবি সালেহ মারা গেলে তাঁর কবর দেয়নি কেউ। মারা যাবার পর তাঁর মৃতদেহ লোকেরা উটের পিঠে চাপিয়ে দিয়েছিল। উট মৃত নবীকে নিয়ে পাহাড়ের কোলে উঠে যায়। তিনদিন ওই উটকে কেউ দেখতে পায় না। তিনদিন পর উট ফিরে এলে দেখা যায় তার পিঠে মৃতদেহ নেই। উটের পিঠে একটি কুঁজ উঠেছে। মৃতদেহ কুঁজের মধ্যে রয়েছে। এই কুঁজই হল নবি সালেহের সমাধি।

ইসলামি লোকায়ত মিথের এই ঘটনাই ঔপন্যাসিক উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। ইসলামি শরিয়ত-শাস্ত্র এ ঘটনাকে মান্য করে না। কেবল কোরানের ঘটনাকেই মান্যতা দেয়। রিবিকা ছিল কনানের অধিবাসী। পুরাণ অনুসারে, পবিত্র দেশ কনান। ‘আব্রাহামের মধুদুগ্ধপ্রবাহিণী স্বপ্নের দেশ, মহাপিতা নোহের পিতৃভূমি’। রিবিকার মা ছিল কনানীয় পরিবারের দ্বিতীয় শ্রেণির বউ। অর্থাৎ উপপত্নী। রিবিকার মায়ের মৃত্যুর পর বাস্তু আর জমিতে রিবিকার কোনো আইনগত অধিকার ছিল না, কারণ সে ছিল উপপত্নীর মেয়ে। পশুলোমের বিনিময়ে আক্কাদের কাছে রিবিকার পরিবার তাকে বিক্রি করে দেয়। মরুকূপ থেকে রিবিকাকে উদ্ধার করে সাদইদ। এখান থেকেই শুরু হয় উপন্যাসের ঘটনাক্রম। রিবিকার দ্বন্দ্ব-বিদীর্ণ হৃদয়, ‘ভাড়াটে সৈন্য’ সাদইদের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের দুজনকে ঘিরে একদল মানুষের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব,

অস্বস্তি, অবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়গুলি আদি পৃথিবীর পৌরাণিক চরিত্রদের যাত্রাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইসলামি পুরাণের নবি (ঈশ্বর প্রেরিত দূত) নোহ, আব্রাহাম, মুসা এঁদের জীবনের নানান কার্যাবলী এ উপন্যাসে বহু জায়গায় উত্থাপিত হয়েছে। ইসলাম পুরাণের নবীদের জীবনের অনুরূপ ঘটনাবলীর বিবরণ পাওয়া যায় ইহুদি পুরাণে। ইহুদি পুরাণের আব্রাহাম ও মোজেস কোরানে ইব্রাহিম ও মুসা নামে পরিচিত। মুসার মিশর ত্যাগ করে মিদিয়ন দেশে পলায়ন, সিনাই পর্বতে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ফেরাউনের সঙ্গে মুসার দ্বৈরথ ও ফেরাউনের পতন ইত্যাদি ঘটনা উঠে এসেছে আখ্যানে। ঈশ্বরকে যবহ বা ইয়াহো নামে সম্বোধন করা হয়েছে। উপন্যাসের যবহ এক রহস্যময় ঈশ্বর। মরুভূমির মানুষকে অস্তিত্ব রক্ষা এবং জোট বাঁধার বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রদান করেছেন যবহ। নোহকে দিয়েছিলেন যবহ কিস্তি (নৌকা) বানানোর কৌশল, নিম্নোদের আগুন থেকে বাঁচিয়েছিলেন আব্রাহামকে। মুসার জীবনও বাঁচিয়েছেন যবহ। কোরানের ২৮ সংখ্যক সূরা আল্ কাসাস-এ মুসা নবীর জীবনবৃত্তান্ত রয়েছে। মুসার জন্ম সম্বন্ধে যে কাহিনি প্রচলিত আছে, কাহিনির শুরুতেই দেখা যায়, মিশরে ইসরাইলদের বংশ অত্যাধিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইসরাইলরা মিশরের রাজা ফেরাউনকে অবিশ্বাস ও উপহাস করত। ফেরাউন কারোর নাম নয়, উপাধি। মিশরের রাজাদের ফেরাউন বলা হত। তৎকালীন ফেরাউন নিয়ম করলেন যে, ইসরাইলদের পুত্র সন্তান হলেই তাকে নীলনদের জলে ফেলে দিতে হবে। এইভাবে হাজার হাজার সন্তান বধ করা হল।^{৩৭} শিশুবধের রক্তে মরুভূমির ইতিহাস রক্তাক্ত। মুসা জন্মানোর পর তার মা বড়ো বিড়ম্বনায় পড়লেন। ফেরাউন জানতে পারলেই তার পুত্র সন্তানকে হত্যা করবে। ভয়ে শিশু মুসাকে তার মা কাঠের সিন্দুকে নীলনদে ভাসিয়ে দিলেন। সিন্দুকে ভেসে এসে লাগল ফেরাউনের রাজপ্রাসাদের তীরে। ফেরাউনের স্ত্রী

দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দেখার পর ফেরাউনকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন, তাদের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। কার্যত এভাবেই যবহ মুসার প্রাণ রক্ষা করেছেন। পরবর্তীকালে মুসা নবিত্বে উন্নীত হলেন এবং মুসার প্রধান শত্রু হয়ে উঠল ফেরাউন। মুসাকে হত্যা করার জন্য ফেরাউন তার দলবল নিয়ে তাড়া করে, লোহিত সাগরের সম্মুখে এসে মুসা ও তার সঙ্গীরা পথ খুঁজে পায় না। ঈশ্বর যবহ মুসাকে তার হাতের লাঠিকে জলের উপর আঘাত করতে বলেন, এবং সেই মুহূর্তে সমুদ্রের জলরাশি দু'ভাগ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে যায়। মুসা এবং তার সঙ্গীরা সেই পথ দিয়ে সাগরের উল্টোদিকে উঠে পড়লে তার পেছনে ছিল ফেরাউনের দলবল। মুসা ও তার সঙ্গীরা ডাঙায় উঠতেই যবহের নির্দেশে সমুদ্রের জলরাশি মিশে যায়। ফেরাউন ও তার সৈন্যরা মৃত্যুবরণ করে।^{৩৮}

উপন্যাসে ইহুদ নামের এক নবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। লেখক যাকে মুসাপন্থী এক অখ্যাত নবি বলে চিহ্নিত করেছেন। যাঁর চরিত্র, চেহারা, বেশভূষা, ব্যবহার এবং আচার আচরণে ইহুদি পুরাণের মোজেস এবং ইসলামি পুরাণের হুদ নবীর সাদৃশ্য রয়েছে। দ্বৈত সত্তা নিয়ে ইহুদ আবির্ভূত হয়েছেন মরুমর্ত্যে। সুর-অসুর-এর লড়াই তো সভ্যতার আদি ও অসমাপ্ত ট্রাজেডি। কালে কালে, যুগে যুগে মানুষের রক্তেই লিখিত হয়েছে পুরাণের ইতিহাস। অসুর জাতি বারংবার বীভৎস আক্রমণের মধ্যে দিয়ে মিশরের নিরীহ মানুষকে বন্দি করেছিল। মুসার অনুগামীদের বন্দিত্বের সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি দেখেছেন নবি ইহুদ। অসুররা কতবার মিশর আক্রমণ করেছে তার সঠিক হিসাব নেই। মিশর মুসার নেতৃত্বে প্রতি আক্রমণ চালিয়ে একসময় শান্তি ফিরিয়ে এনেছিল, কিন্তু আবার অশান্তি ঘনিয়ে এসেছে। মোসির মতো ইহুদও শান্তি চান। তাঁর অভিযাত্রা অবশিষ্টদের নিয়ে, যারা অসুরদের হাতে এখনও বন্দি এবং যারা আজও মিশরের ক্রীতদাস রূপে জীবন নির্বাহ করে। মোসির অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে চান ইহুদ। তিনিও আব্রাহামের মতোই

দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত থেকে অর্ধগোলাকৃতি পথে দক্ষিণ-পশ্চিম কিনারা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। ইহুদের হাতে মুসার মতোই একটি লাঠি রয়েছে। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, সকল নবীকেই আল্লাহ্ কমবেশি আলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। ইসলামি পরিভাষায় যাকে বলে মোজেজা। মুসার লাঠি ছিল অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। মাটিতে ফেলে দিলেই লাঠি সাপের রূপধারণ করত, এই লাঠির আঘাতেই মুসা লোহিত সাগর দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। ইহুদের লাঠি পাথর আঘাত করা মাত্রই পাথর দু'ভাগ হয়ে যায় এবং দেখা যায় একটি ঘাস ফড়িং একটি ঘাস মুখে করে পাথরের তলায় দিব্যি বেঁচে রয়েছে। ঈশ্বর ইলাহো এভাবেই সকলকে বাঁচিয়ে রাখেন সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন ইহুদ।

উপন্যাসের নায়িকা রিবিচার জীবন বড়ো বিচিত্র। মরুভূমির মানুষকে নিরাপদে রাখতে সাদইদ স্বর্গের কল্পনা করেছিল। আর এই কল্পনাকে বাস্তবায়িত করতেই প্রয়োজন হয়েছে নারীর। তেমনই এক নারী হল রিবিচার, তার জীবন জুড়ে তিনজন পুরুষ। প্রথমজন আবিরুদ। মিশরের ভূপতি নমরুর পুত্র ছিল আবিরুদ। আবিরুদকে ভালোবাসত রিবিচার। নমরু যখন জানতে পারল, তার ছেলে তারই রক্ষিতা দেবদাসী রিবিচার প্রেমে আসক্ত, তখন তার হৃদয়ে পিরামিড ভেঙে পড়ল। আবিরুদের সঙ্গে রিবিচার পালিয়ে গেলেও আবিরুদ শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারেনি। নমরুর বর্শার আঘাতে প্রাণনাশ হয় আবিরুদের। এরপর মিশর ছেড়ে সৈনিক দলের ছাউনিতে চলে আসেন রিবিচার। দেবী ইস্তারের মতোই রিবিচার দুঃখী আর বিষাদমগ্নিত। রিবিচারকে মরুভূমির ডাকাত দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে আশ্রয় দেয় সাদইদ। ইহুদিদের ‘আদিপুস্তক’ অর্থাৎ ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’-এর শুরুতেই রয়েছে ভাষা-বিভেদের কথা। *বাইবেলে*-র ‘বুক অব জেনেসিস’-এর ১১ সংখ্যক অধ্যায়ে বলা হয়েছে:

সারা পৃথিবীতে তখন এক ভাষা প্রচলিত ছিল ও শব্দসংখ্যা ছিল সীমিত। মানবগোষ্ঠী পূর্বদিকে পরিভ্রমণ করতে করতে অবশেষে শিনিয়র দেশে সমতলভূমি দেখতে পেয়ে সেখানেই বসতি স্থাপন করল। পরে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা বলল, এসো, আমরা হুঁট তৈরি করে ভালো করে পোড়াই। এইভাবে তারা পাথরের বদলে হুঁট ও চুন-সুরকির বদলে আলকাতরা সংগ্রহ করল। তারপর তারা বলল, এসো এবার আমরা নিজেদের জন্য একটি নগর ও আকাশছোঁয়া একটি মিনার তৈরি করে নিজেদের নাম প্রতিষ্ঠা করি, তা না হলে সারা পৃথিবীতে আমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ব।

পরে প্রভু পরমেশ্বর মানব সন্তানদের দ্বারা নির্মিত নগর ও মিনার দেখার জন্য স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। তিনি বললেন, দেখ, এরা সকলেই এক জাতি ও এক ভাষাভাষী। এটি তাদের কীর্তির সূচনা, এর পরে তারা যা কিছু করার সংকল্প করবে তা থেকে তাদের নিবৃত্ত করা যাবে না। চলো, আমরা নিচে গিয়ে ওদের ভাষার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করি যাতে ওরা একে অন্যের কথা বুঝতে না পারে। তখন প্রভু পরমেশ্বর তাদের সেখান থেকে সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত করে দিলেন, ফলে তাদের নগর নির্মাণ স্থগিত হয়ে গেল। এইজন্যই সেই নগরের নাম হল বাবেল (বিভেদ)। কেননা সেখানে প্রভু পরমেশ্বর সারা পৃথিবীর ভাষায় বিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেখান থেকেই তিনি মানব-সন্তানদের সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন।^{৩৯}

ধর্ম ও ভাষা নিয়ে বিভেদ শুধু প্রাচীন পৃথিবীর মানুষদেরই নয়, একালের মানুষদের ও দন্ধ, বিচ্ছিন্ন এবং যুদ্ধলিপ্ত করেছে। বিশেষত, ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে কীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সে ইতিহাস আজও প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে মানুষের রক্তে, অস্থিমজ্জায় সংক্রামিত। এ উপন্যাসেও লোটা নামক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে মানুষের ভাষা সমস্যার কথা বর্ণিত হয়েছে। লোটা ছিল সাদইদের প্রধান সেনাপতি। কামনাতাড়িত, নারীসঙ্গহারা, অপমানিত লোটা সাদইদের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। অমিত সাহসী ও বীর্যশালী সৈনিক লোটা, যে উট পূজা করে। তার ভাষা সাদইদ ছাড়া আর কেউ বোঝে না। লোটোর ভাষাও লোটোর মতোই একা, নিঃসঙ্গ। লোটোর কান্না যেন তার কান্না নয়, অবলুপ্ত হবার ভয়ে যেন লোটোর ভাষাটাই কাঁদছে। ইসলাম ধর্মের আকর গ্রন্থ কোরান-

এও ভাষা প্রসঙ্গে বিভিন্ন আয়াত রচিত হয়েছে। কোরান-এর ৩০ সংখ্যক সূরা রুমের ২২ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে:

তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলির মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের (মানুষের) ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানী লোকদের জন্য অবশ্যই দৃষ্টান্ত রয়েছে।^{১৪০}

ভাষার মাধ্যমে মানুষকে ঈশ্বর বিচ্ছিন্ন করেছিলেন, সেই মর্মান্তিক ঘটনার বিষণ্ণ সাক্ষী হিসাবে লেখক লোটা নামক চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। লোটোর ভাষাই শুধু আলাদা এবং একলা নয়, তার পূজাবিধিও আলাদা। জুমা পাহাড়ের একমাত্র উট উপাসক লোটা। তার ভাষা এবং পূজা পদ্ধতি স্বতন্ত্র হবার কারণে মানুষের কাছে অপমানিত হতে হয়েছে তাকে বারবার। লোটোর অন্তর্জাতির কোলাহল, ছটফটানি, অস্বস্তি দেখে সাদইদের অনুভূতিতে উঠে এসেছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগের ইস্তাহার:

সাদইদ সক্রিয় চোখে রিবিকার দিকে চাইল। তারপর একটা ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। লোটাকে সবাই খাটো চোখে দেখে। কবে সেই বাবিলের জিগুরাত, দর্পিত স্বর্গ মাটিতে ভেঙে পড়ল, কোন্ সেই অতীতের কথা। কিন্তু ভাষার ভিতর রইল তার শাপ-লাগা স্মৃতি। ঈশ্বর যেখানে একবার নাক গলাবেন, যুগ যুগ ধরে তারই প্রহার চলতে থাকবে।^{১৪১}

বস্তুত, সাদইদের কাছে লোটা এক সুতীব্র সমস্যা। লোটোর শরীরে যে ভাষার বিষ প্রবেশ করেছে তা থেকে নিস্তার নেই তার। অথচ ভাষাই তার অস্তিত্বের নির্ধারক। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্বদা সচেতন লোটা ভাষা এবং উট উপাসনা কোনোটাই ছাড়তে চায় না। লোটোর মতো সৈনিকদের যুদ্ধই জীবন। রাজার নির্দেশ মতো যুদ্ধের পৃথিবীতে তারা লড়াকু যোদ্ধা। তাদের আশ্রয়ের সুবন্দোবস্তটুকুও রাজা হিতেন করেননি। তাঁবুতে থাকে পুরুষরা, মন্দিরে থাকে দেবদাসী। রাজা হিতেন সৈন্যবাস এবং দুর্গ স্থাপনের জন্য

সাদইদকে পাহাড় এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ দান করেছেন। রাজার মর্জি-মাফিক না চললে রাজা সে আশ্রয় ছিনিয়ে নিতে পারেন। পলাতক সৈন্যরা থাকে তাঁবুর তলায়। এদের কোনো সংসার নেই। সাদইদ চায় এদের জন্য নগর নির্মাণ করতে, যদিও সে কাজ বড়োই কঠিন। সাদইদ মনেপ্রাণে চায় সৈনিক ও দেবদাসীদের নিয়ে কনান প্রদেশে একদিন পৌঁছে যেতে। তার প্রবর্তিত জুমপাহাড়ী ভাষা যুদ্ধকালীন ভাষা, তার ভয় হয় যুদ্ধ থামলে এই ভাষাটিরও মৃত্যু হবে। কিন্তু কনান প্রদেশে ঢুকে যেতে পারলেই ভাষাটি আর মরবে না। সৈনিকদের মুখে এই ভাষা বেঁচে থাকবে। সৈনিকরা সংসার পেলে এবং দেবদাসীদের কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ করতে পারলেই জুমপাহাড়ী হয়ে উঠবে মরুমর্ত্যের ঐক্যের ভাষা। অথচ লোটা কিছুতেই তার ভাষা ছাড়বে না, জুমপাহাড়ী ভাষা সে মুখে উচ্চারণও করবে না। নিজের ভাষা আর ধর্ম ত্যাগ করতে চায় না লোটা। মাতৃভাষার প্রতি লোটোর অন্তরে, চেতনায়, আবেগে ও ভালোবাসায় যে টান দীপ্ত হয়ে আছে তা কল্পনা ও পুরাণের সমুদ্র পেরিয়ে মিশে যায় ভারতীয় উপমহাদেশের বাস্তবতার মোহনায়। আমাদের মনে পড়ে বাংলা বর্ণমালার রক্তাক্ত ও গৌরবান্বিত ইতিহাস। যা বাঙালিদের (বিশেষত পূর্ববঙ্গের) শিরায় ও শোণিতে আজন্ম বহমান। ১৯৫২ সালে জনগণনার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক ছিল বাঙালি, যারা মোট নাগরিকের প্রায় ৫৪%। ওই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি শুধুমাত্র উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসাবে ঘোষণার প্রতিবাদে বাঙালি ছাত্ররা সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। সেদিন মাতৃভাষা রক্ষার স্বার্থে প্রাণ দিয়েছিলেন বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক প্রমুখ। ভাষা আন্দোলনের ঘটনাকে আরও একবার পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কথাকার। ইসলামি পুরাণের আকর গ্রন্থ কোরান-এর ১৪ সংখ্যক সূরা ইব্রাহিম-এর চার সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে:

আমি (আল্লাহ) প্রত্যেক রসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তারা (রসূলরা) যাতে আমার কথা খোলাখুলিভাবে তাদের (অনুসারীদের) কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে। আল্লাহ্ শক্তিমান ও তত্ত্বজ্ঞানী।^{৪২}

সাদইদের মনে হয়, লোটার ভাষা ঈশ্বরের মতো, তাই কেউ বুঝতে পারে না!

সাদইদের ভাবনার মধ্যে দিয়ে লেখক কি প্রতিষ্ঠানিক ধর্মগুলির ভাষা বিভেদ নিয়ে কটাক্ষ করেছেন? পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মেরই ধর্মগ্রন্থগুলি বিভিন্ন ভাষায় রচিত। ইহুদিদের হিব্রু ভাষায় ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’, আদিতে বাইবেল আরামাইক ভাষায় রচিত, বাইবেলে-এর পরবর্তী ভাগগুলি গ্রীক ভাষায় রচিত। পরবর্তীকালে পবিত্র বাইবেল যদিও ইংরেজিসহ একাধিক ভাষাতে অনূদিত হয়ে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। ইসলাম ধর্মের কোরান রচিত হয়েছে আরবি ভাষায়, হিন্দু ধর্মের গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে মূলত সংস্কৃত ভাষায়। এছাড়াও বহু প্রাদেশিক ভাষায় ধর্মভিত্তিক একাধিক পুস্তক রচিত হয়েছে। গড়, আল্লাহ্, ভগবান— ঈশ্বরের নামের ভিন্নতার পাশাপাশি ভাষারও বদল হয়েছে। লোটার ধর্ম এবং ভাষাও ঠিক এমনই স্বতন্ত্র ও একক। রিবিকার কণ্ঠস্বরে ভেসে উঠেছে লোটার হৃদয়ের আত্ননাদ:

আমার দেবতা একমাত্র দেবতা, যিনি জীবন এবং মৃত্যুকে বহন করেন। আমার ভাষা একমাত্রের ভাষা, যা নবি সালেহ বলতেন। আমার উটগুলি সেই দেবভাষা ছাড়া কিছুই জানে না। আমি আজ প্রমাণ করতে চলেছি, আমার ভাষা আর ধর্ম অনশ্বর। চিরন্তন। এর ক্ষয় নেই। প্রতিটি মৃতদেহ আমার উট বহন করে নিয়ে যাবে দূর দিগন্তের দিকে। ফেলে রেখে আসবে দেহ। আসলে নবি সালেহ যেখানে রয়েছেন, সেখানে লুকিয়ে ফেলবে উট, এই মৃতদেহগুলি। তোমরা আমার ভাষা বোঝো না। আমিও বুঝি না তোমাদের। যদি জানতে মৃত্যুকে বহন করার দেবতা একমাত্র উট! জীবনকে বইবার ক্ষমতা একমাত্র তারই। আমার ব্যাকুলতা যদি বুঝতে!^{৪৩}

লোটার নবি ছিলেন সালেহ। নবি সালেহ মারা গেলে তাঁর কবর দেয়নি কেউ।

মারা যাবার পর তাঁর মৃতদেহ লোকেরা উটের পিঠে চাপিয়ে দিয়েছিল। উট মৃত নবীকে

নিয়ে পাহাড়ের কোলে উঠে যায়। তিনদিন ওই উটকে কেউ দেখতে পায় না। তিনদিন পর উট ফিরে এলে দেখা যায় তার পিঠে মৃতদেহ নেই। উটের পিঠে একটি কুঁজ উঠেছে। মৃতদেহ কুঁজের মধ্যে রয়েছে। এই কুঁজই হল নবি সালেহের সমাধি। উটের পিঠে বসে লোটা তাই মরু দিগন্তে হারিয়ে যেতে চায়। সমস্ত যুদ্ধ উটের ওই কুঁজে থেমে যায়। যুদ্ধের অবশেষকে বহন করেন লোটার আদিপিতা সালেহ। নারীসঙ্গহারা এবং কামার্ত লোটার জন্য রিবিকাকে নির্বাচন করতে চেয়েছিল সাদইদ, অথচ রিবিকা চেয়েছিল সাদইদের আশ্রয়। জ্যোৎস্নার মরুভূমির উজ্জ্বল বালুরাশির মাঝে বসে সাদইদের অন্তরে বারংবার ভেসে এসেছে এ বাসনা:

ভাষা থাকে, ধর্ম থাকে, দেবতারা আকাশে থেকে যান, এমনকি পিরামিড ধ্বংস হয় না। এই নারী কেন এমন থাকে না চিরকাল? রিবিকা তুমি থাকবে— বলে হাত বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল সাদইদ। দেখল, উটটা দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে!^{৪৪}

উপন্যাসের কাহিনিতে বিশেষ উপাদান হিসাবে ভাষার সমস্যাটিকে লোটা নামক কল্পিত চরিত্রের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন লেখক। পাশাপাশি ভাষা ও ধর্মের আধিপত্যের খেলা প্রাচীন পৃথিবীর মানুষকে যন্ত্রণাবদ্ধ ও বিযুক্ত করেছে আখ্যানের সেই পটভূমি যেন ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে ছুঁয়ে যায়। একটি সুন্দরী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সাদইদ ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ের দিকে চলে গেলে লোটার ভারী রাগ হয়। লোটার কাঁধে তামাম যুদ্ধের ভার। অথচ সকলের জন্য রয়েছে নারী ও শিশু। লোটার কেউ নেই। তাকে ঘৃণা করে আত্মহত্যা করেছে রুহা। চাষীরা উট উপাসকদের সহ্য করে না। লোটারা তাদের কাছে যাযাবর, বেদুইন, ছিন্নমূল তাড়া খাওয়া মানুষ। অপমানিত লোটার হৃদয়ে ঈশ্বর ইলাহোর প্রতি একরাশ অভিমান বিস্ফোরিত হয়েছে:

সবই ভগবানের ইচ্ছে। বাবিলের জিগুরাত ঈশ্বর ধংস করে দিলেন। মানুষের স্পর্ধা আকাশের দেবতাদের ভালো লাগল না। মানুষ স্বর্গের সিঁড়ি বানিয়ে দেবতাদের আক্রমণ করতে চেয়েছিল। দেবতাদের অন্তত তাই ধারণা। স্বর্গ ধংস হল— এই শান্তিই যথেষ্ট ছিল। ক্রুদ্ধ দেবতারা কিন্তু আক্রোশবশত মানুষকেই বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। ভাষা আলাদা হয়ে গেল।

লোটা ভাবল তার নিজের ভাষাটি ঈশ্বরের দান। ঈশ্বরই লোটার বিচ্ছিন্নতা চেয়েছেন। না চাইলে এই ভাষা তিনি যোগাচ্ছেন কোথা থেকে! ভাষা ত্যাগ করলে মানুষের আর রইল কী? সাদইদ তার ভাষাই কেড়ে নিতে চাইছে। ভাষা চলে গেলে ধর্মও আর আস্ত থাকবে না। সাদইদ তাকে কিছুই দেয়নি। বরং কেড়ে নিতে চাইছে। অথচ বারংবার আশ্বাস দিয়ে চলেছে, নিনিভে ধংস হলে যুদ্ধের যা পাওনা লুণ্ঠ করে নিতে পারা যাবে, তাই হবে জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। অতঃপর তারা কনানের দিকে ঢুকে যাবে। সেইসব লুণ্ঠ করা পশু, খাদ্য, বস্ত্র, অলংকারাদি নিয়ে কনানে ঢুকতে পারলে জীবনটা অন্যরকম হতে পারে। আসলে কী হতে পারে কেউ জানে না। রাজা হিতেন সমস্তই কেড়ে নিতে পারে।^{৪৫}

ভাষা ও ধর্মের নিরিখে লোটা যেমন নিঃসঙ্গ ও একাকিত্বের দ্বন্দ্বে পীড়িত, তেমনই সে মরুভূমির তাবৎ সৈন্যদলের কাছে সংখ্যালঘু। লোটা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক এ কালের রাজনৈতিক ও সমাজের ছিন্নমূল মানুষের অন্তর্বেদনা, নৈরাশ্য ও হতাশাকে প্রতিস্থাপন করেছেন। লোটার চোখ দিয়ে আপামর দেশ ও জাতির অন্তর্চেতনা বাঙ্ঘুয় হয়েছে:

ভাবতে ভাবতে লোটার বুক হু-হু করে উঠল। কোথায় চলেছি? কেন যুদ্ধ করছি! শীতে বাঁচব কিনা জানি না! সাঁজোয়া ভর্তি লাশ বহে এনে পোশাক ছিনতাই করছি— জীবনের এই তলানি এত উষর যে, সেখানে একটা নারী অবধি পাওয়া যায় না! কারকে ছুঁয়ে ফেললে আত্মহত্যা করে! এই অন্ধ জীবন আর চাই না, হা নবি!^{৪৬}

আদি পৃথিবীর মরুময় জগতের এক আশ্চর্য মানুষ লোটা। যেখানে মরুভূমির বালি আব্রাহামকে গোষ্ঠীপিতা থেকে জাতির পিতা বানিয়ে দেয়, মোজেসের হাতে দেয় অলৌকিক ক্ষমতা, আশ্রয়হীন একাকী সাদইদ হয়ে ওঠে সকলের আশ্রয়— সেই মরু

প্রদেশে লোটার শব্দ রূপান্তরিত হয় নৈঃশব্দ্যে, মরুভূমির বালি ভিজে যায় তার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনার জলে। আরাধ্য ঈশ্বর, আরাধ্য নবি ও আরাধ্য প্রতীক উটের মুখোমুখি নতজানু হলেও কেউই লোটাকে রক্ষা করতে পারে না। রাজা হিতেনের প্রণীত আইন বড়োই ভয়াবহ। যৌন-পীড়কের শাস্তি মৃত্যু। দেশদ্রোহিতা-হত্যা এবং যৌন অপরাধের জন্য হিতেনের আইনে স্পষ্টভাবে নির্দেশ রয়েছে মৃত্যুদণ্ডের। হিতেনের আইন মতে, ‘নারী বিলাস’ পুরুষের সৌন্দর্যচর্চা। নারী তার প্রিয় পুরুষের কাম প্রশমন করে সূক্ষ্ম কলানৈপুণ্যে, ব্রীড়ায়, লাস্যে, সংগীতে ও নৃত্যে। নারীর ক্ষমতা স্বর্গীয়। তাকে পদাঘাত ও বলাৎকার করা পাপ। অত্যন্ত সুদক্ষ, প্রত্যয়বান সৈনিকও যদি কোনো সামান্য দেবদাসীর উপর গর্হিত আচরণ করে এবং তা প্রমাণিত হয়, তবে মৃত্যুদণ্ডই হবে সৈনিকদের শাস্তি। রাজা হিতেনের গুপ্তচর সর্বদা অনুসরণ করে অপরাধীদের। তারা পায়চারি করে তামাম মরুতে। রুহার মৃত্যুর অভিশাপ ছিটকে এসে লাগে লোটার গায়ে। রাজা হিতেন লোটার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। সাদইদ প্রথম জানতে পারে লোটার মৃত্যুদণ্ডের খবর। অথচ লোটার কিছুই জানা নেই। মহাত্মা ইহুদ লোটার মৃত্যুদণ্ডের খবর পেয়ে ব্যথিত হন। লোটাকে মৃত্যুর শাস্তিসুখা হিসাবে রিবিকাকে তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন ইহুদ। ইহুদের মতে, ‘রিবিকার বিবাহ ইয়াহোর নির্দেশ মাত্র। বঞ্চিত লোটার জন্য ঈশ্বরের একমাত্র উপহার’। রিবিকা ও লোটার বিবাহ মেনে নেয়নি রাজা হিতেন। সে লোকলঙ্কার নিয়ে মহাত্মকোষে মরুভূমিতে চলে আসে। উদ্দেশ্য ছিল লোটাকে বধ করে রিবিকাকে জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়া। এইসময় আচমকা ঘটে যায় এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। লোটার বর্ষার আঘাতে খুন হয়ে যায় রাজা হিতেন। লোটা নিরুদ্দেশ হয়। কয়েকদিন পর উটের পিঠে ফিরে আসে লোটার মৃতদেহ। নবি সালেহর মতোই যেন লোটা অনন্তকালের জন্য ঘুমিয়ে যায় উটের কুঁজের তলদেশে।

সভ্যতার আদি থেকেই ধর্ম এবং ভাষা মানুষকে বারবার বিচ্ছিন্ন করেছে। সেই বিচ্ছিন্নতার মূর্ত প্রতীক এই লোটা। সে দেশরক্ষার কাজ করে, অথচ তার নিজের কোনো দেশ নেই। ‘দেশান্তর’ কবিতায় কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন:

তারপর, ভোরের সামান্য আগে
সীমান্তসাত্তীর গুলি এসে বুকে লাগে—
মরণের আগে ঠিক বুঝতেও পারি না আমি
শরীর লুটাব কোন্ দেশে।^{৪৭}

আদি পৃথিবীর মরুভূমির ঈশ্বর অনেক বেশি রাজনৈতিক। রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে তিনি মরুভূমির মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেইসঙ্গে বিতাড়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গোরা নিজের জন্মবৃত্তান্ত, আত্মপরিচয় জানার পর খুঁজে পেয়েছিল ভারতবর্ষের দেবতাকে। আনন্দময়ীর কাছে এসে বলেছিল, ‘মা তুমিই আমার ভারতবর্ষ।’ লোটা সবটা জেনেও নিজের ধর্ম আর ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি। সে রহস্যময় মরুর বুকে একদিন হারিয়ে যায়, কেউ তার খোঁজ পায় না। হারিয়ে যায় লোটোর ভাষাও, হারিয়ে যায় তার উট পূজা। একটি মানুষ একটি ধর্ম ও ভাষাকে ধারণ করেছিল। তার নিরুদ্দেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে মরুর বুক থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায় তার ভাষা ও ধর্ম। মানুষকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়, মানুষেরই হাতে নতুন নগর নির্মাণ হয়। নগর সভ্যতা নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে। আর লোটা ঘরে বাইরে মুছে যায়।

মরুস্বর্গ উপন্যাসের নায়ক সাদইদ ইসলামি পুরাণে নিন্দিত। সাদইদ ইসলামি পুরাণ ও মিথের কাহিনিতে শাদ্দাদ নামে পরিচিত। ইহুদি ও ইসলামি পুরাণে বর্ণিত শাদ্দাদ বাদশাহ হল উপন্যাসের নায়ক। কোরান বা হাদিসের কাহিনিতে শাদ্দাদের গল্প পাওয়া যায় না। ইসলামি মিথ হিসাবে এই কাহিনি পাওয়া যায় *কাসাসুল আফিয়া* জাতীয় গ্রন্থে।

ইসলামি পুরাণ অনুসারে নোহের পুত্র ছিল শাম এবং শামের পুত্র ছিল আদ। শাদ্দাদ ছিল আদ জাতির বংশধর। আদ জাতি ইসলামি শাস্ত্র অনুসারে অভিশপ্ত এক জাতি। যাদের কথা কোরান-এর নানান জায়গায় উচ্চারিত হয়েছে। নোহ নবীর সময়ে পৃথিবীব্যাপী যে মহাপ্লাবন হয়েছিল, তার সার্বিক ধ্বংসকাণ্ডের পর নোহের কিস্তিতে (নৌকা) আরোহিত মানুষ, পশুপাখি এবং যাবতীয় জীবকুল থেকে আবার পৃথিবী পূর্ণ হয়, নতুন সভ্যতা ও জনবসতি গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ‘আম্মান, হাজরামাউত ও পারস্য উপকূলে এক শক্তিশালী এবং সম্পদশালী জাতি বসতি স্থাপন করে। যাদের রাজধানী ছিল ইরাম, এরাই জাতিই আদ জাতি নামে খ্যাত। ঈশ্বরের শত্রু শয়তানের প্ররোচনায় আদ জাতির মানুষেরা পৌত্তলিক এবং মূর্তিপূজারী হয়ে ওঠে।’^{৪৮} আখ্যানে মূর্তিমান ঈশ্বরের পূজা সেই সাক্ষ্য দেয়। আদ জাতির লোকেরা ধনসম্পদ ও দৈহিক ক্ষমতার কারণে অহংকারী হয়ে উঠেছিল। নবি (ঈশ্বর প্রেরিত দূত) হজরত হুদ মূর্তি পূজা বিরোধী ছিলেন। হুদ নবি আদ জাতির লোকেদেরকে মূর্তি পূজা বন্ধের উপদেশ দিলে তারা সে কথায় কর্ণপাত করেনি। অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছায় আদ জাতির মানুষদের উপর ভয়ানক শাস্তি নেমে আসে। প্রচণ্ড ঝড় ও বজ্রপাতের ফলে তাদের বসতি, ঘরবাড়ি সব তছনছ হয়ে যায়। ঈশ্বরের রাজনৈতিক বুদ্ধির কাছে হেরে যায় স্বাধীনচেতা আদ জাতি। কোরান শরীফের সুরা শোয়ারা-র ১২৩-১২৬ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে:

আদ সম্প্রদায়ের মানুষেরা রসুলগণের (ঈশ্বর প্রেরিত দূত) প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। যখন ওদের কাছে আল্লাহর নবি হুদ বলেছিলেন, ‘তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল। তোমরা আল্লাহ্-কে ভয় কর এবং তার আনুগত্য কর।’^{৪৯}

কোরানে হুদ নবীর নামাঙ্কিত একটি সুরা রচিত হয়েছে। সুরা হুদের ৫০-৫৫ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে:

আদ জাতির কাছে তাদের ভ্রাতৃপ্রতিম হুদ-কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন— হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনা করেছে। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের ঈশ্বরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। এবং তারপর তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করো। তিনি তোমাদের প্রচুর শান্তি বর্ষণ করবেন। তোমাদের আরও উন্নতি হবে, শক্তি বৃদ্ধি হবে। তোমরা অপরাধী রূপে মৃত্যুবরণ করো না। আদ জাতির লোকেরা বলল- হে হুদ! তুমি আমাদের কাছে কোনো প্রকাশ্য নিদর্শন আনোনি এবং আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাসকদের ত্যাগ করব না। তোমার নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব না।^{৫০}

ঈশ্বরের আনুগত্য অস্বীকার করার প্রতিফল হিসাবে ঈশ্বর কর্তৃক আদ জাতির বিনাশ ও ধ্বংসসাধনের কথা ইসলামি পুরাণের বহু জায়গায় উচ্চারিত হয়েছে। *কোরান*-এর অন্যত্র (৭ সংখ্যক সূরা আরাফ) এও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। ইসলামি শাস্ত্রে মূর্তি পূজা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ধর্মবিশ্বাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের অকাট্য দলিল হিসাবে পরিচিত *কোরান শরীফ*-এ বহুবার এ কথা ব্যক্ত হয়েছে। ‘ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়’ অতএব তাঁকে ছাড়া অন্য কারোর উপাসনা ইসলামি শাস্ত্র মান্য করে না। আদ জাতির মানুষদের মূর্তি পূজার প্রতি বিশ্বাস অবিচল ছিল। কোরানের ৪৬-সংখ্যক সূরা আহ্কাফ-এর ২১-২৮ সংখ্যক আয়াতে তার বর্ণনা রয়েছে:

হজরত হুদ আদ জাতির লোকেদের সতর্ক করেছিলেন এই বলে— আল্লাহ ব্যতীত কারোর উপাসনা করো না। আল্লাহ ব্যতীত কারোর উপাসনা করলে আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের (মহাপ্রলয়) শাস্তির আশঙ্কা করছি। আদ সম্প্রদায় বলেছিল— তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেবদেবীদের পূজা করতে নিষেধ করতে এসেছ? তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে যে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছ তার প্রমাণ দাও।

হুদ বলেছিলেন— এই জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে। আমি যে জ্ঞান নিয়ে তোমাদের দরবারে এসেছি কেবল সেটাই প্রচার করছি। তোমরা দেখছি এক নির্বোধ সম্প্রদায়। অতঃপর ওদের উপত্যকায় মেঘ শান্তি রূপে আবির্ভূত হল। আল্লাহর নির্দেশে ঝড়

এবং প্রবল বর্ষণের প্রকোপে ওদের বসতি ছাড়া আর কিছুই রইল না। সবকিছু ধ্বংস হল। এইভাবে আল্লাহ্ অপরাধী সম্প্রদায়কে তাদের প্রতিফল দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন— আমি তোমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকাকে ধ্বংস করেছিলাম। আমি বারংবার আমার নিদর্শনসমূহ ওদের দেখিয়েছিলাম। যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে। কিন্তু ওরা আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের উপাস্য দেবতা রূপে গ্রহণ করেছিল, তারা ওদের সাহায্য করল না কেন? বরং ওদের কাছে থেকে ওদের উপাস্য মূর্তিগুলি অন্তর্হিত হয়ে পড়ল। এইসবই ওদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম।^{৫১}

আখ্যানেও মরুভূমির মানুষদের অনেক দেবতা ছিল, যে দেবতাদের বিরোধিতা করেছেন মহাত্মা ইহুদ। আকাশের দেবতা সূর্য, নাম তার সামাশ। সূর্যদেবতা আমন, কৃষির দেবী ইস্তার। লোটা ও রিবিকার বিবাহের প্রাক্‌মুহূর্তে ইহুদ সাদইদের উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন তা ইসলামি পুরাণের হুদ নবীর বক্তব্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়:

আমার ধর্মে কোনো প্রতিমা পূজা নেই সাদ। আমার ধর্ম দেবতা সামাশ বা আমনের চেয়ে শক্তিশালী। ইয়াহো নিরাকার। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অদ্বিতীয় ঈশ্বর। বলো, তিনি যা তিনি তাই। তুমি এই কথাগুলি লোটাকে বলিয়ে নাও। এই মন্ত্রই বিবাহের মন্ত্র। এখানকার সমস্ত পুরুষ তোমার মতো নারীর স্বপ্ন দেখে। আমি সকলকে সেই স্বপ্নের দিকে নিয়ে চলেছি। তোমরা সকল বিগ্রহ বর্জন করো। ইয়াহো সূর্যকে অবধি নিয়ন্ত্রণ করেন। বাতাস তাঁরই নির্দেশে চলে। মেঘ, বৃষ্টি, সমুদ্র, নদী তাঁরই ইশারায় আন্দোলিত হয়। বৃক্ষের একটি পাতাও তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কাঁপে না।^{৫২}

প্রাচীন বাইবেল এবং পরবর্তীকালে কোরানে পশুপালক মরুযাযাবর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কৃষিজীবী মানুষদের ধর্ম ও জীবনগত দ্বন্দ্বের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আখ্যানে লেখক এই দ্বন্দ্বকেই মূর্তিমান ঈশ্বর এবং মূর্তিহীন ঈশ্বরের দ্বন্দ্ব রূপে কল্পনা করেছেন। ইহুদ এবং সাদইদের কথোপকথনে সেই ভাবনার কথাই উঠে এসেছে। ইসলামি পুরাণে ঈশ্বর প্রেরিত নবীদের জীবনকাহিনিতেও দেখা যায়, তৎকালীন মানুষেরা নিরাকার ঈশ্বরকে ছেড়ে নানান দেবতা ও মূর্তির আরাধনা করত। এবং ঈশ্বরের দূত তাদের মূর্তি পূজা

থেকে বিরত রাখার সর্বত্রভাবে চেষ্টা করতেন। আব্রাহাম (কোরানে ইব্রাহিম) পন্থীদের সঙ্গে নিম্নোদের লড়াই, মোজেসের সঙ্গে ফেরাউনের লড়াই, এমনকি মুহম্মদ অনুসারীদের সঙ্গে ‘অমুসলিম’দের যুদ্ধও সেই প্রমাণ দেয়। ইসলামি পুরাণ মতে, এ যুদ্ধ ও সংগ্রাম এবং বৈরীতার মূল লক্ষ্য ছিল ‘আল্লাহ্ মনোনীত ধর্ম’ (দীন)কে প্রতিষ্ঠা এবং সুসংগঠিত করা। হাদিস অনুসারে এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার (মতান্তরে দু লক্ষ চুয়ান্ন হাজার) নবি বা পয়গম্বরকে ঈশ্বর দূত স্বরূপ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁদের কাজই ছিল ইসলাম ধর্মের মূল বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা, নিরাকার ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা— মুসলমানদের *কোরান* ও হাদিসে এ নিয়ে বহু ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। উপন্যাসের কাহিনিতেও লেখকের কল্পিত নবি ইহুদপন্থীদের সঙ্গে মূর্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষদের দ্বন্দ্বটি প্রাচীন পৃথিবীর বিলুপ্ত নগর সভ্যতার বিলুপ্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। বিশ শতকের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস *গোরা*-তেও মূর্তিমান ও মূর্তিহীন ঈশ্বরের দ্বন্দ্বটি দেখিয়েছিলেন ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মের মধ্যকার বিরোধ রূপে। গোরা, পরেশবাবু এবং বরদাসুন্দরীর কথোপকথনে মতানৈক্যের প্রসঙ্গটি উঠে এসেছিল:

বরদাসুন্দরী: এখন আপনি সাকার-উপাসনায় বিশ্বাস করেন?

গোরা: আকার জিনিসটাকে বিনা কারণে অশ্রদ্ধা করব আমার মনে এমন কুসংস্কার নেই। আকারকে গাল দিলেই কি সে ছোটো হয়ে যায়? আকারের রহস্য কে ভেদ করতে পেরেছে?

পরেশবাবু: আকার যে অন্তবিশিষ্ট।

গোরা: অন্ত না থাকলে যে প্রকাশই হয় না। অনন্ত আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই অন্তকে আশ্রয় করেছেন। নইলে তাঁর প্রকাশ কোথায়? যার প্রকাশ নেই তার সম্পূর্ণতা নেই। বাক্যের মধ্যে যেমন ভাব তেমন আকারের মধ্যে নিরাকার পরিপূর্ণ।

বরদাসুন্দরী: নিরাকারের চেয়ে আকার সম্পূর্ণ আপনি এমন কথা বলেন?

গোরা: আমি যদি নাও বলতুম, তাও কিছুই আসত যেত না। জগতের আকার আমার বলার উপর নির্ভর করছে না। নিরাকারই যদি যথার্থ পরিপূর্ণতা হত তাহলে আকার কোথাও স্থান পেত না।^{৫৩}

রবীন্দ্রনাথের মতো একালের কথাকার আবুল বাশারও তাঁর কল্পিত চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এই দ্বন্দ্বকে আরও সুসংহত ও শৈল্পিক দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন। মূর্তি কেবল মূর্তি বা দেবতা নয়, তা আর্টের নির্দশন। শিল্পীর হাতের সিদ্ধি। উপন্যাসের ইহুদ আর্টিস্টের স্বাধীনতাকে পাপ বলে দেগে দিতে চেয়েছেন। এভাবেই শুরু হয় শিল্পীদের সঙ্গে মৌলবাদীদের সংঘাত। ধর্মীয় অনুশাসনে নিষিদ্ধ কোনো ব্যক্তিমানুষ বা বস্তুর পটচিত্র বা ছবি-কার্টুন অঙ্কন করলে আজকের পৃথিবীতে মানুষকে খুনও হতে হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষত বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে ব্লগারদের খুন, ভারতীয় চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হোসেনের উপর মৌলবাদীদের বিষোদ্গার— আখ্যানে উল্লেখিত আদিম পৃথিবীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আজকের মুক্তমনা মানুষদের মতোই সাদইদ আর্টিস্টের স্বাধীনতার সপক্ষে বলেছিল তার যুক্তিনির্ভর কথা। লোটার মৃত্যুর পর সে মরুপ্রদেশে হারিয়ে গেলেও নিনিভা নগরীর নির্মাতা ভাস্কর হেরা সাদইদের নির্দেশে লোটার মূর্তি বানিয়ে তাকে মরুমতে অমর করে রাখতে চেয়েছে। অথচ ইহুদের দলবল রাতারাতি লোটার মূর্তি ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। ইহুদের মতে, এসবই ঈশ্বর ইয়াহোর নির্দেশ। ফেরেশতা জিবরাইল ভেঙেছেন এ মূর্তি। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে আর্টিস্টের স্বাধীনতাকে হত্যা— মেনে নিতে পারেনি সাদইদ। ইহুদ ও সাদইদের কথোপকথনে উঠে এসেছে সেই প্রসঙ্গ:

সাদইদ বলল— ...কিন্তু লোটার এই মূর্তি ভেঙে দিয়ে আপনি মহাত্মার কাজ করেননি। আপনি জানেন, লোটা বেঁচে থাকলে ফিরে আসত। লোটা নেই বলেই তার মূর্তিটা হেরা তৈয়ের করে এই রাস্তার উপর খাড়া করেছে। হেরা প্রচুর পরিশ্রম করেছে, দিনরাত ভেবেছে। লোটার মৃত্যু সে দেখেছে মহাত্মা ইহুদ। আপনি কেন ভেঙে দিলেন?

ইহুদ বললেন— দ্যাখো সাদইদ। লোটার মৃত্যু ধারণা মাত্র। তার মৃত্যু হতে পারে না। মহারাজা হিতেনের মতো বলশালী রাজচক্রবর্তীকে যে হত্যা করে, তার মৃত্যু নেই। কালো অশ্ব তাকে আনতে গেছে। সে ফিরে এসে রিবিকাকে উদ্ধার করবে। তোমার লাম্পটের গহ্বরেই তোমার পতন অনিবার্য সাদইদ। লোটার আর কোনো রূপ নেই। ইয়াহো তুলে নিয়েছেন।

সাদইদ বলল— মূর্তি দিয়ে চিন্তা করা সহজ মহাত্মা। নকশার ভাষা হল মূর্তির ভাষা। মূর্তি আবার সকল ভাষার চেয়ে শক্তিশালী। আপনি জেনে রাখুন, মানুষ মূর্তি বানাবেই। আকাশের ঈশ্বর মূর্তি বানিয়েছিল, সেগুলি মানুষ। মূর্তি গড়া একা ঈশ্বরের অধিকার নয়। মানুষেরও অধিকার।^{৫৪}

সাদইদের স্পর্ধিত উচ্চারণের হ্যাঁচকা-টানে ইহুদ কোনো পরিপূর্ণ ‘লজিক’ উত্থাপন করতে পারেননি। তিনি কেবল বলেছিলেন, মূর্তি ধ্বংস করাও কিন্তু ইয়াহোর নির্দেশ। কারণ তাঁর নিজের কোনো রূপ নেই। পুরাণের গল্পেও আদেশ-নির্দেশ ও প্রত্যাদেশ-এর ছড়াছড়ি। সাদইদের সুস্পষ্ট যুক্তির বেড়াজাল ভেদ করে যা নতুন কোনো লজিকের জন্ম দিতে পারেনি। কথাকার আবুল বাশার সাম্প্রতিক সময়ের মৌলবাদীদের সঙ্গে মুক্তমনা মানুষদের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তাঁর *রাজাবলি* উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছিলেন— ‘ধার্মিক মুসলমান অত্যন্ত স্পর্শকাতর প্রাণী, তাঁরা *কোরান* এবং মুহম্মদ শোনা মাত্রই শিউরে ওঠেন। কোনো শাস্ত্রই হজরত মুহম্মদ চরিত্রের কণামাত্র স্থলন বরদাস্ত করে না, আমার বিচারে তাই তাঁকে অবলম্বন করে কখনও কোনো উপন্যাস রচিত হতে পারে না, অন্তত ভারতীয় উপমহাদেশে বসে সম্ভব নয়। পাঠককে স্পষ্ট বলে রাখি, একজন আধুনিক লেখক যদি কোনো চরিত্রকে স্পর্শ করার কোনো হেতুই না পান এবং সেই প্রবল চরিত্রকে স্পর্শমাত্রই লেখকের জন্য মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা জারি করে রাষ্ট্র, তাহলে বুঝতে হবে, সেই মহৎ চরিত্র শাস্ত্রমূলেই একদিন গুঁকিয়ে যাবে। শাস্ত্র বলশালী, কিন্তু সাহিত্য দুর্বল নয়, আধুনিক রুচির কাছে সাহিত্য কখনও কখনও শাস্ত্র অপেক্ষা গ্রাহ্য। শুনতে কারও পক্ষে মন্দ হলেও, এ সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক হস্তক্ষেপে শাস্ত্র ম্লান হয়নি, তিনি তাঁর আধুনিক যুক্তির

সঙ্গে শাস্ত্রকে গেঁথে তুলেছিলেন, তিনি যেভাবে কৃষ্ণসার গ্রহণ করেন, আমরা মহানবিকে সেভাবে স্পর্শ করারও অধিকারী নই।”^{৫৫}— ইসলামি মৌলবাদীদের দাপট ও রণহুঙ্কারের দৌলতে আটের নানান ক্ষেত্রের মানুষ তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা-চিন্তাকে দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করতে অপারগ। মৌলবাদের দাপট এমনই ভয়াবহ। উপন্যাসের ইহুদ ও সাদইদের কথোপকথন এবং আর্টিস্ট হেরার কারুকার্যের বিরোধিতা— সাম্প্রতিক সময়কে ছুঁয়ে যায়। মধুদুগ্ধের দেশ কনান (বর্তমান প্যালেস্টাইন)— আব্রাহামের স্বপ্নের দেশ। মহা নবি নোহের পিতৃভূমি। এই দেশেই একদিন আগমন ঘটেছিল কারুশিল্পী হেরার। সাদইদ হেরাকে দিয়ে নগর নির্মাণের স্বপ্ন দেখত, নগর দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছিল স্বর্গ। স্বর্গ নির্মাণ ছিল সাদইদের ‘প্যাশন্’ ও আকাঙ্ক্ষা। অথচ বারবার সে নির্মাণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে হেরা-সাদইদ। সাদইদের মতে, ইহুদের ধর্মের ঈশ্বর পাহাড়ে থাকেন। তাঁর রূপ নেই। আছে কেবল আগুন-ঝরা দুটি চোখ। সে চোখ দেখা যায়, কল্পনা করা যায় মাত্র। মূর্তিহীন ঈশ্বর সবকিছু দখল করতে চেয়েছে, মূর্তি গড়া সেখানে পাপ বলে গণ্য করা হয়। সাদইদ যখন ইহুদের সপক্ষে বলতে গিয়ে হেরা জানিয়ে দেয়, শিশু ও নারীর জন্য মরুভূমিতে শিল্পচর্চা নিষেধ। একজন কারুশিল্পীর ছটফটানি ও হৃদয়ের দ্বন্দ্ব চমৎকার ভাষায় তুলে ধরেছেন লেখক। হেরা ও সাদইদের কথোপকথন ও বয়ানে হেরার অনুভূতির তীব্রতা বোঝা যায়:

হেরা— অসম্ভব! এ হতে পারে না। হাস্যকর প্রস্তাব। মূর্তি না বানাতে আমি খেতে পাব না। বাঁচতে পারব না। মাটি মানেই মূর্তি। মাটি তার রূপ চায়। পাথর তার রূপ চায়। পেতল তার রূপ চায়। সোনা চায় অপূর্ব রূপের কাস্তি। নগর হল রূপের একটি উচ্চতা। নিনিভা আমার পাপের উপার্জন নয়। সে আমার অর্জন। একটা রূপের বদলে পেয়েছি। ও আমার বোবা দেবী, ওর সঙ্গে দেহ মিলনে কোনো পাপ নেই আমার। আমায় বিরক্ত ক’রো না! নিনিভা! ও নিনিভা! স্বপ্নের নগরী! হায়!

সাদইদ— তোমার সেই এক কথা হেরা। নগর। নগরের সঙ্গে মূর্তির কী সম্বন্ধ?

হেরা— ডানাঅলা বৃষ— নিনিভের ভাস্কর্য। মূর্তি ছাড়া তুমি তোমার শক্তি, সমৃদ্ধি, তোমার শৌর্য— কিছুই প্রকাশ করতে পারো না। মানুষ মূর্তিতে পরিণত না হলে দেবতা হতে পারে না। যেমন মিশরের ফেরাউন। মূর্তি যত বিশাল হবে মানুষও তত দেবতা হয়ে উঠবে নতুবা দেহটা হবে সিংহের, মাথা হবে মানুষের— অন্তত তুমি তাই হও— আতঙ্কের জনক। তোমার পায়ের তলায় পিঁপড়ের সমান পড়ে থাকবে চাষা। একজন মুটে। একজন কারিগর। একজন ঘরামী।^{৫৬}

শিল্পী হেরার কারুকার্যময় যুক্তিনির্ভর বয়ান সাদইদকে মূর্তি এবং নগর নির্মাণে প্রণোদিত করেছিল। সাদইদ মরুভূমির বিচরণশীল মানুষদের জন্য বড়ো বড়ো নগর তৈরি করে স্বর্গ গড়ার পরিকল্পনা করে। সাদইদের ভাষায়, ‘একজন মানুষ ভালোবাসে কতকগুলি আকৃতি— নারী তার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আকৃতি— স্বর্গ মানে চির বসন্তের আলো— নগ্ন নারী আর নগ্ন শিশুর চেয়ে সুন্দর কিছু নেই। সেই আলোর মধ্যে নারী আর শিশুরা থাকে। হেরা! আমি আর কিছু চাই না!’^{৫৭}— আর ইয়াহোর স্বর্গে শুধু নারী থাকে। পুরুষ আর নারীর অবিচ্ছিন্ন ক্লাস্তিহীন মিলন। সেখানে শিশু নেই। সাদইদের কটাক্ষ যেন ইহুদের ঈশ্বরের প্রতি। ইসলামি পুরাণেও পরকালের বেহেশতে যৌনতার যে বর্ণনা আছে তার গভীরে নারী যে ভোগের সামগ্রী সেই বীজ নিহিত। ইসলামি পুরাণের আকরগ্রন্থ *কোরান*-এর বহু জায়গায় হুর’দের রূপ ও গুণের বর্ণনা রয়েছে।^{৫৮} কার্যত এইসব নানাবিধ কারণে ইহুদের ইয়াহোর বেহেশতকে অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে সাদইদের। এখান থেকেই শুরু হয় সাদইদের স্বর্গ গড়ার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি। নগরের ভাস্কর্য ও সৌন্দর্যই ছিল তার স্বর্গ কল্পনার ভিত্তি।

ইসলামি পুরাণ অনুসারে, শাদ্দাদ বাদশাহ সেদিনের পৃথিবীতে স্বর্গ নির্মাণ করেছিল অহংকারের বশবর্তী হয়ে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ ক’রে। ইহুদি ও ইসলামি পুরাণে শাদ্দাতকে নিন্দা করা হয়েছে। পুরাণের গল্পে শাদ্দাদ নিন্দিত। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী শাদ্দাদ স্বর্গ নির্মাণ

ক'রে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছিল নিজেকে। পুরাণের ঈশ্বর শাদাদের স্পর্ধিত স্বপ্নকে সহ্য করেননি। স্বর্গে প্রবেশ করার আগেই ঈশ্বরের আদেশে যমদূত আজরাইল প্রাণ হরণ করে শাদাদের।

ইহুদি ও ইসলামি পুরাণের অহংকারী বাদশাহকেই আবুল বাশার তাঁর উপন্যাসের নায়ক করে তুলেছেন। পুরাণের শাদাদ বাদশাহ আখ্যানের সাদইদ। সে সেনাধিপতি, মানুষের রক্ষক। যে ‘হিতেনের ভাড়াটে সেনা’ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে বারবার। যে যুদ্ধ বিদীর্ণ মরুভূমির জন্ম-যাযাবর মানুষকে নিয়ে পাড়ি দিতে চেয়েছে শস্যশ্যামল ভূমিক্ষেত্রে। মানুষের জন্য গড়তে চেয়েছে মন্দির ও স্বর্গ। রোধ করতে চেয়েছিল কৃষি জীবন নির্ভর বহু দেবদেবীর ধর্মের মধ্যকার বিরোধ। প্রাচীন বাইবেল ও কোরানে যে মরু-যাযাবর ও কৃষিজীবী-গোষ্ঠীর ধর্ম ও জীবনগত দ্বন্দ্ব রয়েছে, উপন্যাসে সেই দ্বন্দ্বকেই মূর্তিহীন ঈশ্বর ও মূর্তিমান ঈশ্বরের দ্বন্দ্ব রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মরুভূমির তিন ধর্মের এই কল্পনা ও বিশ্বাসের লড়াই-যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে এক নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিল সাদইদ।

ইসলামি পুরাণের আকরগ্রন্থ কোরান এবং হাদিসে শাদাদের জীবনবৃত্তান্ত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। ইসলামি পুরাণের নীতিকথামূলক আখ্যান এবং মিথ হিসাবে এ কাহিনি কাসাসুল আফিয়া জাতীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। কাসাসুল বা কিসাস উল-আফিয়া হল— ইসলামি পুরাণে নবি এবং রসুল হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিদের জীবনকাহিনির একটি সংকলন যা তাফসির (কোরানের ব্যাখ্যা) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কাসাসুল শব্দের আরবি অর্থ হল গল্প এবং আফিয়া হল নবি শব্দের বহুবচন। যার অর্থ নবীগণ। এই গ্রন্থে হজরত হুদ নবি এবং আদ জাতির বর্ণনা প্রসঙ্গে শাদাদের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

কোরান শরীফে হুদ এবং আদ জাতিকে নিয়ে বিস্তারিত কথাবার্তা থাকলেও শাদ্দাদ এবং তার নির্মিত বেহেশতের উল্লেখ নেই। তবে স্পষ্টভাবে কোরানে শাদ্দাদের বেহেশতের কথা উল্লেখিত না হলেও আদ জাতির গল্পের অন্তরেই নিহিত রয়েছে শাদ্দাদের বৃত্তান্ত। কোরানের ২৬-সংখ্যক সূরা শোয়ারা ১২৮-১২৯ ও ১৩৯ সংখ্যক আয়াতে রয়েছে:

তোমরা তো অযথা প্রতিটি উচ্চস্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করেছ। তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করেছ
এই ভেবে যে তোমরা চিরস্থায়ী হবে।... অতঃপর ওরা তাঁকে (হুদ) প্রত্যাখ্যান করল
এবং আমি (আল্লাহ) ওদের ধ্বংস করলাম।^{৫৯}

ইসলামি পুরাণ অনুসারে বাদশাহ শাদ্দাদ যে স্থানে তার বেহেশত নির্মাণ করেছিল, মরুপ্রদেশের সেই স্থানটির নাম ছিল ইরাম নগরী। চলতি ভাষায় যাকে বলা হত মরুর আটলান্টিস। কোরানে ইরাম নগরীর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। কোরানের ৮৯-সংখ্যক সূরার ৬-৮ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে:

তুমি কি দেখনি তোমার আল্লাহ্ আদ জাতির ইরামে কী করেছিলেন? তাদের ছিল
সুউচ্চ সব প্রাসাদ, যেমনটি আগে কোনো দেশে নির্মিত হয়নি।^{৬০}

ইবনে কাসিরের *আল বিদায়া* গ্রন্থ থেকেও জানা যায়, আদ জাতি প্রতাপশালী ও ধনী ছিল, নির্মাণ করেছিল সুউচ্চ সব অটালিকা। তারা একসময় একেশ্বরবাদ বর্জন করে এবং মূর্তিপূজা শুরু করে, যেমন সামদ, সামুদ এবং হারা ছিল তাদের তিন উপাস্য। হুদ অনেক দিন তাদের মাঝে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, আল্লাহ্র পথে ডাকেন। কিন্তু তারা না ফেরায় এক ঝড় তাদের ধ্বংস করে দেয়, আর সকাল বেলা জনশূন্য ইরাম পড়ে থাকে।^{৬১} তবে শাদ্দাদের উপকথা এ নগরী ধ্বংসের আগের ঘটনা। বলা হয়, শাদ্দাদ আর তার ভাই শাদ্দিদ পালা করে এক হাজার আদ গোত্রের ওপর রাজত্ব করত। পুরো আরব আর ইরাকের রাজা ছিল শাদ্দাদ। এমনকি, কিছু আরবি লেখকের মতে, যে

শাদ্দাদের অভিযানের কারণে কানানের দেশান্তর হয়েছিল। শাদ্দাদের কাহিনি এবং ইরাম নগরীর কথা *আরব্য রজনী*-র মধ্যেও সংকলিত হয়েছে। *আরব্য রজনী* গ্রন্থের ২৭৭ থেকে ২৭৯ তম রাতে বলা হয়। উপকথা অনুযায়ী, হুদ শাদ্দাদকে পরকালের বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু শাদ্দাদ জানায় দুনিয়াতেই বানাবে সে নিজস্ব বেহেশত, পরকালের বেহেশতের প্রতি তার কোনো বিশ্বাস ছিল না। এরপর ইয়েমেনের আদানের কাছে এক বিশাল এলাকা জুড়ে শাদ্দাদের বেহেশত নির্মাণ শুরু হয়। প্রাচীর দেয়ালগুলি ৭৫০ ফুট উঁচু ছিল, আর প্রস্থে ৩০ ফুট। চারদিকে চারটি ফটক। ভেতরে তিন লক্ষ প্রাসাদবাড়ির কথা বর্ণিত আছে, উপকথা অনুযায়ী যার নির্মাণ কাজ শেষ হয় ৫০০ বছরে। *আল বায়যাওয়া* গ্রন্থ থেকে আব্দুল্লাহ ইবন কিলাবাহ এর বর্ণনা করা একটা ঘটনা জানা যায়, তিনি ইয়েমেনের আদানে এক আরবের দেখা পেয়েছিলেন, যিনি কিনা হাদ্রামুতের পশ্চিমে মরুভূমির গহীনে এক রহস্যময় শহরের সন্ধান পেয়েছিলেন, যা ইরাম নগরীর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। অন্য বর্ণনায় আব্দুল্লাহ নিজেই সেই শহরে যান। সেখান থেকে জহরতও নিয়ে আসেন। এ অভিযানের কথা তখনকার খলিফা মুয়াবিয়ার কানে পৌঁছায়। নিজের অভিযানের সত্যতা প্রমাণের জন্য তিনি খলিফাকে ইরামের কিছু মুক্তো দেখান, যেগুলি এখন হলুদ রূপধারণ করে হারিয়েছে তার সৌন্দর্য। খলিফা তখন সাহাবী কাব আল আহবারকে জিজ্ঞেস করেন এ শহরের কথা, তিনি তখন উপকথার কাহিনিগুলি বর্ণনা করেন।^{৬২} তবে *কোরান* বা মহানবি হজরত মুহম্মদের কোনো কথায় শাদ্দাদের বেহেশতের কোনো কাহিনি পাওয়া যায় না, তাই এ ঘটনার কোনো হাদিসি দলিল নেই ইসলামি পুরাণে। ইসলামি পুরাণের (*কাসাসুল আফিয়া*) গল্প অনুযায়ী, হুদ নবির কাছে ঈশ্বরের স্বর্গের বর্ণনা শুনেছিল বাদশাহ শাদ্দাদ। *কাসাসুল আফিয়া* গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী, হুদ নবির

ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে শাদ্দাদ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে স্বর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। স্বয়ং ঈশ্বর নাকি নবি মুহম্মদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন:

হে মুহম্মদ! শাদ্দাদ পৃথিবীতে এমন বেহেশত নির্মাণ করেছিল, দুনিয়ার কোনো বাদশাহ কোনোদিনই ঐরূপ প্রাসাদ বানাতে পারেনি। হে মুহম্মদ! তুমি তো দেখনি তোমার প্রতিপালক সে বিরাট বিরাট প্রাসাদ নির্মাণকারীদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছিলেন।^{৬৩}

শরিয়তি ইসলাম যদিও এমন কথাকে মান্যতা দেয় না। আদ জাতি এবং তৎকালীন নানান উচ্চ অট্টালিকা ও প্রাসাদ ধ্বংসের কথা কোরান-এর বহু জায়গায় স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হলেও বিশেষভাবে শাদ্দাদের বেহেশতের কথা কোথাও নেই। পরবর্তীকালে এ ঘটনা সংযোজিত হয়েছে কাসাসুল আফিয়া জাতীয় গ্রন্থাবলীতে। এই গ্রন্থেও শাদ্দাদের পরিণতির সঙ্গে কোরান-এর প্রাসাদ ধ্বংসের ঘটনা মিলে যায় অনেকখানি। বহু স্বর্ণ, রৌপ্য এবং হীরা-জহরতসহ দেশ-বিদেশের বহু অতি উজ্জ্বল পাথর সহযোগে নির্মিত হয়েছিল শাদ্দাদের বেহেশত। হুদ ঈশ্বরের বেহেশতের যেরূপ বর্ণনা দিয়েছিলেন শাদ্দাদকে, শিল্পী-মিস্ত্রীসহ সমস্ত শ্রেণির কারিগরদের সেই মতো স্বর্গ নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছিল শাদ্দাদ। কথিত আছে, শাদ্দাদের স্বর্গ নির্মাণের জন্য প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বস্তা সোনা এবং রূপা নিঃশেষ হয়ে যেত। এভাবে টানা তিনশো বছরে তার নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। এরপর সমস্ত শিল্পীরা অনুরোধ করে বাদশাহ শাদ্দাদের কাছে, হুজুর! আপনার বেহেশত নির্মাণ আমরা শেষ করেছি। শাদ্দাদ শুনে খুব খুশি হয়ে সৈন্যদের আদেশ করে যে, এখন রাজ্যের সমস্ত সুন্দর বালক ও সুন্দরী বালিকাদের বেহেশতে এনে একত্রিত কর। আদেশ অনুসারে সৈন্যরা দেশের অসংখ্য সুন্দরী বালক-বালিকাদের নিয়ে এল এবং তাদেরকে সুন্দর পোশাক পরিধান করে হুর্^{৬৪} ও গেলেমানদের^{৬৫} মতো সাজিয়ে বেহেশতের নানান জায়গায় মোতায়ন

করল। এইভাবে শাদ্দাদ তার বেহেশতকে ঈশ্বরের বেহেশতের অনুরূপ তৈরি করতে চাইল। স্বর্গ নির্মাণ পুরোপুরি সম্পূর্ণ হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ তাবৎ সৈন্য-সামন্ত ও লোক-লস্কর নিয়ে স্বর্গ দর্শন করতে এল তখন একজন অপরিচিত লোক শাদ্দাদের পথ অবরোধ করে দাঁড়ালেন। শাদ্দাদ তাকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি উত্তর দিলেন— আমি ‘মালাকুল মৌত’ (মৃত্যুর ফেরেশতা বা মৃত্যুর দূত)। স্বর্গে প্রবেশ করার আগেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় মৃত্যুর দূত আজরাইল শাদ্দাদের প্রাণহরণ করেন। কত সাধের স্বর্গ শাদ্দাদের অদেখায় রয়ে যায়।^{৬৬}

পুরাণের বাদশাহ শাদ্দাদের মতো উপন্যাসের সাদইদেরও তার নির্মিত স্বর্গ দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। বিভেদ ও সংঘর্ষময় পৃথিবীতে শান্তির আশ্রয় নির্মাণ করতে গিয়ে সাদইদ ট্রাজেডির অতলান্তে গভীরে তলিয়ে যায়। মৃত্যুর দূত আজরাইল ঈশ্বরের আদেশে কত শত কোটি প্রাণ হত্যা করেছেন। সে নির্দয় বলেই তাকে প্রাণ হরণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ঈশ্বর।^{৬৭}

ইসলামি পুরাণে রয়েছে, একটি সাগরে একবার নৌকাডুবিতে সমস্ত যাত্রী মারা যায়, কেবল একজন গর্ভবতী নারী নৌকার একটা তকতায় ভাসতে ভাসতে একটা দ্বীপে আশ্রয় নেয়। কিছুক্ষণ পর সেই নির্জন দ্বীপে মহিলাটি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। সদ্যোজাত সন্তানকে দেখামাত্র মহিলাটি তার সমস্ত দুঃখ দুর্দশা ভুলে যায়। আর তখনই ঈশ্বর নির্দেশ দিলেন, মৃত্যুর দূত আজরাইলকে যে, ওই মহিলার প্রাণ হরণ করতে হবে। তখন মৃত্যুর দূত এ কথা ভেবে কেঁদেছিল যে, এখন এই দুঃখপোষ্য শিশুটির কী অবস্থা হবে? শিশুটি হয়তো না খেতে পেয়ে মারা যাবে অথবা কোনো হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলবে।

দ্বিতীয়বার মৃত্যুর দূত আজরাইল কেঁদেছিল শাদ্দাদ বাদশাহর মৃত্যুর সময়। কেননা সে বহু বছর ধরে তৈরি করা তার সাধের স্বর্গ দেখতে পায়নি। ঈশ্বরকে বলেছিল, এত আশা আকাঙ্ক্ষা ও সাধ নিয়ে একজন রাজা স্বর্গ নির্মাণ করল অথচ নিজের চোখে দেখতে পেল না। ঈশ্বর তখন মৃত্যুর দূত আজরাইলকে জানিয়েছিলেন, ‘সেই দুঃখপোষ্য শিশুই বাদশাহ শাদ্দাদ, যার মায়ের মৃত্যুর সময় তুমি কেঁদেছিলে আজরাইল।’

পুরাণের কাহিনি পড়লে কোথাও প্রশ্ন ওঠে, মৃত্যুর দূত আজরাইলের কান্না কোথাও যেন ঈশ্বরের আইন, বিচার বা ক্ষমতার প্রতিস্বর। ঈশ্বরের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা স্বর তৈরি করেছে। পুরাণের কাহিনি স্বাভাবিকভাবেই প্যারাবল্ জাতীয়। সেখানে নীতিকথাই বেশি। উপন্যাসের সাদইদ কোনো বাদশাহ নয়, সে সাধারণ সৈনিক। নিজেকে বারবার বলেছে ‘রাজা হিতেনের ভাড়াটে সেনা’। আখ্যানেও পুরাণের মতো সাদইদের জন্মের পরেই তার মা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। নিজের আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে সাদইদ রিবিবিকাকে জানিয়েছে:

ক্ষুধার্ত মেয়েকে বলাৎকার করা কাপুরুষতা। সমকামিতার চেয়ে নোংরা জিনিস। আমি যদি সারগন হতাম, আমার নাগরিক অনুশাসনে একথা লিখতাম। অবশ্য সারগনের মতো আমার জন্মমুহূর্তেই মা আমাকে ত্যাগ করেছিলেন। হয় আমি জারজ ছিলাম। কোনো সৈনিক আমার পিতা ছিলেন, যার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না— নতুবা মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। আমার মাকে তোমাদের ঈশ্বর হত্যা করেছিলেন। নইলে নবজাতক সাদইদ কেন ঝুড়িতে করে জলে ভেসে যাবে।

একজন ভিস্তি— ভিস্তি বোঝো তো! দ্রাক্ষাকুলের মালি। তিনি কে? তিনি এক ক্রীতদাস। বস্তুত তিনিই আমার পিতা— আসল বাপটি কে জানি নে। এইরকম দিশেহারা নিরাশ্রয় জন্ম আমার। সারগনের মতো। কিন্তু আমি সারগন নই।^{৬৮}

ইসলামি পুরাণে নিন্দিত, এমনকি যাকে অহঙ্কারী-পাপী-নরকবাসী বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই চরিত্রকে আখ্যানে পুরোপুরি বিপরীতভাবে নির্মাণ করেছেন লেখক।

উনিশ শতকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১)-তে যেমন ভারতীয় পুরাণের রাম-রাবণ-ইন্দ্রজিতের গল্পকে ভেঙে অন্য চোখে দেখতে উৎসাহিত করেছিলেন। *রামায়ণ*-এর ঘটনা নিয়ে নির্মিত গল্পকথা মাইকেলের আধুনিক চিন্তন ও তর্জনির ছটায় রাবণ হয়ে উঠেছিলেন ‘Grand fellow’ এবং ইন্দ্রজিৎ হয়ে উঠেছিলেন ‘Favorite’। আলোচ্য *মরুস্বর্গ* উপন্যাসের সাদইদ চরিত্রটিও লেখকের নিজস্ব ভাবনায় পুরাণকথা ছাড়িয়ে পাঠকের প্রিয় হয়ে উঠেছে। পুরাণে সাদইদের কোনো গুণের কথা নেই, সে দোষযুক্ত পাপী। আর আখ্যানের সাদইদ এমন সৈনিক, জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে যে সর্বদা সজাগ, মানুষের প্রতি আস্থা ও পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা— এসবই যেন সাদইদ চরিত্রের মূল সত্তারই রূপান্তর। সৈনিক সমেরুকে বলা কথার মধ্যেই সেই রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়:

মনে রেখো সমেরু, একজন সৈনিক আমার কাছে আমার এই সাদা ঘোড়াটার মতোই দামী। অথবা কোনো প্রাণের বাজে খরচ পিতা নোহ পছন্দ করেন না। রাজা হিতেনের কাছে একশটি সুন্দরী দেবদাসীর মূল্য যেরকম, আমার কাছে ক্ষুদ্র একজন সৈন্য তারও চেয়ে শতগুণ মূল্যবান। আমি তোমাদের শপথ করে বলতে পারি, কখনও যদি একটি গ্রামও আমি অধিকার করি, তোমাদের মতো সৈনিকদের আমি সেখানে সংসার গড়বার ব্যবস্থা করব।^{৬৯}

যুদ্ধবিধ্বস্ত মরুমর্ত্যের মানুষকে সুস্থ ও উন্নত জীবন দিতে চেয়েছে সাদইদ। সে স্বর্গ নির্মাণ করতে চেয়েছিল সেদিনের নগরগুলির নির্মাণ ও ভাস্কর্যের সৌন্দর্য দেখে— নগরগুলিই ছিল তার স্বর্গ-কল্পনার ভিত্তি। মরুভূমির বিচরণশীল মানুষ ভাষা আর ধর্মের কারণে বারবার নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এত বিচ্ছেদ ও ছিন্নতার মধ্যেও সাদইদ মানুষের জন্যে স্বর্গ গড়তে চেয়েছিল। আশ্রয়হীন মানুষকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল, বিভেদ ও সংঘর্ষময় পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এই ছিল তার স্বর্গ নির্মাণের

অভিপ্রায়। কেবল সৈনিকদের জন্যে নয়, শিশুদের প্রতি সাদইদের স্বার্থহীন ও অকৃত্রিম স্নেহ ভারাক্রান্ত হৃদয় সৃজন করেছে এমন এক চারিত্রিক কাঠামো, যা পুরাণের গল্পের মূল কাঠামোকেই করে তুলেছে দ্বন্দ্বিকতায় ভরপুর। যুদ্ধে মৃত লাশের ভেতরে যখন হেরার শিশুপুত্রকে আবিষ্কার করে সাদইদ, তখন তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। শিশুর গলার লকেটের প্রতীকী সংকেত এবং চিরকুটে শিশুর আত্মপরিচয় জানার পর সাদইদের স্নেহশীল সত্তা জাগ্রত হয়েছে। ‘শিশুটিকে কোলে তুলে নেবার সময় সাদইদের বারবারই মনে হচ্ছিল আরও একটি শিশুর কথা। তার মা তাকে প্রসব করা মাত্রই আজরাইল মাকে হত্যা করেন। সে ভেসে যেতে থাকে ঝুড়িতে। যে দ্বীপে তার জন্ম সেই দ্বীপ নাকি সমুদ্রের তলায় তারপর তলিয়ে যায়। কুফর দ্বীপে তার জন্ম— সে দ্বীপ আর নেই। তাকে তার ভিস্তি পিতা কাফেরের পুত্র বলে ডাকত। কুফর এক অভিশপ্ত দ্বীপ।’^{৭০}

এই শিশু যেন সাদইদের প্রতিক্রম। শিশুর উপস্থিতি ও অস্তিত্বের সর্বস্ব জুড়ে সাদইদের অতীত ও শৈশবের স্মৃতি নিরবিচ্ছিন্ন রেখাচিত্র তৈরি করেছে। শিশুর অনাগত ভবিষ্যৎ, সাদইদের অতীতের রূঢ় বাস্তবতা, তার জীবনের উপলব্ধি ও ঈশ্বরের প্রতি অভিমান— সবমিলিয়ে সাদইদ যেন ভবিষ্যতের আয়নায় দেখে অনাথ-বেওয়ারিশ শিশুদের মুখ:

এই শিশুটি তারই মতো কাফের নিশ্চয়। কোনো স্বপ্নদর্শী এই শিশুকে দেখলে হয়তো বলতে পারতেন, এ বেচারি ঈশ্বর বিশ্বাস করবে না, আকাশের দেবতাদের অবজ্ঞা করবে, নবীদের করবে উপহাস। কেননা এর জন্ম আর শৈশব মৃতদেহ স্তূপে এসে ঠেকেছে, এতদূর হতভাগ্য শিশু কোথাওই তার আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না— বরং সে নিজেকেই ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে। সে তার নিজেরই মতো করে একটি একটি আকাশ, সূর্য, চন্দ্র এবং অজস্র তারকাপুঞ্জ আর পাহাড় বন নদী সৃষ্টি করে আপন মনে। তার কেবলই মনে হয় এই আকাশ, বন, নদী, সমুদ্র কোনো দেবতার সৃষ্টি নয়— এরা সূর্যের মতো আপনাতে আপনি পূর্ণ— এদের কোনো নির্মাতা

নেই। মানুষও জন্মের পর নিজেকে বানায়— নিজেকে সে খাদ্য দেয়, বস্ত্র দেয়, গৃহ দেয়— সে নিজেই তবে জীব-দেবতা।^{৭১}

সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে একজন শিশুর বড়ো হয়ে ওঠার প্রস্তুতি-প্রক্রিয়া শুরু হয়। তার মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে চারপাশের পরিস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায়, চারপাশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাগ, ক্ষোভ, বিরক্তি ও ঘৃণার সম্মিলিত একটি আবেগের তরঙ্গ তার মন ও মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। পিতৃ-মাতৃহীন জীবন ও আজন্ম টিকে থাকার লড়াই তার ভেতরে ঈশ্বরবোধের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়। ঔপন্যাসিক সাদইদের এই ভাবনার মধ্যে দিয়ে ‘সমাজের চোখে অপরাধ’ এবং তার মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির উদ্ঘাটন করে অভিনব মাত্রা সন্নিবিষ্ট করেছেন। একজন অনাথ সৈনিকের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুই হয়ে ওঠে মহামূল্যবান সম্পদ, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। পুরাণের অহঙ্কারী ও দাস্তিক বাদশাহ শাদ্দাদ থেকে উপন্যাসের এমন বাস্তববাদী, আত্মসচেতন, দায়িত্বশীল সৈনিক— মিথ থেকে বাস্তবে রূপান্তরের যাত্রাপথে সাদইদ চরিত্রের মূল অবয়বটিকে লেখক ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছেন। ইহুদ নোহের মতো কিস্তি বানিয়ে তার দলের লোকেদের কেবল বাঁচানোর কথা উল্লেখ করলে সাদইদ সুতীব্রভাবে তার প্রতিবাদ করেছে। পাপী-পুণ্যবানের ভেদাভেদ নেই তার কাছে, তার স্বর্গে সবার সমান অধিকার। এখানেই উপন্যাসের কল্পিত নবি হুদের থেকে মহান হয়ে ওঠে ‘ভাড়াটে সেনা’ সাদইদ।

ইহুদ নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ঈশ্বরের নির্মিত পরকালের স্বর্গে বিশ্বাসী। সাদইদ স্বর্গ নির্মাণ করতে চাইলে সে বারবার বাধা দিয়েছে। সাদইদের স্বর্গ নির্মাণের কারিগর ছিল হেরা। যার কাছে মূর্তিহীন ও মূর্তিমান দ্বন্দের চেয়েও বড়ো ছিল শিল্পীর স্বাধীনতা। নান্দনিকতার দিক থেকে, আর্টের চোখ দিয়ে সে সবকিছুকে দেখে, গড়ে। সে বিশ্বাস

করে মূর্তি না গড়লে মানুষ দেবতা হতে পারে না, যেমনটা হয়েছে পিরামিডের ক্ষেত্রে। মিশরের রাজাদের বলা হয়েছে অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক দেবতা। সাদইদ সাধারণ সৈনিক হয়ে হেরার হাত দিয়ে তৈরি করতে চেয়েছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের চিরকালীন আশ্রয়। সে মরুভূমির মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছে, মাটি ফুঁড়ে ফসল উৎপাদন, উন্নত চাষের সম্ভাবনা, পাশাপাশি মানুষকে সুরক্ষা এবং নিরাপদ জীবন দান করাই সৈনিক সাদইদের স্বপ্নের অভীষ্ট লক্ষ্য। হেরাকে বলা কথার মধ্যে দিয়ে সেই সত্য উন্মোচিত হয়েছে:

সমস্ত উদ্ভূত, যা দিয়ে নগর এবং মূর্তি তৈরি হয়, সব বিলি করে দেব। যত মূল্যবান ধাতু, দামী পাথর বাইরে থেকে আনা হয়েছিল, সব বিক্রি করে বস্ত্র কিনে নেব। সবই বিলি করতে হবে।^{৭২}

স্বর্গ নির্মাণের কাজ স্থগিত রেখে দামী পাথর অল্প মূল্যে বিক্রি করে দেয় সাদইদ। সৈন্যদের কথা ভাবে মানবদরদী সাদইদ। স্বর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা ও তার সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়, অপরাধবোধে তাড়িত করে তাকে নিরন্তর। রিবিচার সৌন্দর্যে বিভোর তার শরীরের অন্দরমহলে যৌনতার উদগ্র চোরাস্রোত বয়ে চলে।

উপন্যাসের সাদইদের স্বর্গ আসলে একটি নগরের সার্থক রূপ। যেখানে যুদ্ধবিদীর্ণ মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। যুদ্ধ দাঙ্গা বিমুক্ত একটি মহানগর। ঘরহীন মানুষগুলি যাতে আশ্রয় পায় সেই স্বর্গে। অথচ সাদইদের স্বর্গকে কেউ বিশ্বাস করেনি, ইহুদ তার দলবল নিয়ে সে স্বর্গ ভেঙে দেয়, পুরাণের গল্পে একদা যেমনভাবে ভেঙে ছিলেন ঈশ্বরের দূত জিবরাইল। সাদইদের স্বপ্নকে কেউ বিশ্বাস করেনি। ইহুদের ক্ষমতার কাছে হেরে গেছে সাদইদ। ইহুদ গোপন সংগঠন গড়ে তাকে ‘হত্যাকারী’, ‘লুণ্ঠনকারী’ ঘোষণা করেছেন। জনমানসের অন্তর্গৃহে সাদইদের প্রতি অবিশ্বাসের বীজ বুনে দিয়েছিলেন ইহুদ। সাদইদের স্বর্গকে বিশ্বাস হয়নি বলেই তার স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করেছেন ইহুদ।

অতীতে যেমন নোহের পুত্র নোহের স্বপ্নকে বিশ্বাস করেনি বলেই তাকে কিস্তিতে জায়গা দেননি নোহ। ‘মানুষের মাংসেই তো গেঁথে আছে এই নিয়ম। তোমার স্বপ্ন যে বিশ্বাস করে না, তাকে মারো, তাড়াও, কেটে ফ্যালো।’^{৭০}— পুরাণ ও ইতিহাসের সর্বত্রই চলে বলপ্রয়োগের খেলা। ভাষা ও ধর্মের আধিপত্যবাদের খেলা চলতেই থাকে। থামে না। অধিকারের লড়াই সভ্যতার আদি ও অসমাপ্ত ট্রাজেডি। অধিকারের বলেই ইহুদের বিশাল সৈন্যবাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাদইদের স্বর্গের উপর। স্বর্গ গড়ার কারিগর শিল্পী হেরার আঙুল কেটে নেয় ইহুদের অনুগামীরা, কাটা আঙুলের রক্তে রাঙিয়ে দেয় স্বর্গের মাটি। যুগে যুগে হেরে যাওয়া মানুষের রক্তেই লিখিত হয়েছে পুরাণের ইতিহাস। মিশালের নৌকায় ঘুমিয়েছিল সাদইদ। ঘুমন্ত সাদইদের নৌকার নোঙরের দড়ি খুলে দেয় এক রহস্যময় কিশোর। ইহুদ ও তার অনুগামীদের জয় হয়, আর মানবতার পূজারী সাদইদ ট্রাজেডির অতল গভীরে তলিয়ে যায়। সমুদ্র পরম সমাদরে টেনে নেয় সাদইদকে। যেমনভাবে জন্মের মুহূর্তে নির্জন দ্বীপে তাকে ঠেলে দিয়েছিল সমুদ্র। নির্জন দ্বীপে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের মৃত্যুর সময় সেখানে আজরাইল (মৃত্যুর দূত) ছাড়া আর কেউ ছিল না। এই মৃত্যুর নিঃসঙ্গতা ছিল বড়োই ভয়াবহ। অন্ধকার সমুদ্রে এক ক্লান্ত সৈনিকের অন্তর্ধান যেন তার মায়ের কোলে ফিরে যাওয়ার অভিযাত্রা। এই তার নিয়তি। বস্তুত, লেখক পুরাণের বাদশাহ শাদাদের কাহিনির মূল মিথের গল্প ভেঙে যে নবমিথ নির্মাণ করেছেন তাতে মিশে আছে আধুনিকতার ছোঁয়া, সাম্প্রতিক সময়ের বহু চিহ্ন ও নিশান। রাষ্ট্র যেমন স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে দিয়ে চারপাশের সবকিছুকেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়। ইহুদ ও তার অনুগামীরাও সেইভাবে বারবার বাধা দিয়েছে সাদইদের স্বর্গ নির্মাণে। আরব মরুভূমি থেকে একাধিক ধর্মের উদ্ভব এবং ঈশ্বর পূজার একাধিক মতভেদ এবং তা নিয়ে যাযাবর ও কৃষকগোষ্ঠীর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব-সংঘাত— এই ঐতিহাসিক পরিবেশকে

সামনে রেখেই লেখক সাদইদ নামক চরিত্রের মাধ্যমে বিভেদ ও সংঘর্ষময় পৃথিবীতে চেয়েছিলেন মানবতার বন্ধন রচনা করতে। *মরুত্ব* এক অর্থে লেখকের কাক্সিত আদর্শ— যেখানে ইতিহাস, পুরাণ ও একালের সমাজজীবন— এই তিনেরই ঘটেছে মেলবন্ধন।

এ উপন্যাসে ইহুদি ও ইসলামি পুরাণের পুনর্কথন-এর ভিত্তিতে সমকামকে একটা অসুখ হিসাবে দেখানো হয়েছে। এ নিয়ে ইহুদি ও ইসলামি পুরাণে বিস্তারিত কথা রয়েছে। সমকামিতা বেড়ে যাবার কারণে ঈশ্বরের আদেশে ফেরেশতারা দুটো শহর পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল। ইসলামি পুরাণে যাকে বলা হয় ইরম ও সাদুম নগরী এবং ইহুদি পুরাণে সদোম ও গমোরা নগরী।^{৭৪}

মানুষের যৌনতা এবং রুচি, তার বিচারবোধ নানান বিষয়কে ধরতে চেয়েছে এই উপন্যাস। লেখকের ভাষায়— প্রাচীন পৃথিবীর ধর্ম, ভাষা ও মানুষের বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব ও সমস্যার আদিতে গিয়ে, শিকড়ে নেমে তার বিশ্বব্যাপ্ত সমগ্রতায় পৌঁছতে চেয়েছে এ উপন্যাস।

৩. খ. ছোটোগল্পে ইসলামিক মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ:

গল্পকার হিসাবে আবুল বাশারের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বিশ শতকের আটের দশকে। প্রথম গল্পের বই *মাটি ছেড়ে যায়* বেরোয় ১৯৮৮-তে। ১৯৮৯-তে প্রকাশ পায় *অন্য নকসি*। *অন্য নকসি*-র গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৮০-১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ। তারপর ১৯৯০-তে *অমৃত বারিধি* এবং ১৯৯১-তে প্রকাশিত হয় *একই বৃত্তে*। ১৯৯৯-তে প্রকাশিত হয় একটি *খামে ভরা কাহিনী* (১৯৯৯) গল্পগ্রন্থ। *আবুল বাশারের গল্পসমগ্র* প্রকাশিত হয় ১৩৯৯ বঙ্গাব্দে। *আবুল বাশারের শ্রেষ্ঠ গল্প* প্রকাশিত হয় ২০১২-তে। কবিতার হাত দিয়ে আবুল বাশার

বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করলেও তিনি গল্পকার-উপন্যাসিক হিসাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাতের দশকের উত্তাল সময় এবং সেই সময়ের গ্রামীণ জনমানসের জীবন-যন্ত্রণা বাশারকে গল্প লিখতে প্ররোচিত করে। সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে তিনি যে বহুধা বিস্তৃত জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চার করছিলেন তাকেই রূপ দিয়েছেন গল্প-উপন্যাসে। বহরমপুরের *রৌরব* পত্রিকাগোষ্ঠীর লেখক-বন্ধুদের উৎসাহ আবুল বাশারকে গদ্য লিখতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। তিনি তাঁর নানান সাক্ষাৎকারে সে কথা বহুবার স্মরণ করেছেন। আবুল বাশার তাঁর গল্পে গ্রামবাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্মভাবনা, জীবনাচরণ ও জীবনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্ণনা প্রসঙ্গে আরব-মরুর লোককথা এবং ইসলামি মিথ-পুরাণের ব্যবহার করেছেন। মুসলমান সমাজের আদিম বিশ্বাস, বহুবিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও তালাক-প্রথার প্রসঙ্গ রয়েছে তাঁর গল্পে। শুধু গ্রামবাংলা নয়, নাগরিক সমাজের মানুষদেরও মন ও মেজাজের কথা তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি বামপন্থী রাজনৈতিক তত্ত্ব-দর্শনের সঙ্গে লোকায়ত মিথ-সংগরিত সমন্বয়ী জীবনের দ্বন্দ্ব ও মিলন আবুল বাশারের গল্পের পরতে-পরতে ছড়িয়ে আছে। আরব্য-রজনীর গল্পকথা, ইসলামিক লোককথা, কিংবদন্তি এগুলি শুধুমাত্র মুসলমান জনমানসের বিশ্বাস বা সংস্কার নয়, ধর্মাত্ম ও রক্ষণশীল মানুষদের নিয়ন্ত্রকও বটে। ইসলামি গল্পকথা ও মিথ-পুরাণ নির্ভর সংস্কৃতি মানুষের যাপিত জীবনে কেমন প্রভাব ফেলে তাঁরও চিত্রায়ন আছে তাঁর গল্পে। বিবাহ-বিচ্ছিন্না মুসলিম নারীর অসহায়তা ও তাদের যৌনতার দাসত্ববৃত্তি এবং সামাজিক যৌনশোষণ, সেইসঙ্গে গ্রামীণ সমাজের মোল্লাতন্ত্রের দাপট সবকিছু নিয়েই আবুল বাশারের গল্পের মানচিত্র নির্মিত।

মাটি ছেড়ে যায় (১৯৮৮) গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প ‘মাটি ছেড়ে যায়’-তে গ্রামীণ মুসলমান সমাজের অতি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনসংগ্রাম ও জীবনচর্যার কথা বলেছেন

গল্পকার। পাশাপাশি গ্রামীণ সংস্কার, মানুষের আদিম প্রবৃত্তি ও লোকাচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। মানুষের গায়ের রঙ— বর্ণভেদ, বৈষম্য, সর্বোপরি কালো-ফর্সার ভেদাভেদ আজও সমাজের চারপাশে বিদ্যমান। পৃথিবীর নানান দেশে, বিশেষত আফ্রিকা-আমেরিকা, এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, ব্রাহ্মণ-দলিত, সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু লড়াই অব্যাহত এই একুশ শতকেও। গ্রামীণ জনমানসে মানুষের শরীরের রঙ নিয়ে ভেদাভেদ আরও বেশি। আলোচ্য এ গল্পটি ‘কালো নূরী’ এবং ‘কালো সুলতান’-এর দাম্পত্য আখ্যান। তাদের প্রেম-ভালোবাসা এবং প্রতিদিনের বেঁচে থাকার তীব্র সংগ্রামের ইতিবৃত্ত।

আবুল বাশারের বেশিরভাগ গল্পেই ঘুরে ফিরে এসেছে নদীর কথা। সেই পুরাকাল থেকেই নদীকে ঘিরে মানুষের গল্পকথা, মিথ-কিংবদন্তির শেষ নেই। নদীই তো সভ্যতার ভাঙা-গড়ার সুদক্ষ কারিগর। প্রাচীনকাল থেকেই নদীকে মা জ্ঞানে পূজা করা হয়। ভারতীয় পুরাণে গঙ্গা নদীকে ‘মা গঙ্গা’ বা ‘গঙ্গা মাতা’ বলা হয়েছে। গঙ্গার জলকে বলা হয়েছে ‘সর্বপাপনাশিনী’। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, গঙ্গায় পুণ্যস্নান করলে সব পাপ মুছে যায়। পুরাণে আছে ভগীরথ কীভাবে মহাদেবের জটা থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যে আনেন সেই প্রসঙ্গ। আলোচ্য গল্পেও আবুল বাশার নদীকেন্দ্রিক মানুষদের জীবনচর্যা ও জীবনবোধকে দেখিয়েছেন বাংলা ভূমির মানুষের পৌরাণিক ও লৌকিক বিশ্বাসের পটভূমিতে।

এ গল্পে নূরী ও সুলতানের অসহনীয় দারিদ্রের সংসার। প্রেম আর স্নেহ দিয়ে দু’জন ‘কালো মানুষ’ তাদের সংসারকে বেঁধে রেখেছে নদীর বুকে। অন্যদিকে একই রূপ ও একই ভঙ্গিমা নিয়ে নদী প্রতিবছর আসে তাদের স্বপ্নকে তছনছ করতে। বাংলায় প্রবাদ আছে— “নদীর ধারে বাস/ভাবনা বারো মাস”— নূরী ও সুলতানের প্রতিদিনের জীবন ও

সংসারের বিপন্নতা এ গল্পের মূল উপজীব্য। এই দারিদ্রের ঘরে জন্ম নেয় একদিন এক শিশু। ‘কালো মানুষ’ নূরী ও সুলতানের পুত্র ছায়েব (সাহেব)। সাহেব ছিল ফর্সা। গ্রামীণ জীবনের লোকাচার ও সংস্কার ‘কালো-সাদা’ মানুষের বিভেদ-বিভাজন, শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ মানুষদের যেমন শরীরের খুঁত নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করার অভ্যাস দেখা যায়, তেমনি কালো রঙটাও একজন মানুষকে স্বস্তি দেয় না। কালো মানুষ ভাবে কালো হওয়াটা তার যেন জীবনের অভিশাপ। তার এমনও মনে হয়, কালোকে ধুয়ে মুছে ফেলার ওষুধ থাকলে ভালো হত। কালো রঙটা যেন তার ব্যাধি। এ ব্যাধির উপশম হবে না জেনেও একজন কালো মানুষ একটু বেশিমানায় প্রসাধন চায়। সামর্থ্যে না কুলায় যদি অন্তত সস্তা সাবান আর সস্তা পাউডার ব্যবহারে তার ঝোঁকটা অনেকসময় অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। পরিচ্ছন্ন থাকার মধ্যে দিয়ে সে কালোর মধ্যে মাধুর্য রচনা করে। সাদা-কালোর এই দ্বন্দ্ব সমাজের সর্বত্রই বিদ্যমান। মানুষ একদিন অরণ্য কেটে বসত গড়েছে। নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধার সৃষ্টি করেছে। উষর ভূমিকে করেছে শস্য-শ্যামলা। প্রকৃতির বিরূপ শক্তির সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে লড়াই করতে করতে মানুষ নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। ‘নদী স্বপ্ন ছিল মানুষের, মানুষ চাইত, নদী কিছুটা তাদের দিকে সরে আসুক... নদী এল।— ধীরে ধীরে স্বপ্ন মিলিয়ে যেতে থাকল, মানুষ দেখল নদী দুঃস্বপ্নময়। একে বাঁধা যায় না, রোখা যায় না। নদী প্রতিবছর একটি-দুটি ভিটা, দু-দশ কাঠা মাটি গিলে খাচ্ছে। যে মাটি পলি জলে উর্বর হচ্ছে এ বছর, আগামীতে নদী তাকে গ্রাস করছে’। যে ভিটায় লতাপাতার সবজি জন্মাচ্ছে একসন, পরবছর সে ভিটা নদীবৃক্ষে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এভাবেই একদিন ‘মধ্যরাতের দুঃস্বপ্ন’— এসে হানা দেয় নূরী ও সুলতানের সংসারে। এই দুস্থ দম্পতির ‘অন্ধকার আকাশের একমাত্র তারাটি তাদের কালো দেহের আন্তরণে, রক্তের অন্ধকার তলদেশে, ভিতে বুনিয়াদে জোনাকির মতো এক ফোঁটা শুভ্র-সবুজ আলো জ্বলেছিল’—

সেই সাহেব, তাদের একমাত্র সন্তান— ‘একটি উল্কার মতো গহন নদী স্রোতে টুপ করে খসে’ পড়ল। সুলতান ও নূরীর একমাত্র সন্তান সাহেব ও তাদের ভিটে মাটি তলিয়ে গেল বন্যার করাল থাসে, প্লাবনের তাড়নে।

নদীর প্লাবিত জলধারায় সাহেবের মৃত্যু— এই ব্যক্তিগত ট্রাজেডিকে গল্পকার মিলিয়ে দিয়েছেন দারিদ্র উখিত সমাজের চোখের জলের সমষ্টিগত দুঃখকে। গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নদীর উপস্থিতি বহুমাত্রিক ধারায় বহমান। কখনও তা নারীর উপমান, কখনও তা গ্রাম সমাজের দ্রষ্টা, কখনও তা উচ্ছলতার প্রতীক, কখনও তা ধ্বংসবহ।^{৭৫} গল্পের শেষে শোকাক্ত সুলতানের দৃষ্টিকে আদিম গোষ্ঠীপতির দৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন গল্পকার:

ঠিক এমনি করেই পুরাকালের পৃথিবীতে, প্রাচীনতম নদীর কিনারে প্রথম মানুষ বন্যা দেখেছিল। সেই প্রথম মানব-মানবী, তার গোষ্ঠীদল, বন্যার তাড়া খেয়ে এইভাবেই নদীর পথ ধরে মাটি খুঁজতে বার হত। তাদের সেই আতঙ্কগ্রস্ত চাহনি, বন্য হিংস্র জলরাশির বিভীষিকা নূরীর কালি-পড়া চোখের পাতায় ছায়া ফেলে যায়।

সুলতান ফের থমকে দাঁড়িয়ে চেয়ে দ্যাখে বউকে। মনে হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে কালো মেয়েমানুষের নাম নূরী। হতশ্রী। শ্যাওলা ভাসছে চোখে মুখে। পেছনে আরও দূরে, যেভাবে প্রথম পৃথিবীর গোষ্ঠীপতি চেয়ে দেখেছিল তাদের আস্তানা, দেখল সুলতান সেভাবেই, না, আর চোখে পড়ে না।

তার তিন কাঠা মাটি।

তার ঘর।^{৭৬}

আদিম গোষ্ঠীপতি নুহ নবি (ঈশ্বর প্রেরিত দূত) এবং তাঁর অনুসরণকারীরা এমনভাবেই বন্যা দেখেছিল পুরাকালের পৃথিবীতে। সেই মহাপ্লাবনে নুহ তাঁর স্ত্রী-পুত্রসহ অধিকাংশ আত্মীয়কে হারিয়েছিলেন। সেই শোকে ঈশ্বরের কাছে নতজানু হয়ে তিনি এতটাই কেঁদেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁকে নুহ নামে অভিহিত করেন।^{৭৭} নুহ কথার অর্থ

ক্রন্দন। পুরাণ অনুসারে আদিকালের মহাপ্লাবনে পৃথিবী তার নতুন রূপ নিয়ে গড়ে তুলেছিল নতুন সভ্যতা। আদিম গোষ্ঠীপিতা নুহ-এর কাহিনিই কালে-কালান্তরে মানুষের ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবনে ঘুরে ফিরে এসেছে বারংবার। গল্পকার আবুল বাশার তাঁর আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব দৃষ্টিকোণ দিয়ে গল্পের নূরী-সুলতানের শোক ও স্বজন হারানোর বেদনা, চলমান জীবনপ্রবাহ থেকে তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরাকালের ঘটনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। পৌরাণিক জীবনের পুনর্বিন্যাস গল্পের কাঠামোকে স্বতন্ত্র আঙ্গিকে উন্নীত করেছে।

‘চঙ’ গল্পটি শুরুই হয়েছে এইভাবে— ‘আরব্য রজনীর হাজার নিশীথ গল্পে গল্পে কেটে গেছে। তারপর শুরু।’ মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার লোককথা নির্ভর গল্প সংকলন *আরব্য রজনী*। সহস্র রাতের নানান গল্পকথার বর্ণনা আছে এই সংকলনে। মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে থাকা এই আরব্য রজনীর গল্পের মতোই এক রাতের গল্প লিখেছেন আধুনিক গল্পকার আবুল বাশার।

গ্রামীণ মুসলিম সমাজের দরিদ্র অসহায় নারীর যৌনতার দাসত্ববৃত্তি এবং সামাজিক যৌন শোষণের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে গল্পে। লিচু বা আম গাছের মগডালে বাঁধা হয়েছে শূন্য মাচা আর ডালে বাঁধা হয়েছে বাঁশের বুক ফাটানো বাদুড় তাড়ানো খটখটি। এরই নাম চঙ। এই চঙে থাকে মীরজাদা ফাতুমির। গ্রামের জঙ্গল, বাগান, জমি-ফসল সবকিছুরই মালিক ফাতুমির। ক্ষমতার দাপট নিয়ে নারী শরীরকে নিয়ে আমোদ করতে ভালোবাসে সে। আর ফাতুমিরের এই প্রবৃত্তির খিদের খোরাক জোগাড়ের তদারকি করে কুলশম। গ্রামের বিবাহ বিচ্ছিন্না এবং দরিদ্র নারীদের চাল-গমের লোভ দেখিয়ে, ফুসলিয়ে, রূপকথা শুনিয়ে ফাতুমিরের কাছে নিয়ে আসে কুলশম। চঙ হল ফাতুমিরের সিংহাসন, তার ভোগের

শয্যাগৃহ। আর ফাতুমির সেখানকার একচ্ছত্র সম্রাট। কয়েক কৌটো চালের বিনিময়ে গ্রামের উঠতি যৌবনা বা বিধবা মেয়েরা ফাতুমিরের শয্যাসঙ্গিনী হয়। ফাতুমিরের শাগরেদ কুলশম কলোনীর মেয়েদের বলে:

এক ছোঁয়াতে দোষ নাই। লেবুর পাতায় রস নাই। এক ছোঁয়া মাত্র। দোষ নাই
পাগলি।^{৭৮}

এভাবেই কলোনীর মেয়েদের অর্থনৈতিক সমস্যার সুযোগ নিয়ে চঙ সাহেব ফাতুমির তার শরীরী আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করে। ফাতুমিরের সঙ্গী কুলশম রান্নাবান্না করে, পান সেজে দেয়, পা টিপে দেয়। কুলশম কলোনির বস্ত্র থেকে মাঝেমাঝেই রান্না তরকারি চেয়ে আনে। দারিদ্র বিড়ম্বিত মেয়েদের নানাবিধ কচুখোঁচু রান্না চঙ সাহেবের বেজায় পছন্দ। কুলশমের চাইবার পদ্ধতিটিও ভারী সুন্দর। যখন যার কাছে থেকে তরকারি চাওয়া হবে, তার মানে তাকে এবার চঙে যেতে হবে। কলোনির মেয়েরা অসহনীয় দারিদ্র জীবন নিয়ে ফাতুমিরের লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর ‘১৯৪৬-৪৭’ কবিতায় লিখেছিলেন:

পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকদের দাবি এসে
সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।
বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন
কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়;^{৭৯}

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর ধ্বংসলীলা সংবেদনশীল কবির মানবিক বোধকে গভীরভাবে পীড়িত করেছিল। মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলির মৃত্যু ও ‘ক্ষমতার রাজনীতি’র অপকীর্তি, হিংসা, দ্বেষ, অবিশ্বাস কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ‘ক্ষমতার অপব্যবহার’ ও আধিপত্যবাদী আকাঙ্ক্ষা এ গল্পেও প্রতিফলিত হয়েছে। এই গল্পে জঙ্গলের লতাপাতা ও বুনো ওল খেয়ে দিন গুজরান হয় পিয়াসাদের। মাতৃহীন পিয়াসা তার ছোটো বোন চারুকে

নিয়ে মাঠে, বাগানে খাদ্য সংস্থান করার চেষ্টা করে। অভাবের সংসারে তারা ভাতের মুখ দেখতে পায় না। ‘ভাত খাওয়া যেন পূর্বজন্মের স্মৃতি। বাপের উপার্জনের ক্ষমতা নেই। পিয়াসাই মুরগি-ছাগল পালে, পাটি বোনে’। পিয়াসার বুড়ো বাপ চঙে গিয়ে ফাতুমিরের কাছে থেকে চাল নিয়ে আসে। এদিকে চঙ সাহেবের কুনজরে পড়ে পিয়াসা। সে কথা জানতে পেরে পিয়াসা মনে মনে বলে, ‘আমি ওর মুখে নুড়ো ঘসে দেব। চঙের গায়ে আমি পেসাব করি!’^{৮০} মাঠে নির্জন উদাস দুপুরে বাঁশি বাজায় শাদাৎ। পিয়াসার ভালোবাসার মানুষ শাদাৎ। চারুকে নিয়ে বুনো ওল তুলতে তুলতে পিয়াসা সেই বাঁশির স্বর শুনে উতলা হয়। মায়ের মৃত্যুর পর চারুকে মায়ের মতো বুকের দুধ দিয়ে বড়ো করেছে পিয়াসা। স্বামী তাকে রাগের বশে তালাক দিয়েছে। জীবনের এই কঠিন কঠোর রূপ দেখে এবং অন্যদিকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে ভুগতে পিয়াসার জলের তলায় শুতে ইচ্ছে হয়। জলের ফেরেস্তা ওদের পাহারা দেবে। মানুষের সংসার ওদের ভালো লাগে না।

এক রাতে খাদ্যের সংকুলান করতে অপারগ হয়ে পিয়াসা কুলশমের কাছে যায়। কুলশম তাকে চঙ সাহেবের কাছে নিয়ে যায়। মিরজাদার কাছে এসে ‘চোখে তার কান্নার পানি টলটলিয়ে ওঠে। বউটার গোঙানি কানে ভেসে আসে। মনে হয় সমস্ত চরাচর ফুঁসছে। কিন্তু এই ধরিত্রী বড়ো অসহায়’। মিরজাদা ফাতুমিরের শরীরে লালসা কামনার উদগ্র স্রোত বইতে শুরু করলে ভয় পায় পিয়াসা। এরপর ধর্ষক ফাতুমিরের হিংস্র ধস্তাধস্তিতে চঙ থেকে নিচে পড়ে যায় পিয়াসা। অর্ধমৃত রক্তাক্ত দেহটিকে ফাতুমির নির্দয়ভাবে ফেলে দেয় জলে। ইসলামি পুরাণ মতে, পৃথিবীর প্রথম পাপী মানুষের তকমা নিয়ে স্বর্গচ্যুত হয়েছিল আদম। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে আদম তাঁর ‘চয়েস’, তাঁর স্বাধীনতার বীজ বপন করতে চেয়েছিল। তাই সে হয়ে গেছিল বিচ্ছেদের অনিবার্য অংশীদার। পাপের শাস্তি স্বরূপ আদম ও হাওয়া বিবি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নির্বাসিত হয়েছিল। সৃষ্টির আদিতেই এই

পাপ সঞ্চারিত হয়ে আছে আদম ও হাওয়া বিবির সন্তানদের শরীরে। নারীকে কেন্দ্রকে এক ভাই আর একভাইকে হত্যা করে। ইসলামি পুরাণ অনুসারে পৃথিবীর প্রথম হত্যাকারী কাবিল এবং প্রথম শহীদ হাবিল^{৮১}। আদিকালেই নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। আকলিমা নামক রমণীকে পাওয়ার লোভে রাগে হিংসায় উন্মত্ত হয়ে কাবিল হাবিলকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। পুরাণের এই কাহিনিকেই গল্পকার সংযুক্ত করেছেন সমকালীন সময়ের সঙ্গে। মানুষের মাংসেই গঁথে আছে সেই পাপ। মনুষ্যজন্ম বংশপরম্পরায় সেই পাপ রক্তে বহন চলেছে অনাগত সময়ের দিকে। এই গল্পে আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় মিরজাদা ফাতুমিরের মুখে সেই কথাই উচ্চারিত হয়:

ভয় কীসের লক্ষ্মী! আমি বাঘও নই, ভালুকও নই— আদম আমার বাপজান। হাওয়া আমার জননী। এই যে দেখছ চঙ, মাটির থেকে অনেক উঁচুতে, ভয় তো করবেই!^{৮২}

পিয়াসা রক্তাক্ত শরীর নিয়ে জলে সাঁতার দেবার চেষ্টা করলেও একসময় তার দেহের সব ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে শুদ্ধ হয়। দরিদ্র ঘরের মেয়ে পিয়াসা সংসার আর প্রবৃত্তির জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার আশায় জলের তলায় শুতে চাইত। গল্পের শেষে গল্পকার অপূর্ব নাটকীয়তায় মিথের কাহিনির সঙ্গে গল্পকে জুড়ে দিয়েছেন:

বিলে চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছিল পৃথিবী। সেই রাতে জলের তলায় শুয়ে পড়ে পিয়াসা। পাহারা দেয় জলের দেবদূত।^{৮৩}

ইসলামি মিথ-পুরাণে জলের দেবদূত বলা হয় খিজিরকে। *কোরান* ও হাদিসে খিজিরকে নবি (ঈশ্বর প্রেরিত দূত) বলে অভিহিত করা হয়েছে।^{৮৪} খিজির ছিলেন মহাজ্ঞানী। মুসা নবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং নানান অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা আছে *কোরানে*।^{৮৫} মানুষকে বিপদকে রক্ষা করা এবং মানুষের জন্যে নানান হিতকর কাজ করতেন খিজির। ইসলামি পুরাণের ভাষ্য অনুযায়ী, খিজির যখন পৃথিবীতে অবস্থান

করেছিলেন সেই সময় বাদশাহ ছিলেন জুলকারনাইন। মুসলমান সমাজের অন্দরে অন্তরে খিজিরকে নিয়ে নানা চটকদার ঘটনা বিস্তার লাভ করেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল ‘আবে হায়াত তত্ত্ব’। যে জল পান করলে মৃত্যু হয় না, অমরত্ব লাভ করা যায়, তার নাম আবে হায়াত। ‘আবে হায়াত’ শব্দের অর্থ হল জীবনবারি বা অমৃতবারি। গ্রামীণ মুসলমান সমাজের মানুষদের বিশ্বাস খিজির অমৃতসুধা পান করেছেন এবং এখনও তিনি জীবিত আছেন। বর্তমানে তাঁর আবাস জলের তলদেশে। এই কারণেই ইসলাম ধর্মের হাদিসেও নদী-পুকুর বা সমুদ্রের জলে মলমূত্র ত্যাগ করা কঠোরভাবে নিষেধ। কোরানে বাদশাহের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা থাকলেও খিজিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা খিজিরের অমৃতসুধা পানের বর্ণনা নেই।^{৮৬} খিজিরের অমরত্ব লাভের ঘটনা মুসলমান সম্প্রদায়ের লৌকিক বিশ্বাস। কথিত আছে, ‘আবে হায়াত’ বা অমৃতবারির খবর জানতেন মহাজ্ঞানী খিজির। তিনি বাদশাহ জুলকারনাইনকে জানান, যে সাগরের ওপারে অন্ধকার দেশ আছে। সেখানে সারাক্ষণ অন্ধকার থাকে। ওই জায়গায় এক গুহায় আবে হায়াতের ঝর্ণা আছে। এ কথা শুনে বাদশাহ জুলকারনাইন খিজিরসহ অনেক লোক-লস্কর নিয়ে আবে হায়াতের খোঁজে বের হন। কিন্তু গভীর অন্ধকারে বাদশাহ জুলকারনাইন পথভ্রষ্ট হন এবং খিজির আবে-হায়াত ঝর্ণায় পৌঁছে যান। খিজির আবে-হায়াতের জল পান করে অমরত্ব লাভ করেন। এই ঘটনা যদিও ইসলামি শাস্ত্র স্বীকার করে না। মৌখিক পরম্পরায় মানুষের লৌকিক বিশ্বাস মিথের রূপ নিয়েছে। এই গল্পে আবুল বাশার মিথের ঘটনাকে গল্পের শেষে সংযুক্ত করেছেন। পৌরাণিক খিজির যেহেতু ছিলেন মানুষের রক্ষাকর্তা ও নিরাপত্তা প্রহরী এবং বর্তমানে তিনি জলের ফেরেশতা। বস্তুত, সেই কারণেই গল্পের শেষে মিরজাদা ফাতুমিরের লালসার শিকার মৃত পিয়াসাকে পাহারা দেবেন জলের দেবদূত খিজির। সমকালীন গ্রামীণ মুসলমান সমাজের বিবাহ বিচ্ছিন্না অসহায় নারী, যে আত্মরক্ষা করতে অপারগ হয়ে ধর্ষক

পুরুষের লোলুপতার বলি হয়। সেই দৃশ্যকেই গল্পকার মেলোড্রামাটিক ভাবে সাজিয়ে গল্পের চরিত্রকে দিয়েছেন এপিক ব্যাপ্তি।

‘সিংহ আর শশকের গল্প’-এর নামকরণেই আছে মিথের ব্যঙ্গনা। লোকায়াত বিশ্বাস ও ঈশপের নীতিকথামূলক গল্পের অনুসঙ্গ রয়েছে এ গল্পে। গ্রিকের প্রাচীন গদ্যকার ঈশপের (খ্রিস্টপূর্ব ৬২০-৫৬৪) গল্পে পশু-পাখিদের ঘিরে নানান উপকথা ও কল্পকাহিনি মানুষের মুখে মুখে নীতিকথা রূপে ব্যক্ত হয়ে আজও অমর হয়ে আছে। পশু-পাখির আধারে ঈশপ মানুষের চরিত্রের নানা দোষ-গুণের কথা বলেছেন তাঁর গল্পে। অ্যালিগোরিক্যাল এই রচনাগুলিই বর্তমানে কিংবদন্তি, লোককথা রূপে গোটা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।

আবুল বাশারের এই গল্পে সিংহ হল শাসকশ্রেণির প্রতিনিধি। ক্ষমতার অলিন্দে অবস্থান করে যে সমাজের নিচুতলার মানুষদের শাসন করে। বনের রাজা হল সিংহ, সে বনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী পশুও বটে। পক্ষান্তরে, শশক অর্থাৎ খরগোস হল ক্ষুদ্র প্রাণী। সিংহের দাপট ও ক্ষমতার কাছে খরগোস অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, নগণ্য। আলোচ্য গল্পের খলনায়ক নিয়ামত মল্লিক, তার প্রতীকী নাম নিমু সিংহ। আর শশক হল পিয়ার মহম্মদ মুনশি, ঝারি বেওয়া প্রমুখ। নিমু সিংহ রাজনীতির শীর্ষ নেতা। মুসলিম সমাজের দুস্থ নারীরা তার ভোগ্য বস্তু। ‘নারীঘটিত বদনামকে অপ্সের আংটি বানিয়ে নিয়েছে’ সিংহ মশাই। অন্যদিকে ঝারি বেওয়া এবং মুনশির মধ্যে কোনো সম্পর্ক না থাকলেও অসহনীয় দারিদ্র তাদের এক সুতোয় বেঁধে দিয়েছে। সংসারে একা এই দু’জন মানুষ একসঙ্গে সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখে। অফিসের নিচুতলার কর্মী মুনশি প্রোমোশনের জন্যে সাহায্য চায় নিমু সিংহের কাছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ামক নিমু সিংহের চেলা প্রভাতের কাছে থাকে নিমু সিংহের ভোগ্য নারীদের তালিকা। সেই তালিকাতে ঝারি বেওয়ার নাম দেখে

আঁতকে ওঠে শশক মুনশি। সিংহের হিংস্রতার হাত থেকে ঝারি বেওয়াকে বাঁচানোর আশ্রয় চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় মুনশি। সবলের কাছে দুর্বলেরা চিরদিনই অসহায়। এই গল্পে সিংহ আর শশকের রূপকে সেই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন গল্পকার। সেইসঙ্গে মূল গল্পটিকে বদলে দিয়েছেন লেখক। প্রচলিত গল্পে খরগোসের বুদ্ধির কাছে সিংহ হেরে গেছিল, কিন্তু এ গল্পে গল্পকার বুদ্ধির চেয়ে গা-জোয়ারি ক্ষমতা ও দাপটের রাজা সিংহের জয় দেখিয়েছেন। কারণ বনের ব্যবহারিক নিয়ম অনুসারে, লড়াইতে খরগোস কখনই সিংহকে হারাতে পারে না।

‘কুটুম্ব’ হল মানুষের বেঁচে থাকার, টিকে থাকার, অস্তিত্ব রক্ষার গল্প। দরিদ্র মুসলমান পরিবারের মা-ছেলের সম্পর্ক এ গল্পের উপজীব্য। কসাই দেলজান তার মা খোদিজাকে ঠিকমতো খেতে পরতে দেয় না। মুসলিম সমাজে কসাই অর্থাৎ যারা পশু জবাই করে মাংস বিক্রি করে তাদের নির্মম প্রকৃতির মানুষ বলা হয়। কসাই মানেই নিষ্ঠুর— এটাই সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মিথ আকারে মুসলিম সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এ গল্পের দেলজানের মা আশ্রয় পায় না ছেলের ঘরে। কসাইখানার দূষিত পচাগন্ধ রক্ত পরিষ্কার করে সেখানেই থাকতে হয় খোদিজাকে। ‘এই আশ্রয়টুকু ছাড়া দেলজান মাকে কিছুই দেয় না। খাদ্য, পরিধেয়, পান, সুপারি জর্দা এবং একটি কানাকড়ি পর্যন্ত কিছুই না। দেলজানের গেরস্থালির সঙ্গে খোদিজার সম্পর্ক জননী ও পুত্রের মতো গতানুগতিক নয়। কিন্তু স্বাভাবিক। মাকে কসাই খেতে দেয় না। যারা এই বাংলার পল্লিতে মাকে খেতে শুতে এবং পরতে দেয়, তারা সবাই বড়োলোক। কিছুটা শৌখিন। তারা বেঁচে থাকার কষ্টকর যুদ্ধের উর্দে, তাদের অস্তিত্ব এত মসৃণ যে, পর্যাপ্ত সুখের তেল মাখানো শিবলিঙ্গের মতো সে-জীবন ঠাণ্ডা, নিস্তরঙ্গ এবং দর্শনীয়’। আর খোদিজা কসাই পুত্রের জননী হয়ে দারিদ্র বিড়ম্বিত জীবন কাটায়। একসময় খোদিজা মেয়ে রসিদার বাড়ি যাবার জন্যে

দেলজানের দোকানের সামনে বসে থাকে দু টুকরো হাড়-মাংসের আশাবাদী প্রত্যাশা নিয়ে। ‘মা তো মা। কুকুর নয়। সন্তানের জননী’। অথচ কসাই দেলজান মায়ের মুখের দিকে চেয়েও দেখল না। শেষে মটরশুঁটির লতাপাতা নিয়ে খোদিজা যায় মেয়ের বাড়ি এবং সেখানে থেকে জামাইয়ের কাছে চোর অপবাদ নিয়ে অপমানহত হয়ে ফিরে আসে। রুজিহীন নিরন্ন জীবন নিয়ে খোদিজা এখানে সেখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকে। সে জানে, ‘মুসলমান লতাপাতার সম্পর্কেও গুরুত্ব দিয়েছে এতকাল এ-সংসারে সবাই কুটুন্স। দুনিয়ার মানুষ সকলেই কোনো-না-কোনোভাবে কুটুন্স’। মানুষকে সে কথা মনে করিয়ে দিতে চায় খোদিজা। খোদিজার সংবেদনশীল মনের এই অনুভূতি স্মরণ করিয়ে দেয় সৃষ্টিতত্ত্বের মিথ। ইসলামি পুরাণ অনুসারে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই আদম-হাওয়া বিবির সন্তান। সৃষ্টির আদি থেকেই মানুষ তাই লতাগুল্মের মতো একে অন্যের সঙ্গে জড়ানো। সুতোর জটের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে বাঁধা। খোদিজা এই মিথ-পুরাণে বিশ্বাসী হয়ে অবহেলা অবজ্ঞা সয়েও জীবন কাটায়। বস্তুত খোদিজা জানে:

ধর্মের কিতাবে লেখা আছে। রুজির মালিক খোদা। সময় যতই নিষ্ঠুর হোক। আকাল যতই ঘনাক। কোথা থেকে আহার আসে সেই মক্কর ধরবার, মানুষের সাধ্য নয়। খোদা বড়োই মক্করবাজ। রহস্যে ঘনিল। সমুদ্রের তলায় তিনি ঘুমিয়ে রেখেছেন বিশাল মরু। সেই মরুর বুকে লুকিয়ে আছে একখণ্ড অলৌকিক পাথর। সেই পাষাণের অন্তস্তলে জিয়ন্ত এক ঘাস-ফড়িং বেঁচে আছে। সেই ফড়িংয়ের মুখে আহার জোগাচ্ছেন খোদা। একফালি ঘাস ঠোঁটে ধরে আছে সেই ক্ষুদ্র পতঙ্গ। আজ এই নির্মম সময়ে একমুঠো ভাতের জন্য খোদিজা চলেছে সতিনের মেয়ে রসিদার কাছে মামদালিপুর। খোদার রহস্য দেখে মকরান্নাহ বলেছে মানুষ।^{৮৭}

ধর্মের কিতাব অর্থাৎ কোরানে মানুষের রুজি-আহার নিয়ে যে কথা বলা হয়েছে সেই কথাই এ গল্পে বিবৃত করেছেন গল্পকার। ইসলামি পুরাণে আহার ও রুজি নিয়ে বলা হয়েছে, মানুষের জীবিকাদাতা ও রুজিদাতার মালিক আল্লাহ্।^{৮৮} আলোচ্য গল্পের খোদিজা

ছেলে দেলজানের কাছে অপমানিত হয়েও সে খোদার উপর বিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। খোদিজা ছেলের উপর রাগ করে আহারীকৃত সমস্ত খাদ্য বমি করে উগরে দিয়েছে। খালি পেটে শূন্য শরীর নিয়ে কসাইয়ের কসাইখানায় গুয়ে পড়েছে। সমুদ্র, মরু ও পাষাণের ভিতর একটি মহাপ্রাণী মানুষ হয়ে বেঁচে থেকেছে। ক্ষুদ্র পতঙ্গ ফড়িংয়ের মেটাফর হিসেবেই এখানে আধপেটা খাওয়া খোদিজাকে চিত্রিত করেছেন গল্পকার। সংসার-সন্তান যাকে খেতে না দিলেও খোদার দয়ায় সে বেঁচে থাকে।

মুসলমান সমাজের বহুবিবাহ ও তালাকপ্রথা এবং নারীর যৌনতার দাসত্ববৃত্তি আবুল বাশারের বহু গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে। তেমনই একটি গল্প হল ‘এক টুকরো চিঠি’। এ গল্প গোঁড়া, সাম্প্রদায়িক স্বামীর বিরুদ্ধে শিক্ষিত স্ত্রীর আত্মমর্যাদা ও অস্তিত্বরক্ষার আখ্যান। মিথ-পুরাণ ও শাস্ত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জগতের কথা ভুলে মানুষ যখন সংসারে-সমাজে অলৌকিকতা ও প্রথাসর্বস্ব বিষয় দিয়ে জীবনকে পরিচালিত করে তখনই ঘটে বিপত্তি। এই গল্পের প্রাক্তন মুসলিম লিগ এম.এল.এ আখতার হাজির স্ত্রী কুলসমের মাসতুতো বোন শিরিন। পড়াশোনায় মেধাবী শিরিন স্কুল ফাইনাল পাস করার পরেই হাজি সাহেবের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। হাজির যৌনলালসার শিকার ও সামাজিক যৌনশোষণের অংশীদার শিরিন একদিন সংসার-স্বামীর প্রতি বীতরাগ হয়ে সিঁদুরে আমগাছের ডালে একগাছি দড়ি বেঁধে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। জীবনানন্দের ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতার নায়ক ‘আরো এক বিপন্ন বিস্ময়ে’র বোধে আক্রান্ত হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল। আর শিরিন স্বামীর যৌনতার দুর্বোধ্যতা বুঝতে অপারগ হয়ে মরতে চেয়েছিল। শিরিন ছিল গর্ভবতী এবং ‘গায়ে তার ভরন্ত সুষমা, চোখে টলটলে মাতৃত্ব’। নিজের জীবনকে নষ্ট করে ব্যর্থ হলেও শিরিন তার গর্ভের সন্তানকে হারিয়ে ফেলে। সে প্রসব করে অপুষ্ট মৃত মাংসপিণ্ড।

এরপর শিরিনের আত্মহননের জন্যে বেছে নেওয়া সিঁদুরে আমগাছ নিয়ে শুরু হয় হিন্দু-মুসলিম সমাজের বিশ্বাস-সংস্কারের দ্বন্দ্ব। পাশাপাশি গল্পে উঠে এসেছে দুই সম্প্রদায়ের বিবাদ-বৈপরীত্যের ছবি, গাছকে নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, মিথ, কিংবদন্তি ও লোকাচার এমন নানান প্রসঙ্গ। দুই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ স্বর গ্রামবাংলার সাম্প্রদায়িক বিভেদটি স্পষ্ট করে দিয়েছে। আখতার হাজির বাবার হাতে পোঁতা সিঁদুরে আমগাছ পড়েছিল তার ভাইয়ের ভাগে। তার ভাই ওই গাছ বিক্রি করেছিল প্রতিবেশী গোলোক সমাজদারকে। গোলোক সমাজদার নিখিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একজন সক্রিয় সদস্য। শিরিনের ওই দুর্ঘটনার পর দু'বছর আমগাছে আর মুকুল আসেনি। গোলোক বাবুর স্ত্রী বলেছে, 'গাছে শাপে লেগেছে। অপয়া বউ পেটের বাচ্চা মেরেছে। গাছকে করেছে বন্ধ্যা। গাছ ভয় পেয়ে বোল দিচ্ছে না'। বন্ধ্যা নারীকে, নিঃসন্তান রমণীকে কিংবা প্রসবকালীন সন্তান মারা গেলে প্রসূতিকে অপয়া ভাবার মিথ গ্রামবাংলার মানুষদের অস্থিমজ্জায় সংক্রামিত হয়ে আছে বহুদিন থেকেই। হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই বিশ্বাস-লোকাচার সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মিথের রূপ গ্রহণ করেছে। গোলোকবাবুর স্ত্রীর শিরিনকে অভিসম্পাত বর্ষণ করার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে সেই প্রসঙ্গ। গোলোক বাবুর স্ত্রীর উক্তির মধ্যে দিয়ে দুই সমাজের বিভেদ-বৈষম্যের দিকটিও গল্পকার তুলে ধরেছেন অপূর্ব শৈল্পিক দক্ষতায়:

আমাদের কেঁপুপুরের বাগানে একবার কাঁঠাল চুরি হল। সোনামুখী গাছ গো। সে কী কাঁঠাল! কোয়া দেখে চোখ ধরে যায়। জোয়ালের সমান সাইজ। চুরি করল এক মুসলমান ছিঁচকে, নফর শাহ নাম। শালা ছুঁচকি চোর। অমাবস্যায় চুরি তো। গাছ উরিয়ে গেল। আর ফল দিলে না। ওইভাবে চুরি হলে গাছের সতীত্ব চলে যায়। গাছেরও তো প্রাণ আছে। মান অভিমান আছে। আমার সিঁদুরে গাছটার সেই হাল করল ওই অপয়া মেয়ে। গাছের বুকে ডর ধরিয়ে দিয়েছে।^{৮৯}

এইভাবে দোষারোপ চলতে চলতে একদিন গোলোকবাবু গাছের তলায় ঘট প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু রীতি মেনে তেল-সিঁদুর, পাতাপল্লব দিয়ে পূজো দেয়। ঢাক বাজানো হয়। মন্ত্র পড়ে মুসলমানের গাছের হিন্দুত্বপ্রাপ্তি ঘটানো হয়। এ দৃশ্য দেখে খেপে যায় আখতার হাজি। তার বাবার হাতে বোনা গাছের নিচে হিন্দুর ঢাকের শব্দে তার বাবার আত্মা কবরে শুয়েও শান্তি পাবে না— একথা ভেবে হাজির মগ্নচৈতন্য নাড়া দেয় বারংবার। সংস্কারপন্থী মানুষ হাজি সাহেব বাস্তব ও পার্থিব যুক্তি বিচারের কষ্টিপাথরে ধর্ম-মিথ-পুরাণকে যাচাই করতে জানে না। গোঁড়া মুসলমানিত্বের উগ্র চোরাস্রোত তার জড়সর্বস্ব মগজের আঙিনায় খেলা করে অবিরত। বস্তুত, পূজোর ঢাকের আওয়াজ আখতার হাজির শিরা-উপশিরায় গজিয়ে ওঠা সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতার বোধকে জাগিয়ে দেয়। হাজি সাহেবের যত রাগ উপচে পড়ে দ্বিতীয় পত্নী শিরিনের উপর। পিতৃতান্ত্রিক অহংকারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আখতার হাজি বলেছে:

ওই মেয়েকে আমার তালুক দেওয়া দরকার। ও আমার সন্তান খেয়েছে। হিন্দু প্রতিবেশীর সাথে ওরই কারণে বিবাদ-বিসংবাদ হচ্ছে। আমি লিগ করি। হিন্দু রাষ্ট্র, দার-উল-হার্ব, এদেশে দার-উল-ইসলাম নয়। এখানে ধর্ম বাঁচে না। ওই শালা সমাজদার কতখানি সাংঘাতিক বামন জানো না তো! পারে না যে গাছের গলায় পইতে পরায়।^{৯০}

গোঁড়াপন্থী আখতার হাজি এ দেশকে কখনও নিজের দেশ বলে মনে মনে করেনি। তার মতে এ দেশ বিধর্মীর দেশ। দার-উল-হার্ব। এদেশে স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। এখানে বিধর্মীদের, কমিউনিস্টদের শাসন জারি হয়েছে। হাজি সাহেব ফতোয়া-ই-আলমগিরিতে বিশ্বাসী। সে মনে করে দেশে যখন ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকে না, বিধর্মীর শাসন জারি হয়। আদালত ইসলামকে অপমান করে। নাস্তিক মার্কস্ সাহেবের পূজো করে মানুষ। তখন সে দেশ দার-উল-হার্ব। তাই বাধ্য হয়ে হাজি সাহেব জামাত-ই-

ইসলামকে পছন্দ করে। মাঝে মাঝে চায়, সংসার-স্ত্রী-সন্তান সবকিছু ছেড়ে জামাতে চলে যেতে এবং দেশে দেশে ইসলামি জীবন-বেদ প্রচার করে বেড়াতে। ইসলামি যুবশক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করে মুসলমান সমাজে নবজাগরণ ঘটাতে চেয়েছে সনাতনপন্থী আখতার হাজি। কিন্তু আখতার হাজির এই গতানুগতিক জীবনকে মেনে নিতে পারেনি আধুনিকপন্থী শিরিন। গাছ নিয়ে শিরিনের উপর একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছিল আখতার হাজি। আর সেই কথার সূত্র ধরে ফস্ করে জ্বলে উঠে এক নির্মম ঘৃণাবোধে শিরিন জবাব দিয়েছিল:

আপনিই বা ওই গাছের মাথায় ইসলামি টুপি পরাতে চাইছেন কেন?^{৯১}

শিরিনের সাহসভরা এই স্পর্ধিত উচ্চারণের হ্যাঁচকাটানে গোঁড়াপন্থী আখতার হাজির ঠুনকো ধর্মবোধে লাগে এক সপাট চড়। এই উক্তির মধ্যে দিয়ে শিরিনের জেদি ও নিভীক চেহারাটিও পাঠকের কাছে প্রকট হয়ে ওঠে।

সাদিক নামের এক মুক্তমনা শিক্ষিত যুবক হাজি সাহেবের বাড়িতে আসে। যে হাজির প্রথম পক্ষের স্ত্রী কুলসমের দূরসম্পর্কের ভাই। সাদিক মার্কসের ভক্ত। রাজনীতির চর্চা করে। সাদিকের চিন্তাধারা ও ধর্মবোধের সঙ্গে হাজি সাহেবের চিন্তা-চেতনার বিস্তর ফারাক। যুক্তিবাদী, মননশীল সাদিকের কথার আমোদে ধীরে ধীরে শিরিন উৎসাহিত হয়। হাজির ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে আটকা পড়ে মুক্তিপ্রয়াসী শিরিন সাদিকের কথার সান্নিধ্যে পায় ক্ষণিক শান্তির নিশানা। ধর্ম ও গাছের প্রাচীনত্ব নিয়ে নানা কথা বলে সাদিক হাজি সাহেবের মেয়ে মিনু ও শিরিনকে। সাদিক হাজি সাহেবের ধর্মীয় সংস্কার ও পুরাণ নির্দেশিত অপার্থিব তথা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের কথা শুনিচ্ছে মিনু ও শিরিনকে:

কারণ হাজি সাহেব মনে করেন শবেকদরের রাতে বৃক্ষলতাপাতা আল্লাহ্-কে সিজদা (প্রণাম) করে, মোনাজাত (প্রার্থনা) করে। যাঁরা পরহেজগার (নৈষ্ঠিক পুণ্যাত্মা) তাঁরা

গভীর রাতে স্বচক্ষে নাকি সেই নামাজ পড়া দেখতে পান। তোমার বাবা হাজি আখতার
এম এল এ (মুসলিম লিগ) আমায় পরম বিশ্বাসের সঙ্গে এ কথা বলেন।^{৯২}

ইসলামি পুরাণ অনুসারে, ‘শাবে কদর’ বা ‘লাইলাতুল কদর’ হল পবিত্র রজনী।
ফার্সি ভাষায় ‘শাব’ ও আরবি ভাষায় ‘লাইলাতুল’ শব্দের অর্থ হল রাত্রি বা রজনী।
অন্যদিকে ‘কদর’ শব্দের অর্থ হল হল সম্মান বা মর্যাদা। এছাড়া প্রচলিত অর্থ হল ভাগ্য
বা তাক্দির নির্ধারণ। হাজার বছরের উপাসনার চেয়েও এই রাতের উপাসনাকে উত্তম
বলা হয়েছে কোরানে।^{৯৩} আরবি রমজান মাসের (মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের রোজার মাস)
শেষ দশ দিনের এক রাত্রি হল শাবে কদর। ইসলাম ধর্মের ধর্মপ্রচারক মহানবী হজরত
মুহম্মদের অনুসারীদের সম্মান বৃদ্ধি করা হয় এই রাতে। এবং সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য
নির্ধারণ করা হয়। শবেকদর সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইসলামি পুরাণে বলা
হয়েছে, হজরত মুহম্মদের পূর্ববর্তী নবি এবং তাঁদের অনুসারীগণ দীর্ঘায়ু লাভ লাভ করার
ফলে বহু বছর আল্লাহর উপাসনা (এবাদত) করার সুযোগ পেতেন। কিন্তু মুহম্মদ থেকে
শুরু করে তাঁর পরবর্তী অনুসারীগণের আয়ু অনেক কম হওয়ায় তাদের পক্ষে স্রষ্টার
আরাধনা করে পূর্ববর্তীদের সমকক্ষ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয় বলে তাদের মাঝে
আক্ষেপের সৃষ্টি হয়। এই আক্ষেপের প্রেক্ষিতে তাদের চিন্তা দূর করার জন্যে সুরা কদর
রচিত হয়।^{৯৪} শবেকদরের রাতের উপাসনা তাই হাজার রাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এই রাতে
ফেরেশতারা মর্ত্যে আসে ধার্মিক মানুষদের জন্যে প্রার্থনা করার জন্যে। আর সমস্ত গাছ
ও বৃক্ষলতাপাতা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজ্দা (নতমস্তকে প্রণাম) করে।

আলোচ্য গল্পে হাজি আখতার সাহেবের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের বৈপরীত্যে অবস্থান
করা মার্কসবাদে বিশ্বাসী সাদিক শবেকদরের রাত্রির ঘটনার সঙ্গে মানুষের চৈতন্যকে
একাকার করে দিয়েছে। লালন ফকির থেকে আইনস্টাইন হয়ে জীবনানন্দও গাছের মধ্যে

নিজের চৈতন্যকে দেখতে পেতেন— মিনু ও শিরিনকে সাদিক শুনিয়েছে সেই গল্প। এবং লিলি ফুলকে নিয়ে সাদিক তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে দিতে চেয়েছে দার্শনিক প্রতীতি:

লিলি পুরুষকে ঠিক সহ্য করে না। বইতে পারে না।... ইউরোপের দেশগুলোর মতন, আমেরিকার মতন, এদেশেও মেয়েদের একশ্রেণির মধ্যে একটা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে। সেটা ফিমেল লিব নামে চলছে। মেয়েরা তাদের নিজেদের মধ্যে একটা সর্পিলা যুদ্ধ, প্রচণ্ড আগ্নেয় নারীসত্তাকে শ্রদ্ধা করতে চাইছে। স্বাধীনতার একটা তুমুল কনসেপ্ট বলা যায়। সেটা ঠিক কিনা জানি না। হয়তো নয়। কারণ সেই ক্ষোভ, নিজেকে সম্পূর্ণ এক রক্তাক্ত জীবন-পিণ্ডে পরিণত করা এবং পুরুষকে দলিত করার ইচ্ছে, যৌন দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যৌনতার স্বাধীন উচ্ছ্বাস পেতে চাওয়ার অভিপ্রায়, এই আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েদের জৈব বৈশিষ্ট্য আর দেহের নারী-লক্ষণগুলোর মধ্যেই রয়েছে তার চিরকালের অপমান। তা সেইসব কথাগুলো ওই শিবপুর গার্ডেনে গিয়ে লিলিকে দেখে আমার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল। আমার খুব ভালো লেগেছিল, ওই বিরাট গোলপাতা, সেই রক্তাক্ত ফুল, বেশ প্রতিবাদী, পুরুষ-বাচ্চাদের ডুবিয়ে দেয়। নেয় না।^{৯৫}

সাদিকের এই অ্যাবসার্ডধর্মী দুর্বোধ্য কথার জালে শিরিন নিজেকে জড়িয়ে ফেলে ক্রমশ। এক দুর্ভেদ্য চৈতন্য দিয়ে শিরিনকে বিদ্ধ করেছিল সাদিক। ফুলের ও গাছপালার গল্প ব'লে সাদিক চিন্তার এমন এক দুশ্ছেদ্য পরিমণ্ডল রচনা করত যে তার কাঁচা কাঁচা কথার আদলে জীবনের একটা 'কনসোলেশন' খুঁজে পেত শিরিন। ভাষার চমকপ্রদ বাক্যবন্ধে গুরুতর যৌনতা নিয়েও সাদিক আলোচনা করত। অথচ সাদিক শিরিনকে ভালোবাসে এবং মনে মনে কামনা করে সেটাও বুঝতে দিত না শিরিনকে। তার কথায় একটা 'ম্যাজিক এফেক্ট' ছিল। 'ফিমেল লিব' থেকে শুরু করে লাজুকলতা নয়, লিলির বিদ্বেষ, দৃঢ়তা, তার বিদ্রোহ— সমস্ত কিছুই শিরিনের মন ও মনন, চিন্তা-চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। শিরিনের অস্থির অন্তরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি

করেছিল। অকথ্য জীবনযন্ত্রণা নিয়েও শিরিন সাদিকের কথার নকশায় মুগ্ধ হয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখত।

হাজি সাহেব রোজ রাতে তাহাজুতের নামাজ (মধ্যরাতের নামাজ) শেষে অত্যন্ত পাশবিক ভাবে যৌন নির্যাতন করত শিরিনের উপর। গোঁড়াপন্থী হাজি সাহেবের বিকৃত কামের পৈশাচিক উল্লাসে শিরিনের বোবা কান্না শোনা যেত। পশুর মতো গোঙাত শিরিন। কোথাও বেরোনোর সময় নিজের সব সৌন্দর্যকে বোরখার আড়ালে ঢেকে রাখতে হত শিরিনকে। বাড়িতে রাতভর লিগের মিটিং থাকলে বারবার চা করে দিয়ে আসতে হত শিরিনকেই। তার জন্যে বারবার বোরখা পরতে ও খুলতে হত। প্রতিদিন হাজি সাহেব তার ভুক্তাবশেষ খাওয়ানোর চেষ্টা করত। শিরিনের সতীন ও বড়ো বোনের ছোটো ছেলেটার হাত মায়ের দুধ খাওয়ার সময় পেছন থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত হাজির নির্দেশে। নইলে ছেলে মায়ের বুকে হাত দেবে। এসবই সহ্য করতে হত শিরিনকে। হাজি তাকে বাধ্য করত পাঁচবার নামাজ পড়তে।^{৯৬} এহেন পুরুষের চক্ররে পড়ে শিরিন মানসিক ও শারীরিকভাবে অত্যাচারিত হত প্রতিনিয়ত। হাজি সাহেব বিবাহিত স্ত্রীকে ইচ্ছেমতো সম্ভোগ করাকে ধর্ষণ বলে মনে করত না। সাদিকের সঙ্গে হাজি সাহেব আরব মুলুকের গল্প ও কাফেরদের কেচ্ছা শুনত। এই কথার সূত্র ধরে হাজি সাহেব সাদিককে শুনিয়েছিল শিরিনের প্রতি তার ভোগ লালসার পৌরাণিক মনস্তত্ত্ব:

ইব্রাহিমের পাথর মক্কায় রয়েছে। নাম হাজারে আসুয়াদ। তাতে হাজিরা চুমু দেয়। এতই তার আকর্ষণ, মুখ তুলতে ইচ্ছে হয় না। এতই তার টান। দুই ঠোঁট শক্ত আঁঠার মতন লেগে যায়। বুঝলে সাদিক, সংসারটাই এইরকম। ছোটো বউ হলে সেই হাজারে আসুয়াদ। টেনে ধরে আছে। ছাড়ে না। ছাড়াতে পারি না। হেঃ হেঃ! সবই খোদার কুদরত। মেয়েরা হল, তোমাদের ইংরাজি ভাষায়, ম্যাজিক স্টোন। হাজারে আসুয়াদ। তাই কিনা?^{৯৭}

হাজারে আসওয়াদ হল একটি কালো রঙের প্রাচীন পাথর। ইসলামি পুরাণ মতে, এই পাথর আদম ও হাওয়া বিবির সময় থেকেই পৃথিবীতে রয়েছে। প্রাক্ ইসলামি পৌত্তলিক সমাজেও এই পাথরকে সম্মান করা হত। ইসলামি বর্ণনা অনুযায়ী, এটি মুহম্মদ ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে কাবা শরীফের দেয়ালে স্থাপন করেন। বর্তমানে এটি একটি রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় কাবার দেয়ালে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। এর রঙ গাঢ় কালো এবং লক্ষাধিক হাজিদের স্পর্শের কারণে এটি মসৃণ আকার লাভ করেছে। মুসলমানদের বিশ্বাস, এটি আদম ও হাওয়া বিবির সময় বেহেশত (স্বর্গ) থেকে পৃথিবীতে এসে পড়ে। এটিকে উল্কা বলা হলেও এর সত্যতা নিশ্চিত নয়। হজ্জের মরসুমে বা উমরা হজ্জের সময় মুসলিমরা তাওয়াফ করেন। তাওয়াফ মানে প্রদক্ষিণ করা। আরবি উমরা শব্দের অর্থ হল- জনবহুল স্থানে ভ্রমণ। সাধারণ হজ্জের সঙ্গে উমরা হজ্জের পার্থক্য হল, সাধারণ হজ্জ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে পালন করতে হয় এবং উমরা হজ্জ বছরের যে কোনো সময় পালন করা যায়। হজ্জের সময় ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে সাতবার কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে হয় হজ্জ যাত্রীদের। এই তাওয়াফ করার শুরুতেই হাজারে আসওয়াদে চুমু দেওয়ার রীতি রয়েছে। ফ্রেমে মুখ ঢুকিয়ে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতে হয়। এর পাশে চব্বিশ ঘণ্টা উপস্থিত থাকে সৌদি পুলিশ। তাঁরা খেয়াল রাখেন, ফ্রেমে মাথা ঢোকাতে বা চুম্বন করতে কোনো হজ্জযাত্রীর অসুবিধা হচ্ছে কিনা। তবে চুমু দেওয়া সম্ভব না হলে হাতের ইশারার মাধ্যমে তাওয়াফ শুরু করা হয়। মুসলিমরা এই হাজারে আসওয়াদ পাথরকে মূর্তি রূপে পূজো করে না।^{৯৮} সাধারণত ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করলে সব পাপ মুছে যায়। মানুষের পাপ টেনে নেবার কারণেই পাথরের রঙ কালো হয়ে গেছে— এমন নানান মিথ ও কিংবদন্তি গ্রামীণ মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তরমহলে ছড়িয়ে আছে।

সাদিক ও হাজি সাহেবের ‘হাজারে আসওয়াদ’ সম্পর্কিত পারস্পরিক কথোপকথনে উঠে এসেছে পৌরাণিক লোককথার অন্তঃকাঠামোটি। হাজিরা যখন হাজারে আসওয়াদে পাগলের মতো চুমু খায়, ছাড়তে চায় না, তখন পুলিশ হাজিদের সরিয়ে দেয়। মিনুর অনুভূতিতে সাদিক যেন সেই পুলিশ। শিরিনের প্রতি হাজির যৌনতাড়নার, রিরংসার পথে সাদিক যেন ‘ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট’। অপ্রতিরোধ্য সত্তা। সাদিকের কথার বাঁধন, সফিসটিকেশন, একটা মায়া জড়ানো জাল, বিভ্রান্ত দর্শনের ছায়া, পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধের মিশেল, যা শিরিনকে সাময়িক মুগ্ধতা ও সাস্থনা দেয়। আখেরে কোথায় টানে তা মিনু বা শিরিন কেউই বুঝতে পারে না। বস্তুত সাদিকের ব্যক্তিসত্তার বহুকৌণিক স্বর ও অভিব্যক্তিই শিরিনের অন্তর্সত্তায় গড়ে দেয় প্রতিবাদের ক্ষেত্র। পুরুষ আধিপত্যবাদকে অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে বাঁচার তীব্র স্পৃহা ও পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার জন্যে শিরিনের চিন্তামানসে রচিত হয় নতুনভাষ্য। শিরিনের অনুভূতিপ্রদেশে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। আর এমন সময় হাজি সাহেব একদিন ক্রোধের বশে তালাক দেয় শিরিনকে। ধর্মকে আত্মীকরণ করে বেড়ে ওঠা হাজি সাহেবের মুখে তালাক শুনে কুলসম অবাক হয়। কুলসম হাজি সাহেবের এই হঠকারি সিদ্ধান্তে বিচলিত হয়েছে। সে সাদিককে গুনিয়েছে শাস্ত্রের কথা:

শুনেছি, ওই তালাক শুনলে নবির রেহেল কেঁপে যেত। আল্লাহর আরশ কুর্সি (সিংহাসন), সাত স্তবক (স্তর) আশমান খরখর করে কেঁপে যায় রে। তবু বে-আক্কেলে বুড়ো ওই নোংরা কথা মুখে আনলে। ওকে তোমরা ক্ষমা করে দাও।^{৯৯}

ইসলামি হাদিস-কোরানে তালাককে সবচেয়ে ‘নিকৃষ্টতম হালাল’ বলা হয়েছে। বিনা কারণে অযথা কোনো পুরুষ যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে আল্লাহর সিংহাসন কেঁপে যায়— এমন মিথ মুসলিম সমাজের মধ্যে প্রচলিত আছে। সেই কথায় বলতে চেয়েছে

কুলসম। স্বামীর মুখে তালুক উচ্চারণ শুনেই শিরিন তার বন্দিত্ব ও পরাধীনতার হাত থেকে রেহাই পেতে এক রাতে হাজির বাড়ি ছেড়ে চলে যায় সাদিকের কাছে। রবীন্দ্রনাথের ‘পয়লা নম্বর’-এর অনিলা বা ‘স্বীর পত্র’-এর মৃণালের মতো স্বামী-সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চেয়েছে শিরিন। সাদিকের কাছে এসে শিরিনের জীবনে নতুন পর্ব শুরু হয়। এদিকে হাজি শিরিনকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করে বারংবার। কুলসম শিরিনকে ফিরে আনার চেষ্টা করেও ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসে। শেষপর্যন্ত কোর্টে কেস ওঠে। ভণ্ড ধার্মিক হাজি সাহেব আদালতে কোরান ছুঁয়ে মিথ্যা কথা বলে। কুলসম স্বামীর ক্ষমতার কাছে অসহায় হয়ে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়। সব দোষ গিয়ে পড়ে সাদিকের উপর। সাদিকের সাহায্যে প্রান্তিক শহরের টোলে শিক্ষিকার কাজ পায় শিরিন। পাশাপাশি শিরিন তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিসর তৈরি করে আত্মানুসন্ধানের পথে ধাবিত হয়েছে। সাদিকের চেষ্টায় শিরিনের মুক্তচিন্তার প্রসার ঘটেছিল। একদিন আচমকা শিরিন আবিষ্কার করে সাদিকের ডায়েরি। ডায়েরির পরতে-পরতে ছিল সাদিকেরও দেহ-মন জুড়ে শিরিনের প্রতি সুপ্ত কামনার বীজ। সমস্ত বিশ্বাসভঙ্গের হতাশা নিয়ে শিরিনের জীবনে ঘনিয়ে আসে ঘোর অন্ধকার। যার আশ্রয়ে নিজেকে সে নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল সেই আশ্রয়ও অচিরেই নস্যাত হয়ে যায়। বনফুলের ডানা উপন্যাসের ডানা যেমন ভাস্কর বসুর মধ্যে নব রূপচাঁদকে দেখেছিল। গল্পে শিরিনও সাদিকের মধ্যে হাজি সাহেবের আর এক সত্তাকে দেখতে পায়। ডানা সবকিছু ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু শিরিন পারেনি। শিরিনের সমগ্র অস্তিত্বের পেছনে ত্রাসসঞ্চারক রূপে সর্বদা ধাওয়া করেছে হাজি সাহেব। সাদিকও পার্টির কাজে চলে যায় পাটনা। কুলসম একটি ছোট চিঠি লিখে মিনুর ব্যাগে রেখে দিয়েছে। তাতে উঠে এসেছে তার সমস্ত অপরাধবোধ ও মিথ্যা সাক্ষ্যের বয়ান। কুলসম ছোটো বোন শিরিনকে সাদিককে বিয়ে করার উপদেশ দিয়েছে। এ চিঠি

মিনুর হাতেই রয়ে গেছে, হস্তান্তর হয়নি। শিরিনের জীবনে আবার ঘনিয়ে আসে হাজি সাহেবের যৌন লালসার দাসত্ববৃত্তি। হাজি সাহেবের যৌন নির্যাতনের ভারে মনের সব সংযোগ হারিয়ে বেঁচে রইল শিরিন। পাগল হতে চাইলেও সে পাগল হতে পারল না। আত্মহত্যা করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলল সে। কেবল সিঁদুরে আমগাছ পৃথিবী আলো করে হাসছিল। শিরিনের ঘরের জানালার ওপারে জীবনে বিপরীত সৌন্দর্য এক হয়ে মিশে গেছিল। পুরুষের যৌন লালসার শিকার হয়ে শিরিন ট্র্যাজেডির অতলান্ত গভীরে নিমজ্জিত হল।

এ গল্পের মধ্যে দিয়ে গল্পকার আসলে গ্রামীণ মুসলমান সমাজের মিথ ও ধর্মনির্ভর সংস্কৃতির বেড়াজালে বন্দি নারীর অসহায়তার দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। মুসলিম নারীর অন্তরমহল থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে জীবনচর্যার পথে বারবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মানুষের সামাজিক সংস্কার। ইসলামের আধুনিকীকরণ করতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত গোঁড়াপন্থী মানুষদের শাস্ত্রের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে যুক্তিবাদী মুক্তমনা মানুষেরা। মোল্লাতন্ত্রের দাপট নারীর ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন বিচরণের পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। আধুনিক সমাজে-পরিবারে নারী অবরোধবাসিনী হয়ে পুরুষের ইশারাতেই জীবনকে চালিত করেছে। পরাধীনতার নাগপাশ কেটে বাইরের পৃথিবীতে হাঁটতে চাইলেও ব্যর্থমনোরথ হয়ে পরিবারেই প্রত্যাবর্তন করেছে।

‘নিশি কাজল’ গল্পেও আছে বামপন্থী আদর্শ ও মিথ-পুরাণ নির্ভর ধর্ম সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব-সংঘাত। বামপন্থী চেতনার সঙ্গে শরিয়তি ইসলামের দ্বন্দ্ব আবুল বাশারের লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার। লেখক ব্যক্তিজীবনেও বামপন্থী চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তারই প্রভাব পড়েছে তাঁর রচিত কথাসাহিত্যে। আলোচ্য গল্পের মহিম কমিউনিস্ট পার্টির নেতা।

মহিমের চিন্তাধারা সনাতন মূল্যবোধে বিশ্বাসী পিসিমার মতের সঙ্গে মেলে না। সেকেলে ম্যাট্রিক পাস পিসির ধর্মবিশ্বাস, তুলসী তলায় প্রদীপ দেওয়া, ঘোড়াপিরের আস্তানা থেকে উথিত মাটিতে তুলসী গাছের চারা রোপন করার বাসনা— এসব মহিমের কাছে ‘আঁকাড়া সংস্কার’। পিসির মনে জমে থাকা সংস্কার, কিংবদন্তি শুনে বামপন্থী মহিম অবাকই হয়। পিসির সঙ্গে এক বাড়িতে থাকলেও মহিম পিসির বিশ্বাস-জীবনযাপনের ব্যবধানকে অতিক্রম করতে পারে না। ঘোড়াপিরের আস্তানার মাটি কিংবা আকুল চোরের আত্মসাৎ করা নিশিকাজল পিসির কাছে ‘স্বপ্নাদ্য’ জিনিস। যা কেবলমাত্র স্বপ্নেই পাওয়া যায়। সেই স্বপ্নাদ্য জিনিসের কথা শুনিয়েছিল পিসি:

হ্যাঁ। স্বপ্নের দান। আকুলের বাবা পরান ছেলেকে দিয়ে গেছে। নিশি-কাজল নাম। পিলুর মা সাঁঝ-কানা। আকুলের ওই কাজল চোখে পরল এক সপ্তা। দিব্যি এখন দেখতে পাচ্ছে। চোরের জিনিস। কিন্তু তারই মধ্যে যে মায়া লুকোনো আছে, তার খোঁজ যুক্তি-তর্কে মেলে না। জীবনটা তো শুধু যুক্তি-তর্কে চলে না মহিম। তার অন্য মহিমে (মহিমা) আছে। ওই নিশি-কাজলের গল্পটা ভারি চমৎকার।^{১০০}

পিসির বিশ্বাস ও সংস্কারের আবর্তে মজে থাকা জীবনের উচ্ছ্বাস সহ্য করতে পারে না মহিম। সে ভয়ানক বিরক্ত হয়। বামপন্থী আদর্শের জাঁতাকলে জীবনকে সঁপে দিয়ে মহিমের স্নায়ুকোষে অন্য উত্তেজনা চারিত হচ্ছিল। আদালতে কোরান তুলে দেবার মামলা, কোরানের সুরা বাকারার মধ্যে গো-হত্যার বিদ্বেষ আবিষ্কারের মহাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা বা শরিয়তের সাম্প্রতিক কলরব ও দোলন কিংবা সাবানের মধ্যে শূকর ও গরুর চর্বি, দেওয়ালে ত্রিশূল সবই অবচেতনে মহিমকে রক্তাক্ত করেছে। কারণ মহিমের অন্তঃকরণে আরও এক ভয় তাকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। সেটি হল গ্রামে এই মুহূর্তে দাঙ্গা বাঁধবার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই দলুইডাঙা, কাঁকুড়গাছি, বাজিতপুর, মেথিডাঙা, নস্করপুর দাঙ্গার আগুনে ফুঁসছে। বিশ বছর আগেই এইসব গ্রামগুলিতে দাঙ্গা

হয়েছিল। এত বছর পরেও বামপন্থী ভাবাদর্শ দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেনি মহিম ও তার পার্টির লোকজন। বিশ বছর আগের দাঙ্গার দুর্বিষহ স্মৃতি পিসির মনোজগতে এখনও তাজা হয়ে আছে। দাঙ্গার একটি নৈসর্গিক কারণ আবিষ্কার করে পিসি বলেছিল, ইদ আর দোল একই দিনে পড়ার ফলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিদ্বেষের বিষবাস্প বাতাসকে দূষিত করেছিল। আরবের ঋতু ও বাংলার প্রকৃতি আলাদা হওয়া সত্ত্বেও ঘুরতে ঘুরতে দোল আর ইদ একই তিথিতে, একই চাঁদে মিলে যায়। দুটোই খুশির উৎসব, ‘কালার্ড ফেস্টিভ্যাল’ হলেও শশাঙ্কের ছেলে নেতাইয়ের হোলির পিচকারির রঙ ছিটকে পড়ে মোবারকের আতর মাখা ইদের পোশাকে। এই ছিল প্রত্যক্ষ কারণ:

বুঝলি মহিম! ভগবান ইদ আর দোলকে একইদিনে টেনে আনলেন কেন, মানুষের ধর্মবুদ্ধিতে তার বিচার ছিল না। মানুষের ধর্ম ভালো। ধর্মবুদ্ধি খারাপ। বোধ আর বুদ্ধি তো এক কথা নয়। বোধের মধ্যে থাকে মায়া, বুদ্ধিতে থাকে যুক্তির আশ্রয়। হ্যাঁ রে! জীবন থেকে সেই মায়া, বাবা বলতেন মায়া-বোধি সেইটে হারিয়ে গেল যে!^{১০১}

যে মানুষ লজিক বা যুক্তির তোয়াক্কা না করে ধর্মের গডডালিকা প্রবাহে গা ভাসায়, তার কাছে মুক্তবুদ্ধির চর্চা ‘উলুবনে মুক্তা ছড়ানো’র সমান। ধর্মের নামে হিংসাকে প্রশ্রয় দিয়ে মানুষ দাঙ্গার সৃষ্টি করে। পুরাকালের পুরাণ ও মিথের আশ্রয়ে লালিত হয়ে ইন্ধন জোগায় দাঙ্গা, ধর্মযুদ্ধ, জেহাদে। প্ররোচনা দেয় হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে। ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’— রাজনৈতিক দলগুলি যতই মহামিলনের বাণী প্রচার করুক, গল্পে দেখা প্রকারান্তরে রাজনৈতিক দলগুলিই দাঙ্গা উসকে দেয়। দাঙ্গার মূল হোতা রাজনীতি। গ্রামের সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি ইমাম আলি মহিমের কাছে আসে মসজিদের আজান বন্ধের কারণে। ইমাম মসজিদে পুনরায় আজান হবার আর্জি জানায় পার্টির মেম্বার মহিমকে। মানবতায় বিশ্বাসী ইমাম আলি ও পিসির কথোপকথনে উঠে এসেছে তাদের অতীত জীবনের নানান টুকরো ঘটনা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি। সন্ধ্যার আজানের সুর

শুনে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালানো পিসির নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। আজান বন্ধের কারণে পিসিও ব্যথিত হয়েছে। বামপন্থী মহিম তার সাধ্যমতো চেষ্টা করে আজান যাতে পুনরায় ঘোষণা করা যায় তার জন্যে। একসময় মহিমের বাবা গ্রামের সংখ্যালঘু মানুষদের রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল। যুবক বয়সে ইমাম আলি ও পিসির ছোড়দি চারুর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। ভিন্ন ধর্মের কারণে সে সম্পর্ক আর পূর্ণতা পায়নি। আজ যুগ বদলেছে। এখন উভয় সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে হিন্দুয়ানি ও মুসলমানিত্বের জিগির উঠেছে। ধর্মবুদ্ধিই তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। পিসি ও ইমাম আলির কথোপকথনে উঠে এসেছে সেই প্রসঙ্গ। মানুষের নিয়তিবাদে বিশ্বাসী পিসি ও ইমাম আলির ধর্ম-সংস্কার বামপন্থী মহিমের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও আদর্শের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। পিসি ও ইমাম আলির সামাজিক শিকড় ও তাদের যাপিত জীবনের লোকায়ত বিশ্বাস বামপন্থী মহিমকে অবাক ও বিচলিত করেছে। ইমাম আলির কাছে সেইসব পুরানো দিনের স্মৃতিচারণ করে পিসি বলেছিল:

ছেলেবেলায় আমি, তুমি আর ছোড়দি কতদিন ঘোড়াপিরের থানে গিয়েছি। সেখানে পিরের কবর। শুনতাম, জাগ্রত পির কবরে শুয়ে আজান দিচ্ছেন। সেখানে তুলসীমঞ্চ ছিল। তেল-প্রদীপ হত। মানতের বাতাসা খেতাম আমরা। সেই তুলসীমঞ্চের মাটিতে কান পাতলে আজান শোনা যেত। আমরা কান পেতে সত্যিই একটা ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেতাম। বিয়ের পর সেই মাজার (থান) থেকে আকুল আমাকে তুলসীর চারা দিয়ে গিয়েছিল। সেই মঞ্চের কান পাতলে আজান শুনতে পেতাম। পরে স্বামী হারিয়ে সেই তুলসীর চারা মহিমদের মাটিতে পুঁতেছি।^{১০২}

একদিন পিরের মাজার ছিল হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মিলনস্থল। উভয়ের জন্যেই থানের দ্বার অব্যাহত। এখন সবাই উগ্র হিন্দুয়ানি আর মুসলমানিত্ব নিয়ে মেতেছে। পিসি আক্ষেপ করে বলেছে, ‘কীসের চাপে সেই সুর থেমে গেল জানি না’। আজ সবাই বড়ো বেশি হিন্দু-মুসলমান হয়ে গেছে। আকুল চোরের নিশি-কাজলের মায়ায় হিন্দু-

মুসলিমের দৃষ্টিতে ছিল সম্প্রীতির ছোঁয়া। ওই কাজল পরে আকুল করত মন্ত্র-তন্ত্র। চুরি করতে বের হত অমাবস্যার রাতে। যারা কালীসাধনা করে অমাবস্যার রাতে তারা কবরস্থানে গিয়ে টাটকা কবর খোঁজে। টাটকা মৃতদেহের মুণ্ডু তাদের সাধনায় বড়ো ফল দেয়। আজও গ্রামবাংলার কোথাও অমাবস্যার দিনে কেউ মারা গেলে কবরস্থ মৃতদেহ পাহারা দেয় পরিবারের লোকজন। যাতে লাশের মাথা চুরি না যায় সেই ভয়ে। অথচ সেই নিশি-কাজলের মায়ার টানে আকুল বদলে পরে যায়, আকুলের ছেলে পরানও নিজেকে শুধরে চোর থেকে হয়ে ওঠে নিপাট ভালোমানুষ। এই মায়ায়, এই জাদুতেই একদিন তো দস্যু রত্নাকর নিজের দস্যুসত্তাকে খুন করে হয়ে উঠেছিলেন ঋষি বাল্মীকি। যুক্তির তাড়া খেয়ে মানুষের এই বদলবৃত্তান্তের কথা ইমাম আলিও শুনিয়েছিল পিসিকে:

জুম্মাবারে (শুক্রবারে) আমরা খুদবা পাঠ করি। খুদবার একটা ভাগ আছে, নাম তৌবাতুন নসুহা। নসুহা ডাকাত যেমন করে তৌবা করেছে, একটা চোর, যে কিনা কবর থেকে কফিন চুরি করে বিক্রি করত, এমনকি মেয়ে মূর্দার সাথে কবরে ঢুকে ব্যভিচার করত, বলাৎকার করত, সেই নসুহা তৌবা করেছিল। তার মতো কাঁদতে হবে, সেটা এক দৃষ্টান্ত।^{১০৩}

আকুল চোর বা নসুহা ডাকাত দস্যু রত্নাকরের মতো আপন কৃতকর্মের জন্যে পরিতাপ করে, তৌবা করেছিল। ইসলামি পুরাণে আরবি ‘তৌবা’ কথার অর্থ হল ফিরে আসা। অর্থাৎ পাপ বা অন্যায় কাজ পুনরায় না করার অঙ্গীকার নিয়ে ঈশ্বরের পথে প্রত্যাবর্তন করা। আর যে এই কাজ করে তাকে ‘তাওবায়ে নসুহা’ বলে।^{১০৪} এখন ধর্মবুদ্ধিতে অন্ধ হয়ে সবাই সবাইকে আড়চোখে দেখছে। তারফলে গ্রামে দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মহিম তার বামপন্থী চেতনা ও আদর্শ দিয়ে দাঙ্গা রুখতে চেয়েছে। অন্যদিকে ইমাম আলি ও পিসি শাস্ত্রের মধ্যে থেকেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে।

শেষপর্যন্ত গোঁড়াপন্থী মানুষদের বিশ্বাস ও মনোবলের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে সকলেই। দাঙ্গাবাজদের দাপটে ইমাম আলির মুণ্ডু ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, অন্যদিকে যুগীপাড়ার নগেনের কিশোর ছেলে হারাধনের গলা-কাটা দেহ তাঁতের গর্তে পড়ে রয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের ধর্মাত্মক মানুষদের বিকৃত উন্মাদনার মোহে সমাজ-পরিবার তছনছ হয়ে গেছে। ইমাম আলির মৃত্যুর পর পিসি আর সন্ধ্যার তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালাতে পারেনি। আজানের অপেক্ষায় তার সারা সন্ধ্যা কেটে গেছে। পার্টি অফিসে বামপন্থী কর্মী ইমরান আক্ষেপের সুরে বলেছিল:

আমরা কি কমিউনিস্ট হতে পেরেছি? ভোট করতে করতে শেষ হয়ে গেলাম। আমি হিন্দু, না কমিউনিস্ট, নাকি মুসলমান, এই দ্বন্দ্বের যে কবে শেষ হবে!^{১০৫}

দাঙ্গা রুখতে অপারগ হয়ে মহিমও বামপন্থী হয়ে বামপন্থীদের সমালোচনায় মুখর হয়েছে। মহিম দেখেছে পার্টিই পরোক্ষভাবে দাঙ্গায় প্ররোচনা দিয়েছে। রাজনীতির মগজাস্ত্রে প্রলুব্ধ হয়ে ধর্মাত্মকের দল দাঙ্গার সৃষ্টি করেছে:

পোস্টার পড়তে পড়তে পার্টির ভাষায় সে দ্যাখে সুবিধাবাদী কী মারাত্মক চাতুরী!
হিন্দুকে খুশি করে। মুসলমানকে খুশি করে তারা। ভোট আসে ভোট যায়। জীবন
বদলায় না।^{১০৬}

দাঙ্গায় ইন্ধন জোগানোর, মানুষের মনে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বাষ্প ও বীজ নিহিত আছে রাজনীতির অন্তরে অন্তরে। মহিম আর পার্টির উপর ভরসা রাখতে পারেনি। তার নীতি-আদর্শের অপরাধতত্ত্ব সমাজের গভীর থেকে উঠে এসে মহিমকে পুড়িয়ে দিচ্ছিল বারবার। গল্পকার ব্যক্তিগত জীবনে বামপন্থী হয়েও বামপন্থীদের সমালোচনা করেছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে আবুল বাশার জানিয়েছিলেন:

আমি বামপন্থী হয়েও বামপন্থীদের সমালোচনা করেছি। এটা তো প্রতিটি বামপন্থী দল জানে আমি কোন দলে ছিলাম, কতদিন সক্রিয় রাজনীতি করেছি। কিন্তু এখন আমি বাম আমলের সমালোচনা করছি। এখনও করে যাচ্ছি। আমার মনে হয়, ওদের সমালোচনা করে আমার কথা কিছুটাও যদি ধরাতে পারি, তা হলে তো বামপন্থারই লাভ।^{১০৭}

মহিমের আত্মসমালোচনা, পার্টির আদর্শ ও নীতির দোষগুণ বিচার— যেন গল্পকারের ব্যক্তিসত্তার অবক্ষিপণ। সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে বামপন্থীদের অসহায়তা তা প্রমাণ করে দেয়। গল্পকার মূলত এটাই দেখাতে চেয়েছেন যে, মানুষের ধর্ম-পুরাণ-মিথ এই পরলৌকিক ও লৌকিক বিশ্বাসের বৈপরীত্যে বামপন্থী আদর্শ কোনো বিরুদ্ধ স্বর তৈরি করতে পারেনি। ‘বামপন্থী রাজনীতি চর্চা ধর্মীয় বোধের বিকল্প কোনো আত্মিকবোধ নির্মাণ করতে অসমর্থ’।^{১০৮} ধর্মকে অস্বীকার করে ধর্ম সমন্বয়ের পথ প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছে বামপন্থীরা। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, শাস্ত্রের আইনকানুন ও ধর্মীয় উন্মত্ততা যুক্তির কাছে জিতে গেছে। মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের গলায় বেড়ি পরিয়ে সাম্য বা ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়নি। সেই অসুস্থ সময়ের সমস্যা-সংকটকেই এই গল্পে বিধৃত করেছেন গল্পকার।

আধুনিক কথাকার আবুল বাশার তাঁর ‘সিয়ার’, ‘কাসীদ’ ও ‘পথ’ এই তিনটি ছোটোগল্পে অতীতের কারবালার ঐতিহাসিক পরিবেশ ও পরিসরকে ব্যবহার করেছেন গল্পের সূত্র হিসাবে। কারবালার ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লেখকের ‘মোটিভ’ নয়, মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মিথ যখন তার নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে তখন মানুষ কী পরিমাণ পাপবুদ্ধির অধিকারী হয়ে ওঠে এবং কীভাবে পতিত হয় অশিক্ষার অন্ধকারে তাই-ই দেখাতে চেয়েছেন গল্পকার। ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করেও মানুষের সনাতন ধর্ম-প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা-বামপন্থী চেতনা— এই তিনের দ্বন্দ্ব আবুল বাশারের গল্পে বারবার ফিরে

এসেছে। তাঁর গল্পের চরিত্ররা কেউই তাদের সামাজিক ও পারিবারিক সংকটকে পশ্চিমি যুক্তিবাদ দিয়ে সমাধান করতে চায়নি, উদারবাদী বামপন্থী মানুষও শেষ পর্যন্ত বামপন্থা থেকে সরে এসে ধর্মীয় বা শাস্ত্রের মধ্যে থেকেই সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে। আলোচ্য গল্প তিনটিতে দেড় হাজার বছর পূর্বের প্রাচীন পৃথিবীর ঐতিহাসিক পরিবেশকে সামনে রেখে গল্পকারের কল্পিত চরিত্রদের বিশ্বাস, সংস্কার, আধুনিকপন্থা ও শরীয়তীপন্থার বিরোধ ও দ্বন্দ্ব, মুসলিম নারীর জীবনের অসহায়তার দিকগুলি প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে।

কারবালার যুদ্ধ ইসলামিক পঞ্জিকা অনুসারে মহরম মাসের দশ তারিখ ৬১-হিজরিতে (ইংরেজি ১০-অক্টোবর, ৬৮০-খ্রিস্টাব্দ) বর্তমান ইরাকের কারবালা নামক প্রান্তরে সংগঠিত হয়েছিল। হজরত মুহম্মদের নাতি হোসেন এবং তার অল্প কিছু সমর্থক-আত্মীয়, উমাইয়া খলিফা প্রথম ইয়াজিদের বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে হোসেনসহ তার সকল সমর্থক নিহত হয় এবং নারী ও শিশুরা বন্দি হয়। ইতিহাসের ঘটনা মাত্রই সর্বজনীনতার দাবি করে। কারবালা এক অর্থে যেহেতু ধর্মযুদ্ধ (জেহাদ) — বস্তুত এই ঘটনা সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মিথের আকার নিয়েছে। ইতিহাস পুনঃপ্রোথিত হতে হতে মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস সত্যের আকার ধারণ করে। আজও প্রতি বছর মহরম মাসের ১০-তারিখ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ ‘মহরম’ উৎসব পালন করে।

শিয়াপন্থী মুসলিমরা প্রতি বছর মহরমের প্রথম দশ দিন ‘অনুতাপের দিন’ হিসাবে পালন করার রীতি চালু করেছে। এছাড়া তার বীরোচিত সংগ্রাম ও যুদ্ধক্ষেত্রে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গভীর আবেগময় পুনারাভিনয় করা হয়। প্রতি বছর

এই পুনরাভিনয় দুটি ভাগে দেখানো হয়। যুদ্ধের স্মরণে একটি অংশ দেখানো হয়, তার নাম ‘আশুরা’ (দশম দিবস)। মহরমের দশ দিন থেকে আরও চল্লিশ দিন পরে কারবালা প্রান্তরে দেখানো হয় আর একটি অংশ তার নাম ‘মস্তকের প্রত্যাবর্তন’। হজরত আলীর পুত্র হোসেনের এই রক্তদান আলাদা মতবাদ গড়ার ব্যাপারে শিয়া সম্প্রদায়কে অনেক বেশি প্রেরণা দিয়েছিল। মহরমের দশম দিনে শিয়া মতবাদের জন্ম হয়েছিল।^{১০৯}

মানুষের বিশ্বাস এবং মৌখিক পরম্পরায় পুরাণ ও ইতিহাস কীভাবে মিথে পরিণত হয় ও সেই মিথনির্ভর সংস্কৃতি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করলে মানুষ বোধবুদ্ধি হারিয়ে কেমন অসহায় পরিস্থিতির শিকার হয় ‘সিমার’ গল্পে অনুভবী অন্তর্বেদনার বয়ানে গল্পকার সে কথাই ব্যক্ত করেছেন। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে সিমার ছিল এজিদের সেনাপতি। কারবালার মরুপ্রান্তরে যখন হোসেন ও তার দুগ্ধপোষ্য শিশু জলের জন্য কাতরাচ্ছে, হোসেনের কণ্ঠনালি শুকিয়ে গেছে। তখন এজিদ জলের বদলে অস্ত্র হাতে সিমারকে পাঠিয়ে ছিল। কারবালার যুদ্ধে সিমার হোসেনকে হত্যা করেছিল। বড়ো নির্দয় ও নৃশংসভাবে হোসেনের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিল সিমার। সিমারের বুকে কোনো লোম ছিল না। এই ঘটনায় সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মিথের আকার নিয়েছে। ইসলামি ধর্মাবলম্বী বহু মানুষের বিশ্বাস, যে পুরুষের বুকে লোম নেই, সে নির্দয়, নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়। এই যুক্তিহীন প্রথা ও সংস্কার নিয়েই আবুল বাশারের ‘সিমার’ গল্প। এ গল্পের নায়ক সুখবাসের বুকেও লোম নেই। ‘লোহা দিয়ে ঢালাই করা তবীয়ত। ইস্পাতে ঘাস গজায় না। সুখবাসের বুকে লোম গজানোর নরম ভেজা শ্যামলী মৃত্তিকা খোদা দেয়নি। সুখবাসের বুকখানাই বুঝি বা এক উষর কারবালা। হেথায় সিমার এক আশ্চর্য অধিপতি।’— মিথের মানুষ, ইতিহাসের মানুষ, যুদ্ধ, হত্যা, নিষ্ঠুর কিংবদন্তি সমস্ত কিছুই ভর করে সুখবাসের মন ও মননে। চারপাশের মানুষজন সুখবাসকে সিমার বলে সম্বোধন করলে সুখবাসের

অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। দাদিমা সুখবাসের বুকে হাত বুলিয়ে বলেছিল— চুল কৈ বাছা! হায় পাপী! সিমারের বংশ রে সুখবাস। বড়োই নিদয়া।^{১১০}— এসব শুনে সুখবাস কেঁদে ফেলে। চোখে চিকচিক করে জল। সে বুঝতে পারে ভেতরে ভেতরে দাদিমা তাকে ঘৃণা আর ভয় করছে। গ্রামবাসীও তাকে সিমার বলে ডাকে। সিমারের নির্দয় চাপে সুখবাস নামটা ক্রমশ তলিয়ে যায়। অস্তিত্বের অস্থিরতা, টানাপোড়েন, ছটফটানি সমস্ত কিছু নিয়ে সে সুখবাস না সিমার— এই দ্বন্দ্বিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে না সুখবাস। ‘আইডেন্টিটি ক্রাইসিস’ তাকে নিরন্তর তাড়া করে। আত্মপরিচিতির বিদেহী সত্তা নিয়ে সে তালগোল হারিয়ে ফেলে এবং ডুকরে কেঁদে ওঠে প্রতিবার। দাদিমা ও সিমারের পারস্পরিক কথোপকথনে উঠে এসেছে সেই প্রসঙ্গ:

- নেকাপড়া শিকেয় তুললি বাপ। জন্তু ফিরিয়ে বেড়ালি। মানুষ হলি নে।
- কী হবে মানুষ হয়ে, আমি তো সিমার। পাপী। তুমিই বুলেছ।
- হ্যাঁ। ঠাট্টা করেছি বাপ রে। মুসলমান কি সিমার হয়?
- হয় লিচয় হয়।

সুখবাস ডুকরে উঠল। বলল- স্কুলের ফার্সি- স্যার সাদেক মৌলবী আমাকে বুলে দামড়া। মুখের ভাষার ভুল ধরে। ‘কালাপাহাড়’, ‘সিমার’ বুলে গাল দেয়। জামা তুলে সকলকে দেখায় বুকে চুল নাই। সবখানে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে, আমি খারাপ। আমি যাব না।^{১১১}

মাদ্রাসার কারী বলেছিলেন— বুকখানা সিমারের মতন বটে, মুখখানা তো নয়।^{১১২}—

এই দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির কবলে পড়ে সুখবাস বিভ্রান্ত ও দিশাহারা হয়। সে রেডিওতে গান শুনলে খতিব বলে সে এজিদের বংশের বলেই নামাজের সময় বেয়াদবের মতো গান বাজায়। তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে তার মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসার জন্ম হলেও তার সুরাহা করতে পারে না মূর্খ সুখবাস— মুসলিম দুনিয়ায় সে যে কে, সেই ধন্দের সাফ জবাব কেউ দেবে না।^{১১৩}— এই অবস্থায় মজুবের মগরাহাটের মৌলবী গিয়াসজির মেয়ে

নাবালিকা জাহেদার সঙ্গে বিয়ে হয় সুখবাসের। বিয়ের আসরে দেশজ লৌকিক আচার-
আচরণের পাশাপাশি মুসলমান সমাজের লৌকিক সংস্কার ও লোকাচারের প্রসঙ্গ আছে।
যেমন একটি রসগোল্লার অর্ধেকটা বর সুখবাসকে খাইয়ে বাকি অর্ধেক জাহেদার মুখে
তুলে দেওয়া হয়েছে। ইসলামি পুরাণ মতে, বিয়ের দিন বরের খাদ্যের উচ্ছিষ্ট স্ত্রীকে
খাওয়ালে উভয়ের মধ্যে মহব্বত (ভালোবাসা) বৃদ্ধি পায়। গিয়াস মৌলবী মেয়েকে
সুখবাসের হাতে সাঁপে দিয়ে বলেছিলেন:

খাইয়ে না-খাইয়ে এতদিন সাথে ক'রে আগলে রেখেছি। মানুষ করতে পারিনি। তবে
মেয়ে আমার দশ পারা কুরান কণ্ঠস্থ করেছে। দেহ তার পবিত্র। তার যেন অসম্মান
না হয় সুখবাস বাবাজীবন। জাহেদার নিঃশ্বাসে ফেরেস্তার গায়ের গন্ধ পাবে বাবাজী।
কখনো কোনো যাতনা দিও না। আদর দিয়ে মুহব্বত দিয়ে সুখি করবে, তার বেশি
কামনা করি না। তার জীবনমরণ তোমার হাতে। তার ভালোমন্দ তোমারই হাতে।
তোমারই পায়ের তলায় তার জান্নাত (স্বর্গ)। মা জাহেদা, সুখবাসই তোমার সব মা।
ইহকাল পরকালের সাথী। সুখদুঃখের শরীক। স্বামীর কথা কখনো অমান্য কোরো না।
যখন যা চাইবে, সাথে সাথে পালন করবে। যত কষ্টই হোক, কোনো কিছুতেই না
বলবে না। (হাদিসে আছে উটের পিঠে যেতে যেতে স্বামীর যদি কামনা জাগে, স্ত্রী তা
সেই উটের পিঠেই নিবৃত্ত করবে।) কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলেন না গিয়াসজী।
আটকে গেল। কেন না জাহেদার এখনো সারা বুকে স্ফুট পূর্ণিমা আসেনি। হায়েজ
(মাসিক ঋতুস্রাব) হয়নি। কাঁচা নরম গা। হাড়গুলো পুরোপুরি শক্ত হয়নি। এসব
কথাও তো বলতে হয়। বলতে পারেন না তিনি। কারণ তিনি পিতা। চুপ ক'রে
থাকেন। কিছুক্ষণ পর ফের বলে যেতে থাকেন— যখন যা চাইবে দিতে হবে। তার
সমস্ত ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা। তার ভালো লাগাই তোমার ভালো লাগা। তার দেহই
তোমার দেহ। তার মনই তোমার মন। এক আত্মা, এক প্রাণ।^{১১৪}

গ্রামীণ মুসলিম নারীর সামাজিক যৌন শোষণের দিকটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন
গল্পকার। পাশাপাশি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ মৌলবী সাহেবের উপদেশবলী জাহেদার
জীবনকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর অন্ধকারে। বিয়ের রাতে সুখবাস জাহেদাকে ধর্ষণ করে
এবং জাহেদা মারা যায়। ইসলামি পুরাণে নারীর শরীরকে খেতের সঙ্গে তুলনা করা

হয়েছে। সেখানে নারীর স্বামী ইচ্ছেমতো গমন করতে পারে।^{১৫} অর্থাৎ নারী সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। ভারতীয় পুরাণেও বলা হয়েছে, ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা’— অর্থাৎ পুত্র উৎপাদনের জন্যেই ভার্যা গ্রহণ করা হত। মহাভারত থেকে মনুসংহিতা পর্যন্ত সর্বত্র পুরুষ পরিণত হয়েছে দেবতায়, কিন্তু নারী সেখানে মিথ্যা পদার্থ। কেননা বিবাহের পরেই নারীর কোনো স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য ছিল না। নারী হয়ে যেত স্বাতন্ত্র্যহীন। নারীর দেহ ও মন সবই হবে পুরুষের অধিকৃত। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম খ্রিস্টাব্দ থেকে দেড় হাজার বছর পর্যন্ত যে সব শাস্ত্র রচিত হয়েছিল, তাতে নারীকে নিজের দেহের বা সম্পত্তির ওপর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বারবার বলা হয়েছে, শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্ররা নারীরা রক্ষাকর্তা, নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়; ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহর্তি।^{১৬} বর্তমানের আলোকবর্তিকার যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের প্রভাবে ভারতীয় হিন্দু পরিবারের নারী-পুরুষদের চিন্তাধারা, প্রত্যাশা ও মূল্যবোধের কিছুটা রূপান্তর ঘটলেও গ্রামীণ মুসলিম সমাজের নারীদের জীবন আজও শাস্ত্রের নিয়মাধীন। তাদের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাধীন জগৎ উন্মুক্ত হয়ে গেলেও গ্রামবাংলার মুসলিম সমাজে মোল্লাতন্ত্রের ফতোয়াই শেষ কথা বলে। ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিশ্বাসের বৃত্তের বাইরে এসে নারী-পুরুষ কেউই যুক্তির আলোকে জগৎ ও জীবনকে দেখতে পারে না। বস্তুত অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, তালাকপ্রথা অন্ধকার যুগের (আইহামে জাহেলিয়া) মতোই সেখানে প্রকট। গল্পকার সেই তমসচ্ছন্ন নারী-পুরুষের অসহায় জীবনের ওপরই আলোকপাত করেছেন।

জাহেদার মৃত্যুর পর সুখবাসের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়। সে নিজেকে আরও বেশি করে সিমার ভাবতে শুরু করে। অথচ অচিরেই সেই ঘায়ে প্রলেপ দেন স্বয়ং মৌলবী গিয়াসুদ্দিন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পরাকাষ্ঠা গিয়াস মৌলবী সুখবাসকে খোদার কাছে ‘মাফ চাও’ ইত্যাদি উপদেশ দিয়েছিলেন। সুখবাসও ক্রমশ অনুভব করেছে ‘জাহেদা এক

তুচ্ছ জীব। অমন মৃত্যু কখনো ঘটে না এমন নয়’। এই ঘটনার সাত মাস পর সুখবাসের দ্বিতীয় বিয়ে হয়। দ্বিতীয় বউ ‘মদিনা ছিল জাঁহাজ মেয়ে। তাগড়া। তাজা। পুরুষ্ট আর ভয়ানক যুবতী’। সুখবাসের খালি গা, ফাঁকা বুক দেখে চমকে উঠেছিল মদিনা। সুখবাসের বুক হাত রেখে মদিনা বলেছিল:

লোকে বলে তুমি সিমার। আমার বেহাল কোরো না। মেরো না। পাষাণের তলায় পানি থাকে। আমি জানি। আমি ভালোবাসব তোমাকে। ঘেন্না করব না। সিমারও তো মুসলমান।... তুমি আমাকে ভালোবাসবে তো?^{১৭}

মদিনা সুখবাসের বুক আঙুলের তুলিতে লিখে দিয়েছিল ‘আলিফ লাম মিম’। কোরান-এর প্রথম বাক্য ‘আলিফ লাম মিম’। অথচ মদিনার কথা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে যায় সুখবাসের। সিমারও যে মুসলমান একথা প্রথম শুনল সে। শুনল পাষাণের তলায় ‘পানি’ থাক। এক নারীর কণ্ঠে ভালোবাসার কথা শুনে সুখবাসের অন্তর্গহ তোলপাড় করে। সিমারের সত্তার গভীরে হারিয়ে যাওয়া তার সুখবাস সত্তা জেগে ওঠে। তার মনে অপরাধবোধ জাগ্রত হয়:

আমি সিমার ঠিক কথা মদিনা। লোকের বচন আমাকে সিমারই করেছে। আমি জাহেদার মুখে কাপড় ঠেসে দিনু, কী একটা যে ভর করল গায়ে। একিন হয় তুমার? লরম পাখির পারা মেয়েলোকের পরাণ আমি ঠুকরে খেয়েছি, হায় গো! একিন হয় মদিনা? কাপড় ঠেসে দিনু।^{১৮}

চারপাশের মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কার সুখবাসের ভেতরের অন্তর্দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র করে দেয়। সে আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগতে ভুগতে ‘আপন বুক সজোরে কিল মারতে থাকে। বুকের ভেতর কে যেন ‘হায় হুসেন’ ‘হায় হুসেন’ করছে। সান্ত্বনাহীন আতর্নাদ করছে।’ সুখবাসের সারা শরীরে, মন ও মননে, চিন্তা-চেতনায় সিমার আর কারবালার মরুপ্রান্তর জেগে ওঠে। সুখবাসের সমস্ত চৈতন্যকে গ্রাস করে নিষ্ঠুর সিমার। সুখবাস

বারবার তার ভেতরে জেগে ওঠা সিমার সত্তাকে মুছে সুখবাস হয়েই বাঁচতে চেয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ মানুষের ঠাট্টা, মস্করার ছোবল সুখবাসের হৃদয়ে পুনরায় সিমার সত্তাই জেগে উঠেছে। অন্যদিকে মদিনার বাবা গফুর জোলা অসহনীয় দারিদ্রকে সঙ্গী করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে পরম সন্তোষ আর শান্তি পেয়েছিল। ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ গফুর জোলা একদিন খেয়ালবশে স্ত্রীকে নিয়ে ওপার বাংলায় চলে যায়, আর ফিরে আসেনি। তিনকূলে কেউ ছিল না মদিনার। মদিনা সুখবাসকে বলেছিল, ‘ইহজন্মে আমার আর কেউ নেই গো, তুমি ছাড়া। তুমি ফেলে দিলে কোথাও যাওয়ার ঠাই নাই। আমায় ফেলে দিও না। তুমি যখন যা চাও, যত কষ্টই হোক, আমি দেব’। একথা শুনে সুখবাসের মগ্নস্মৃতিতে মদিনা জাহেদার কল্পরূপে মিশে যায়। কিছুতেই জাহেদার মুখ মনে করতে পারে না সুখবাস। সংসারের ‘তুচ্ছ জীব’ জাহেদা মৃত্যুর পর ঘরে বাইরে মুছে গিয়েছে। এক সময় সুখবাস বুঝতে পারে তার অন্তরালে, আড়ালে আবডালে দাদিমা এবং মদিনা ‘তাকে সিমারই মনে করে। সিমার বলে ডাকে। তাকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করে। গল্প করে। মনে হতো, ভালোবাসে। আসলে ঘৃণা করে। ছোটলোক ভাবে। সহ্য হয় না সুখবাসের। বুকের মধ্যে সত্যিই সেই সিমার, নির্বোধ সিমার জেগে ওঠে।’ আর এরপরেই ক্ষণিকের উন্মাদনায় হঠকারিতার বশে সুখবাস স্ত্রী মদিনাকে ‘তালাক’ দেয়। মিথের চরিত্র ভর করে সুখবাসের চৈতন্যে, সে ক্রমশ তলিয়ে যায় সিমার নামের তলদেশে। মানুষের সংস্কার, বিশ্বাস তার ভেতরের মায়া, প্রেম, স্নেহের সত্তা লুপ্ত করে দেয়। জেগে থাকে শুধু নিষ্ঠুর নির্দয় সিমার। শাস্ত্র বলশালী, আর তার কাছে ধর্মাত্মক মানুষ বড়োই অসহায়। সুখবাসের মুখে ‘তালাক’ উচ্চারণের অব্যবহিত পরেই মদিনা পরনারীতে পরিণত হয়েছে। এখন ‘মদিনার চোখে চোখ পড়লে পাপ হবে। মদিনার কোথাও যাওয়ার ঠাই নাই। মদিনা থাকবে বাড়িতে, সুখবাসের ঘরে। সুখবাস থাকবে জঙ্গলে, অন্যের ঠেকে বা কোথাও। মদিনা আর সুখবাস

সামনা সামনি হওয়া ধর্ম বিরুদ্ধ। তালাকের সাথে সাথেই মদিনার উচিত ছিল বাপের বাড়ি যাওয়া। মদিনা কোথায় যাবে? বাপ কোথায়! মদিনা সুখবাসের ঘরেই আছে’। এদিকে সুখবাস তার হতবুদ্ধির পীড়নে শাস্ত্রজ্ঞান ভুলে যায়, সে পুনরায় মদিনার সঙ্গে সংসার করতে চায়। সুখবাসের বাবা ছেলের কষ্টে সমব্যথী হয়ে ছেলেকে ঘরে ফিরে আনতে চেয়েছে:

ছেলে জঙ্গল থেকে ফিরে এসে ঘরে থাক। মদিনার দায়িত্ব খোদার। যেথা খুশি সে চলে যাক। ভিখিরি হয়ে যাক। বেশ্যা হয়ে যাক। মদিনাকে বাড়ির কেউই আর তেমন আর সহ্য করতে পারে না।^{১১৯}

সুখবাস ও মদিনার বিচ্ছেদের পর সুখবাসের বাবা নিজের সন্তানের জন্যে উদ্ভিগ্ন হলেও মদিনার প্রতি তার কোনোরকম দয়ার উদ্রেক হয়নি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চেহারাটা কাচের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে এখানে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হলেও একদিন গভীর রাতে মদিনা সুখবাসের মাচায় এসে ওঠে। দেহদান করে। কেউ কোনো কথা বলে না। দেহদানের মধ্যেই তো থাকে মানুষের আর এক ধর্মশক্তি। যা কেতাবি ধর্মের চেয়ে গূঢ়। এ কথা মদিনা জীবন ও জৈব প্রাণে অনুভব করে। সে রাত্রির অন্ধকারে পর্দা-হাদিস-কোরান-ঈমান সমস্ত কিছু জলাঞ্জলী দিয়ে অদ্ভুতভাবে নিঃশব্দে পাগলের মতো হেসে ওঠে। মদিনার কোনো গত্যান্তর ছিল না। তার প্রবৃত্তির কাছে সমাজ ও শাস্ত্রের অনুশাসন মূল্যহীন হয়ে যায়। ‘কোনো বিচার থাকে না। সমাজ থাকে না। সে ভাবে, সে তো সিমারের ছেড়ে দেওয়া বউ। বড়ো জোর দোষখের জ্বালানি বৈ নয়’। এইভাবে তিন মাস কেটে যায়। গিয়াস মৌলবী তার ভাইপো ঈশার সঙ্গে মদিনার বিয়ে দিয়ে মদিনাকে ‘হালাল’ করিয়ে সুখবাসের কাছে ফিরিয়ে দিতে চান। ইসলামি শাস্ত্রে ‘তালাক’ দেওয়ার পর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে চাইলে অন্য পুরুষের সঙ্গে সেই নারীর বিবাহ দেওয়ার

নিয়ম রয়েছে।^{১২০} নচেৎ সেই স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সহবাস ইসলামি শাস্ত্রে অবৈধ, হারাম। গিয়াস মৌলবীর দৌলতে ঈশার সঙ্গে মদিনার বিবাহ হয়। পুরুষের হাতে নারীর হস্তান্তর হয়। মদিনার ইচ্ছা-অনিচ্ছা মূল্য হেরে যায় শাস্ত্রের অমানবিক যুক্তির কাছে। আর যৌন লাঞ্ছনার ভাগীদার হয় পুরুষ। বিয়ের পর ঈশা মদিনাকে তালাক দিতে অসম্মত হয়। মৌলবী গিয়াসজী পড়েন দো-টানায়। সাইফুল্লা তার দলবল নিয়ে গিয়াসজী ও নবদম্পতিকে গাড়িতে তুলে দেয়। শুরু হয় নতুন স্বামী ঈশা ও মৌলবী গিয়াসজীকে নিয়ে মদিনার ‘অলৌকিক অপার্থিব মোহগন্ধহীন সুখকর দেশান্তর। এক অদ্ভুত অভিযাত্রা’। এই অভিযাত্রার পথেই গিয়াসজীর নির্দেশে ঈশা মদিনাকে দুই তালাক দেবার পরেই হাজির হয় সুখবাস। সিমার ও সুখবাস— এই দ্বৈত সত্তা খুইয়ে সুখবাস তখন পাগল, উন্মাদ। গিয়াসজী বারবার তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেই সুখবাস উত্তর দিয়েছে, ‘আই ডোন্ট নো’। সমস্ত সত্তা ও চৈতন্য হারিয়ে সুখবাস ট্রাজিক নায়ক হয়েই বেঁচে রইল। অন্যদিকে মদিনা সুখবাসকে ভালোবাসলেও নতুন স্বামী ঈশার জীবনের সঙ্গেই নিজের জীবনকে গেঁথে শোকের চলমান পথে যাত্রা করল। মদিনার করুণ পরিণতি— মানবী থেকে তাকে রপান্তরিত করেছে জড়পদার্থে। দৈহিক কামনার দস্তুর এই অযৌক্তিক রীতি রেওয়াজের কবলে পড়ে নারীর জীবনে কী শোচনীয় অন্ধকার নেমে আসে তা পরিস্ফুট করেছেন গল্পকার। সুখবাসের মুখে ‘তালাক’ উচ্চারণ শোনার পরেই মদিনা বলেছিল, ‘তালাক আসলে পুরুষের হাদীসী অসুখ। হিস্টিরিয়া। দাঁত-খিচুনি বদ-হওয়ার দোষ।’— একজন গ্রাম্য মহিলার এমন শব্দচয়নের দক্ষতা আমাদের অবাক করে। গল্পকার জানিয়েছিলেন, মদিনা লেখাপড়া শিখেছিল স্কুলে। মদিনার স্পর্ধিত ‘হিস্টিরিয়া’ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে গ্রামীণ নারীর প্রতিবাদী স্বর। এরপরেও অবৈজ্ঞানিক প্রথা ও

যুক্তিহীন মিথের বলি হয়ে নারী-পুরুষ উভয়েরই জীবন এসে ঠেকেছে অন্ধকারের তলানিতে। সেখানে থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পায়নি কেউই।

ইতিহাস যখন ধর্মীয় বিশ্বাসের বৃত্তে বড়ো হতে হতে মিথের আকার নেয় এবং সেই মিথনির্ভর সংস্কৃতি ধর্মভীরু জনমানসের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তৈরি হয় বিড়ম্বনা। মানুষ লজিক বা যুক্তির তোয়াক্কা না করে অন্ধবিশ্বাস ও গডডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে বিজ্ঞান ও ইতিহাসকে অস্বীকার করে ক্রমশ তলিয়ে যায় অসত্যের অন্ধকারে। সেই কঠিন সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন গল্পকার এই গল্পে।

‘কাসীদ’ গল্পে আছে কারবালা, মরম ও শিয়া-সুন্নির দ্বৈরথ-এর প্রসঙ্গ। কারবালা ইতিহাস হলেও, কারবালার ইতিহাসের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি কিংবদন্তি-মিথ রূপে মুসলিম সমাজের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে। কাসীদ শব্দের অর্থ হল— বার্তাবাহক বা পিয়ন। গঙ্গা ওরফে ভাগীরথীর দু’পারে এক অদ্ভুত শিয়া-সুন্নির বিভেদ-মিলনের পারাপার। ওপার থেকে পালিয়ে আসে খুনের আসামি কাশেম। কাশেম ফেরারি। এ পারের নৈনিহাল কাশেমের বন্ধু। নৈনিহাল শিয়া এবং কাশেম কোরেশী। কাশেমের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় স কিনার। এই গল্পে শিয়া-সুন্নির সেই বিভেদ-সংঘর্ষের ছবি আছে। গল্পকার অতীত ইতিহাস ও পুরাণকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে নির্মাণ করেছেন। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, হাসানের পুত্র কাশেম ও হোসেনের কন্যা সখিনার বিবাহ হয় এবং বিয়ের দিনই কারবালার যুদ্ধে কাশেম শহীদ হয়। এই গল্পেও অতীতের সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ইতিহাসের জীবন উঠে এসেছে বাস্তবের ভিটায়।

এ গল্পের কাশেম নিজের জ্ঞাতি ভাইকে খুন করে পালিয়ে আসে এপার বাংলায়। তার শরীরে-মনে ছিল খুন করার নেশা। ‘নিজেকে খুন করার, রক্ত ঝরানোর নেশা’। আর

এই নেশার ঘোরেই কাশেম হজরতকে পায়, ফতিমাকে পায়, এজিদকে দেখতে পায়। এখন কাশেম লহর নিশানায় দেখতে পাচ্ছে সকিনাকে। কাশেমের মুখে খুনের ঘটনা শুনে ভয় পায় সকিনা। সকিনার মনে পড়ে অতীত ইতিহাসের সেই বিষাদ গাঁথা। ‘কারবালার যুদ্ধের গোড়ায় তো সেই নারী। জ্ঞাতি দ্বন্দ্বের নামই তো জিহাদ’— সেই কথা স্মরণ করে ব্যথিত হয় সকিনা। এজিদের পিতা মোয়াবিয়া ছিলেন হজরত মহম্মদের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। হাসানের স্ত্রী জয়নবের রূপজমোহে মুগ্ধ হয়ে এজিদ কৌশলে হাসানের দ্বিতীয় স্ত্রী জাহেদাকে দিয়ে বিষপান করিয়ে হাসানকে হত্যা করে। এরপরেই হাসানের ভাই হোসেনের দলের সঙ্গে এজিদের যুদ্ধ বাঁধে কারবালার প্রান্তরে। এক সপ্তাহ আগে মহরম ছিল। সেখানে লাঠি খেলেছিল কাশেম কোরেশী। তা দেখে কাশেমের বন্ধু নৈনিহাল কাশেমকে বলেছিল:

শিয়ারা লাঠি খেলে না। মাতম করে। মর্সিয়া গায়। কালো পোশাক পরে। মহরম মাসে খালি পায়ে হাঁটে। এই মাসে বিয়ে শাদী করে না। তুই কি সুন্নীর বাচ্চা রে কাশিম? সন্দ হয়, তুই কোরেশী না। তুই ভড়ের বাঙাল। নশীপুরের ছেলে বলেছিলি, এখন দেখছি সেইডে বুঠবাত। তুই রাঙা জামা পিন্ধেছিস, পাট্টা পাজামা, পায়ে সস্তা নাগরা, গলায় বেঁধেছিস রঙিলা রুমাল, আহা! পারিস তো গা কেটে দেখা, তুই শিয়ার ঝাড়। মাতম দে উন্নত। মাতম দে। শালা শোগে মরে না ভোগে মরে, বাধেগৎ সুন্নীর পোনা! মহরম মাসে শাদীর আলমতলায় গাঁট বাঁধবি শালা। আমি ঘোড়া নাচব বলেছিলাম, দুলাদুলির নাচ, তোর শাদীর বাসরে, ছেঃ! আমি থুথু মারি তোর ইয়েতে! শালা ছলিয়াবাজ এজিদ। লাগা লাগা, লাঠি খেলে যা, কী করবি দোস্ত! দুঃখু হয়!^{১২১}

এই লাঠি খেলাও যেন ইতিহাসের কারবালার মতোই নারীঘটিত। সকিনার কাছে হিরো সাজার বাসনা। সকিনাও কাশেমের বানা পাটায় বিজলিঘাত দেখে বুক ফুলিয়ে মঞ্জিল মাটি দিচ্ছে। কারবালার যুদ্ধ থেকেই মঞ্জিল মাটির উৎসবের সূচনা হয়েছে। মহরমের দিন শিয়ারা নকল কবর দেওয়ার অভিনয় করে, কারবালার যুদ্ধের শেষে

যেমনভাবে শহীদদের কবরস্থ করা হত। একে গোর-পর্ব বলা হয়। প্রতীকী শোলা-কাগজের টুকরো গুলো কবরে পুঁতে দেয় শিয়ারা। এই কবর অনুষ্ঠানকেই বলে মঞ্জিল মাটি।^{১২২} কাশেম সকিনার মঞ্জিল মাটি দেওয়া দেখে বীরোচিত উল্লাস ও শোকের বিকারে ছোরা লাঠি খেলতে খেলতে নিজেকে রক্তাক্ত করে ক্রমশ। শেষে অসাবধানে এমনভাবে সে ছোরা মেরেছিল বুকে, তা আর বের করতে পারেনি। এমতাবস্থায় আহত তৃষ্ণার্ত কাশেম জল চেয়েছিল বন্ধু নৈনিহালের কাছে। নৈনিহাল জল দেয়নি। কারবালার যুদ্ধে জলের অভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল হোসেনের সন্তান ও তার সমর্থকদের। এ গল্পে কাশেম পৌঁছে যায় প্রেমের কারবালায়:

এ-কেমন কাফেরার দেশ গো। জহর মিলে পানি মিলে না।

সুন্নীদের জারিকণ্ঠ পেছনে শোনা যায় ভাসছে। কাশেমের তেষ্টা পায়। ধীরে ধীরে জুলুস ভাগীরথীর মঞ্জিল মাটির গোরস্থানের দিকে এগিয়ে যায়। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যায় কাশেমের। দোস্তকে বলে— এক ফোঁটা পানি দোস্ত, আর পারছি না!

— এই জুলুসে পানি কোথায় দোস্ত। তিয়াসা লাগলেও পানি তো পাবে না। পানি হারাম।

— না। আমাকে এক জরা দাও নৈনিহাল।

— পাবে না। এ হ'ল মরুভূমি। সামনে ফোরাতে চলো।

— জুলুসের মানুষ তো কাফের নয় নৈনিহাল।

— কে বলেছে কাফের নয়। এই জুলুসে সব আছে। সব রকম। এখন আমরা কুফা নগরী পার হচ্ছি ভাই। এই যে লাঠি খেলা খেলছে সুন্নীরা দ্যাখো দ্যাখো। কার সাথে কার খেলা বল তো? কে এজিদ আর কে হোসেন লেখাজোখা আছে?

— পানি দাও ভাই নৈনিহাল, ছোরা চালাতে পারছি না।

— শহীদের দর্জা কি সহজ? চালাও। সামনে তো ইউফ্রেটিস টাইগ্রিস। হা হা হেসে ওঠে নৈনিহাল মির্জা। সেই হাসি কি বিষাক্ত। সকিনা কিছুই দেখছে না।^{১২৩}

জীবনের তাড়া খেয়ে কাশেমের প্রাণ প্রেমের কারবালায় ছটফট করে। কার সঙ্গে কার খেলা— গুলিয়ে ফেলে সে। অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে এক ধাঁধা ও অস্বস্তির অতলান্তে

তলিয়ে যায় কাশেম। সে অনুভব করে আত্মকামের বশে নিজের সঙ্গে নিজেরই খেলা চলছে তার। প্রেম ও হত্যার কারবালার ইতিহাস বর্তমানের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। ফেরারি কাশেম লিজেন্ডের চরিত্রের মতো প্রতিভাত হয় বর্তমান পটে। ইতিহাস ও মিথ-পুরাণের কারবালা মিশে যায় ভাগীরথীর মোহনায়।

গল্পকার ইতিহাসের বাস্তবতা ও কারবালা থেকে উৎসারিত মিথ-কিংবদন্তি-উৎসব-অনুষ্ঠানকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে নির্মাণ করে কোন বার্তা দিতে চাইলেন! এ গল্পের শিয়া নৈনিহাল যেন এজিদ ও কোরেশী কাশেম হোসেন। এবং জয়নবের মতো সাকিনার ট্রাজিক পরিণতি!— প্রেমের বা কামনার ত্রিভুজের এই আখ্যান বিন্যাসে গল্পকার যেন কাশেমকে অ্যান্টিহিরো হিসেবে দেখছেন? এজিদের পক্ষকেই সমর্থন করছেন! সময়ের স্রোতে ইরাকের মরুপ্রান্তর থেকে ভেসে আসা জ্ঞাতি-নিধনের আখ্যানকে অন্য চোখে দেখতে প্রণোদিত করছেন আমাদের। আর আদিমজীবনের ধারা বেয়ে সেই নারীর জীবন-ই হয়ে উঠেছে একাকিত্ব ও স্বজনহারা কারবালার বিষাদ সংগীত।

মুর্শিদাবাদের লালবাগ অঞ্চলকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে ‘পথ’ গল্পের ঘটনা। এ গল্পের মুখ্যচরিত্র খোদাদিল টাঙাঅলা। সবাই তাকে ঘোড়াদিল বলে ডাকে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের জীবন ও পরিবেশ বদলে যায়। স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী শক্তির দৌলতে-আধিপত্যে ঘোড়ার গাড়ির প্রয়োজন একসময় কমে যায়। অন্যদিকে লাল রাস্তা কালো হয়। মোরাম থেকে পিচ হয়। আর সে রাস্তার বুকে বয়ে যায় নতুন নতুন যানবাহন। খোদাদিলের বাড়ির উপর দিয়ে বয়ে যায় পিচের রাস্তা। এই ঘোড়াতে করেই তো হোসেন এজিদের বিপক্ষে কারবালার যুদ্ধ করেছিল। ‘প্রকাণ্ড জং-এর কারবালা তিয়াসা আর লহু, রক্ত আর পিপাসা, আসমানের নিহরে ভিজে গেছে অশ্বের কেশর, ঘামে ভিজে উঠেছে

ঘোড়ার পেট, ঘোড়ার নিঃশ্বাসে-শ্বাসে ঝরেছে জরিণা কি আসগরের শোক!— এই পথই তো খোদাদিলের জীবন। পথ আছে বলেই তার ঘোড়া আছে, সে আছে। পথটা কাঁচা ছিল, মোরাম পড়ে হটরমটর লাল হল তাতে খোদাদিলের সুবিধাই হয়েছিল। অথচ এই লাল রাস্তাও একদিন কালো হয় প্রগতির হাত ধরে কালের নিয়মে। খোদাদিল, তার ঘোড়া ও পথ— সমস্ত কিছুর রঙই কালো। যেন অন্ধকারময় এক উষর কারবালা। খেটে খাওয়া টাঙাঅলা মানুষের জীবনটা এক অর্থে যুদ্ধক্ষেত্র। খোদাদিল প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে প্রবৃত্তির সঙ্গে, সংসারের সঙ্গে।

এইভাবে লাল পথ কালো হয়ে এগিয়ে আসতেই খোদাদিলের আঙিনায় ঘোড়ার গাড়ি-রিকশা পেরিয়ে সে পথে নামে মজুমদার বাবুদের আর্মি জিপ। সেইসঙ্গে নন্দবাবুদের ট্রেকার। খোদাদিল কাজ হারায়। বেকার অর্থনৈতিক অসচ্ছল জীবনের দুর্বিপাকে জড়িয়ে পড়ে সে। রাস্তার উন্নয়নের সঙ্গে খোদাদিলের রোজগারে ভাটা পড়ে। সে প্যাসেঞ্জার পায় না। এ পথেই আর্মির জিপে চাপা পড়ে মারা যায় খোদাদিলের ছোট মেয়ে নুরি। নুরির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খোদাদিলের জীবনযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে— ‘কারবালা খতম’ হয়। যুদ্ধের শেষে চিহ্নায়ক হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিন্নভিন্ন দেহ এবং রক্তাক্ত লাল পথের চিত্র ফুটে ওঠে। খোদাদিলের উঠোন ভিজে যায় নুরির রক্তে। ‘এখন আর পথটাকে উঠোন মনে হয় না। উঠোনকে পুরোপুরি পথ ঠাহর হয়। সংসারকেও মনে হয় পথ। পথকে মনে হয় অজগর। নুরির কচি মুখটা বারবার মনে পড়ে যায়’। কারবালার যুদ্ধে ঘোড়াই ছিল কাসীদ (বার্তাবাহক)। আর এ গল্পে টাঙাঅলার কাজ ছেড়ে খোদাদিলের মনে হল:

জীবন এই পথের উপর একটি চমৎকার ঘোড়া নাচ। নুরির সঙ্গে নাচত বাঘমণ্ডা। চারিদিকে তারই ছায়া তাকে ঘিরে ধরেছে। রাস্তার উপর কোমরে দুলদুলির ঘণ্টা বেঁধে দাঁড়াল খোদাদিল। পায়ে বাঁধল ঘোড়ার ঘুঙুর। হাতের তাগায় ছোট ছোট ঘণ্টা, গলায়

পরল গাঁদার মালা। মসজিদে সিজদা দিল মুনশি। পথের উপর দাঁড়িয়ে ভাবল, পথের শেষ কোথায়? কোথায় বা শুরু? তার পথটা কি কারবালায় গিয়ে শেষ হয়েছে?^{১২৪}

গ্রামের বিভিন্ন লোকের মানত মাথায় নিয়ে কাসীদ চলে যায় লালবাগের কারবালায়। সঙ্গে মেহেদি আর জুলুয়ার (শুভদৃষ্টি) বার্তা— কাশেম-সকিনার মতো আজই যেন বিয়ে হয়েছে তার সোনাভানের সঙ্গে। কারবালার সংবাদবাহক অশ্বের মতো খোদাদিল তার গতি শিথিল করে না। এ যেন কারবালার হোসেনের নাছোড় লড়াইয়ের অন্তিম ইঙ্গিত। দুর্বল দেহ নিয়ে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় খোদাদিল এগিয়ে চলে কারবালার পথে— খোদাদিলের ‘চোখে পথের একটি আশ্চর্য ক্ষুধা জ্বলতে থাকে’। খোদাদিল টাঙাঅলার জীবনের সঙ্গে মরুভূমির কারবালা একাকার হয়ে যায়। হোসেনের মতো বীরের আত্মাহুতি মিলে যায় খোদাদিলের যাত্রায়। আবুল বাশার এই গল্পে ইতিহাস ও মিথ-পুরাণের কারবালার সঙ্গে সাম্প্রতিক প্রেক্ষিত ও গ্রামীণ জনমানসের ব্যক্তিজীবনের সমস্যা-সংকটকে মিশিয়ে দিয়েছেন অপূর্ব শৈল্পিক দক্ষতায়।

শাস্ত্রীয় আইনকানুন ও পৌরাণিক বিশ্বাসের কাছে সাধারণ মানুষ বারংবার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। শাস্ত্র বলশালী, শাস্ত্রের অদ্ভুত অযৌক্তিক ক্ষমতার কাছে গ্রামীণ প্রতিবেশের মুসলমান নর-নারী নিরুপায়। যখন শাস্ত্রের রক্ষাকবচ থাকে ধর্মের ধ্বজাধারী শরিয়তপন্থী গোঁড়া মানুষের হাতে, তখন সেই শাস্ত্রের নিয়মপ্রণালীর আবর্তে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ধরাশায়ী হয় মানুষের বিবেক ও বিশ্বাস। তখনই হয় স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য। নারীর জীবন পর্যবসিত হয় ‘অবমাননাকর লজ্জায় লজ্জিত চমকপ্রদ কিসসায়’। ‘নাস্তিক’ গল্পের মধ্যে দিয়ে গল্পকার গ্রামীণ মুসলিম সমাজজীবনের সেই অন্ধকার দিকের কথাই তুলে ধরেছেন। এ গল্প শাস্ত্রের কাছে হেরে যাওয়া মানুষের নিঃসঙ্গ ও নৈরাশ্যতার বয়ান।

এ গল্পের কথক মামুন। ধর্মের নামে, শাস্ত্রের নামে মোল্লার দল নারী-পুরুষের জীবনকে যেভাবে করে তুলেছে নাটকীয় তার বৈপরীত্যে অবস্থান করেও মামুন ছাড় পায়নি। নাস্তিক হয়েও মামুন শাস্ত্রের অযৌক্তিক আইনের অনিবার্য অংশীদার হয়ে গেছে। গল্পের শুরুতেই কথক শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে জানিয়েছে:

ধন্যবাদ হে অমর হাদিস, ধন্যবাদ বিশ্ব-কুরান! হে মৌলভী মৌলানা, হাফ মোল্লা, ফুল মোল্লা আপনাদের সকলকেই হাজার শুকরিয়া।

ধন্যবাদ এইজন্যে যে, এ কাহিনির আসল স্রষ্টা তো আপনারাই— আপনাদের মছলা মোতাবেক, শলা-সওয়াল-মাফিক যতদূর সম্ভব আমি এই কাহিনির কথকতা করছি মাত্র।

ভাগ্যিস আমি ধর্মে মুসলমান, আমার পিতামাতা মুসলমান, হামিদুল এবং রাবেয়া, তারাও তো মুসলমান, তাদের পিতামাতাও পরহেজগার সুন্নী, অতএব এ গল্প এই শর্ত ছাড়া কোনোভাবেই শুরু হতে পারত না।

আমি যদি হতাম হিন্দু, রাবেয়া যদি হতো শর্মিলা, হামিদুল যদি হতো নির্মল কিম্বা অনিমেঘ— তবে কি এ কাহিনী সৃষ্টি হতে পারত?

কস্মিনকালেও আর যাই হোক, রাবেয়াকে নিয়ে তিন মাস আমি যে ঘর করলাম, তা কি সম্ভব হতো?^{১২৫}

গল্পকথক কটাক্ষের সুরে শাস্ত্রের গোঁড়া অংশে আঘাত করেছে। অমর শাস্ত্রের অমোঘ আইন কে খণ্ডাতে পারে! শাস্ত্রের ধ্বজাধারীরাই তো এই কাহিনির স্রষ্টা। সেই কাহিনিই শুনিয়েছে নাস্তিক মামুন। মুসলমান সমাজের একজন হয়ে মামুন অনুভব করেছে সমাজের নারীজীবনের অসহায়তার কথা। উনিশ শতকের নবজাগরণ বাংলার সমাজে-সাহিত্যে প্রভূত আলোড়ন তুললেও তাতে মুসলিম সমাজের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের হাত ধরে যেভাবে হিন্দু সমাজের সংস্কার হয়েছিল, মুসলিম সমাজের গায়ে নবজাগরণের তেমন আঁচ লাগেনি। একদিকে ঐতিহ্যের প্রতি পিছুটান, অন্যদিকে আধুনিকতার হাতছানি। সনাতন বুদ্ধিজাত মানুষদের সঙ্গে

প্রগতিশীল মানুষদের তর্ক। হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যকার বিরোধ, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর উদ্ভব, খ্রিস্টান মিশনারীদের দৌরাভ্য, বাংলা গদ্যের সূচনা, ছাপাখানা বা মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা— এতকিছুর মাঝেও নারীর সামাজিক অবস্থান বদলায়নি। উনিশ শতকের সমাজ ছিল মূলত পিতৃতান্ত্রিক। শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্ররা ছিল নারীর রক্ষাকর্তা। নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা ব্যক্তিত্বের বোধ গঠন করতে দেয়নি সমাজ। জন্মের পরেই বিবাহ, স্বামী মারা গেলে সহমরণ। কৌলীন্য প্রথার কুপ্রভাব বাংলার সমাজে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল তা থেকে নারীদের মুক্তি পেতে কেটে গেছে কয়েক শতাব্দী। উনিশ শতকের সমাজে নারীদের লেখাপড়া তো দূরে থাক, লেখাপড়া শিখতে চাওয়াটাই ছিল প্রবল অপরাধের। গোটা উনিশ শতক জুড়ে যে সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল মূলত নারীশিক্ষা ও নারী সমাজের সার্বিক প্রগতি। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বঞ্চিত নারীর অবস্থান ছিল পরিবারের অন্তরমহলে। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতোই নারী বাইরের আকাশে পাখা মেলায় জন্যে ডানা ঝাপটাত, নারী পায়নি মুক্তির স্বাদ। সমাজের বিভিন্ন সংস্কার ও নানান অযৌক্তিক প্রথার বিরোধিতা করে কেউ কেউ নারীদের অন্তরমহল থেকে বের করে এনেছিলেন। নারী নির্মাণ করতে পেরেছিল তার নিজস্ব চিন্তা ভাবনার পরিসর। অথচ সেই পরিবর্তনের ঢেউ মুসলিম সমাজে ততটা জোয়ার আনতে পারেনি। বিশ শতকের শুরুতে বেগম রোকেয়ার মতো নারীরা মুসলিম সমাজের গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজের গায়ে আঘাত হানার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক ভাবনার বিস্তার মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের উন্নতি হয়নি। কেননা মুসলমান সমাজের জ্ঞানচর্চা মিথ-পুরাণ নির্ভর সংস্কৃতি ও ধর্মকেন্দ্রিক পুস্তকের মধ্যেই আনাগোনা ছিল। ধর্ম পরিচয়কে গৌণ করে বাঙালিসত্তার জাগরণ ঘটেনি। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অসম্মত হওয়ার ফলে ধর্মীয় জাত্যাভিমান ও ধর্মীয় গোঁড়ামিই মাথা চাড়া দিয়ে

উঠেছিল। পাশাপাশি শাস্ত্রের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে জীবনকে পরিচালিত করতে গিয়ে নারীর জীবন হয়ে উঠেছিল বিপন্ন। আর সেই ধারা বয়ে চলেছে বর্তমান সময়েও। আজও গ্রামবাংলার সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মৌলবীরা। ইসলামি শাস্ত্র ও মোল্লাতন্ত্রের দাপটে নারীর জীবনে কোনো সদর্থক পরিবর্তন আসেনি। এই রক্ষণশীল গোঁড়াপন্থী সমাজেরই বহুমাত্রিক সমস্যাকেই প্রতিফলিত করেছেন গল্পকার। গল্পের কথক গ্রামীণ মুসলমান সমাজের ধর্মাত্মতা ও নারীর সামাজিক যৌন শোষণের কথাই অকপটে বিবৃত করেছে পাঠকের সামনে। ধর্ম স্বাধীনতার চেয়ে ধর্মীয় অস্তিত্বই যখন বড়ো হয়ে ওঠে মানুষের কাছে তখন মানুষ কেমন পাপবুদ্ধির গোলোকধাঁধায় নিমজ্জিত হয় সেই কাহিনিই গুনিয়েছে কথক।

আখ্যানের শুরুতেই দেখা যায়, এক বর্ষার সন্ধ্যায় গাজিপুুরের শিকদারের ছেলে হামিদুল, হামিদুলের স্ত্রী রাবেয়া, রাবেয়ার ভাই রুস্তম ও মৌলবী সাহেব মামুনের ভাড়া বাড়িতে আসে আচমকা। হামিদুল হঠকারিতার বশে তালাক দিয়েছে রাবেয়াকে। মৌলবী সাহেব রাবেয়ারকে মামুনের হেফাজতে রাখতে এসেছেন। মামুনের সঙ্গে রাবেয়ার বিবাহ দিয়ে রাবেয়াকে ‘হালাল’ করিয়ে হামিদুলের কাছে ফিরিয়ে দিতে চান মৌলবী সাহেব। হামিদুল মামুনের ছোটবেলার বন্ধু, সহপাঠী। যৌবনের প্রথম বেলায় দুই বন্ধুই মনেপ্রাণে ভালোবেসেছিল রাবেয়াকে। অথচ অর্থ-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার জোরেই রাবেয়াকে বিয়ে করেছিল হামিদুল। অন্যদিকে কলেজের অধ্যাপনার কাজ পেয়ে শহরে চলে আসে মামুন। অন্যের স্ত্রীকে নিজের হেফাজতে রাখার কথা শুনেই শিক্ষিত সংবেদনশীল যুবক মামুনের রুচি ও সুস্থ সংস্কারের বৃত্তিবোধে চূড়ান্ত ঘা লাগে। শাস্ত্রের এই একতরফা আইনকানুন শুনে মামুনের চৈতন্যের ভূ-ভাগ জোর প্রকম্পনে আন্দোলিত হয়। রাবেয়ার শুকনো সজল চোখমুখ দেখে হামিদুলের প্রতি একরাশ ঘৃণা জন্মায় মামুনের অন্তর্সত্তায়। অমানবিক ও

যুক্তিহীন তালাক প্রথার কবলে পড়ে এক পুরুষের হাত থেকে আর এক পুরুষের হাতে, নারীর এই হস্তান্তর— এসব দেখে মার্জিত যুবক মামুনের অন্তরাত্মা শিউরে উঠেছিল। মামুনের বারবার মনে হয়েছিল, ‘নিজেকে যদি মুসলমান বলি, এর চেয়ে লজ্জাজনক পরিচয় সভ্য মানুষের কাছে আর কিছু নেই’। ধর্মীয় পরিচয়ের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানিয়েছে নাস্তিক মামুন। ধর্মশাস্ত্রে ঘোর উল্লাসিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষাদীক্ষায় লালিত যে মানুষ, তার জন্যে এ রকম শাস্তি আর হাদিসি জুলুম যে কত পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে পারে সেই মানবতাক্ষরী প্রসঙ্গ উঠে এসেছে খতিব সাহেব ও মামুনের কথোপকথনে:

আজ যে হাদিস আদিমযুগের কুসংস্কারের ডিপো হয়ে উঠেছে, তার নিগড়ে আধুনিক সভ্য-মন বাঁধা পড়তে পারে না। অথচ এ বাঁধন আজ অক্টোপাসের মতোই আমাকেও জড়িয়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। কেমন ভয় পেয়ে আমি সহসা গর্জে উঠলাম, এ যে সাংঘাতিক পাপ! প্রচণ্ড ভগ্নমি খতিব সাহেব।

হামিদুল বললে নিচু স্বরে, হ্যাঁ, আমি ভগ্ন মামুন! এ তো আমারই পাপ। তুই প্রায়শ্চিত্ত করে দে ভাই!

খতিব সাহেব বললেন, হামিদের পাপ, তোমার পুণ্য মামুন।

শুধালাম, আর রাবেয়ার কী?

বললেন, তার দুর্ভাগ্য! বদনসিব!^{২৬}

আদিমযুগের সংস্কার ও পুরাকালের বিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তমনা মানুষের চিন্তা-ভাবনার দ্বন্দ্ব-সংঘাত আবুল বাশারের লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে। আর গল্পকার দেখিয়েছেন বলশালী শাস্ত্রের কাছে এই মুক্তমনা মানুষেরা কীভাবে হেরে যায় বারংবার। যুক্তিবাদী মানুষদের প্রতিবাদের নিশান চাপা পড়ে যায় সংস্কারগ্ৰস্ত মানুষের বোধের কাছে। অন্যদিকে নারীর আত্মতাবোধ থেকে ভাষা উঠে এলেও সমাজ তার মূল্য দেয় না। ‘মানুষের ভাষা অনুভূতিপ্রদেশ থেকে আলো’ আনলেও পৌরাণিক বিশ্বাস ও শরিয়তি আইন-কানুনের অন্ধকার বেড়াজালে তা অবরুদ্ধ। ছেলেবেলায় মামুন, হামিদুল ও রাবেয়া বর-

বউ-শ্বশুর সেজে খেলা করত। কোনোদিন মামুন বর সাজত রাবেয়ার, কোনোদিন বর হত হামিদুল। ছেলেবালার সেই তুচ্ছ খেলার লাগাম থাকত হামিদুল ও মামুনের হাতে। যখন ইচ্ছে খেলা সাজ করত তারা। আজ শিক্ষিত অধ্যাপক মামুনের মনে হয়েছে, ‘কেতাব কুরান, হাদিস-পুথি, কলেমা-কলম সবই ওই খেলারই নিমিত্ত মাত্র’। শাস্ত্রের ধ্বজাধারী খতিব সাহেবদের এই ‘নিমিত্ত’-এর জোরেই মুসলমান সমাজ টিকে আছে। এ কথার প্রতিবাদ করে গভীর প্রত্যয় নিয়ে মামুন বলেছিল:

টিকে নেই। জোর করে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। একদল মোল্লাগাজি মৌলানার খেয়াল আর স্বার্থপরতার হাতে ঐ নিমিত্তকে সুবিধাবাদের অস্ত্ররূপে তুলে দেওয়া হয়েছে। হজরতের ধর্মে আজ আর প্রাণ নেই খতিব সাহেব! আপনারাই তার গলা টিপে নিঃশেষ করেছেন। প্রাণটা উবে গেছে, এখন শিকলটাই পড়ে আছে, আজ মানুষ সেই শিকলেরই স্তবগান করছে, অনুশাসন আর বাইরের প্রথা-কানুন, তার জোরেই সে গাজীপুর থেকে এই দুর্যোগের রাতে দুটি নরনারীকে আপনারা এতদূর ছুটিয়ে এনেছেন।^{১২৭}

শাস্ত্রের নামে অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক প্রথার নামে মানুষের জীবনকে শূন্যতার গর্ভে তলিয়ে দিতে উদ্যত মোল্লাদের মুখোশ খুলে দিয়েছে নাস্তিক মামুন। তালাক এবং তালাকের পরেই ‘ইদ্দৎ পালন’— একরৈখিক নিয়মে শাস্তি কেবল নারীর। মূলত একটি বৈধ নারীজীবনকে পতিতাবৃত্তির পাঁকে নিক্ষেপ করা। পুরুষ এখানে হুকুমদাতা। মামুন যুক্তিবাদী মন নিয়ে শাস্ত্রের এই অংশের বিরোধিতা করলেও সেখান থেকে নিস্তার পায়নি। তালাক-প্রথা নারীর জীবনে কত বড়ো অভিশাপ কত বড়ো ট্রাজেডি তা তুলে ধরেছেন গল্পকার রুস্তমের কথনে:

মানুষ আপন দোষে নিজের দুঃখ নিজেই বয়ে আনে। এই তার আসল ট্রাজেডি। মুসলমানের তালাকের মধ্যে পুরাতন সেই গ্রীক ট্রাজেডির একটা পাকা রস রয়েছে— চরিত্রের চোরা দুর্বল ছিদ্র পথ ধরে অদৃশ্য জীবাণুর মতো সেই ট্রাজেডির অনুপ্রবেশ

ঘটে। আমি এ কথা অনেককেই অনেকদিন বোঝাতে চেয়েছি। যাই হোক। সেই এক
ট্রাজেডির বোঝা আমরা আজ তোমার কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাই, প্রফেসর!^{১২৮}

শরিয়তি বিধানের কারণে নারী-পুরুষ উভয়েরই জীবন ট্রাজেডির অতলান্ত গভীরে
তলিয়ে যায়। খতিব সাহেব রাবেয়ার সঙ্গে মামুনের বিবাহ দিয়ে রুস্তম ও হামিদুলকে
সঙ্গে নিয়ে গাজীপুর ফিরে যান। যাবার আগে খতিব সাহেবের কড়া নির্দেশ ছিল, বিয়ে
হচ্ছে চুক্তি, সোসাল কনট্রাক্ট। নর-নারীর যৌন সম্পর্কের বৈধতাকে স্বীকৃতি দেয় এই
চুক্তি। এই চুক্তির নাম নিকাহ্। এই চুক্তির জন্যে ছেলেদের দেনমোহর দিতে হয়। তিনমাস
দশ দিন পর রাবেয়ার ইদ্দৎ পালন খতম হলে খতিব সাহেব নিয়ে যাবেন রাবেয়াকে।
তিন মাসে এক এক করে তিন তালাক দেবে মামুন। আর হামিদুল বন্ধুকে জানিয়েছিল
তার নিঃসঙ্গতা ও যন্ত্রণার কথা। ছেলেবেলায় হামিদুল পেয়ারা পেড়ে মামুনের হাতে দিয়ে
খেতে নিষেধ করত। হামিদুল না বলা পর্যন্ত মামুন পেয়ারা খেত না। আজ হামিদুলের
সেই পেয়ারার কথাই মনে পড়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ হামিদুল স্ত্রীকে দেখেছে
ফলের ‘মেটাফর’ হিসাবে। এসব শুনে হামিদুলের প্রতি একরাশ ঘৃণা উগরে দিয়েছে
মামুন। নারী যে মানুষ, সে যে পেয়ারার মতো ভোগ্য নয় তা স্বরণ করিয়ে দিয়েছে মামুন।
হামিদুলদের মতো ধর্মান্ধ মানুষ নারীর ব্যক্তিত্বকে পায়ে ঠেলে তাকে ভোগের সামগ্রী
রূপেই দেখে।

এরপর শুরু হয় মামুন ও রাবেয়ার অস্থায়ী দাম্পত্য। সামাজিকভাবে স্বামী-স্ত্রীর
পরিচিতি নিয়েই দুজনের জীবনের নতুন পর্ব শুরু হয়। অথচ কেউই কারও কাছে আসতে
পারে না, দুজনেই দিশাহীন উত্তেজনা, বিহ্বল আত্মপীড়ন অনুভব করে। সাধারণত
অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের ধর্মীয় কুসংস্কারলালিত জীবনে প্রত্যহ যে নাটক অভিনয় হয়,
সেই নাটকের নায়ক-নায়িকা হয়ে ওঠে মামুন-রাবেয়া। হামিদুলের পাপ দণ্ড করে

দুজনকেই। কেউই স্বস্তিকর জীবনে ফিরে যেতে পারেনি। অপ্রাপ্তির ব্যথায় গুমরে মরেছে। যে রাবেয়াকে একদিন বয়ঃসন্ধির বয়সে মনে মনে কামনা করেছিল মামুন, তাকে স্ত্রী রূপে পেয়েও সেই স্মৃতিরই দংশনে পীড়িত হয়েছে। রাবেয়া মামুনের সান্নিধ্যে পেয়েছিল ক্ষণিক শান্তির নিশানা। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনকেই আরও সুন্দর ও সহজ করতে চেয়েছিল রাবেয়া। অথচ রাবেয়া তার ভালোবাসার তলদেশে তলিয়ে গেলেও গহনে নামতে ভয় পায়, দম আটকে আসে তার। স্বপ্নেই তাদের অভিযাত্রা। এক দমবন্ধ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রাবেয়া ইসলামিক সমাজব্যবস্থা, পৌরাণিক বিশ্বাস ও শরিয়তি আইন-কানূনের দিকে আঙুল তুলেছে সাহসী ও নির্দিধায়:

জীবন মানেই কোনো না কোনো গল্পের পাঠ। প্রত্যেক মুসলমান নারী-জীবন এক একটি উপন্যাস। শরৎবাবু লিখেছিলেন, হিন্দু বিধবাদের নিয়ে, তেমন কেউ নেই, যিনি আজকের তালুক নিয়ে লেখেন, মুসলমান মেয়েদের অন্তর্বেদনার ছবি আঁকেন! গ্রামে যাও, দেখবে প্রায় প্রত্যেক ঘরেই ছিনিমিনি চলছে। দরিদ্রদের মধ্যে তালুক যেন ডালভাত হয়ে গেছে, কথায় কথায় তালুক, গালিগালাজের মতো অবলীলায় উচ্চারিত হয়। আমরা মেয়েরা বুঝে পাইনে, বিংশ শতাব্দীর ফুরিয়ে আসা সাঁঝবেলাতেও সত্যিকার মুসলমান জাতটা কোথায় রয়েছে!^{১২৯}

হামিদুলের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ‘মুসলমান পুরুষের’ প্রতি রাবেয়ার ধিক্কার ফেটে পড়েছিল। ধর্মাত্মক মুসলমান পুরুষদের আদিম সংস্কার, মিথ-পুরাণ নির্ভর সংস্কৃতির আলোয় মনটা বিকল হয়ে আছে। ধর্মনির রক্তে তাদের জিঘাংসার নেশা লেগে আছে। রাবেয়ার মনে হয়েছে, হামিদুলের মতো এক একজন পুরুষ আরব্য উপন্যাসের ক্ষমতাধর বাদশা। যাদের ইচ্ছানুসারে নারীর জীবনচর্যা অতিবাহিত হয়। নাস্তিক মামুনের মধ্যে রাবেয়া খুঁজে পেয়েছিল তার স্বপ্নদর্শী পুরুষকে। ভালোবাসার ধর্মই হল এক হয়ে ওঠা, কিন্তু এক হতে চাইলেই কি পূর্ণ এক ও অভিন্ন সত্তা হওয়া যায়! মানুষ তা চাইলেও পারে না। রাবেয়া-মামুন কেউই পারেনি। তারা জানে, ‘ধর্মে, রুচিতে, সংস্কারে, মতে আদর্শে,

এক না হয়ে ভালোবাসায় এক হওয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা’। রাবেয়ার প্রতি মামুনের ইন্দ্রিয়স্পর্শের মাদকতা এবং শরীরী অনুভবের রম্যতা ক্রিয়াশীল হলেও তাকে সে নিবৃত্ত করেছে। কলেমা-হাদিস-ফতোয়া-মসলা-মাসায়েল— ইসলামি শরিয়তের দাপটে হামিদুলের একান্ত ব’লে রাবেয়া মামুনের স্পর্শসুখ থেকে বঞ্চিতই থেকেছে। ইদত-এর পুণ্য-ক্রিয়ার কোনো যৌন দায় মামুন পালন করতে পারেনি। এই সাজানো দাম্পত্যের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে রাবেয়া বলেছিল:

তিন মাস তোমার এই ঘরে হাজত-বাস করছি, ছুট কয়েদির মতো কোথায় পালাব?
বিনে সুতোয় তিন কথায় যতটুকু বাঁধবার বেঁধেছ, ফের যেদিন তালাক দিয়ে ফিরিয়ে
দেবে, এই সুন্দর খাঁচা ছেড়ে উড়ে যাব আর এক পিঞ্জিরায়, মেয়েদের কোথাও মুক্তি
নেই!^{১৩০}

গ্রামবাংলার মুসলিম সমাজের মিথ-পুরাণ নির্ভর সংস্কৃতির পাঁকে জড়িয়ে নারীর ব্যক্তিস্বল্পণা কী ভয়াবহ হয়ে ওঠে, তা পরিস্ফুট হয় রাবেয়ার উক্তি। মানুষের ধর্মনৈতিক ট্র্যাডিশন নারীকে পরিবারের অন্তরমহলে বন্দি করে রেখেছে। শরিয়তি আইনের বাইরে বেরিয়ে নারী পায় না মুক্তির স্বাদ। কেবল তালাক শব্দ উচ্চারণ শোনা এবং তার পরেই স্বামী-বদল, ঘর-বদল— নারীর এই হস্তান্তর রাবেয়ার কাছে পতিতাবৃত্তিরই নামান্তর। একটা বুট দাম্পত্য, মিছিমিছি ছায়াবাজি খেলা করছে দু’জন মানুষ। শাস্ত্রের নিয়মে পাপমোচন করতে, শুদ্ধ হতে এসে রাবেয়া ও মামুন দুজনেরই জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। শরিয়তের কঠোর নিয়মাধীন হয়েই নাস্তিক মামুন স্বস্তি পায় না। মোল্লাগাজিরদের ফতোয়া প্রতি পদে পদে পায়ে বেড়ি পরিয়ে মানুষের জীবনকে নাজেহাল করে দিচ্ছে, আর নাস্তিক মামুন সেই মানুষদেরই একজন হয়ে শাস্তি ভোগ করছে। এই রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে মামুনের অনুভূতি, স্বর, আকাঙ্ক্ষা ও অন্তরাত্মার কোলাহল ও ছটফটানি ছিল খুবই ভয়াবহ:

কলেজে মন টেকে না, কোথায় যেন পালিয়ে গিয়ে নিরালায় বসে থাকতে ইচ্ছে করে। বয়ঃসন্ধির উগ্র প্রেমিকের নেশার মতো তরল ভাবাবেগ তাড়া দিয়ে ফেরে। ঠিক একটি স্বপ্নবেষ্টিত কাল্পনিক স্বাধীন ভূখণ্ড আবিষ্কার করি মনে মনে। যেখানে হারিয়ে গেলে কোনো বাধা থাকে না। পায়ে পায়ে শেকলে টান ধরে না। মোল্লাগাজী হাজী মৌলানা পিরজাদা কারো কোনো কুটিল ঝুঁকুটি নেই। হাদিস মছলার ফতোয়া যে পৃথিবীকে পঙ্কিল করেনি। বাস্তবকে মোকাবিলা করার যখন কোনোই পথ থাকে না, তখনই সে স্বপ্নিল ভূখণ্ড জলের তথা মাটির আস্তরণে আভাষিত হতে থাকে। সমাজের বাধানিষেধে চাপা পড়ে ভেঙে যাওয়া ব্যক্তির মন এইভাবে স্বপ্নের রাজ্যে পালাবার পথ খোঁজে।^{১৩১}

নিজের বিশ্বাস ও আদর্শ নিয়ে লড়াই করতে করতে একলা হয়ে যাওয়া মানুষ মামুন। সে বলশালী শাস্ত্রের কাছে কিছুতেই পেরে ওঠে না, ঘাতক নিয়মকানুনের ক্লেদাজ ও পঙ্কিলতার অভিজ্ঞান তার বিবাহ। এই রুঢ় বাস্তবের কাছে নতি স্বীকার করে পলায়ন করতে চায় নাস্তিক মামুন। সে অনুভব করে সে হেরে যাচ্ছে। মিথ-পুরাণ কেন্দ্রিক জীবনই মানুষের বাঁচার দস্তুর, মনুষ্যত্ববোধের চেতনা ব্যাপক ও ব্যবহারিক করে তুলতে পারে না কেউই। শাস্ত্রের মানদণ্ড ও ধর্মীয় নৈতিকতার বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইলেও ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে মামুন। এদিকে দু’মাস কেটে গেলেও মামুন রাবেয়াকে কোনো তালাক দেয়নি। একদিন মামুনের বাড়িতে হাজির হন খতিব সাহেব। খতিব সাহেব মামুনকে স্মরণ করিয়ে দেন তালাকের কথা। মামুন হামিদুলের দোস্ত, আর আল্লাহর দোস্ত মুহম্মদ। মামুন ফরাজি, কাজেই তাকে এক এক করে তিন তালাক দিতে হবে। হানাফি হলে ‘এক রাতে সহবাস করে ছেড়ে দেওয়া যায়’। ইদ্দৎ মানেই শোক করা, মনস্তাপ করা, অপেক্ষা করা— সে কথা হাড়ে হাড়ে টের পায় মামুন। মোল্লাতন্ত্রের এই বিধান দেখে যুক্তিবাদী মামুনের একরাশ ঘেন্না হয়েছে:

নিষ্পাপ সারল্যের পেছনে সাপের মতো চেরা জিভের লকলকে ছায়া ভাসছে যেন। এদের মুখে অশ্লীল কোনো কথায় আটকায় না। মুসলিম নারীদের নিয়ে ফতোয়া দেয়ার কুটিল ব্যবসায় এদের সুখ্যাতি প্রচুর। এদের উপর সমস্ত আক্রোশ নিষ্ফল হয়ে যায়,

বারবার এরা জেতে। কেন জেতে সমাজ তা জেনেও কিছুই করতে পারে না। আমাকে এই লোকটি ফাঁদে ফেলে বেঁধেছে। হামিদুলকেও খেলিয়ে ফিরছে। শিকদারকেও নাচাচ্ছে। শিকদারও আপন মহিমায় নেচে চলেছেন। আর এদিকে আমার খেয়ালই ছিল না, আমি ফারাজি, আমি একই মুহূর্তে তিন তালুক দিতে পারি না। রসুলের হাদিসে নাকি এক সাথে তিন তালকের সমর্থন নেই। থাকলেও কোথায় কেমন হয়ে রয়েছে, তার ফতোয়া আমার মতো মূর্খ অধ্যাপকের জানা নেই। আমি আসলে নেমকহারাম নই, এই সুবাদে আত্মহননে লিপ্ত হয়ে নিজেকে খুঁড়ছি আর মন্তন করছি ব্যথিত হৃদয়, বিপন্ন করছি নিজেকে নিজে।^{১৩২}

খতিব সাহেবের মতো মানুষেরা ধর্মকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার করে এগিয়ে যায় তরতর করে, আর তলায় চাপা পড়ে ধর্মভীরু নারী-পুরুষ। বাস্তববোধ ও নৈতিক জ্ঞান খুঁয়ে অধঃপতনের পাতালপুরীতে নেমে যায় ফতোয়াধারী মোল্লার দল। আর আত্মদংশনে প্রতিদিন অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে মামুনের মতো যুক্তিনির্ভর মানুষ। বাস্তবের সংসার-সমাজে অলৌকিক ঈশ্বর ও পরকালের জান্নাত-দোজখ-এর হরেকরকম কিসসা শুনে মুক্তমনা মামুন অবাক ও বিচলিত হয়। তার মগ্নচৈতন্য নাড়া দেয় হরীর কথা শুনে। ইসলামি পুরাণে বলা হয়েছে, জান্নাতি প্রত্যেক পুরুষ প্রতি সত্তর জন হরী থাকবে। এইসব অলৌকিক অবাস্তব পৌরাণিক বিশ্বাসের কথা মনে পড়লে মামুনের যুক্তিবোধে চমক লাগে:

একজন জান্নাতবাসীর জন্যে কী অটেল আয়োজন, ভাবলেই তাক লাগে। পরকালে সত্তরজন হরী আর ইহলোকে স্বামীর পদতলে লুপ্তিত হচ্ছে স্ত্রীর বেহেস্ত। একজন পুরুষের বিস্ময়কর সেক্স-অ্যাবিলিটি, পশুর চেয়ে বীভৎস। সত্তরজন হরী। অঙ্গরী। ভয়াবহ কামবিকার, মাফ করবেন খতিব, এত অশ্লীল কথা।^{১৩৩}

মামুনের অন্তঃকরণে শরিয়তি আইনের কবলে পড়ে নারীর সামাজিক যৌন শোষণের কথা ফুটে উঠেছে। পর্দা-বোরখার ঘেরাটোপে নারীকে বন্দি করে পুরুষ তার ক্ষমতা ও ঐশী গ্রন্থের দোহাই দিয়ে সমাজকে করে তুলেছে পিতৃতান্ত্রিক। পৃথিবীতে

কোনো ধর্মই নারীকে তার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করেনি। নারীরা আদিকাল থেকেই সমাজে অসহায়। ধর্মের প্রতিভূ পুরুষ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গড়ে নারীকে করেছে বাতিল, অপাঙক্তেয়। সংসারে যৌনতার দাসত্ববৃত্তি করে নারী রয়ে যায় কোণঠাসা। বস্তুত এই বোধ ও বিশ্বাস থেকেই ইসলামি মিথে ‘স্বামীর পায়ের তলে স্ত্রীর জান্নাত’ এমন প্রবাদের জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ নারীকে আজীবন স্বামীর মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। নারীর ব্যক্তিগত সুখ-আহ্লাদ সেখানে মিথ্যে। ইসলামি পুরাণে ‘হুর্’ নিয়ে একগাদা আয়াত রচিত হয়েছে, সেখানে শুধুই পুরুষের জয়জয়কার ও পরকালের পুরস্কারের বৃত্তান্ত।^{১৩৪} সেই বৃত্তান্তের পরতে-পরতে নারী ভোগের সামগ্রীর বীজ নিহিত। নাস্তিক মামুন ধর্মের এই একমাত্রিক বিধির বিচার করে আত্মহননের পীড়ায় দগ্ধ হয়েছে। ‘কিন্তু ধার্মিক তো সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করে না। কারণ, ধর্ম আর শাস্ত্রীয় ব্যাপার নিয়ে বিচার করাটাই তার কাছে অধর্ম। তার একমাত্র অবলম্বন অন্ধ বিশ্বাস আর অন্ধ অনুসরণ। একজনের জন্যে সত্তর হাজার হুর্ সম্ভব কি অসম্ভব, সম্ভব হলেও একত্রে অতগুলি হুর্ দিয়ে সে কী করবে এ সব অতি স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রশ্নও তার মনে উদয় হয় না— হলেও উত্তর সন্ধানে সে নিষ্পৃহ অথবা শঙ্কিত। সে উত্তর যতই লজিক্যাল বা যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, তার কাল্পনিক পরিণাম ভেবে সে আরও বেশি ভীত। যে মানুষ লজিক বা যুক্তির সম্মুখীন হতে ভয় পায়, তার কাছে মননশীলতা বা মুক্তবুদ্ধির চর্চা এক নিষিদ্ধ ব্যাপার। এমন মানুষকে সত্তর হাজারের পরিবর্তে সত্তর লক্ষ বললেও সে বিশ্বাস করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। হয়তো ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে আরও বেশি উৎফুল্ল, আরও বেশি বেপরোয়া ধার্মিক হয়ে উঠবে। যে মানুষ জীবনে একটা হুর্ সামলাতেই গলদঘর্ম, মৃত্যুর পর সে সত্তর হাজার সামলাবার অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবে— এমনতর অদ্ভুত বিশ্বাসই

সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ ও সম্মোহিত করে রাখে’।^{১৩৫} আর তার সঙ্গে যুক্ত হয় মোল্লাতন্ত্রের মগজাস্ত্র। ধর্মাত্ম মানুষ এই সংস্কার ও ট্রাডিশনের ছত্রছায়ায় নিজেকে লালিত করে।

দিন ঘনিয়ে এলে রাবেয়া মামুনের কাছে ‘স্বপ্ন দিয়ে মোড়া’ ‘অভিজ্ঞান’ চায়। একটা স্মৃতিচিহ্ন। রাজা দুঋন্ত যেমন শকুন্তলাকে দিয়েছিল। মামুন রাবেয়াকে বুঝিয়েছে, দুঋন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলনের জন্যে অভিজ্ঞান জরুরি ছিল, কিন্তু চির-বিচ্ছেদের জন্যে কোনো অভিজ্ঞান লাগে না। তালাকে অবিশ্বাসী মামুনকে শুনিয়েছে রাবেয়া ধর্মের বাণী:

আমি তালাকে বিশ্বাস করি। নইলে এই তিন মাস কি বেশ্যার মতো ‘জিনা’ করব বলে বসে আছি? আছি যখন, আছি কোন্ সাহসে? তুমিও বিশ্বাস কর বৈকি! লোকদেখানো বিশ্বাস করতেই হয়। ধর্ম নিয়ে ভণ্ডামি করো না মামুন, আমি তোমার হাদিস কুরানের বউ।^{১৩৬}

ইসলামি মতে ইদ্বৎ-এ একটি সার্থক বাসররাত্রি প্রয়োজন। রাবেয়া সেই বাসররাত্রির পশরা সাজিয়ে মামুনকে অনুরোধ করে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে। তালাক প্রথার শিকার রাবেয়ার অস্তিত্বের চেতনমূলে যৌনবাসনার দুর্মর উপস্থিতি নেই, আছে মাতৃত্বের অগাধ আকাজক্ষা। এমন অবস্থায় মামুনের কানে ধেয়ে এসেছে খতিবের কণ্ঠস্বর, ‘হামিদুলের পয়সায় তুমি মানুষ হয়েছ। তোমার বাচ্চাও কি মানুষ হবে? কাগের বাসায় বগের ডিম! কিন্তু তুমি তো নেমকহারাম নও’।— তালাকশাসিত দাম্পত্যের খপ্পরে পড়ে মামুন আত্মপীড়নের জ্বালায় দগ্ধ হয়েছে। তিন মাস দশ দিন পূর্ণ হয়ে গেলে হামিদুল টাঙা নিয়ে হাজির হয়। শাস্ত্র মোতাবেক রাবেয়া ফিরে যায় প্রথম স্বামীর কাছে। যাবার আগে মামুনের পা ছুঁয়ে কদমবুসি (প্রণাম) করে রাবেয়া শেষ তালাকটি চেয়েছিল মামুনের কাছে। প্রতিবাদহীন সমাজের নিঃসঙ্গ নাগরিক মামুন বলেছিল:

ওটা থাক। ঐ একটি বাঁধন চিরকাল মুসলিম জাহানের কাছে অজ্ঞাত অশ্রুত থাক,
রাবেয়া। তুমি আর আমি জানব। আমি তোমায় ত্যাগ করতে পারি নি। মুখের কথায়,
একটি শব্দে এই সম্পর্ক মিথ্যা হয় না।^{১৩৭}

শাস্ত্রের কথা অমান্য করে মানবতাবাদী মামুন তালাক প্রথার অসাড়তাকে প্রমাণ
করে দিয়েছে। রাবেয়াও মনে মনে আবৃত্তি করেছিল, ‘তুমি সুন্দর। তুমি পবিত্র। মানুষ
তোমাকে ভুলতে পারে না’। এভাবেই বিচ্ছেদ-পর্ব সমাপ্ত হয় মামুন-রাবেয়ার। এ গল্প
আসলে তালাকশাসিত দাম্পত্যের বাঁধনে বন্দি হয়ে দু’জন মানুষের বেঁচে থাকার ট্রাজেডি।
আধুনিক সভ্য সমাজের একজন হয়ে মামুন মিথ-পুরাণ কেন্দ্রিক ধর্মের বিধি-বিধানের
কাছে নতজানু হয়ে শেষে কটাক্ষের সুরে বলেছিল:

হ্যাঁ, মৌলানা সাহেব, হাফ ও ফুল মৌলভী সাহেব। আমি এবং রাবেয়া দুজনেই চেষ্টা
করেছিলাম বিস্তর। আশ্রয় এবং আন্তরিক। পারি নি।

হে অমর হাদিস, বিশ্ব-কুরান!

তোমার অমোঘ নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতে পারি নি।

শরীফ সাহেব! হজরত পিরজাদা কুতুবুদ্দিন সাহেব। আমরা দুজনে ইদাতের যোলকলা
পূর্ণ করতে পারি নি। ঢের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে গেছে।

আপনারাই ভালো বুঝবেন দোষঘাট কতটা। মাফ করবেন।

এ কাহিনির স্রষ্টা তো আপনারাই। ধন্যবাদ, শুকরিয়া!

এই তিন মাসের দাম্পত্যজীবনের জন্য রাবেয়াকে পেয়েছিলাম। আপনারাই হাতে
দিয়েছিলেন। রাবেয়াও আমাকে পেয়েছিল।

লক্ষ্যবার শুকরিয়া। ধন্যবাদ।

আলহামদোলিল্লাহ্! শুকুর আলহামদোলিল্লাহ্!

হে রাব্বুল আল্ আমিন।^{১৩৮}

ইসলামি সংস্কার ও পৌরাণিক দর্শনের অভিমুখ ও গতিপথের ছিদ্রে নারীর
পাশাপাশি অবিশ্বাসী নাস্তিকের জীবনও হয়ে ওঠে বিপন্ন। এ গল্প অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচতে
চাওয়া দু’জন মানুষের ট্রাজিক জীবনের খতিয়ান। ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী আবুল বাশার

মুসলমান জনমানসের মৌলবাদী চিন্তাধারার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। সময়ের দলিলীকরণে বিশ্বাসী গল্পকার সেই সামাজিক দায়কে অস্বীকার করেননি। একটি সাক্ষাৎকারে আবুল বাশার জানিয়েছিলেন:

আমি হজরত মহম্মদ ও কোরানের বিরোধী নই। আমিই সেই লোক, যে কোরান ও হাদিস ধরে উপন্যাস লিখেছি। ওরাও বুঝেছিল, এটা কোরান বা হাদিসের বিরুদ্ধে নয়, ওদের বিরুদ্ধে। ওই গোঁড়া অংশটার বিরুদ্ধে।^{১৩৯}

আবুল বাশারের গল্প সেই মৌলবাদী চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে একধরনের জেহাদ বলা যায়। যে মৌলবাদী চেতনার বশবর্তী হয়ে ধর্ম-শরিয়ত-ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিকও ছাড় পায় না, শাস্ত্রের অযৌক্তিক আইনের কোপে গুমরে মরে।

‘আবাবিল নয়’ গল্পে লেখক ইসলামিক পুরাণের ঘটনাবলীর সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ের যোগসূত্র নির্মাণ করেছেন। এ গল্পের নিজাম শা ঘাসুড়ে। সে ভূমিহীন, নিঃস্ব। গাই-গরু হারা, সর্বহারা একজন সাদাসিধে চোর। খটখটি বাজিয়ে জমি থেকে পাখি-পতঙ্গ তাড়ায়। প্রয়োজনে চুরি করে এবং ধরা পড়ে মারও খায়। নিজাম শা একসময় বহু জমির মালিক ছিল, কিন্তু মানুষের চক্রান্তে আজ তারা দুর্ভাগ্যপীড়িত অসহায়। নিজাম শা’র মেয়ে শাহেদার স্বামী জমির শা কাস্তে হাতুড়ি পার্টির পঞ্চায়েত মেস্বার। শ্বশুরের চৌর্যবৃত্তি জমিরকে আঘাত করে। একদিন জমিরের জমিতেই চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে নিজাম শা। শ্বশুরের রাগ গিয়ে পড়ে মেয়ের উপর। জমির শাহেদাকে এক তালাক দিয়ে সতর্ক করে দেয়। এইভাবে গল্প এগোতে থাকে। নিজাম শা এতটাই নিঃস্ব হয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের ‘দুই বিঘা জমি’-র উপেনের মতোই নিজের মনকে প্রবোধ দেয়— ‘মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে/ তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।’— ইহুদি ও ইসলামি পুরাণে উল্লেখিত আদি পৃথিবীর নুহ নবীর কিস্তি (নৌকা)

নির্মাণের গল্পকে নিজাম জীবনপথের পাথেয় করে তোলে। নুহ নবি (ঈশ্বর প্রেরিত দূত) ছিলেন ‘উচ্চকোটের স্বপ্নবিদ’। তিনি একাধারে নৌ-কারিগর, গোষ্ঠীনেতা, চমৎকার নির্বাচক, পরিত্রাতা এবং সংরক্ষক। তাঁর আমলেই পৃথিবীব্যাপী মহাপ্লাবন হয়েছিল। ইহুদিদের *হিব্রু বাইবেল* এবং মুসলিমদের *কোরান*-এ তার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মহাপ্লাবনের সংবাদ বয়ে এনেছিল নুহর স্বপ্ন। নুহ পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় কিস্তিতে তুলেছিলেন। অর্থাৎ লিঙ্গ ভেদে একজোড়া। এইভাবে পৃথিবীর ভূমিক্ষেত্র ভেসে গেলেও ঈশ্বরের সৃষ্টি ও সভ্যতাকে টিকিয়ে রেখেছিল নুহের কিস্তি। গল্পের নিজামের কাছে পৃথিবীর শস্যশ্যামল ভূমিক্ষেত্র বা তপ্ত মরুশলাকা এসবই নুহের দান। এতে সবার সমান অধিকার। কারোর আদিপত্য নিজাম স্বীকার করতে চায়নি:

আমি নুহর খাই। কুন্সু শালার খাই না। যে বাঁচায়, যে রক্ষা করে, চাষা জানে না সেই হচ্ছে নুহ। নুহর ধম্ম চেরকালের, বাপ সেই কথা বুলতক।^{১৪০}

জমির এবং পাড়ার মানুষদের কাছে অপমানিত নিজাম ক্লান্ত শরীর নিয়ে শুয়ে থাকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে স্বপ্ন দেখে আবাবিল পাখির। ইসলামি পুরাণের আকরগ্রন্থ *কোরান*-এ উল্লেখিত আবাবিল হল চডুই পাখির মতো একপ্রকার ছোট পাখি। ধার্মিক মুসলমানদের কাছে আবাবিল আত্মরক্ষার প্রতীক, ধর্মরক্ষার প্রতীক। সর্বহারা নিজামের দিবাস্বপ্নে দিগন্তের নীলে কালো কালো অজস্র ফুটকি ভেসে ওঠে:

এইসব কি আবাবিল পাখি? কুরানে আছে আবাবিল পাখির কথা। বুকুর ভিতর অদ্ভুত রক্ত ছলাৎ করে ওঠে ভয়ে। আবাবিলের মুখে থাকে টুকরো টুকরো সাংঘাতিক বিস্ফোরক পাথর। তা যদি মাথায় পড়ে নিশ্চয়ই নিজাম মারা পড়বে। ফুটকি গুলি ভেসে ভেসে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ছে। যার দেহ উঠতে চাইছিল না, কী অদ্ভুত ঠেলায় মনও তাকে ধাক্কা দেয়। নিজাম বীরের মতো মাটি ঠেলে ওঠে। টলতে টলতে ওঠে। পাখিরা ক্ষেতে নেমে গিয়েছে। সর্বনাশ হয়ে গেল রে! সব খেয়ে ফেললে! বলেই নিজাম

লাফিয়ে উঠেছে। তারপরই খেয়াল হয়েছে, এ যে ছটরা। বর্গীপাখি। আলোর পাখি।
আবাবিল নয়।^{১৪১}

কোরান শরীফ-এর ১০৫ সংখ্যক ‘সুরা ফিল’-এ আবাবিল পাখির বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এ সুরা রচিত হবার কারণ হিসাবে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। আরবি ‘ফিল’ শব্দের অর্থ হল— হাতি। এ সুরার প্রতিটি শ্লোকে রোমানদের হস্তিবাহিনীর সঙ্গে ঈশ্বর কী ব্যবহার করেছিলেন তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে। কথিত আছে, রোমান শাসকরা মক্কার কাবাঘরের দখল নেবার উদ্দেশ্যে অসংখ্য হস্তিবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ্ নগণ্য পক্ষীকূল অর্থাৎ আবাবিল পাখির মাধ্যমে রোমানদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন।^{১৪২} আবাবিল পাখি মুখে ক্ষুদ্র পাথরকনা বর্ষণ করেছিল রোমান সেনাদের উপর। পাথরের আঘাতে রোমানদের দলবল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছিল। সুরা ফিল-এর পাঁচটি আয়াতে এ ঘটনার উল্লেখ আছে।

তুমি কি দেখনি যে, তোমার রব হস্তি অধিপতিদের পরিণতি কেমন করেছিলেন?
তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি?
তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকূল (আবাবিল পাখি) প্রেরণ করেছিলেন।
যারা (আবাবিল) তাদের উপর পাথর জাতীয় কাঁকর নিক্ষেপ করেছিল।
অতঃপর তিনি তাদেরকে (রোমানদের) ভক্ষিত (চেবানো) তৃণ করে দিয়েছিলেন।^{১৪৩}

আবাবিল ঈশ্বরের ক্ষুদ্র দূত, যাদের ক্ষমতা অসীম। জোটবদ্ধ হয়ে কাবা শরীফ মসজিদের হেফাজত করেছিল। প্রতিরক্ষার প্রতীক হিসাবে আবাবিল পাখি ইসলামি শাস্ত্রে উন্নত আসন অধিকার করে আছে। এ গল্পে লেখক আসলে পুরাণমুগ্ধ মানুষের অসহায়তা, তাদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান নির্মাণ করেছেন। ধর্মকে ব্যবহার করে কেউ লোভ লালসার সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে যায়, কেউবা ধর্মকে আশ্রয় করেই পরকাল, অদৃশ্য বিচারকের ভরসায় অত্যাচারের বশবর্তী হয়ে জীবনধারণ করে। নিজামের স্বপ্ন

অতীতের পুরাণ কথাকে স্পর্শ করে। গল্পের শেষে সবকিছু হারিয়ে নিজাম ও শাহেদার স্টেশন যাত্রা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহুচর্চিত গল্প ‘মহেশ’-এর গফুর ও আমিনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নিজাম শা ও শাহেদা জমিরের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল দু’মুঠো ভাতের লোভে, খিদের তাড়নায়। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে কীভাবে স্বামী-স্ত্রীর আত্মপরিচয় বদলে যায় তা জমির ও শাহেদার অসুস্থ দাম্পত্যের রূপ দেখলেই অবলোকন করা যায়। জমিরের উদ্দেশ্যে শাহেদার বক্তব্য আত্মস্থাপক মুসলিম নারী জীবনের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ:

দেহু দিইছি, বিনি মাগনা দিইনি জমির শা। বদলে বাপ মেয়ে ভাত গিলেছি। শোধবোধ হয়েছে। সালাম আলেকুম।^{১৪৪}

শাহেদার স্পর্ধিত উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছিন্না মুসলিম নারীর সমাজিক যৌন শোষণ, যৌনতার দাসত্বের কদর্য চেহারাটি উঠে এসেছে। সেইসঙ্গে গল্পকারের লেখনশৈলীর দক্ষতায় মুসলিম সমাজের ক্ষত ও নারীর জীবনের অভিশাপ নির্মেল ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে।

মুসলিম নারীর যৌনশোষণ ও যৌনতার দাসত্ব— আবুল বাশারের গল্পে বারবার ফিরে এসেছে প্রধান ভূমিকায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও মানসিকতার চক্ররে বিবাহ-বিচ্ছিন্না নারীর শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ তাঁর গল্পে গভীর কল্পনা ও অনুভূতির সঞ্চরে প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতে রেনেসাঁর কোনো উন্নত আলো এসে পৌঁছায়নি, তাঁর নৈসর্গিক জনপদ জুড়ে শরিয়তি গোঁড়া, মৌলবী-মোল্লাতন্ত্রের প্রবল দাপাদাপি— পুরাণকথাকেই যারা জীবনের সারসত্য বলে মনে করে, এবং তাদের হাতেই নারীর দাম্পত্য জীবন ‘ব্যবহৃত ব্যবহৃত হতে হতে শুয়োরের মাংস হবার ইতিকথা’-য় পরিণত হয়। অবিবাহিত-বিবাহিত কিংবা বিবাহ-বিচ্ছিন্না নারীর অস্বস্তিকর জীবন লটকে থাকে

শরিয়তি বিধিনিষেধের জালে। নারীর এই অন্তরাত্মার কোলাহল, ছটফটানি ‘রুকু দেওয়ান’, ‘ডানামেলা বৃশ্চিক’ প্রভৃতি ছোটোগল্পে চমৎকৃত রূপ পেয়েছে।

‘রুকু দেওয়ান’ গল্পে নিষিদ্ধপল্লীর একজন দেহ ব্যবসায়ী নারীর ট্রাজিক জীবনের গল্প বুনেছেন গল্পকার। পাশাপাশি সেই নারীর জীবনের পথযাত্রার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন আরব উপকথার এক গল্প। রুকু দেওয়ান সমাজের চোখে ‘বেশ্যা’, রূপমতী রূপাজীবা নারী। রুকু চোখে দেখতে পায় না, তবু ‘তার দুই চোখ সুলেমানি সুমিষ্ট কয়রা’। রাজশাহি তিরাইল জোয়ারির মসজিদ পাড়ায় বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত বালিকা রুকু। তার পাড়ার চারপাশে ইসলামি অনুশাসন ও শরিয়তি বিধিনিষেধ ছিল দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো। পাড়ার মানুষদের জীবনে তিন ভাগ দারিদ্র্য ও একভাগ ধর্ম হলেও সে ধর্মের দাপট ছিল জোরদার ও ভয়াবহ। পাড়ায় মাঝে মাঝেই মেয়েদের তালাক হয়ে যেত এবং সেইসঙ্গে অতর্কিতে ‘দু একটি কচি-বালিকা গাঁ থেকে উধাও হয়ে যেত।’ সুন্দরী অন্ধ মেয়ে রুকুর সঙ্গে জুম্মা শেখের বিয়ে হয়েছিল। জুম্মা ছিল উর্দুভাষী নারী পাচার চক্রের বাঙালি দালাল। একমাস দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করার পর জুম্মা ধনাই ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করে দেয় রুকুকে। জুম্মার কাছে নারী কেবল ভোগের সামগ্রী। অন্যদিকে ব্যাপারী ধনাইয়ের কাছে গরু-নারীতে ভেদ নেই— দুটো প্রাণীই তার পাচারের ‘চোরাও পণ্য’ এবং উপার্জনের চালিকা শক্তি। ধনাই রুকুকে বিবাহ করে দু’মাস ‘ভোগ’ করার পর এক উর্দুভাষীর হাতে চালান করে দেয়। এইভাবে বিবাহ-বিচ্ছিন্না নারী রুকু পুরুষের হাতে হয়ে ওঠে ব্যবসার উপকরণ— পণ্যের মতোই হস্তান্তর হয়। দাসপাড়া হয়ে কলকাতার সোনাগাছি— রুকুর ঠাই হয় বেশ্যাপল্লীতে। বেশ্যাবৃত্তিই হয় তার জীবনধারণের উপায়। সোনাগাছিতে রুকুর নাম হল রুক্মিণী দাসী। তারকনাথ নাহা নামের এক বাবুর রাতের স্থায়ী রক্ষিতা। তারকনাথের ঔরসে জন্ম হয় পুটুর ঔরফে নির্মাল্য কবির। ছেলে পুটুকে রুকু শোনাত

এক আরবীয় পরণকথা। পরণকথার গল্পই রুকুর জীবনের সঙ্গে আদ্যোপান্তভাবে জড়িয়ে আছে।

অতীতের আরব মরুভূমির উপকথা মৌখিক পরম্পরায় গ্রামীণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে মিথ আকারে ডালপালা বিস্তার করে ছড়িয়ে থাকে জনমানসের আনাচে-কানাচে। এবং কালক্রমে এই মিথই ‘পরণকথা বা oral tradition’-এর রূপ নিয়ে বেঁচে থাকে মানুষের স্মৃতির তলদেশে। গল্পে এই পরণকথার কথক একজন সমুদ্র সন্ন্যাসী। নিষিদ্ধপল্লীতে যাকে লোকে ছেলেবেলায় পুটু নামে চিনত। রুক্মিণী দাসী দেহ ব্যবসার কাজে জড়িয়ে পড়লেও সে নিয়মিত নামাজ পড়ত, ধর্মচর্চা করত। তারকনাথের ঔরসে জন্ম নেওয়া সন্তানকে সে নিষিদ্ধপল্লীর হাওয়া বাতাস থেকে দূরে রেখেছিল। মুসলিম অন্ধ সুন্দরী পতিতা চাইতেন তার হিন্দুপুত্র হবে একজন সমুদ্র সন্ন্যাসী। পুটুকে স্কুলে ভর্তির সময় সত্যানন্দ মহারাজ ভর্তির খাতায় তাকে পিতৃত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন। সত্যানন্দ মহারাজের পিতৃত্বের স্বীকৃতি ছিল রুক্মিণীর কাছে ঈশ্বরের অলৌকিক উপহার। বারাজনাদের সন্তানরা পিতৃপরিচয়ের অভাবে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হত তার নিদর্শন ইতিহাস ও সাহিত্যের পাতায় সময়ের সংকট ও আর্তি নিয়ে মূর্ত হয়ে আছে। বিশেষত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস *সেইসময়*-এ উনিশ শতকের উত্তর কলকাতার এক বারাজনা হীরা বুলবুলের পুত্র চন্দ্রনাথের হিন্দু কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে তৈরি হয়েছিল জটিলতা, এবং পরবর্তীকালে পিতৃপরিচয়হীন এবং ‘বেশ্যার সন্তান’ চন্দ্রনাথ কলেজে ঢোকান প্রবেশাধিকার পেলেও তার প্রতিবাদস্বরূপ উচ্চশ্রেণির ছেলেদের কলেজ পরিত্যাগ ও হিন্দু কলেজের ভাঙন— এসবই লেখক নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করলেও এ ঘটনা ছিল সময়ের লেখ্য দলিল।

ইসলামি পুরাণে ‘বেশ্যাবৃত্তি’ বা ‘দেহ ব্যবসা’ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামি পরিভাষায় অবৈধ সম্পর্ককে ‘জিনাহ্’ বা ‘জেনাহ্’ বলা হয়। ঐতিহ্যগত আইনশাস্ত্র অনুসারে, জিনাহ্-এর অন্তর্ভুক্ত হল ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ, অবৈধ যৌনমিলন, সমকামিতা, অজাচার এবং পাশবিকতা প্রভৃতি। বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত নয়। একমাত্র বিবাহিত নারী-পুরুষের যৌনতাই ইসলামি শাস্ত্র অনুমোদন করে। ইসলামি পুরাণের আকরগ্রন্থ কোরান-এ ব্যাপারে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে:

বিশ্বাসী নারীদেরকে বলো— তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে, তাদের যৌন-অঙ্গের হেফাজত করে। এবং শরীরের যে অংশ সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে। তারা তাদের বক্ষঃস্থল যেন কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নি-পুত্র, সেবিকা যারা তাদের অধিকারভুক্ত ও অনুগত, যৌনকামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।^{১৪৫}

নারীদের যৌনতা নিয়ে ইসলামি পুরাণে বহুল শ্লোক রচিত হলেও পুরুষদের যৌনতা বিষয়ে খুব বেশি কথা নেই। নারী যেহেতু ভোগ্য এই ধারণায় সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত। পুরুষের একাধিক বিবাহ ইসলামি শাস্ত্র অনুমোদন করলেও নারীর জন্য সে আইন তৈরি হয়নি। ইসলামি শাস্ত্রে পাপ বা গুনাহ-এ কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক, সগীরা গুনাহ অর্থাৎ ছোটো গুনাহ, দুই, কাবির গুনাহ অর্থাৎ বড়ো গুনাহ। ‘ব্যভিচার’ বা ‘পতিতাবৃত্তি’ ইসলামি শাস্ত্রে কাবির গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। শাস্ত্র অনুযায়ী, সগীরা গুনাহ বিভিন্ন পুণ্য কাজের প্রতিদান হিসাবে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। পক্ষান্তরে তওবা ব্যতীত কাবির গুনাহ থেকে কেউ মুক্তি পায় না। ইসলামি পরিভাষায় তওবা-র অর্থ হল—

প্রত্যাবর্তন করা। অন্যায়, অপরাধ, বড়ো গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসার নামই হল ‘তওবা’। অর্থাৎ নিজের দুষ্কর্মের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর বিধানের পথে পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসার নাম ‘তওবা’। শরিয়তের বিধি অনুসারে, মৌখিকভাবে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি মানুষকে অবশ্যই পাপ বলে স্বীকৃত যে সমস্ত কাজ তা থেকে বিরত থাকতে হবে। তওবার প্রকৃত অর্থই হল— পাপ থেকে পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহর বিধানের পথে ফিরে আসা। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুসারে, তিনটি পদ্ধতিতে কাবির গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। প্রথমত, পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। দ্বিতীয়ত, পূর্বের কৃত পাপের প্রতি নিবিড়ভাবে অনুতপ্ত হওয়া। এবং তৃতীয়ত, অতিরিক্ত পুণ্যের মাধ্যমে কৃত পাপ ক্ষয় করে পুণ্যাত্মা রূপে ঈশ্বরের আরাধনা করা। কোরান ও হাদিসের ছত্রে ছত্রে ঈশ্বরকে ‘দয়াময়’, ‘ক্ষমাশীল’ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে।

গল্লেবের রুকু দেওয়ানের মুখে বহুবার ‘পাপ’ শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। ইসলামি শাস্ত্রের প্রতি অগাধ বিশ্বাস সাদাসিধে একজন গ্রাম্য বালিকা হয়ে রুকুর নিষিদ্ধপন্থীতে আগমন— ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের এই ‘জার্নি’কে রুকুর পাপ বলেই অনুভূত হয়েছে। ছেলে সম্বুদ্ধ সন্ন্যাসীর কথায় তার উল্লেখ রয়েছে:

হয়তো মুসলমান বলেই মায়ের পাপবোধের কোনো সীমা ছিল না। নামাজ পড়তেন ফজরে (সূর্যের প্রথম আলো আসার আগে) আর মাগরিবে (সূর্যাস্তের পর মুহূর্ত কয়েক দণ্ড মাগরিব)। আর সুগন্ধি সাবান দিয়ে ফজরের আগে ফজর-স্নান দিতেন। সেই সুঘ্রাণ মনে পড়ে সম্বুদ্ধের। মা তাঁর জায়নামাজ (নামাজের আসন) পুত্রকেও স্পর্শ করতে দিতেন না।

একদিন আমি মায়ের টাকা গুনতে গিয়ে মায়ের মনে চরম প্রতিক্রিয়া ঘটে। মা বলে ওঠেন, খবরদার পুটু, এই পাপের টাকা তুমি এক পাকিও ছোঁবে না। তুমি মায়ের দালাল নও পুটু। তুমি ছাত্র। তোমাকে বি এ-এম এ পাশ দিতে হবে। তুমি বিদ্বান

সন্ম্যেসী হবে। যাও, পড়ার ঘরে যাও। ভালো না লাগে, আকাশের তারা গুনবে। বেশ্যার
টাকা নয় পুট।^{১৪৬}

রুকুর নিজস্ব পরণকথা ছিল এই আকাশের নক্ষত্রকে ঘিরেই। মায়ের বিশ্বাস তার
‘ব্যভিচারী’ জীবনের পাপ তার পুত্র সম্বুদ্ধ দূর করবে। রুকু ছেলেকে এম.এ পাশ
করিয়েছে। নিষিদ্ধপল্লীর ‘নরকে’ সে কখনও ঢুকতে দেয়নি ছেলেকে। রুকুর পুত্র সম্বুদ্ধ
সন্ম্যেসীই এক পরণকথা শুনিয়েছে সকলকে, যে পরণকথা রুকুই একদিন তার সন্তানকে
শুনিয়েছিল। বালক পুটকে রুকু ছাদে বসে আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে দেখাত, যার
নাম সে বলেছিল— ‘জহুরাতুল কোবরা’। সম্বুদ্ধ সন্ম্যেসী লিখেছে, তার মা রুকু ওই তারা
দেখতে চাইতেন অন্যের চোখ দিয়ে। নিষিদ্ধপল্লীর একদল বারবণিতা সেই উজ্জ্বল
নক্ষত্রের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। সম্বুদ্ধের পরণকথা অনুসারে, জহুরা
ছিলেন একজন নিঃসঙ্গ রূপাজিবা। আকাশের জহুরা নক্ষত্র তার নামাঙ্কিত। পরণকথার
নায়িকাই হল জহুরা। সামান্য একজন বারবণিতা এমন মহানুভব জীবন কীভাবে পেল!
সেই গল্প শুনিয়েছে সম্বুদ্ধ।

পরণকথা অনুযায়ী, জহুরা নামের গণিকা দেহের বেসাত করেই জীবন নির্বাহ
করত। রাজার হারেমের মতো কোনো উন্নত জায়গায় তার ঠাঁই হয়নি। একজন সাধারণ
বারবণিতা যে আল্লাহর নামে কোনো কথা বলার শিক্ষাও পায়নি। নিজেকে পাপবিদ্ধ
‘বেশ্যা’ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারত না গণ-বিনোদিনী জহুরা। তার মনে হত, খোদাকে
ডাকার অধিকারও সে হারিয়েছে। মানুষের সংসার থেকে সে শতধা বিচ্ছিন্ন। তার পাপের
ভার ডুবে মরার মতো জলও নেই শুষ্ক মরুভূমিতে। শাস্ত্রের নিয়ম মতে, জহুরা জানত
মৃত্যুর পর অতি নিকৃষ্ট নরকে তার ঠাঁই হবে। নিজের জীবন নিয়ে বিভ্রান্ত ও বীতশ্রদ্ধ
জহুরা একদিন রাস্তায় দেখে, মরুভূমির তৃষ্ণায় ছটফট করে মরে যাচ্ছে একটি বাচ্চা

কুকুর। নির্জন মরুপ্রান্তরে জলের জন্য তখন মৃত্যুন্মুখ কুকুরটি। নিঃসঙ্গ পতিতা জহুরার সর্নিবন্ধ মিনতি মানবতাবাদী চারিত্র্যকে পরিস্ফুট করেছে:

হে খোয়াজা খিজির, হে পানির ফরিস্তা, কাউকে যেন পানির মায়ায় বিভ্রান্ত না করেন,
হে দোস্ত আপনি হতভাগ্য পথিকের জন্য আব-এ-জমজম উন্মুক্ত করুন দয়াময়। আমি
কখনও খোদাকে ডাকিনি, কিন্তু আপনাকে বলছি, দয়া করে এই গণিকার কথা শুনুন।
শুনেছি আপনি জ্ঞানী, মরু আরাবার সকল জীবকে জ্ঞানদান করুন, যাতে তারা বুঝতে
পারে, দিগন্তে যা ছলছল করেছে, তা জল নয়। একমাত্র জমজমা (মরুকূপ)-এর পানিই
পানি, হে খোয়াজা!^{১৪৭}

ইসলামি পুরাণে জলের দেবদূত বলা হয় খিজিরকে। কোরান ও হাদীসে খিজিরকে
নবি (ঈশ্বর প্রেরিত দূত) বলে অভিহিত করা হয়েছে। খিজির ছিলেন মহাজ্ঞানী। মুসা
নবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং নানান অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা রয়েছে কোরানে।^{১৪৮}
মানুষকে বিপদকে রক্ষা করা এবং মানুষের জন্যে নানান হিতকর কাজ করতেন খিজির।
খিজির যখন পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলেন সেই সময় বাদশাহ ছিলেন জুলকারনাইন।
মুসলমান সমাজের অন্তরে অন্তরে খিজিরকে নিয়ে নানা চটকদার ঘটনা বিস্তার লাভ
করেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল ‘আবে হায়াত তত্ত্ব’।^{১৪৯} জমজম কূপ হল আরব মরুতে
অবস্থিত একটি কুয়ো, বর্তমানে মরুয় অবস্থিত। ইসলামি পুরাণ মতে, আল্লাহর নবি
হজরত ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইলের পদাঘাতে এই কূপের সৃষ্টি হয়। ধূ ধূ মরুপ্রান্তরে
যখন ইব্রাহিমের দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরা জলের জন্য ছোট্টাছুটি করেছিলেন তখন শিশু
ইসমাইলের পায়ে আঘাতে ভূমি থেকে জল নির্গত হয় এবং সেটিই পরবর্তীকালে জমজম
কূপে পরিণত হয়।^{১৫০} জমজম কূপের কথা কোরানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই,
মুসলমানদের হাদীসে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা জমজম
কূপের জল পবিত্র বলেই বিশ্বাস করে। হজ্জ-যাত্রীরা এই জল পান করেন এবং সঙ্গে

করে নিয়ে আসেন। ভারতীয় পুরাণে গঙ্গার জলকে যেমন পবিত্র রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, মুসলমানদের কাছে জমজম কূপের জলের মাহাত্ম্যও সেইরূপ। দুই জলের উৎপত্তির মূলেই পৌরাণিক গল্পের অবতারণা আছে।

বস্তুত সেই কারণেই গল্পের পরণকথার নায়িকা জহুরা নামী গণিকা জলের দেবতা খিজিরের কাছে জলের জন্য প্রার্থনা করেছেন। তৃষ্ণার্ত কুকুরের জন্য কূপের সন্ধানে মরুভূমিতে ছোট্টাছুটি করার পর শেষমেশ একটি কূপের দেখা পায় জহুরা। কিন্তু কূপের জল তলদেশে তলিয়ে গেছে। খোদাকে কখনও জহুরা মনেপ্রাণে ডাকেনি, সে বরাবর ভাবত জগতের কুখ্যাত নরকে সে বাস করে, তার আত্মা কলুষিত, দেহ পাশে পরিপূর্ণ, সংসারের তাপে ও কঠিন শৈত্যে নিষ্করণ তার হৃদয়, কোন মুখে খোদাকে ডাকবে সে— এই প্রথম প্রাণভরে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল জহুরা। আর মরুভূমির ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ তার মস্তিষ্কে দিয়েছিলেন বুদ্ধির সুতীক্ষ্ণ ঝলক। গায়ের পোশাক ছিঁড়ে জহুরা বানাল দড়ি, এবং পায়ের জুতো খুলে সেই দড়ির শেষপ্রান্তে বেঁধে কূপের গভীরে নামিয়ে দিল। নিমেষেই উঠে এল জুতো ভর্তি জল। তারপর অতি যত্নে সেই জল পান করাল তৃষ্ণার্ত কুকুরকে। জল পান করে কুকুর উঠে দাঁড়াতেই জহুরা বলল:

তুমি অপবিত্র জীব, আমিও না-পাক ঔরত। এসো আমরা একসঙ্গে বাঁচি।^{১৫}

এই ঘটনার পর কুকুরটি জহুরার নেওটা হয়ে মরুভূমির বেশ্যা বাজারে রয়ে গেল। তারপর একদিন অপঘাতে মারা গেল রূপাজিবা জহুরা। সমাজের চোখে নিকৃষ্ট একজন ‘বেশ্যা’ নারীর মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করল না। মালকিনের মৃতদেহ আগলে বসে রইল কিংবদন্তির কুকুর। হঠাৎ কুকুরটি লক্ষ করল:

সম্মুখের মৃতদেহ থেকে ঠিকরে বার হচ্ছে আশ্চর্য জ্যোতি আর ধীরে ধীরে দেহটি জ্যোতির্বলয়ে বদলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে দেহটিই আর রইল না। আলোর বলয়টি ধীরে ধীরে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে আকাশের দিকে উড়ে চলল। এবং সংহত হতে লাগল। তারপর সেই আলোক-বলয় নক্ষত্রে পরিণত হয়ে আকাশে স্থির হয়ে দীপ্তি পেতে থাকল।^{১৫২}

পশ্চিমে আকাশে জ্বলতে থাকা উজ্জ্বল জহুরাতুল কোবরা-ই হল এই নক্ষত্র। জহুরার কুকুরটি নক্ষত্রের দিকে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে মিলিয়ে যায় পাহাড়ের বুকে। মরুভূমির পথে আর কোথাও তাকে দেখা যায় না। গল্পের শেষে দেখা যায়, সমুদ্র সন্ধ্যাসী মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ঘরে ফিরছে। আর পেছনে একটি কৃষ্ণকায় কুকুর তাকে অনুসরণ করছে। রুকু দেওয়ান যেন রূপাজীবা জহুরার কল্পরূপে মিশে যায়।

এ গল্পের রূপাজীবা জহুরার ঘটনা ইসলামি পুরাণের হাদিসে পাওয়া যায়। হাদিসে গণিকার নাম উল্লেখিত হয়নি, জহুরার গল্পকথা, নক্ষত্র রূপে আকাশে অবস্থান, এবং রুকুর পরণকথা এসবই গল্পকারের মৌলিক সৃষ্টি। ইসলামি পুরাণের অন্যতম আকরগ্রন্থ হাদিসে রয়েছে:

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর থেকে এ হাদিসের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, হজরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— একবার একটি পতিতা মহিলার সব গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হল। কারণ মহিলাটি একবার একটি রাস্তার উপর দিয়ে যাবার সময় দেখল, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে একটি কূপের পাশে দাঁড়িয়ে জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। পিপাসায় সে মরার উপক্রম। মহিলাটি কুকুরটির করুণ অবস্থা দেখে নিজের পায়ের মোজা খুলে ওড়নার সাথে বেঁধে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে কুকুরটিকে পান করাল। এই পুণ্য কাজের জন্য তার সকল গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হল। এ কথা শুনে উপস্থিত সাহাবীগণ (হজরত মুহম্মদের সঙ্গী ও অনুচর) প্রশ্ন করলেন, পশু-পাখির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার মধ্যেও কি আমাদের জন্য পুণ্য আছে? হজরত মুহম্মদ বললেন— হ্যাঁ। প্রত্যেকটি প্রাণীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার মধ্যেও পুণ্য আছে।^{১৫৩}

ইসলামি পুরাণের এই নীতিকথামূলক আখ্যান নিয়েই গল্পকার রুকু ও জহুরার পরণকথা নির্মাণ করেছেন। মানবদরদী কথাকার ছোটোগল্পের স্বল্প পরিসরে এমন অভিনব বিষয় ও আঙ্গিকের মধ্যে দিয়ে একই সঙ্গে মুসলিম নারী জীবনের তালাক-প্রথা, পিতৃতান্ত্রিক পরাকাষ্ঠার ফলে নারীর অস্বস্তিকর অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি ভাষাহীন প্রাণীদের প্রতি লেখকের মায়াময় দৃষ্টিভঙ্গি গল্পটিকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। নিষিদ্ধপল্লীর একজন পতিতার অচ্ছুৎ মৃতদেহকে অদ্ভুত জাদু বাস্তবতায় স্থান দিয়েছেন পশ্চিম আকাশের চাঁদের বুকে। এ যেন রূপকথার কলঙ্কিত চাঁদ সাদরে গ্রহণ করেছে মর্ত্যের মানুষের চোখে ‘কলঙ্কিত নারী’কে। গ্রামীণ মুসলিম নারীর যৌন-শোষণ ও যৌনতার দাসত্ববৃত্তি যেমন উঠে এসেছে, তেমনি যৌন লাঞ্ছনার শিকার এমন নারীকে লেখক উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠা করে চরিত্রকে দিয়েছেন মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি।

‘ডানামেলা বৃশ্চিক’ গল্পটি শুরুই হয়েছে আসমানতারা চরিত্রের স্বামীর বাড়ি যাবার পথযাত্রা দিয়ে। আসমানতারার ভাই মীর নাসিরুদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মৌলবী ধরনের মানুষ। মুসলমান পুথি আত্মস্থ করে। দিনা নামের একটি মেয়ে, যে সম্পর্কে মীরের বৌদি। দিনা মীরের প্রতি মুগ্ধ হলেও মীর তার আকাজ্জ্ঞা পূরণ করতে ভয় পায়, তার ভয় হয় পাছে তার বোন আসমানতারাকেও যদি ‘বারো ভূতে ভোগ করে’। গল্পকারের বিবৃতি ও বর্ণনায় অভিব্যক্ত হয়েছে দেহাতি মুসলিম নারীর যৌনদাসত্বের রূঢ় বাস্তবতা। যৌনতা নিয়ে গ্রামীণ মুসলিম জনমানসে যে সমস্ত বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে তাতে নারী ভোগের সামগ্রী বৈ আর কিছু নয়। যৌনতা মূলত একপাক্ষিক— সবটাই পুরুষের অধিকৃত এবং এটাই জীবনচর্যাগত এক স্বাভাবিকতা। শরিয়তি অনুশাসনে বিবাহ হল শারীরিকভাবে নারী-পুরুষের মিলনের সামাজিক চুক্তি। আর গোঁড়াপন্থী জনপদে এই চুক্তি রক্ষার দায়িত্ব বর্তায় নারীর উপর এবং চুক্তিভঙ্গের একচ্ছত্র অধিকার পুরুষের। গল্পের আসমানতারা

চুক্তি রক্ষার তাগিদেই ভাই মীরের সঙ্গে যাচ্ছিল স্বামীর ঘরে। অথচ স্বামী হাসর আলি আসমানতারাকে গ্রহণ করতে চায় না। ইসলামি পুরাণে হাসর বলতে মহাপ্রলয় বা মহাবিচারের দিনকে বোঝায়। হাসরের বক্তব্যই যেন আসমানতারার ভ্রামণিক জীবনের বিচারের রায়। রাতের দিকে পার্টির কর্মীরা হাসরের কাছে অনুমতি নিয়ে আসমানতারাকে ধর্ষণ করে। তিনজন যুবক একসঙ্গে অত্যাচার চালায়। পুরুষের ধর্ষকামী মানসিকতায় বিশ্বস্ত হয়ে অসহায় আসমানতারার— ‘জাগো জাতি, জাগো ইসলাম, জাগো সমাজ’— উক্তির মধ্যে দিয়েই নারীর ব্যক্তিক ট্রাজেডি যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি গোঁড়াপন্থী সমাজের প্রতি একরাশ বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণা প্রকাশিত হয়েছে। অত্যাচারী ধর্ষকদের মীর বলেছে দাজ্জাল:

বোন। এরা সেই খরে দাজ্জাল। আখরি জমানায় গাধার পিঠে চড়ে আসবে। গাধার ডান চোখ এবং তার বাঁ চোখ কানা। গাধার পিঠের দুপাশে ঝুলবে দুটি প্রকাণ্ড থলে। একদিকে বেহেস্ত, অন্যদিকে দোজখ। মসিউল অর্থ মোসী বলে— একপাশে থলেয় থাকবে সমাজতন্ত্র। অন্য পৃষ্ঠে ঝুলবে ফ্যাসিবাদ। দাজ্জালের কপালে লেখা থাকবে কাফ ফেরেত= কাফের। কিন্তু তখন সাক্ষরতার বান ডাকবে। পিদ্দিম জ্বলবে ঘরে ঘরে, কিন্তু কেউ পড়ে উঠতে পারবে না কাফের শব্দটি। সমস্ত সংগ্রহের পৃষ্ঠা মুছে যাবে।^{১৫৪}

ইসলামি পুরাণে দাজ্জাল হল এক অশুভ শক্তি। হাদিসে দাজ্জালের আবির্ভাব ও কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।^{১৫৫} বিধায়কের শাগ্রেদ এবং হাসরের বন্ধুরা যেন দাজ্জালের ছদ্মবেশে আসমানতারাকে পথভ্রষ্ট করেছে। এরপর দুটি মাস্কেটের বিনিময়ে বিক্রি হয়ে যায় আসমানতারা। নারীকে পণ্য হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় পুরানো যুগের আরবীয় প্রথায় যেন একালের বাংলার সমাজজীবনকে গ্রাস করেছে। শরিয়তি গোঁড়া সমাজের অনুশাসনের বলি নারীদের ভবিতব্য ও নিয়তিই এ গল্পের মূল উপজীব্য।

গল্পকার ‘রুকু দেওয়ান’ বা ‘ডানামেলা বৃশ্চিক’ গল্পে পুরুষতান্ত্রিকতার যূপকাণ্টে বন্দি মুসলিম নারীর পরাধীন জীবন অবস্থা দেখিয়েছিলেন, আর ‘দুই অক্ষরের গল্প’তে গল্পকার রুকু দেওয়ান বা আসমানতারার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে থাকা এমন এক নারী চরিত্র নির্মাণ করেছেন, যে শরিয়তি আইনকানুন ও সামাজিক অনুশাসনের গোঁড়া-মুখে সজোরে থাপ্পড় মেরে ব্যক্তিত্বময়ী হয়ে উঠেছে। আবুল বাশারের গল্পে নাজিয়া এক ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র। দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা এই গল্পের আখ্যান আবর্তিত হয়েছে একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে। গল্পে দাঙ্গার প্রেক্ষাপট মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ও বহরমপুর। এক দাঙ্গায় মারা যায় কাজী জাফরের দাদাজি সালাউদ্দিন। দাদাজির মৃত্যু জাফরের ভেতরের মুসলমানিত্বকে কঠোরভাবে জাগিয়ে দিয়েছিল। জাফরের মধ্যে মুসলিম হিসাবে আত্মগরিমা যেমন আছে, তেমনি পাশাপাশি হিন্দুদের প্রতি তার সুগু বিদ্বেষের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। জাফর সাহেবের একমাত্র মেয়ে নাজিয়া প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে উৎপলের সঙ্গে। নাজিয়া ধর্মীয় পরিচয়ের উর্দে উঠে সামাজিক মেলামেশায় বিশ্বাসী। এই সূত্রেই সে উৎপলকে তার বাড়ি নিয়ে এসেছিল। জাফর মেয়েকে হিন্দু বন্ধুদের থেকে দূরে সরিয়ে মুসলমান ছেলে ওয়াশেফের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। নাজিয়া বাড়িতে চায়ের চায়ের কাপের তলায় জল দিয়ে লিখেছিল ইংরেজি ‘U’। উৎপলের নামের আদ্যক্ষর হল ‘U’। জাফরের চোখে পড়তেই জাফর ‘U’ কে ‘W’ করে দিয়েছিলেন। জাফরের বিশ্বাস ‘U’ কে ‘W’-তে পরিণত করতে তাকে বেশি বেগ পেতে হবে না। স্বামীর কথা শুনে মারিয়ার মনে হয়েছে, ‘মেয়ে তার, তারই জীবনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। শুধু W-এর মধ্যে একটি U চিরকাল লুকিয়ে থাকে।’ মারিয়ার মনে পড়েছে তার পূর্বপ্রেমিক আশিকুলের কথা। আশিকুলের A-কে Z (জাফর)-এ পরিণত করেছে একদিন তার স্বামী। দাদাজির সামনে প্রেমভাষণ-এর সংসাহস ছিল না মারিয়ার। ‘ভালোবাসি’— এই একটি বাক্য উচ্চারণও করতে

পারেনি মারিয়া। বস্তুত এরপরেই আশিকের জায়গায় জাফর এল। শুরু হল মারিয়ার দাম্পত্য জীবন। এখন মেয়ের মধ্যে মারিয়া নিজের অতীতকে দেখতে পাচ্ছে।

একটি বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মারিয়া পরিবারের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে স্বাধীনচেতা হয়ে উঠতে পারেনি। অথচ তাদের মেয়ে নাজিয়া ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের প্রশ্নে আপোষহীন। দাঙ্গার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে একদিন নাজিয়া জখম পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায়, উৎপলের কাঁধে ভর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে। উনিশ বছরের নাজিয়ার এই দুরন্তপনা, স্বাধীনচেতা মনোভাব দেখে মারিয়া স্তম্ভিত হয়ে যায়। ভোরের দিকে মারিয়ার ঘুম ভাঙলে দেখে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ অগ্রসর হয়েছে সিঁড়ির দিকে। নাজিয়া কোথাও নেই। উৎপলের সঙ্গে সে চলে গেছে:

হঠাৎ যেন ষোল বছরের মারিয়ার গালে চড় মেরে কে যেন বলেছে, বল্ ভালোবাসি।
বল্! মিথ্যুক কোথাকার! বেণী দুলিয়ে কখনও আর ওভাবে মাথা নেড় না। বুঝলে?^{১৫৬}

পারিবারিক বিধিনিষেধের জালে বন্দি হয়ে মারিয়া একদিন সহজ সত্যিটা স্বীকার করতে পারেনি, মেয়ে নাজিয়া কেবল পরিবার নয়, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের তোয়াক্কা না করে স্বাধীন মনোবৃত্তির কথা ঘোষণা করেছে সোচ্চারে। বাংলা কথাসাহিত্যে উনিশ শতকের সমাজ রোহিণীকে হত্যা করে, কুন্দনন্দিনীকে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়। বিশ শতকের সাহিত্যে এই দৃশ্য আর আবর্তিত হয় না। কপিলা অনায়াসে কুবেরের সঙ্গে ময়নাদ্বীপে পাড়ি দেয়, লাবণ্য অমিতকে ভালোবেসে শোভনলালকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। নাজিয়া তো লাবণ্যদেরই উত্তরাধিকার বহন করছে। আধুনিকমনস্ক নারী, যে জগৎ ও জীবনকে যুক্তির আলোকে দেখতে চেয়েছে। এ গল্পে লেখক অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি দিয়ে শরিয়তি অনুশাসনের উর্ধ্ব মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ইসলামি পুরাণ, শাস্ত্রীয় ও শরিয়তি ইসলামের বহু ঘটনা ও বিধিনিষেধকে গল্পের বিষয় করে তুললেও আবুল বাশার লৌকিক ইসলামের বিভিন্ন দিক এবং শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে লোকায়ত মিথের দ্বন্দ্ব নিয়ে বেশ কিছু আখ্যান নির্মাণ করেছেন। গল্পের উৎসমুখ-এ ব্যাপারে লেখক সংক্ষেপে আলোচনাও করেছেন। বাংলার লোকায়ত ইসলামের সূচনা মূলত সুফি মতবাদের মধ্যে দিয়ে। সুফি মতবাদের প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি বাউল-ফকির বা পিরতত্ত্বের উদ্ভব, কোরান ও হাদিস— অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ইসলামের এক একটি ব্যাখ্যার পথ ধরে এক একটি দল-উপদলের সৃষ্টি, পাশাপাশি খলিফা, ইমাম বা পিরতত্ত্বের প্রভাবে বিবিধ উপদলের বিভাজন— শরিয়তি ইসলাম এবং গোঁড়া মুসলমানদের ভেতরে বারংবার ক্রোধের জন্ম দিয়েছে।

সুফি মূলত প্রেমবাদ। সুফি মতবাদে যাকে বলা হয়— ‘ফানাফিল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া। সুফি মতবাদের উৎস নিয়ে বহু মতানৈক্য থাকলেও অধিকাংশ বিজ্ঞজনের মতে, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, তন্ত্র এবং ইসলাম ইত্যাদি মতবাদের সংমিশ্রণে সুফি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্বকালে আরব উপদ্বীপে ইহুদিদের তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন বা হৃদয় দিয়ে চিন্তা করার উপাসনা, খ্রিস্টানদের বৈরাগ্য সাধনা এসবের পাশাপাশি নিবিষ্টমনে ধ্যান বা উপাসনা শাস্ত্রীয় ইসলামের আদি বৈশিষ্ট্য ছিল। বিশেষত আরবের হেরা পর্বতের গুহায় হজরত মুহম্মদের ‘নবুয়ত প্রাপ্তি’ (ঈশ্বর প্রেরিত দূত হিসাবে আত্মপ্রকাশ), নবুয়ত প্রাপ্তির আগে মহম্মদ নিভূতে আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। ইহজগতের ভোগবিলাস বিমুখতা ও বিষয়ে অনাসক্তি তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।^{১৫৭}

ইসলামে আল্লাহ-কে মৌখিকভাবে স্মরণ করাকে ‘জিকির’ বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় ‘জিকির’-এর অর্থই হল স্মরণ করা। কোরানে বহুবার ‘জিকির’-এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে।^{১৫৮} যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই যখন তার উদ্ভূত গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য কোনো স্থানে প্রচারলাভ করে তখন ধর্মের শাস্ত্রীয় পরিমণ্ডল ছাড়াও সেই অঞ্চলের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও প্রচলিত সংস্কৃতির সঙ্গে সেই ধর্মের বাহ্যিক লোকাচার— যেমন আচার, অনুষ্ঠানের একটি সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, যার মধ্যে দিয়ে একটি মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম হয়। বহু লৌকিক কালচার ধর্মের আদি অনুশাসনের সঙ্গে মেলে না। এইভাবে একটি ধর্মের মূল নীতিগুলির সঙ্গে বহু রীতি রেওয়াজ, কিংবদন্তি, গালগল্প ইত্যাদি জুড়ে লোকাচার মিশ্রের সৃষ্টি হয়। যার সঙ্গে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের ঘোর বিরোধ তৈরি হয়। বৌদ্ধ, ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে।^{১৫৯} বাংলার অধিকাংশ মুসলমান নিম্নবর্ণীয় হিন্দু, উচ্চবর্ণের অত্যাচারে ধর্মান্তরিত হওয়া মানুষ। ইসলাম ধর্মের পরিবর্তিত অবস্থা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ‘লৌকিক ইসলামে’র। যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেরই লৌকিক রূপ স্থান ভেদে পৃথক। বিশেষত, বাংলার লৌকিক ইসলামের (পির-ফকিরদের মতবাদ) সঙ্গে শাস্ত্রীয় ইসলামের (কোরান-হাদিস ও পরবর্তীকালের ইমামদের মতবাদ) ভয়ানক বিরোধ। শাস্ত্রীয় ইসলাম কোরান বা হাদিস বহির্ভূত কোনো নিয়ম-রীতিকে মান্যতা করে না। ইসলামি পরিভাষায় এগুলিকে ‘বিদআত’ বলে। এছাড়াও পৌত্তলিকতা বা বহুঈশ্বরবাদ চর্চা করাকে ইসলামে পাপ বলে গণ্য করা হয়। ইসলামি পরিভাষায় যাকে বলা হয় ‘শিরক’— অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য হিসাবে নির্ধারিত করা বা তার উপাসনা করা। আল্লাহ-কে স্রষ্টা হিসাবে মান্য করার পাশাপাশি কোনো বস্তুকে স্রষ্টার অস্তিত্ব বা কর্তৃত্বের অংশীদার হিসাবে সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে। ইসলামি পুরাণের বহু জায়গায় ‘স্রষ্টার একত্ববাদ’ নিয়ে বহু আলোচনা

রয়েছে। কথিত আছে, হজরত মুহম্মদ তাঁর নবি জীবনের সময়ে ‘একেশ্বরবাদ’ বিষয়ক নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। পৌত্তলিকতা বিষয়ে ইহুদিপন্থীদের সঙ্গে হজরত মুহম্মদের দ্বন্দ্ব চলাকালীন কোরান-এর ১১২ সংখ্যক সূরা এখলাস রচিত হয়। এ সূরার মূল বক্তব্যই ছিল একেশ্বরবাদের প্রচার। কোরান-এ ব্যাপারে স্পষ্টতই বলা হয়েছে:

বল— তিনিই একমাত্র আল্লাহ্ (উপাস্য), একক ও অদ্বিতীয়।

আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

তিনি জনক নন, এবং জাতকও নন।

তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।^{১৬০}

ফকির-পিরদের বিবিধ মতবাদ এবং তার পাশাপাশি লৌকিক স্তরে কোরানের বিচিত্র ফকিরি বিশ্লেষণ, ‘আউল-বাউলের কোরানীয় মতবাদ’ প্রাতিষ্ঠানিক ইসলাম কোনোদিনই মান্য করেনি। শরিয়তি ও মারফতি তত্ত্বের সংঘর্ষ থেকেই সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কার শাসিত মূল্যবোধের ব্যাপক স্তরে একটি অদ্ভুত ধারণা প্রচারলাভ করেছে যে, এক শ্রেণির সমাজছুট মুসলমান কোরানকে উল্টো করে পাঠ করার পক্ষপাতী। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে নাকি কোরানের মন্ত্র জাদুতে পরিণত হয়। শাস্ত্রীয় ইসলামই এই ব্যাখ্যার রূপকার, তাদের ধারণা মাফিক বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধারা উল্টো-কোরান পড়া ও ব্যাখ্যা করার প্রবণতা রয়েছে, এবং তা শরিয়তি ইসলামের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ। শরিয়তি মতে, কোরানের আরবি হরফ ডানদিক থেকে বাঁদিকে পড়া হয় এবং প্রথম সংখ্যক সূরা ফতেহা থেকে শেষতম সূরা নাস পর্যন্ত ক্রমানুসারে পড়তে হয়। বাউলদের উল্টো ধারা কোরান পড়াকে শাস্ত্রীয় ইসলাম ‘কোরানের বিকৃতকারী’ ও ‘অবমাননাকারী’ আখ্যা দেয়। এছাড়া পিরপন্থীদের অনেকেই কোরানের বর্তমান সংকলনকে সমগ্র কোরান হিসাবে মান্য করে না, তাদের মতে এটি প্রক্ষিপ্ত অংশ। এ নিয়ে শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে পিরপন্থীদের তীব্র দ্বন্দ্ব রয়েছে। এমন বহু কারণেই শরিয়তি

ইসলাম পিরপস্থীদের স্বীকার করে না। অন্যদিকে বাউল-ফকির সম্প্রদায়কেও শরিয়তপস্থীরা প্রতি পদক্ষেপে হয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। বাউল-ফকির সম্প্রদায় মনে করে, তাদের কোণঠাসা করার জন্যেই উল্টো-কোরানের এমন মনগড়া তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে শরিয়তপস্থীরা। শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে ফকিরদের বিশ্বাসের এমন বহুবিধ দ্বন্দ্ব নিয়েই আবুল বাশার রচনা করেছেন ‘দ্বৈরথ’ ও ‘অন্য নকসি’-র মতো ছোটোগল্প।

কোরান উল্টো করে পড়া কেবল শাস্ত্রীয় ইসলামের বিশ্বাস নয়, তাদের সংস্কারগত জীবনে তা রূপ ধারণ করে আছে লৌকিক কল্পনার বিড়ম্বনা হিসাবে। ‘দ্বৈরথ’ গল্প সেই বিড়ম্বনার ছায়াছবি। এ গল্পে তাবিজ-মন্ত্রের দ্বারা বশীকরণের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন গল্পকার। মন্ত্রের সাহায্যে মানুষের উপর জাদুটোনার ইতিহাস ইসলামি পুরাণের কোরানেও উল্লেখ রয়েছে। স্বয়ং হজরত মুহম্মদ জাদুটোনার কবলে পড়েছিলেন তাঁর নবি জীবনের সময়ে। কোরান-এর শেষতম দুই সুরা, অর্থাৎ ১১৩ সংখ্যক সুরা ফালাক এবং ১১৪ সংখ্যক সুরা নাস-এ এ ঘটনার বর্ণনা রয়েছে।^{১৬১} উল্লেখিত দুটি সুরা-ই রচিত হয়েছে হজরত মুহম্মদের উপর জাদুমন্ত্র এবং সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে। ‘মুসনাদে আহমদ’-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, জনৈক ইহুদি হজরত মুহম্মদের উপর জাদু করেছিল। এরফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফেরেশতা জিবরাইল মুহম্মদের কাছে এসে জানান, জনৈক ইহুদি জাদু করেছে এবং যে জিনিসে জাদু করা হয়েছে, তা এক কূপের মধ্যে আছে। হজরত মুহম্মদ তাঁর অনুচরদের পাঠিয়ে সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনতে বলেছিলেন। তাতে একখণ্ড কাপড় ছিল ও কাপড়ে সুতোর অসংখ্য গেরো বা গিঁট ছিল। জিবরাইল মারফত মুহম্মদ উল্লেখিত দুই সুরার আয়াতগুলি শোনার পর তা উচ্চারণ করা মাত্রই সুতোর গেরোগুলি খুলে যায় এবং মুহম্মদ সুস্থ হয়ে ওঠেন।^{১৬২}

গল্পের নায়ক তহিদুল একজন পরম ধার্মিক মুসলমান। সে কোরানের হাফেজ। আরবি হেফজ শব্দের অর্থ রক্ষক, অর্থাৎ যিনি কোরান কণ্ঠস্থ ও চোঁটস্থ করে কোরানের রক্ষা করে থাকেন তাকে হাফেজ বলা হয়। তহিদুল পাঁচবার নামাজ পড়ে। সে একজন ‘তালবিলিম’ বা ‘তালেব-উল-ইলম্’ অর্থাৎ জ্ঞান অন্বেষণকারী বা শিক্ষার্থী। তহিদুল ছেলেবেলায় এসেছে সোনামাটির মাদ্রাসায় আরবি-উর্দু এবং ইসলামি শাস্ত্র (কোরান-হাদিস) শিখতে। কোরান শিক্ষা তার শেষ হয়েছে। সে থাকে হাজী এরশাদ খান চৌধুরীর বাড়িতে। যার আশ্রয়ে থেকে ‘তালবিলিম’ শিক্ষাভ্যাস করে তাকে বলা হয় জায়গিরদার। চৌধুরীর কল্যাণেই তহিদুল আজ খাঁটি মুসলমান ও ইসলামি শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েছে।

আরবি বাক্য ডানদিক থেকে বাঁ দিকে পড়তে হয়। একদিন ভোরের নামাজ (ফজরের নামাজ) শেষে তহিদুল রেহেলে কোরান রেখে সুর ধরে পড়া শুরু করেছিল। এমন সময় আচমকা হাওয়া এসে তার কোরানের পাতাগুলি লগুভগু করে দেয়। হাওয়ার ঝাপটায় কোরানের পাতা বামদিক থেকে ডানদিকে চলে যায়। কৌতূহলবশত তহিদুল কোরানের সুরা বাঁ দিক থেকে ডানদিকে পড়তে চায়। সে জানে শাস্ত্রে বলা হয়েছে, উল্টো করে কোরান পড়লে গুনাহ্‌গার (পাপী) হতে হবে। ‘যদি কেউ এই নিয়ম লঙ্ঘন করে, বাঁ থেকে ডানদিকে পড়তে চায় তাহলে সে ইবলিশ। সে আজাজিল। সে হল না-পাক আদমী। আল্লাহ্র শত্রু। মানবিকতার দুশমন। বেগুমার পাপে সে হয় নিপতিত। উত্থান রহিত সে মনুষ্য হাবিয়ার জ্বালানিতে পরিগণিত হবে।’ আজাজিল হলেন একজন ইবলিশ। খোদার শত্রু। আর হাবিয়া সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ভয়াবহ নরক।^{১৬৩} উল্টো কোরান কয়েক পাতা পড়া মাত্রই ধার্মিক তহিদুলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল ভয়াবহ। সে অপরাধবোধে জর্জরিত হয়।

তহিদুলের সংগ্রহে রয়েছে অসংখ্য তাবিজের বই। তাবিজ-জাদু দিয়ে মানুষকে কীভাবে বশ করা যায় তার ফাঁকফোকর তহিদুলের হস্তগত। চৌধুরী সাহেব তহিদুলকে বড্ড সমীহ করেন। কারণ চৌধুরী তহিদুলের কাছে তার প্রয়োজনীয় বহু তাবিজ নেন। বেনামী জমিতে আধিপত্য বিস্তার করার কৌশল, বৌ এবং মেয়েকে বশে রাখা— ইত্যাদি কারণে চৌধুরী তাবিজের প্রয়োগ করেছেন। বড়ো মেয়ে চৌধুরীর মর্জির খেলাপে পছন্দমতো ছেলেকে বিয়ে করেছে। বস্তুত সেই কারণেই চৌধুরী ছোটো মেয়ে তহমিনা ওরফে লাইলিকে বশে রাখতে চান। সাতদিন পর লাইলির বিয়ে। অন্যদিকে দু’দিন আগেই তহিদুল মনিবের মেয়ে লাইলিকে হবু স্বামীর মন-ভোলানো তাবিজ ব’লে একটি তাবিজ লাইলির হাতে বেঁধে দিয়েছে। লাইলি আকর্ষণ অনুভব করে তহিদুলের প্রতি। তাবিজের দৌলতে টলে যায় লাইলির অনাগত ভবিষ্যতের সমস্ত কল্পনা। ধার্মিক ছেলে তহিদুল অপরাধবোধে দগ্ধ হয়:

তহিদ উল্টো-পুরাণের পাপী বলেই আজ, এখন, এই মুহূর্তে বাংলা শব্দে এত সুন্দর করে ভাবতে পারছে। অবশ্যই আজাজিল তাকে ভর করেছে। মনিব-কন্যার রূপ নিয়ে পর্যালোচনা, তাকে বশে আনার তাবিজী ষড়যন্ত্র, এ যে বড় পাপ হে! অন্নদাস তালবিলিমের মধ্যে এ কেমন যুদ্ধ!^{১৬৪}

তাবিজের কারসাজিতে লাইলি প্রেমে পড়ে তহিদুলের। বিয়ে করতে চায় তহিদুলকে। ইসলামি স্মৃতি-শাস্ত্র, নীতি-আদর্শ-শরিয়তি আইনকানুন-পাপ-পুণ্য সবকিছুই ক্ষণিকের উন্মাদনায় ভুলে যায় তহিদুল। তাবিজের বদৌলতে লাইলির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্ররোচনা তহিদুলকে বিবাহিত জীবনের পথে তাড়িত করে। রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় দু’জনে। ম্যারেজ রেজিস্টার কাম মৌলবী সিদ্দিক মোল্লার সামনে কলমা (ধর্মীয় মন্ত্র) পড়ে এবং রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয় দুজনের। তহিদুল বিয়ের প্রথম রাতেই তাহাজ্জুদের নামাজ (মধ্যরাতের বিশেষ নামাজ, আল্লাহকে অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে

এই নামাজ পড়া হয়। ইসলামি শাস্ত্রে এ নামাজকে ‘নফল’ বলা হয়। যা পালন করলে পুণ্য হয়, কিন্তু পালন না করলে কোনো পাপ হয় না) পড়তে চায়। আচমকা লাইলি এসে তহিদুলের ধর্মীয় সত্তার সমস্ত ভাবসম্মিলন ভঙ্গ করে দেয়। মনিবের বিনা অনুমতিতে তার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ, রাত্রিবাস— তহিদুলের ‘নামাজি হৃদয়’কে ক্ষতবিক্ষত করে। লাইলি তহিদুলের কাছে তাবিজ চায়, যাতে কেউ তাদের বাঁধনকে আলাদা করতে না পারে। উল্টোদিকে তাবিজের অসৎ উদ্দেশ্যের পরিণাম যে ভয়াবহ— অপরাধে বিদ্ধ হয়ে তহিদুল মুষড়ে পড়ে। কোরান-এর শ্লোক এবং তা থেকে উদ্ভূত তাবিজের শক্তির মালিক স্বয়ং আল্লাহ্, তহিদুলের মনে হল আল্লাহ্‌র শক্তির সঙ্গে যেন সে তার মোকাবিলা করেছে। যে পাপ ‘মালেকুল জিন্দেগি’ (জীবন-প্রভু) কখনও ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্-কে ছেড়ে সে আজাজিল শয়তানকে ভর করেছে। গল্পে আজাজিলের কথা বহুবার উল্লেখিত হয়েছে। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, মানুষ মাটি থেকে সৃষ্ট এবং ইবলিশ-শয়তান বা জ্বিন হল আগুন থেকে সৃষ্ট মানুষের মতোই একপ্রকার প্রজাতি। কোরান-এ ইবলিশ সম্পর্কে বহু শ্লোক রচিত হয়েছে। হাদিসেও ইবলিশ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করার পর আজাজিল নামক জ্বিনকে আদমকে সিজ্‌দা (মাথা নত করা) করতে বললে আজাজিল তা অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র অভিশাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যে নির্বাসিত হয়। একসময় আজাজিল ছিলেন আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম দাস। এমন বিচক্ষণ জ্বিন খোদার অবাধ্যতা করার ফলস্বরূপ আল্লাহ্‌র আসমান থেকে বিতাড়িত হয়। খোদাকে সে হারাতে পারে না, আবার নিজেও পরাজিত হয় না, অর্থাৎ পরাজয়কে মেনে না নিয়ে যুদ্ধ করে খোদার বিরুদ্ধে। ইবলিসের প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষ জাতিকে পথভ্রষ্ট করে তাদের দলভুক্ত করা। আজাজিল হলেন ইবলিশদের সর্দার। পরকালে ইবলিশের স্থান হবে জাহান্নাম বা নরক। ‘খোদার দুষমন’ আজাজিলের মতোই যেন স্পর্ধিত চরিত্র হয়ে ওঠে

তহিদুল। বিয়ের প্রথম রাতের বাসরঘরকে তার কখনও মনে হয়েছে ‘বেহস্তের ডিঙি’, কখনও বা ‘হাবিয়ায় ভাসমান ছোট্ট একখানি কিস্তি’। আজাজিল যেন ঘাড়ে করে কোন মহাশূন্যে তাদের নিয়ে চলে এসেছে, যেখানে দুটি দিশেহারা নক্ষত্রের মতোই দু’জন মাটি থেকে বহু দূরে পৌঁছে গেছে। এমন দোলাচল চিত্তবৃত্তি, অস্তিত্বের অস্থিরতা ও পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বিকতার মাঝে হঠাৎ লাইলিকে আর মানবী বলে মনে হয় না তহিদুলের। লাইলি হয়ে উঠেছে যেন শত্রুপক্ষের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র— নারীর দেহ রূপান্তরিত হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তির বিপজ্জনক অস্ত্র রূপে:

লাইলির চোখে শজ্জিনীর কামনা। দোজখের চুল্লি। অন্ন-প্রভুর বেটি। মুখিয়া-মোড়লের মেয়ে। নারীর নগ্ন দেহকে মনে হল, বিরুদ্ধ পক্ষের বিপজ্জনক অস্ত্র। স্পর্শ করার সাথে সাথে ফেটে গিয়ে বলবে, আমি এরশাদ চৌধুরীর রক্তে গড়া, শুক্রাণু থেকে জাত, এ দেহে প্রভুরই প্রভুত্ব। তুই কে? স্পর্শ করতে হাত বাড়িয়ে বসে, কী করছিস? হাত টেনে নে। তোর দেহের প্রতিটি রক্তকণা তারই অঙ্গে তৈরি। তোর বীর্য অবধি তারই দয়ার আনন্দে পূর্ণ। এই দেহ নিয়ে পাপ করবি? খেলা করবি? যা ইচ্ছে তাই করবি?^{১৬৫}

তাবিজের অসৎ প্রয়োগ সম্পর্কে মুসলমানদের হাদিসে কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে। প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো নারীর সম্মতি ছাড়া জাদু বা তাবিজের সাহায্যে তাকে বশ করে কামনা চরিতার্থ করলে তার জন্য পরকালে ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা বিবৃত হয়েছে। মনিবের কন্যা লাইলির বিয়ে ভঙ্গ করে তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে তহিদুল যেন ‘দোজখের চুল্লি’তে প্রবেশ করেছে। বিয়ের পর প্রতিমুহূর্তে তহিদুল মানসিক অস্থিরতার অতলে তলিয়ে গেছে। খাঁটি মুসলমান হয়ে কৃত পাপ বারংবার বিদ্ধ করেছে তাকে। তহিদুলের অনুভূতিতে লাইলির দেহ ও ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে:

এই দেহে সিজদা (প্রণাম) করা উচিত। এই দেহ খোদার ঘর। আজাজিলকে খোদা বললেন, প্রণাম করো। সিজদা দাও। একখানি ঘর তৈরি করো। বানানো মূর্তিটা ঘরের মধ্যে রাখো। ওটা মানুষ। আমি এবার ঐ মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করব। তুমি যাকে মাটি দিয়ে বানিয়েছ, তাকেই এখন সিজদা করতে হবে। আল্লাহ হুকুম। আজাজিল শুনল না। লাইলিকে তহিদ তৈরি করেনি। খোদাই করেছেন। এত রূপ, এ যে বড় অপরূপ ঐশ্বর্য, সবই খোদার হাতে গড়া ভাস্কর্য। তহিদুল আজাজিল ছাড়া কিছু নয়। এই সেই ঘর। শয়তান বানিয়েছে। ঘাড়ে করে কোথা থেকে চুরি করে এনেছে। শূন্য বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। আজাজিল মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকলেই মানুষকে সিজদা করা হয়। তাই ঘরের দরজা খুব ছোট করে বানানো হয়েছিল। আজাজিল প্রথমে মাথা না গলিয়ে পা ঢুকিয়ে দিল। সিজদা নয়, লাথি। লাইলি-এর শাদের রক্ত। বীর্য। শুক্রাণু। এরশাদের অহংকার।^{১৬৬}

গল্পকার যেন মালিক এরশাদ চৌধুরী এবং তার অনুগত শিক্ষার্থী তহিদুলকে ঈশ্বর এবং তার দাসের রূপকে নির্মাণ করেছেন। আর লাইলি যেন হয়ে উঠেছে খোদার সৃষ্টি আদমের প্রতীক। আদমকে প্রণাম করতে আজাজিল অস্বীকৃত হলে খোদা একটি ছোট ঘর বানিয়ে সেখানে মাথা নত করে ঢুকতে বলেছিলেন, কিন্তু আজাজিল আত্মপ্রত্যয়ী ও অহংকারী হয়ে সে ঘরে মাথার বদলে প্রথমেই পা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এরপরেই ঈশ্বরের সঙ্গে আজাজিলের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত, এবং আজাজিল হন অভিশাপগ্রস্ত। তহিদুল যেন তার মনিব চৌধুরী নামক ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে তার সৃষ্টির প্রতি কামনার দৃষ্টি দিয়ে আজাজিল হয়ে উঠেছে। আদম সৃষ্টির পূর্বে আজাজিলও মহাধার্মিক ছিলেন, এমনকি আল্লাহর উপাসনার নিরিখে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ফেরেশতাদের সমতুল্য। ধার্মিক তহিদুলের অধঃপতন যেন আজাজিল চরিত্রেরই নব্য রূপান্তর। অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষতবিক্ষত হতে হতে লাইলির নগ্নদেহে ঝাঁপিয়ে পড়ে তহিদুল। লাইলিও শরিয়তি নিয়মে স্বামীকে শরীরের আবেষ্টনে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল। ‘যাকে সিজদা করার কথা ছিল, তহিদুল তার সঙ্গে পাপ করল’— এই অপরাধবোধে পীড়িত হয় তহিদুল। তার মনে পড়ে অতীতের কথা।

ছেলেবেলায় মা যখন এরশাদ চৌধুরীর বাড়িতে তাকে রাখতে এসেছিল, তখন টানা সাতদিন এরশাদ চৌধুরীর লালসার শিকার হয়েছিল তহিদুলের মা। ধর্ষিতা মায়ের যন্ত্রণা শৈশবেই তহিদুলের স্মৃতিতে, দেহের গোপন শোণিতে অচেনা ক্রোধের জন্ম দিয়েছিল। ছেলেকে পুণ্যবান বানাতে গিয়ে মায়ের শরীর চৌধুরীর পাপে কলুষিত হয়েছে। মায়ের যন্ত্রণারই যেন প্রতিশোধ নিচ্ছে তহিদুল। যেমন আজাজিল নামক ইবলিশ ঈশ্বরকৃত অপমানের প্রতিশোধ হিসাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে নরকের দিকে ঠেলে দেয় সন্তর্পণে।

আজাজিলের চারিত্রিক রূপান্তরের কথা নেই কোনো পুরাণে। অথচ গল্পের শেষে দেখা যায়, তহিদুল পৌরাণিক চরিত্রের আন্তরণ ভেদ করে পুনরায় মানুষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে দ্বিধাগ্রস্ত, তার মনের দোলাচলতা, সাময়িকভাবে দিশেহারা ইত্যাকার সমস্যা নিয়েও জীবনের চরম মুহূর্তে দাঁড়িয়ে স্মরণ করেছে তার আরাধ্য আল্লাহকে। পরদিন সকালে লাইলিকে দেখে সে উপলব্ধি করে, লাইলি যেন নারীর শ্রেষ্ঠ রূপ ‘পদ্মিনী’র মতোই পবিত্র। সিজ্জদা করতে ইচ্ছে করে তহিদুলের। তাবিজ আনার কারণ দেখিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রাস্তায় এসে তহিদুলের মনে হয়, বাড়িখানা যেন শয়তান কাঁধে করে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। গতরাতের সমস্ত পাপ জমে আছে যেন ওই বাড়িতে। তহিদুলের তাবিজের অলৌকিক ক্ষমতায় লাইলি একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, এখন লাইলিকে ফেলে তহিদুল অন্তর্হিত হল। গভীর রাতে দরজায় টোকা পড়লে লাইলি দরজা খোলে চমকে ওঠে। দরজায় সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং এরশাদ চৌধুরী এবং লাইলির বড়ো ভাই। কোনো জ্বিন-ইবলিশ নয়, মানুষ এসেছে লাইলির খোঁজে।

মানুষের চারিত্রিক রূপান্তর ও আত্মদীক্ষায় নতুন রূপে আবির্ভূত হওয়া, পৌরাণিক তাবিজ-জাদুটোনা ইত্যাকার পদ্ধতির মাধ্যমে নারীর হস্তান্তর, মুসলিম নারীর যৌনতার দাসত্ব, ক্ষমতাশালীদের কামাতুর লালসা ও নারীর সম্ভ্রম হরণের মর্মান্তিক কাহিনি— গল্পকার পৌরাণিক উপাখ্যানের উপরিসৌধে আধুনিক মুসলিম বাঙালি সমাজের কঠিনতম রুক্ষতার দিকটি স্পষ্ট করে তুলেছেন।

‘অন্য নকসি’ গল্পে রয়েছে শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে ফকির মতবাদের দ্বন্দ্ব এবং শরিয়তি গোঁড়াপন্থীদের হাতে ফকিরদের উপর অত্যাচারের নির্মম চিত্র। চর-সীমান্তের জীবন নিয়ে লেখা এই গল্পের স্থানিক নাম দেখে আন্দাজ করা যায় মুর্শিদাবাদ-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার প্রেক্ষাপট এ গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। ‘মুর্শিদাবাদ লোকসুত্রে সমন্বয়বাদী ধর্মসংস্কৃতির পুণ্যতোয়া হলেও এ আবার মিনি কোনো পাকিস্তানের মতো শরিয়তি গোঁড়া।’^{১৬৭} সেই গোঁড়া অংশের মানুষদের ফকির নিধনের ইতিবৃত্ত এ গল্পের আলোচ্য বিষয়। চোরাই মাল পাচার সীমান্ত চর এলাকার একটি গোপন ব্যবসা। হাজমত এ ব্যবসার অন্যতম মূল চক্রী। দু’নম্বরী মাল চালান চরের মানুষের জীবিকা। বস্তুত সেই কারণেই চোরাই কারবারিরা দু’পারে দুটি বউ রাখে। যাদের বউ থাকে না তাদের রক্ষিতা থাকে। রাতের অন্ধকারে বউ বা রক্ষিতার সাহায্যে মাল-পত্তর পাচার করে হাজমতদের মতো ব্যবসায়ীরা। রাতে বউয়ের কাছে বা স্বামীর কাছে শুতে যাচ্ছি বললেই বি.এস.এফ ক্যাডাররা ছেড়ে দেয়। হাজমতের স্ত্রী তানজিনা ওরফে তনু খাতুন থাকে ভারতে এবং দ্বিতীয় স্ত্রী লেহেজান থাকে বাংলাদেশে। তনু খাতুন ফকিরের গান শুনতে ভালোবাসে, হাজমত না থাকলে তনুর কাছে আসে রুহুল ফকির।

গল্পের শুরুতেই রুহুল ফকিরের উদ্দেশ্যে মৌলবী মিজান সাহেবের ‘সালাম’ ঘোষণার মধ্যে দিয়ে শরিয়তি গোঁড়াপন্থীদের সঙ্গে ফকিরদের উদারপন্থী মতবাদের সূক্ষ্ম ফারাকটি নির্ণয় করেছেন গল্পকার। ইসলামি শাস্ত্রে ‘সালাম’ দেওয়া পুণ্যের কাজ। আরবি বাক্য— ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলে একে অপরকে সম্বোধন করে মুসলমানরা। ‘সালাম’ আরবি শব্দ, যার অর্থ শান্তি। ‘আসসালামু আলাইকুম’ অর্থাৎ ‘আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক’। সালামের মাধ্যমে পরস্পরের জন্য শান্তি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। মুসলমানদের পরস্পরকে ‘সালাম’ দেওয়া হজরত মুহম্মদের আদর্শ ও পুণ্যের অনুসরণ। ‘সালাম’-এর উত্তর প্রদান করা শরিয়তি নিয়মানুযায়ী অবশ্যই পালনীয় রীতি। মৌলবী মিজান ‘আসসালামু আলাইকুম’-এর পরিবর্তে রুহুল ফকিরকে বলেছেন— ‘আসসালামো আলা মানিত্তা বাআল হুদা’— রুহুল ফকির কখনও এমন ‘সালাম’ শোনেনি, তার উত্তরে মৌলবী মিজান সাহেবের বক্তব্য ছিল:

তা শুনবেন কেন? এ ছালাম তো সচরাচর দেওয়া হয় না। সকলে জানেও না।
বিধর্মীদের জন্য এটা স্পেশাল। এটাই বৈধ। ‘আছছালামো আলাইকুম’ দিতে নেই।
ওটা মুসলমানদের নিজস্ব রীতি, নিজেদের মধ্যে। আপনাকে ওইটেই দিলাম।^{১৬৮}

কোরান শরীফ-এর ২০ সংখ্যক সূরা তোহা-র ৪৭ সংখ্যক আয়াতে ‘বিধর্মী’ বা ‘অমুসলিম’দের জন্য এই ‘সালাম’-এর কথা বলা হয়েছে।^{১৬৯} যার অর্থ— যে ব্যক্তি হেদায়েতের (ইসলাম ধর্ম নির্দিষ্ট অনুশাসনের পথ) পথে খানিকটা এসেছে, পুরোপুরি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়নি বা হতে পারেনি, তার জন্য এই নমস্কার। শাস্ত্রে ফকিরদের জন্য এমন অপমানের ব্যবস্থা দেখে রুহুল ফকির কটাক্ষভরা জবাব দিয়েছে। ইসলামি জীবনব্যবস্থা থেকে দূরে থাকা মানুষজনের প্রতি গোঁড়াপন্থী ধার্মিকদের এত

ঘেনা, বিদ্বেষ, বিভাজন— রুহুল ফকিরের ব্যঙ্গের শাণিত বাণে গল্পকার স্পষ্ট করে দিয়েছেন:

কোরান-হাদিস, তোমার নিজস্ব সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেখান থেকে তোমরা আমাদের উচ্ছেদ করতে চাও। তোমরা বল বিসমিল্লা, আমরা বলি বীজ মে আল্লা, মানুষ বীজরূপী। এই বিশ্ব বীর্ষময়। সে মর্ম তুমি কখনও বুঝবে না শরার মৌলবী। চিরকাল আমাদের গু-মুত খেতেই দেখলে। রূপ-রস-বীজ-মাটির করণ বিষম করণ, কী করে বোঝাই তোমাকে?^{১৬৯}

শরিয়তি ইসলামের কাছে ফকিররা চিরকাল ব্রাত্য, উপেক্ষিত ও অনাদৃত। ফকিরদের জীবন আদর্শ ও শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে তাদের দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে সুধীর চক্রবর্তী তাঁর গবেষণালব্ধ গ্রন্থে এ কথা নির্মেদ ভাষায় তুলে ধরেছেন। অসহনীয় দারিদ্র্য আর অনপনেয় অশিক্ষা তাদের জন্ম জন্মান্তরের বিধিলিপি। হিন্দু সমাজ বাউলদের সঙ্গে খানিকটা সংস্রব রাখলেও ফকিরদের উপেক্ষা করে। মুসলমান সমাজ ফকিরদের ঘৃণা করে, কারণ তারা নামাজ পড়ে না, রোজা পালন করে না, গান করে প্রকাশ্যে (যা শরিয়ত বিরোধী) এবং ধর্মীয় নেতাদের মান্য করে না। কিন্তু গোঁড়াপন্থী মুসলমানদের ফকিরদের অনীহার কারণ অন্য। আসলে ফকিররা মুসলমান শরিয়তি নির্দেশ না মেনে বেরিয়ে গেছে নিজেদের পথে, খুব একটা গ্রাহ্যও করে না মূলস্রোতকে। ধর্মের বাহ্য আচারে তাদের আস্থা নেই। লোকদেখানো আন্দাজি পথ তাদের অপছন্দ। তারা আত্মমগ্ন ও উদাসীন এবং আত্মতৃপ্ত। তারা জীবনবিমুখ বৈরাগীও নয়, গেরুয়া বসন পরে না। দীনবেশে একেবারে রাজভিখারি। বস্তুত এই কারণেই তাদের কথা কেউ জানার চেষ্টাও করেনি, তারা সমাদরও লাভ করেনি। সবার অধম হয়ে দীনাতিহীন হয়ে খোলামেলা নিসর্গের মধ্যে তাদের উপাস্যসম্মান। ফকিরদের কোনো পাঠ্য বই নেই, পাঠ্য হল— ‘দেলকেতাব’— আত্মপাঠ। শরীরের মধ্যেই তাদের মসজিদ। সেখানে সর্বদা চলে

দায়েমি নামাজ। রোজা মানে তাদের কাছে কায়মনোবাক্যের সংযম— কেবলমাত্র একমাস নয়, প্রতিটি দিনই তাদের রোজা— সর্বদাই রোজা। হজ বা তীর্থে ফকিরদের মতি নেই।^{১১}

ইসলামি শাস্ত্রের ‘অবশ্যই করণীয়’ বা ব্যবহারিক আচরণবিধি, যার নিয়ন্ত্রণ থাকে ধর্মীয় মৌলবী-মোল্লাতন্ত্রের শক্ত হাতে, সেসব কৃত্য ফকিররা পালন করে না বলেই গোঁড়াপন্থী ধার্মিকরা তাদের কঠোর বিরোধিতা করে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুশাসনের সঙ্গে ফকিরদের জীবনাচরণের বিস্তর মতানৈক্যের পাশাপাশি গল্পে উঠে এসেছে শরিয়তি ইসলামের তালাক-প্রথা নিয়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে ইসলামের বাহ্যিক উপাসনার নিয়ম-পদ্ধতি মূলত চারজন ইমামের নেতৃত্বে সম্প্রসারিত হয়েছে। বিশেষত সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে আইনশাস্ত্রের নানান নীতি নির্ধারিত করেছেন চারজন ইমাম। এখান থেকেই মুসলমানদের ধর্মীয় উপাসনার পদ্ধতিগত তফাতের কারণে মধ্যে চারটি গোত্রের উদ্ভব হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান দুটি হল— ইমাম আবু হানিফার নিয়মনীতি নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘হানাফি সম্প্রদায়’ এবং ইবনে ইদ্রিশ আশ-শাফির নিয়মনীতি নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘শাফি’ বা ‘ফরাজি’ সম্প্রদায়।^{১২} ইতিহাস খ্যাত উনিশ শতকের ‘ফরাজি আন্দোলন’ের সঙ্গে তথাকথিত আইনশাস্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। ফরাজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সূচিত হলেও পরবর্তীতে এটি কৃষক আন্দোলনের রূপ লাভ করে। এই আন্দোলনের নামের সঙ্গে শাফির মতবাদের সাদৃশ্য থাকলেও শরিয়তি নীতিগত দিক থেকে কোনো মিল নেই। হাজমত ফরাজি ধারার অনুসারী। ফরাজিদের তালাক-প্রথার নিয়মানুযায়ী, হাজমত তিন মাসে তিন তালাক দেবে তনুকে। ইতিমধ্যে এক তালাক সম্পন্ন করেছে সে। পুরুষতান্ত্রের ধারক হাজমতের বয়ানে উঠে এসেছে সে কথা:

পুরো তালাক তো দিব না, মৌলবী সায়েব। খানিক ডর দেখিয়ে সিধে করব। আজকাল আমাদেরও ডরপুক হয়, পাছে না মর্দানি করে মোকদ্দমা ঠুকে খোরপোশ চায়। চোখমুখ-অলা তেজি মেয়েছেলে, পেটে বিদ্যেও আছে দু'ফোঁটা। তিরাইলে হাইস্কুলে পড়ত দু কেলাস। খুব গরিব বলে সতীন-ঘরে এস্যাছে। উর ভিতরির ছটফটানি যে কী সোয়াদে তৈয়ারি হল, শালা ফকিরই জানে।^{১৭৩}

হাজমতের ‘ডর দেখিয়ে সিধে করব’— বাক্যের মধ্যেই গল্পকার তুলে ধরেছেন গ্রামীণ মুসলমান সমাজের নারীর দাসত্বের রূপটি। ফকিরপন্থায় নারী-পুরুষে ভেদ নেই। ফকিরের কথায় তনুর মধ্যে জেগে ওঠে গোষ্ঠীযুগের মেয়ে, মাতৃত্বের সাহসিনী নারী, স্বতন্ত্র দাপুটে নারীবোধ। ফকির-সঙ্গের কারণে তনুর মাকে নির্যাতিত হতে হয়েছিল। রুহুল ফকির শরিয়তকে অস্বীকার করে কোনো আইন প্রতিষ্ঠার কথা বলেনি, ফকিরপন্থার মতোই তার উচ্চারণ একেবারে সবল ও দ্বিধাহীন। কোরানের ১০৮ সংখ্যক সূরা কাওসার-এর শ্লোকের বয়ান রুহুলের ফকিরি উচ্চারণে অন্যমাত্রা পেয়েছে। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, জান্নাতের একটি ঝর্ণা হল আল-কাওসার। ইসলামি আইনশাস্ত্র যারা মেনে চলবে তাদের এই ঝর্ণার জল প্রদান করা হবে। আল-কাওসার-এর জল বরফের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি।^{১৭৪} অথচ রুহুলের মতে, এমন আনন্দের পানীয় ফকিরদের দেহেই থাকে। ফকিররা তার খোঁজ জানে। মৌলবীরা পাঁচবার নামাজে দাঁড়িয়ে এ সূরা উচ্চারণ করলেও ফকিরদের মতো কাওসার-এর অনুসন্ধান করতে পারে না। আর এই ফকিরদের সান্নিধ্যে পেতেই তনুর মা একদিন ঘরে ছেড়েছিল। কোরানের ১০৯ সংখ্যক সূরা কাফেরুণ-এর শেষোক্ত শ্লোকে ‘বিধর্মী’ বা ‘অমুসলিম’দের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে— ‘তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, এবং আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম।’^{১৭৫} ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। এরপরেও মৌলবাদীদের হাতে আক্রান্ত হয় ফকিররা। রুহুল ফকির তনুকে তার মায়ের খোঁজ দেয়। হাতে একতারা এক প্রৌঢ়া বাউলের ছবি দেখে

আঁতকে ওঠে তনু। মৌলবাদী গোষ্ঠীর কবলে পড়ে তনুর মায়ের সমাজ-বিচ্ছিন্ন বাউণ্ডুলে
জীবন— ধর্মীয় বেড়াজালের জমাটবাঁধা খুঁটিটাকে চিনিয়ে দেয়। ফকিরের কথায় উঠে
এসেছে ধর্মের একপাক্ষিক আইনের বিষবাস্পে কীভাবে নারীত্বের মূল্য খর্ব হয়েছে সেই
প্রসঙ্গ:

নারীর ধর্ম কিছু নয়, ধর্ম পুরুষের। তাই নারীকে ওরা এত খাটো করে দেখেছে। আর
আমরা সেই নারীকেই করেছি ভজনার উপায়। প্রকৃতির সঙ্গ ছাড়া আমার ধর্ম বৃথা।
প্রকৃতি-প্রাপ্তিই ধর্ম। ওদের মোসলেম কি দাউদ হাদিসে আছে— পুরুষের বাঁ পাঁজরের
বাঁকা হাড়ে রমণী তৈরি! তাকে সোজা করতে চাওয়া নিষ্ফল। বাঁকা হাড় সোজা হয়
না। বরং তাকে সোজা করতে না চেয়ে তালুক দেওয়া বুদ্ধির কাজ। হাদিসে নির্দেশ
আছে, তা মানুষ কী করবে? তাবত হাদিস পুরুষের পক্ষে লেখা। কোথাও দু'এক
ফোঁটা করুণার সন্ধান পাবে ঠিকই কিন্তু নারীর সত্যকার মর্যাদা কোথাও নেই। আমরা
এই অপমান সহিতে পারিনি বলেই লালন তার গানে শুধিয়েছিলেন, নারীর বিধান
তাহলে কী হবে? বুঝলে তনু, যুক্তির জোরেই মুক্তির আলো জ্বলে।^{১৭৬}

প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ধর্মই নারীকে তার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করেনি। ধর্মের
প্রতিভূ পুরুষ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গড়ে নারীকে করেছে বাতিল, অপাণ্ডভ্যেয়। সংসারের
যৌনতার দাসত্ববৃত্তি করেও নারী রয়ে গেছে কোণঠাসা। সামাজিক যৌন শোষণের
অংশীদার হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে নারী। আজও সমাজে রজঃশীলা নারীকে মন্দিরে
প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না। পর্দা-বোরখার ঘেরাটোপে বন্দি হয়েই অন্তরমহলে কেটে
যায় নারীর জীবন। লালন তাঁর গানে বলেছিলেন— ‘সুন্নত রাখলে হয় মুসলমান/ নারী
লোকের কী হয় বিধান/ পৈতে দেখে বামুন চিনি/ বামনী চিনি কেমনে?’^{১৭৭}— যুক্তির ধর্ম
দিয়ে জীবন ও জগতকে দেখেছেন ফকিরপন্থীরা। ইহুদি ও ইসলামি পুরাণে, আদমের
শরীরের বাঁ পাঁজরের হাড় থেকে ঈভকে সৃষ্টি করা হয়েছে— এ কাহিনি প্রতিষ্ঠা লাভ
করেছে। পাশাপাশি ঈভের প্ররোচনায় আদম নিজের ‘ইচ্ছা’ বা ‘স্বাধীনতা’র বীজ বপন

করতে গিয়েই করে ফেলেছিলেন পৃথিবীর আদি পাপ (Original Sin)। পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের নিমিত্তে আদম-ইভ উভয়েই নির্বাসিত হলেন মর্ত্যে— পৃথিবীর আদি মানব-মানবীর স্বর্গ থেকে মর্ত্যে গমন এবং সভ্যতার ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা— ক্লাসিক্যাল মিথ-পুরাণের নেপথ্যেই জমে আছে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সমীকরণ। বস্তুত ঈভের প্ররোচনাতেই আদম করেছিলেন আদি পাপ। আর সেই থেকে ঈভকে তথা সমগ্র নারীজাতিকে প্ররোচনাকারী ও লোভ-লালসার প্রতীক হিসাবেই গণ্য করে সাধন মার্গে তাকে বর্জন করাই শ্রেয় বিবেচনা করা হয়।^{১৭৮}

মিজান মৌলবীর ‘শরিয়তি বুদ্ধি’তে রুহুল ফকিরের নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। হাজমতের শাগরেদ কেরামত ও কিসমতের আক্রমণ নেমে আসে ফকিরের উপর। ফকিরের গোঁফ-দাড়ি ও চুল কেটে নেয় হাজমতবাহিনী। তনুর উপর চলে অমানবিক শারীরিক অত্যাচার, মারের দাপটে তনু চৈতন্য হারিয়ে ফেললে, অচৈতন্য দেহে যৌন অত্যাচার চালায় হাজমত। তারপর মুমূর্ষু তনুর কানে মুখ রেখে হাজমত উচ্চারণ করে— তালাক। শরিয়তধারী মৌলবির অনুপ্রেরণায় নারীর প্রতি হাজমতের মতো পুরুষদের বীভৎস বর্বরতা ও অমানবিক উৎপীড়ন— শরিয়তি মৌলবাদীদের দাপট এবং মুসলিম নারীর সামাজিক যৌন-অত্যাচারের ন্যাকারজনক ও বিপন্নতার দিকটি স্পষ্ট করে দিয়েছে। চেতনা ফিরে পেয়ে তনু বাঁধা অবস্থায় ফকিরকে সীমান্তে আবিষ্কার করে, তার পা এক দেশে এবং মাথা অন্যদেশে। রুহুল ফকিরের বয়ানে উঠে এসেছে ফকিরি জীবনের যন্ত্রণা:

ওরা চিরকাল এমনি করে মেরেছে আমাদের। আমরা এইরকম আঁধারে লুকিয়ে ফিরেছি
তনু।^{১৭৯}

বাংলার বাউলরা এতটা বিপন্ন নয়, যতটা ফকিররা বিপন্ন ও অত্যাচারিত। আসলে ‘ফকিরপন্থার সূচনাই হয়েছে একরকম দ্রোহ বা প্রতিবাদ থেকে। একে বলা যেতে পারে

গুঢ় অন্তর্দ্রোহ এবং তা ইসলামি শরিয়তি নির্দেশের বিরুদ্ধে। ফকিরদের এই অন্তর্দ্রোহের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় সুফিদের সাধনায়। ইসলামের বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে সুফিরাই প্রথম অন্তর্দীপ্ত ও আত্মস্থ হবার আহ্বান জানায়। শুষ্ক শাস্ত্রগ্রন্থের নির্দেশ একদিকে, আর একদিকে তাদের সজীব অনুভববেদ্য গহন জীবনের আমন্ত্রণ। উপাস্যকে তারা পেতে চায় প্রেমে, তাই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি, লোকদেখানো নামাজ রোজা জাকাত ও হজ তাদের কাছে গৌণ। ধর্মনেতাদের অনুশাসনের চেয়ে আত্মার নির্দেশ সুফিদের কাছে অনেক বড়ো।^{১৮০} মনের মাঝেই তারা অন্বেষণ করে মনের মানুষের।

ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুসারে, আরব উপদ্বীপ থেকেই মূলত ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার শুরু হয়েছিল। এবং বাকি বিশ্বে, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে শাস্ত্রীয় ইসলামের আগমন ঘটেছিল মুসলমান শাসকদের হাত ধরে, আরবদের সিন্ধু জয় থেকে শুরু করে মোগল আমল— দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ মুসলমান শাসনাধীন ছিল। মুসলমানদের শাসনকালেই মধ্যপ্রাচ্যের বহু স্থান থেকে সুফি-দরবেশরা এদেশে এসেছিলেন। অদ্ভুতভাবে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি, ভারতীয় পুরাণ ও লৌকিক আচারের সঙ্গে শরিয়তি ইসলামি ও লৌকিক ইসলামের মেলবন্ধন যেমন ঘটেছিল, তেমনই দ্বান্দ্বিক সন্ধিক্ষণটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকে যখন মুসলমান সমাজের মধ্যেও জাতিভেদ ও জাত্যাভিমান ইত্যাকার ব্যবধান মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, তখন ফকিরদের উদারপন্থী মতবাদই মানুষকে দীক্ষিত করেছিল মানবিক মস্তিষ্কে। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ যথার্থই বলেছেন:

কোরআন-হাদিস অনুগত বিশুদ্ধ ইসলাম বিশ্বাসে ও আচরণে মানা সম্ভবও ছিল না দুটি কারণে। প্রথমত, শাস্ত্র ছিল আরবী ভাষায় লিখিত, বিদেশীয় বিভাষা আয়ত্ত করা বিদ্যালয়-বিরল সেই যুগে কচিৎ কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল, আলিম মৌলবী আজও সর্বত্র শত শত মেলে না। দ্বিতীয়ত, স্থানিক কালিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে পরিবেশে মানুষ আশৈশব লালিত হয়, তার প্রভাব এড়াতে পারে না। শাস্ত্রীয় গোত্রীয় ও স্থানীয়

ঐতিহ্যের আচারের, সংস্কারের মিশ্র ও সমন্বিত প্রভাবেই মানুষের মন-মনন-আচার-
আচরণ নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে বাঙালির ধর্ম সাধারণভাবে বিশুদ্ধ ‘ইসলাম’
নয়,— মুসলমান ধর্ম যাতে রয়েছে যুগপৎ শরীয়ত ও মারফত, কোরআন-হাদিসের
পাশে পির-দরবেশ-দরগাহ-মন্ত্র-মাদুলী, তাবিজ, দোয়া, ঝাড়-ফুক-তুক-তাক।^{১৮১}

বিশেষত আজকের বাংলার মুসলমান সমাজ যুগপৎ ‘আরবীয় ধর্ম’ ও ‘ভারতীয়
সংস্কৃতি’র মিশ্র আচারের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন
বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, যোগীদের মিশ্রণ ঘটেছে, ইসলামের মধ্যেও প্রবেশ করেছে লৌকিক
ইসলামের বিভিন্ন আচার-আচরণ। কোরান-হাদিস সম্বলিত শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে
ফকিরপন্থার বিরোধ তাই অবশ্যাম্ভাবী হয়ে উঠেছে বহু যুগ থেকেই। মানুষের অর্থনৈতিক
প্রবৃদ্ধি, বুদ্ধিমত্তা, জাত্যাভিমান, ধর্মীয় পরিচিতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য— এসবই আধিপত্যের
হরেকরকম স্তর। সংখ্যাগুরু সর্বদাই সংখ্যালঘুদের দমিয়ে প্রভুত্ব কায়েম করতে চায়।
শরিয়তি মৌলবাদীদের অত্যাচারের কারণে ফকিরপন্থীদের দুরবস্থা আজ তা প্রমাণ করে।
সাম্প্রতিক অতীতে ‘নদীয়া-মুর্শিদাবাদে বাউল আর ফকিররা মৌলবাদীদের হাতে
অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হতে হতে এক দশকের আগে রুখে দাঁড়াতে সম্মিলিত হয়েছেন।
তাদের সংগঠনের নাম ‘বাউল-ফকির সংঘ’।^{১৮২} এ গল্পে গল্পকার আবুল বাশার লৌকিক
ইসলাম ও সাম্প্রতিক ইতিহাসের ঘটনা বর্ণনায় অসামান্য বাস্তবচেতনার পরিচয়
দিয়েছেন।

আবুল বাশারের বেশিরভাগ গল্পেরই বিষয় আরবভূমি থেকে উদ্ভূত ইসলামি
পুরাণকথা, যার আধার মুসলমানদের কোরান ও হাদিস ও ইহুদিদের হিব্রু বাইবেল।
পাশাপাশি আরব্য রজনীর নানান গল্পকথা, ইসলামিক লোককথা, কিংবদন্তি, লৌকিক
ইসলামের বহুবিধ আচার-আচরণ, বাউল-ফকিরদের মানবিক ধর্মের হরেকরকম পাঁচালি—
এমন বিচিত্র ঘটনার সমারোহ নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর গল্পের অন্তর্ভবন। ছা পোষা মানুষের

দুর্বিষহ জীবন বিন্যাস এবং পাশাপাশি তালাক-ইদত-তহলীলের জটিল পাকে নিরন্তর নিষ্পেষিত নারী-জীবন ও ধর্মের কূট তামাশায় ধর্মহীন পুরুষের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি— আধুনিক জীবন ও মানসিকতার সঙ্গে যুক্তিহীন প্রথা ও সংস্কারের বিরোধ আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে ফিরে এসেছে বারবার। গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে কথাকার মুসলমান সমাজের অন্দরের নারীজীবনের প্রভূত যন্ত্রণাকে মূর্ত করে তুলেছেন। তাতে ম্যানারিজম নেই। মুসলমান সমাজের আদিম সমস্যাকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন গল্পকার। ইসলামি পুরাণ নির্ভর তাঁর আখ্যান যেন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা এবং সংস্কারহীন শরিয়তি গোঁড়া মুসলমান পরিবারের বিচিত্র সমস্যার সংমিশ্রণ।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. বাশার, আবুল; ‘আমার প্রথম বই’, রবিবাসরীয় প্রবন্ধ, *আনন্দ বাজার পত্রিকা*, রবিবার, ২ ডিসেম্বর, ২০১২
২. হিট্টি, ফিলিপ কে; *আরব জাতির ইতিহাস*, আদি মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৮২
৩. সেনগুপ্ত, মল্লিকা; *স্ত্রী লিঙ্গ নির্মাণ, মল্লিকা সেনগুপ্ত গদ্য সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৪৬৬
৪. কোরান শরীফের ৪ সংখ্যক সূরা নিসা-র ৩ সংখ্যক আয়াত-এ ইসলামে একাধিক বিবাহ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৫০
৫. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Polygyny_in_Islam, তথ্য গ্রহণের তারিখ- ১৭.০২.২০২৩, সময়: ১১: ৩৭ pm
৬. সুন্নত বলতে ইসলামি ফেকাহ-তে বলা হয়েছে, যে কাজগুলি নবি হজরত মুহম্মদ নিজে পালন করেছেন এবং তাঁর অনুসারীদের পালন করতে তাগিদ দিয়েছেন তাকেই বলা হয় সুন্নত। যেমন- পুরুষের মুখের বড়ো দাড়ি, এক বা একাধিক বিবাহ ইত্যাদি।

মুহম্মদ চার-এর অধিক বিবাহ করলেও কোরানে পুরুষের সর্বাধিক চারটি বিবাহের কথা বলা রয়েছে। কোরান শরীফের ৪ সংখ্যক সূরা নিসা-র ৩ সংখ্যক আয়াত-এ ইসলামে একাধিক বিবাহ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৫০

৭. বাশার, আবুল; ফুলবউ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২৬

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

১১. বাশার, আবুল; *আকাশলীনা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৫১

১২. বাশার, আবুল; ফুলবউ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১০৫

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

১৪. কোরান শরীফের ৪ সংখ্যক সূরা নিসা-র ৩৪ সংখ্যক আয়াত-এ ইসলামে পুরুষদের বিবাহ ও দাম্পত্যের নিয়মকানুন প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৫৪

১৫. আয়েশা (রাঃ) তরফ থেকে বর্ণিত হাদিস। তিরমিযী, হাদিস নং ১১০২; আবু দাউদ, হাদিস নং ২০৮৩; ইবন মাজাহ, হাদিস নং ১৮৭৯; আহমদ: (৬/৬৬); দারেমী, হাদিস নং ২১৮৪

দ্রষ্টব্য: *সহীহ বুখারী শরীফ*, (অনুবাদ- হজরত মাওলানা শামসুল হক, শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ), মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০১৯

১৬. বাশার, আবুল; ফুলবউ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১০৬

১৭. কোরান শরীফের ৫ সংখ্যক সূরা মায়িদা-র ২৭-৩১ সংখ্যক আয়াত-এ হাবিল ও কাবিল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০২০, পৃ. ৬৮

১৮. বাশার, আবুল; ফুলবউ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১১৮

১৯. কোরান শরীফের ৪ সংখ্যক সূরা নিসা-র ৩ সংখ্যক আয়াত-এ ইসলামে একাধিক বিবাহ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৫০

২০. বাশার, আবুল; ফুলবউ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৩২

২১. বাশার, আবুল; 'নাস্তিক', *সিমার*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০১, পৃ. ৩৪

২২. কোরান শরীফের বহু জায়গায় হ্রদের রূপ ও গুণের বর্ণনা রয়েছে। বিশেষত, কোরান শরীফের ৫৫-সংখ্যক সূরা 'রহমান'-এ হ্রদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। (আয়াত সংখ্যা- ৫৬, ৫৮, ৭২, ৭৪, ৭৬)। এছাড়াও ৩৬-সংখ্যক সূরা 'ইয়াসিন', (আয়াত সংখ্যা-৫৫), ৩৭-সংখ্যক সূরা 'সাফ্যাত', (আয়াত সংখ্যা- ৪৮), ৩৮-সংখ্যক সূরা 'সোয়াদ', (আয়াত সংখ্যা- ৫২), ৪৪-সংখ্যক সূরা 'দোখান', (আয়াত সংখ্যা- ৫৪), ৫৬-সংখ্যক- সূরা 'ওয়াকিয়া', (আয়াত সংখ্যা- ৮), ৭৪ সংখ্যক সূরা- 'মুদাস্সির', (আয়াত সংখ্যা- ৩৩)।

'হ্রর'— শব্দের আরবি অর্থ হল- 'উজ্জ্বল সাদা-কালো চোখধারী' অর্থাৎ উজ্জ্বল চোখের অধিকারী। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, জান্নাতের ঈমানদার (পুণ্যবান) ব্যক্তিদের সঙ্গিনী হবে হ্ররেরা। হাদিসে রয়েছে, এক একজন পুরুষকে সত্তরজন হ্রর প্রদান করা হবে। জান্নাতি পুরুষদের সেবা করাই হবে হ্রদের প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ। দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

২৩. ফজল, আবুল; 'মানবতন্ত্র', *নির্বাচিত প্রবন্ধ আবুল ফজল*, (সম্পাদনা: মাহবুবুল হক), সময় প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৮ পৃ. ১৫৮

২৪. বাশার, আবুল; ফুলবউ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৪১

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯

২৮. হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। সহীহ বুখারী, হাদীস সংখ্যা- ১৪৬৮

দ্রষ্টব্য: সহীহ বুখারী শরীফ, (অনুবাদ- হজরত মাওলানা শামসুল হক, শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ), মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৪১৫

২৯. মাওলানা খোন্দকার, মহম্মদ বসিরউদ্দিন, দোজখের আযাব ও বেহিশ্তের শান্তি, রহমানিয়া লাইব্রেরি, মগরাহাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, দশম সংস্করণ, পৃ. ৭৭

৩০. বাশার, আবুল; ফুলবউ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৭৮-১৭৯

৩১. ফজল, আবুল; ‘মানবতন্ত্র’, নির্বাচিত প্রবন্ধ আবুল ফজল, (সম্পাদনা: মাহবুবুল হক), সময় প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৮ পৃ. ২৫৪

৩২. বইয়ের দেশ, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি সাক্ষাৎকারে আবুল বাশার বলেছিলেন: ফুলবউ বেরিয়েছিল ১৯৮৭-র শারদীয় দেশ-এ, তার একমাস কি দু’মাস আগে সাগরদা (সাগরময় ঘোষ) দেশ পত্রিকায় মহরম সংখ্যা করলেন। এই মহরম সম্পর্কে আমার যে মূল্যায়নটা, ‘কল্পকাল্পনিক মহরম’ শিরোনামে দেশ পত্রিকায় বেরোল। তারপরেই ফুলবউ। এ দুটোর একসঙ্গে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কারণ, আমি বলেছিলাম যে, ইতিহাস নয়, তারা কতগুলো মিথকে ইতিহাস বলে মনে করে মহরম পালন করছে। এটাতে তাদের আপত্তি ছিল। ইতিহাস বলছ না কেন? গোঁড়া মুসলমানদের একটা অংশ বরাবরই আমার বিরোধিতা করেছে। গ্রামে তো তাদের সঙ্গে থাকতে হয়। সমস্যাটা সেখানে। শহরে এসে আমি আলাদা থাকতে পারি। গ্রামে আমাদের বাড়ির সামনে এক মৌলবি সাহেবের ঘর। ওখানে একটা খারিজি মাদ্রাসা, সেটা এখনও আছে। মাদ্রাসাটা উনি তৈরি করেছিলেন। খারিজি মাদ্রাসা মানে হল, যেখানে শুধুই ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া

হয়। যার সঙ্গে বিজ্ঞানের বা সাধারণ শিক্ষার সম্পর্ক নেই। সেখানে কায়দা, আমপারা, কোরান, হাদিস এ সমস্ত শেখানো হয়। সেই ভদ্রলোক এবং তাঁর যে গোষ্ঠী, মানে গোঁড়া মৌলানা, মৌলবি সাহেবদের তিনি হচ্ছেন মাথা। তিনি অত্যাচারটা নামিয়ে আনলেন আমাদের গোটা পরিবারটার উপর। মানে, আমার টালির বাড়ি, যেখানে বসে লিখেছিলাম ফুলবউ। আমার বাড়ির সামনে যে রাস্তা, তার ওপারে ছিল তাঁর বাড়ি। যিনি ধর্মাবলম্বীদের প্রবক্তা। ওঁর বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণে কোচরে ইট-পাটকেল, পাথর দিয়ে বাচ্চা ছেলেদের বসিয়ে দেওয়া হত। আমার খাপড়ার, মানে টালির বাড়ির ছাদে তারা ক্রমাগত, একঘণ্টা দু ঘণ্টা ধরে পাথর ইট ছুঁড়ত। টালির ছাদ ভেঙে ভেঙে পড়ত আমার মাথার উপর। এটা ছিল একটা দৃশ্য। এ ছাড়া আমাদের গৃহপালিত পশুপাখি যা ছিল, মুরগি, ছাগল এগুলোকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হত। বিষ মিশিয়ে দিল কুয়োর জলে। আমাদের গোটা পরিবারটাকেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল। অথচ আজ যখন সমাজ এগিয়েছে, শিক্ষিত মুসলমানরা বুঝতে পারছে, আমি কিন্তু কোরান বা হাদিসকে আক্রমণ করিনি। বরং আমি তার পক্ষের লোক। এবারের যে উপন্যাস, *বারুণী নদীর কান্না* তাতে কিন্তু হজরত মুহম্মদের চরিত্রের উজ্জ্বল দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে নজরুলকে যেমন আনা হয়েছে, হজরত মুহম্মদ, রবীন্দ্রনাথ এই তিনজনকে কেন্দ্র করে এবং বামপন্থী মতাদর্শকে ভিত্তি করে উপন্যাসটা লেখা হয়েছে। আমি হজরত মুহম্মদ এবং কোরানের বিরোধী নই। আমিই সেই লোক, যে কোরান এবং হাদিস ধরে উপন্যাস লিখেছি। ওরাও বুঝেছিল, এটা কোরান বা হাদিসের বিরুদ্ধে নয়, ওদের বিরুদ্ধে। ওই গোঁড়া অংশটার বিরুদ্ধে। ফলে ওরা খেপে গিয়ে আমাদের উপর অত্যাচার নামিয়ে আনল। তখন ভাবলাম, এর থেকে বাঁচার উপায় কী? এটা পরে জেনেছি, সাগরদা কলকাতায় থেকেও আক্রান্ত হচ্ছিলেন। তাঁর বাড়িতে নোংরা-নোংরা চিঠি পাঠানো হচ্ছিল। ওই অংশটা, যেটা আমাকে পাঠানো হচ্ছিল, সাগরদার টেবিলেও যাচ্ছিল। সাগরদা তখন বুঝলেন, আমাকেই যদি এরকম আক্রমণ করে, তা হলে ছেলেটা কী অবস্থায় আছে গ্রামে! তখন উনি *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র সহকারী লাইব্রেরিয়ান সুনীল দাশকে— উনিও মুর্শিদাবাদের ছেলে— বললেন, বাশারকে নিয়ে এসো। ও নিশ্চয়ই খুব বিপন্ন।

৩৩. কোরান শরীফের ৪ সংখ্যক সূরা নিসা-র ২৩ সংখ্যক আয়াত-এ ইসলামে কোন কোন নারীদের সঙ্গে বিবাহ অবৈধ সেই প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৫২

৩৪. বাশার, আবুল; ফুলবউ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২১২

৩৫. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Imrana_rape_case, তথ্য গ্রহণের তারিখ- ১৮.০২.২০২৩, সময়: ১: ৪৭ am

৩৬. বাশার, আবুল; ‘আমার প্রথম বই’, রবিবাসরীয় প্রবন্ধ, *আনন্দ বাজার পত্রিকা*, রবিবার, ২ ডিসেম্বর, ২০১২

৩৭. মিয়া, বন্দে আলী; *কোরান ও হাদিসের গল্প*, আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৮৩

৩৮. ইসলাম ধর্মের নবিদের (ঈশ্বর প্রেরিত দূত) মধ্যে সর্বাধিক যাঁর জীবনকাহিনির বর্ণনা রয়েছে কোরানে তিনি হলেন হজরত মুসা। (কোরানে ১৩৬-বার মুসার নাম উচ্চারিত হয়েছে। কোরানের ১৮ সংখ্যক সুরা কাহাফ, ২৮ সংখ্যক সুরা ত্বাহা, ২৮ সংখ্যক সুরা আল-কাসাস প্রভৃতি সুরা-তে মুসার বৃত্তান্ত রয়েছে।) দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

৩৯. ‘বাবেল-এ ভাষাভেদের কাহিনি’, ‘আদিপুস্তক’, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যঙ্গালোর, পৃ. ১২

৪০. *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৫২

৪১. বাশার, আবুল; *মরুস্বর্গ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১৬, পৃ. ৪৮

৪২. *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (১৪ সংখ্যক সুরা ইব্রাহিম, আয়াত সংখ্যা ৪) বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ১৪৫

৪৩. বাশার, আবুল; *মরুস্বর্গ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১৬, পৃ. ৬৮

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

৪৭. ঘোষ, শঙ্খ; 'দেশান্তর', কবিতাসংগ্রহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৌষ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫১

৪৮. খান, মুহাম্মদ আলী; আল কোরআনের অলৌকিক ঘটনাবলী, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, পৃ. ২৯

৪৯. কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (২৬ সংখ্যক সূরা শোয়ারা, আয়াত সংখ্যা ১২৩-১২৬) বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২১১

৫০. কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (১১ সংখ্যক সূরা হুদ, আয়াত সংখ্যা ৫০-৫৫) বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২১১

৫১. কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (৪৬ সংখ্যক সূরা আহ্কাফ, আয়াত সংখ্যা ২১-২৮) বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২৮১-২৮২

৫২. বাশার, আবুল; মরুস্বর্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১৬, পৃ. ১০৩-১০৪

৫৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; গোরা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৭-৬৮

৫৪. বাশার, আবুল; মরুস্বর্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১৬, পৃ. ১৪৫

৫৫. বাশার, আবুল; 'প্রারম্ভের গোড়ার কথা', রাজাবলি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৫

৫৬. বাশার, আবুল; মরুস্বর্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১৬, পৃ. ১২৯

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

৫৮. কোরান শরীফের বহু জায়গায় হ্রদের রূপ ও গুণের বর্ণনা রয়েছে। বিশেষত, কোরান শরীফের ৫৫-সংখ্যক সূরা 'রহমান'-এ হ্রদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। (আয়াত সংখ্যা- ৫৬, ৫৮, ৭২, ৭৪, ৭৬)। এছাড়াও ৩৬-সংখ্যক সূরা 'ইয়াসিন', (আয়াত

সংখ্যা-৫৫), ৩৭-সংখ্যক সূরা ‘সাফ্যাত’, (আয়াত সংখ্যা- ৪৮), ৩৮-সংখ্যক সূরা ‘সোয়াদ’, (আয়াত সংখ্যা- ৫২), ৪৪-সংখ্যক সূরা ‘দোখান’, (আয়াত সংখ্যা- ৫৪), ৫৬-সংখ্যক- সূরা ‘ওয়াকিয়া’, (আয়াত সংখ্যা- ৮), ৭৪ সংখ্যক সূরা- ‘মুদাস্সির’, (আয়াত সংখ্যা- ৩৩)। ‘হুর’— শব্দের আরবি অর্থ হল- ‘উজ্জ্বল সাদা-কালো চোখধারী’ অর্থাৎ উজ্জ্বল চোখের অধিকারী। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, জান্নাতের ঈমানদার (পুণ্যবান) ব্যক্তিদের সঙ্গিনী হবে হুরেরা। হাদিসে রয়েছে, এক একজন পুরুষকে সত্তরজন হুর প্রদান করা হবে। জান্নাতি পুরুষদের সেবা করাই হবে হুরদের প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ। দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

৫৯. কোরানে শাদাদের বেহেশতের কথা উল্লেখিত না হলেও আদ জাতির গল্পের অন্তরেই নিহিত রয়েছে শাদাদের বৃত্তান্ত। কোরানের ২৬-সংখ্যক সূরা শোয়ারা ১২৮-১২৯ ও ১৩৯ সংখ্যক আয়াতে আদজাতি সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

৬০. কোরানে ইরাম নগরীর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। (৮৯-সংখ্যক সূরা ফজর, আয়াত সংখ্যা ৬-৮) দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০ পৃ. ৩৪৪

৬১. <https://archive.roar.media/bangla/main/history/lost-city-of-eram-shaddads-heaven>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ১২.০১.২০২৪, সময়: ১: ৪৩ pm

৬২. <https://archive.roar.media/bangla/main/history/lost-city-of-eram-shaddads-heaven>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ১২.০১.২০২৪, সময়: ১: ৫২ pm

৬৩. ‘শাদাদের বেহেশত’, *সহীহ কাসাসুল আফিয়া*, হোসাইনিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২২৬

৬৪. কোরান শরীফের বহু জায়গায় হুরদের রূপ ও গুণের বর্ণনা রয়েছে। বিশেষত, কোরান শরীফের ৫৫-সংখ্যক সূরা ‘রহমান’-এ হুরদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। (আয়াত সংখ্যা- ৫৬, ৫৮, ৭২, ৭৪, ৭৬)। এছাড়াও ৩৬-সংখ্যক সূরা ‘ইয়াসিন’, (আয়াত সংখ্যা-৫৫), ৩৭-সংখ্যক সূরা ‘সাফ্যাত’, (আয়াত সংখ্যা- ৪৮), ৩৮-সংখ্যক সূরা ‘সোয়াদ’, (আয়াত সংখ্যা- ৫২), ৪৪-সংখ্যক সূরা ‘দোখান’, (আয়াত সংখ্যা- ৫৪), ৫৬-সংখ্যক- সূরা ‘ওয়াকিয়া’, (আয়াত সংখ্যা- ৮), ৭৪ সংখ্যক সূরা- ‘মুদাস্সির’, (আয়াত

সংখ্যা- ৩৩)। ‘হুর’— শব্দের আরবি অর্থ হল- ‘উজ্জ্বল সাদা-কালো চোখধারী’ অর্থাৎ উজ্জ্বল চোখের অধিকারী। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, জান্নাতের ঈমানদার (পুণ্যবান) ব্যক্তিদের সঙ্গিনী হবে হুরেরা। হাদিসে রয়েছে, এক একজন পুরুষকে সত্তরজন হুর প্রদান করা হবে। জান্নাতি পুরুষদের সেবা করাই হবে হুরদের প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ। দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

৬৫. গেলেমান বা গিল্‌মান (বিশেষ্য) আরবি ভাষার একটি শব্দ। মুহম্মদ পূর্ববর্তী সময়ে যার অর্থ ছিল ক্রীতদাস বা সেনাবাহিনীর ভাড়াটিয়া সৈন্য। কোরান রচিত এবং সংকলিত হবার পর কোরানের ভাষ্য অনুযায়ী, গেলেমান বলতে বোঝায়, বেহেশতের সেবকবৃন্দ। যাদের মূলত চিরকিশোর বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোরানের বর্ণনা অনুযায়ী, তাদের উজ্জ্বলতা ও উপস্থিতি হবে ছড়িয়ে থাকা মুক্তোর মতো। জান্নাতে পুরুষদের জন্য যেমন হুর প্রদান করা হবে, তেমনি নারীদের জন্য থাকবে গেলেমান। স্বর্গবাসী নারীদের আনন্দ দেওয়াই হবে গেলেমানদের প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ। কোরানের ৫২ সংখ্যক সূরা তুর-এর ২৪ সংখ্যক আয়াত, ৫৬ সংখ্যক সূরা ওয়াকিয়া-র ১৭ সংখ্যক আয়াত, ৭৬ সংখ্যক সূরা দাহর-এর ১৯ সংখ্যক আয়াতে গেলেমান বা চিরকিশোরদের বর্ণনা রয়েছে। কোরান শরীফের বহু জায়গায় হুরদের রূপ ও গুণের বর্ণনা রয়েছে। বিশেষত, কোরান শরীফের ৫৫-সংখ্যক সূরা ‘রহমান’-এ হুরদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। (আয়াত সংখ্যা- ৫৬, ৫৮, ৭২, ৭৪, ৭৬)। এছাড়াও ৩৬-সংখ্যক সূরা ‘ইয়াসিন’, (আয়াত সংখ্যা-৫৫), ৩৭-সংখ্যক সূরা ‘সাফ্যাত’, (আয়াত সংখ্যা- ৪৮), ৩৮-সংখ্যক সূরা ‘সোয়াদ’, (আয়াত সংখ্যা- ৫২), ৪৪-সংখ্যক সূরা ‘দোখান’, (আয়াত সংখ্যা- ৫৪), ৫৬-সংখ্যক- সূরা ‘ওয়াকিয়া’, (আয়াত সংখ্যা- ৮), ৭৪ সংখ্যক সূরা- ‘মুদাসসির’, (আয়াত সংখ্যা- ৩৩)। ‘হুর’— শব্দের আরবি অর্থ হল- ‘উজ্জ্বল সাদা-কালো চোখধারী’ অর্থাৎ উজ্জ্বল চোখের অধিকারী। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, জান্নাতের ঈমানদার (পুণ্যবান) ব্যক্তিদের সঙ্গিনী হবে হুরেরা। হাদিসে রয়েছে, এক একজন পুরুষকে সত্তরজন হুর প্রদান করা হবে। জান্নাতি পুরুষদের সেবা করাই হবে হুরদের প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ। দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

৬৬. ‘শাদাদের আশাভঙ্গ এবং জীবনের যবনিকা’, *সহীহ কাসাসুল আফিয়া*, হোসাইনিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২২৭-২২৮

৬৭. ইসলামি পুরাণে আজরাইল ফেরেশতা ‘মালাকুল মউত’ নামে সমধিক পরিচিত। প্রাণীদের প্রাণ সংহার করাই তাঁর প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ। আদম সৃষ্টির প্রাক্‌মুহূর্তে সকল ফেরেশতা মাটি আনতে অসমর্থ হলে সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন আজরাইল। আল্লাহ্র আদেশ পালন করাই হল তাঁর জীবনের দস্তুর। সেই কারণে আল্লাহ্ আজরাইলকে সবথেকে নিষ্ঠুর কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। দ্রষ্টব্য: মাওলানা বসিরউদ্দিন, দোজখের আযাব ও বেশেষতের শান্তি, রহমানিয়া লাইব্রেরি, মগরাহাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ২০০৮, পৃ. ২৪-৩০

৬৮. বাশার, আবুল; মরুস্বর্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১৬, পৃ. ৪৪-৪৫

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২-৫৩

৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

৭৩. বাশার, আবুল; রাজাবলি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৯

৭৪. *The Holy Bible* (Old and New Testaments), ‘Book of Genesis’, Chapter- 14, The church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City, Utah, USA, 2013, Page- 19-21

বাইবেলের লোট কোরানে লুত নামে পরিচিত। কোরানের ৭ সংখ্যক সূরা আরাফ-এর ৮০-৮৪ সংখ্যক আয়াত ও ৫৪ সংখ্যক সূরা রুম-এর ৩৭ সংখ্যক আয়াতে হজরত লুত নবি ও তাঁর সময়কালের বর্ণনা পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য: কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৯২ ও ২২৫

৭৫. পাল, রবিন; ‘আবুল বাশারের ছোটগল্প’, সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত) এবং মুশায়েরা, বাংলা গল্প ও গল্পকার সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ১৫৩

৭৬. বাশার, আবুল; ‘মাটি ছেড়ে যায়’, মাটি ছেড়ে যায়, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪ পৃ. ২২

৭৭. খান, মুহাম্মদ ইনসান আলী; *আল কোরআনের অলৌকিক ঘটনাবলী*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, পৃ. ২৪

৭৮. বাশার, আবুল; 'চঙ', *মাটি ছেড়ে যায়*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২৩

৭৯. দাশ, জীবনানন্দ; '১৯৪৬-৪৭', *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র*, (সম্পাদনা) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৫ পৃ. ২৮৩

৮০. বাশার, আবুল; 'চঙ', *মাটি ছেড়ে যায়*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২৬

৮১. *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (৫ সংখ্যক সুরা- মায়িদা, আয়াত সংখ্যা ২৭-৩১), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৬৮

৮২. বাশার, আবুল; 'চঙ', *মাটি ছেড়ে যায়*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২৯

৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৮৪. *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (১৮ সংখ্যক সুরা- কাহাফ, আয়াত সংখ্যা ৬০-৮২), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ১৭০-৭১

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০-৭১

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০-৭১

৮৭. বাশার, আবুল; 'কুটুম্ব', *মাটি ছেড়ে যায়*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৪৫-৪৬

৮৮. কোরান শরীফের ৬৭ সংখ্যক সুরা 'মুল্ক', ৩৪ সংখ্যক সুরা 'সাবা' এবং ৪২ সংখ্যক সুরা 'আশ-শুরা'— এই তিনটি সুরায় বলা হয়েছে 'রুজির মালিক আল্লাহ্'। অর্থাৎ মানবজাতির আহারের দায়িত্ব আল্লাহ্র। দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (১৮ সংখ্যক সুরা- কাহাফ, আয়াত সংখ্যা ৬০-৮২), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

৮৯. বাশার, আবুল; 'এক টুকরো চিঠি', *মাটি ছেড়ে যায়*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৭৭

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

৯৩. কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (৯৭ সংখ্যক সূরা- কদর, আয়াত সংখ্যা ৩), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৩৩৭

৯৪. কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (৯৭ সংখ্যক সূরা- কদর, আয়াত সংখ্যা ১-৫), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৩৩৭

৯৫. বাশার, আবুল; 'এক টুকরো চিঠি', মাটি ছেড়ে যায়, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৮২

৯৬. পাণ্ডা, বিশ্বজিৎ; স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম-মানস, সৃষ্টিসুখ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০২০, পৃ. ৬৭

৯৭. বাশার, আবুল; 'এক টুকরো চিঠি', মাটি ছেড়ে যায়, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৮৮

৯৮. https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Stone, তথ্য গ্রহণের তারিখ- ০৫.০৭.২০২১, সময়: ২: ৫৬ am

৯৯. বাশার, আবুল; 'এক টুকরো চিঠি', মাটি ছেড়ে যায়, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৯২

১০০. বাশার, আবুল; 'নিশি কাজল', মাটি ছেড়ে যায়, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১১৪

১০১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫-১১৬

১০২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

১০৪. কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (৬৬ সংখ্যক সূরা- তাহরীম, আয়াত সংখ্যা ৮), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৩১৩

১০৫. বাশার, আবুল; 'নিশি কাজল', *মাটি ছেড়ে যায়*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১২৩

১০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

১০৭. আবুল বাশারের মুখোমুখি সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, *বইয়ের দেশ*, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯, পৃ. ১১৬

১০৮. পাল, রবিন; 'আবুল বাশারের ছোটগল্প', সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত) *এবং মুশায়েরা*, বাংলা গল্প ও গল্পকার সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ১৫৫

১০৯. হিট্রি, কে ফিলিপ; *আরব জাতির ইতিহাস*, আদি মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯

পৃ. ১৮২

১১০. বাশার, আবুল; 'সিমার', *সিমার*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০১,

পৃ. ১০

১১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

১১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

১১৫. গনী, ড. ওসমান; *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ*, (২-নং সুরা বাকারাহ্, আয়াত-২২৩), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২৯

১১৬. দত্তভৌমিক, গোপা; 'সুকুমারী ভট্টাচার্যের দৃষ্টিতে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান এবং কিছু ভাবনা', ফুয়াদ, আফিফ (সম্পাদিত), *দিবারাত্রির কাব্য*, সুকুমারী ভট্টাচার্য সংখ্যা, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ১৪৯

১১৭. বাশার, আবুল; 'সিমার', *সিমার*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০১, পৃ. ১৮

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

১১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১২০. গনী, ড. ওসমান; কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ, (২-নং সুরা বাকারাহ্, আয়াত-২৩০),
বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৩০

১২১. বাশার, আবুল; 'কাসীদ', একই বৃত্তে, প্রজ্ঞা, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১১০

১২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

১২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

১২৪. বাশার, আবুল; 'পথ', আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,

জানুয়ারি ২০১২ পৃ. ১২৪

১২৫. বাশার, আবুল; 'নাস্তিক', সিমার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ডিসেম্বর
২০০১, পৃ. ৩৪

১২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

১২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

১২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

১৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

১৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

১৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

১৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

১৩৪. কোরান শরীফের বহু জায়গায় হুরদের রূপ ও গুণের বর্ণনা রয়েছে। বিশেষত,
কোরান শরীফের ৫৫-সংখ্যক সুরা 'রহমান'-এ হুরদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।
(আয়াত সংখ্যা- ৫৬, ৫৮, ৭২, ৭৪, ৭৬)। এছাড়াও ৩৬-সংখ্যক সুরা 'ইয়াসিন', (আয়াত

সংখ্যা-৫৫), ৩৭-সংখ্যক সূরা ‘সাফ্ফাত’, (আয়াত সংখ্যা- ৪৮), ৩৮-সংখ্যক সূরা ‘সোয়াদ’, (আয়াত সংখ্যা- ৫২), ৪৪-সংখ্যক সূরা ‘দোখান’, (আয়াত সংখ্যা- ৫৪), ৫৬-সংখ্যক- সূরা ‘ওয়াকিয়া’, (আয়াত সংখ্যা- ৮), ৭৪ সংখ্যক সূরা- ‘মুদাস্‌সির’, (আয়াত সংখ্যা- ৩৩)। ‘হুর’— শব্দের আরবি অর্থ হল- ‘উজ্জ্বল সাদা-কালো চোখধারী’ অর্থাৎ উজ্জ্বল চোখের অধিকারী। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, জান্নাতের ঈমানদার (পুণ্যবান) ব্যক্তিদের সঙ্গিনী হবে হুরেরা। হাদিসে রয়েছে, এক একজন পুরুষকে সত্তরজন হুর প্রদান করা হবে। জান্নাতি পুরুষদের সেবা করাই হবে হুরদের প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ। দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

১৩৫. ফজল, আবুল; ‘মানবতন্ত্র’, *নির্বাচিত প্রবন্ধ আবুল ফজল*, (সম্পাদনা) মাহবুবুল হক, সময় প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৮ পৃ. ১৫৮

১৩৬. বাশার, আবুল; ‘নাস্তিক’, *সিয়ার*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০১, পৃ. ৯২

১৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

১৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

১৩৯. আবুল বাশারের মুখোমুখি সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, *বইয়ের দেশ* জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯, পৃ. ১১৭

১৪০. বাশার, আবুল; ‘আবাবিল নয়’, *আবুল বাশার গল্পসমগ্র*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৬

১৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

১৪২. <https://quran.com/en/al-fil>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ১২.০১.২০২২, সময়: ৯: ১১ pm

১৪৩. *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (১০৫ সংখ্যক সূরা- ফিল, আয়াত সংখ্যা ১-৫), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৩৩৯

১৪৪. বাশার, আবুল; ‘আবাবিল নয়’, *আবুল বাশার গল্পসমগ্র*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯৩

১৪৫. কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (২৪ সংখ্যক সুরা- নূর, আয়াত সংখ্যা ৩১), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২০০

১৪৬. বাশার, আবুল; ‘রুকু দেওয়ান’, আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৩১

১৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২

১৪৮. দ্রষ্টব্য: কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (১৮ সংখ্যক সুরা- কাহাফ, আয়াত সংখ্যা ৬০-৮২), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ১৭০-১৭১

১৪৯. ‘আবে হায়াত’ শব্দের অর্থ হল জীবনবারি বা অমৃতবারি। যে জল পান করলে মৃত্যু হয় না, অমরত্ব লাভ করা যায়, তার নাম আবে হায়াত। মুসলমান সমাজের মানুষদের বিশ্বাস খিজির অমৃতসুধা পান করেছেন এবং এখনও তিনি জীবিত আছেন। বর্তমানে তাঁর আবাস জলের তলদেশে। এই কারণেই ইসলাম ধর্মের হাদিসেও নদী-পুকুর বা সমুদ্রের জলে মলমূত্র ত্যাগ করা কঠোরভাবে নিষেধ। কোরানে বাদশাহের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা থাকলেও খিজিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা খিজিরের অমৃতসুধা পানের বর্ণনা নেই। খিজিরের অমরত্ব লাভের ঘটনা মুসলমান সমাজের লৌকিক বিশ্বাস। কথিত আছে, ‘আবে হায়াত’ বা অমৃতবারির খবর জানতেন মহাজ্ঞানী খিজির। তিনি বাদশাহ জুলকারনাইনকে জানান, যে সাগরের ওপারে অন্ধকার দেশ আছে। সেখানে সারাক্ষণ অন্ধকার থাকে। ওই জায়গায় এক গুহায় আবে হায়াতের ঝরনা আছে। এ কথা শুনে বাদশাহ জুলকারনাইন খিজিরসহ অনেক লোক-লস্কর নিয়ে আবে হায়াতের খোঁজে বের হন। কিন্তু গভীর অন্ধকারে বাদশাহ জুলকারনাইন পথভ্রষ্ট হন এবং খিজির আবে হায়াত ঝরনায় পৌঁছে যান। খিজির আবে হায়াতের জল পান করে অমরত্ব লাভ করেন। এই ঘটনা যদিও ইসলামি শাস্ত্র স্বীকার করে না। মৌখিক পরম্পরায় মানুষের লৌকিক বিশ্বাস মিথের রূপ নিয়েছে। ‘রুকু দেওয়ান’ গল্পে আবুল বাশার মিথের ঘটনাকে গল্পের শেষে সংযুক্ত করেছেন। পৌরাণিক খিজির যেহেতু ছিলেন মানুষের রক্ষাকর্তা ও নিরাপত্তা প্রহরী এবং বর্তমানে তিনি জলের ফেরেশতা। বস্তুত সেই কারণেই গল্পের পরণকথার নায়িকা জহুরা নামী গণিকা জলের দেবতা খিজিরের কাছে জলের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

১৫০. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/ZamzamWell>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ২৭.০১.২০২২, সময়: ২: ৩৪ pm

১৫১. বাশার, আবুল; ‘রুকু দেওয়ান’, আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৩৪

১৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫

১৫৩. সহীহ: বুখারী ৩৩২১, মুসলিম ২২৪৫, আহমাদ ১০৬২১, শারহুস্ সুন্নাহ ১৬৬৬, সহীহ আল জামি আস্ সগীর ৪১৬৩, দ্রষ্টব্য: সহীহ বুখারী শরীফ, (অনুবাদ- হজরত মাওলানা শামসুল হক, শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ), মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ২১৭

১৫৪. বাশার, আবুল; ‘ডানামেলা বৃশ্চিক’, আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৯৩

১৫৫. ইসলামি পুরাণ অনুসারে, পৃথিবীতে যখন বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসবে তখন ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। সর্বসাধারণের কাছে সে ‘মসীহ’ নামে পরিচিত হবে। সে একটি গাধায় চড়ে পরিভ্রমণ করবে। তার মাথার চুল লম্বা ও কোঁকড়ানো থাকবে এবং ডান চোখ অন্ধ হবে। ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী কোনো এক স্থান থেকে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। সে নিজেকে নবি বলে দাবি করবে। বহু মানুষ ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে তার দলভুক্ত হবে। দাজ্জালের কপালে আরবি ভাষায় পরিস্কারভাবে লেখা থাকবে— কাফ, ফে, র— অর্থাৎ কাফের।

হাদিসের বয়ান অনুযায়ী, আল্লাহ্ মানুষের বিশ্বাস (ঈমান) পরীক্ষার জন্য দাজ্জালকে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করবেন। সেই অলৌকিক ক্ষমতার বলে দাজ্জাল বহু মানুষকে তার দলভুক্ত করে পথভ্রষ্ট করবে। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীগণ (ঈমানদার) দাজ্জালকে বিশ্বাস করবে না।

দ্রষ্টব্য: মাওলানা খোন্দকার মহম্মদ বশিরউদ্দিন; *দোজখের আজাব ও বেহেশতের শান্তি*, রহমানিয়া লাইব্রেরি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, প্রকাশকাল ২০০৮, পৃ. ৩৪০

১৫৬. বাশার, আবুল; ‘দুই অক্ষরের গল্প’, আবুল বাশার গল্পসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩২৪

১৫৭. শরীফ, আহমদ; *বাংলার সূফী সাহিত্য*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, পৃ. ২৩

১৫৮. কোরান শরীফের বহু জায়গায় ‘জিকির’-এর প্রসঙ্গ রয়েছে। যেমন— ৩ সংখ্যক সূরা আল ইমরান-এর ১৩৫ সংখ্যক আয়াত, ৪ সংখ্যক সূরা নিসা-র ১০৩ সংখ্যক আয়াত, ১৩ সংখ্যক সূরা রাদ্-এর ২৮ সংখ্যক আয়াত, ১৮ সংখ্যক সূরা কাহাফ-এর ৮৩ সংখ্যক আয়াত, ২১ সংখ্যক সূরা আশ্বিয়া-র ৫০ ও ১০৫ সংখ্যক আয়াত, ৩৩ সংখ্যক সূরা আহযাব-এর ৪১ সংখ্যক আয়াত, ৩৮ সংখ্যক সূরা সোয়াদ-এর ৩২ সংখ্যক আয়াত, ৪৩ সংখ্যক সূরা যুখরোফ-এর ৪৪ সংখ্যক আয়াত, ৭২ সংখ্যক সূরা জ্বিন-এর ১৭ সংখ্যক আয়াত ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য: কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

১৫৯. হক, ড. মুহম্মদ এনামুল; বঙ্গে সুফি প্রভাব, রায়মন পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৪১

১৬০. কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (১১২ সংখ্যক সূরা- এখলাস, আয়াত সংখ্যা ১-৪), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৩৪১

১৬১. কোরানের ১১৩ ও ১১৪ সংখ্যক সূরা আল-ফালাক ও আল-নাস এ জাদু বিষয়ক শ্লোক রচিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য: কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৩৪১

১৬২. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Al-Falaq>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ১৮.০১.২০২২, সময়: ৩: ০৩ am

১৬৩. জাহান্নাম বা দোজখ ইসলাম শাস্ত্রের খুব পরিচিত শব্দ। ইসলামি পরিভাষায় দোজখ হল পরকালের জন্য পাপীদের আবাসস্থল। কোরান ও হাদিসে দোজখ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। কোরানে দোজখের সাতটি ভাগ বা স্তরের কথা বলা হয়েছে। যথা- জাহান্নাম, হুতামা (চূর্ণবিচূর্ণকারী বহিঃশিখা), সাকার (ঝলসানো বা গলানো), জাহীম (জ্বলন্ত আগুন), লাযা (লেলিহান অগ্নিশিখা), সাঈর (উজ্জ্বল অগ্নিকাণ্ড), হাবিয়া (অতল গহ্বর)। এর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নরক হল হাবিয়া। নরকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর হল হাবিয়া।

দ্রষ্টব্য: রহমান, বজলুর; কোরআন ও সহী হাদিসের আলোকে জান্নাত ও জাহান্নাম, আস-সিরাত প্রকাশনী, রাজশাহী, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ২০৭-৩৩৫

মাওলানা খোন্দকার মহম্মদ বশিরউদ্দিন; *দোজখের আজাব ও বেহেশতের শান্তি*, রহমানিয়া লাইব্রেরি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, প্রকাশকাল ২০০৮, পৃ. ২৯৯-৩০৯

১৬৪. বাশার, আবুল; 'দৈরখ', *আবুল বাশার গল্পসমগ্র*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫৩

১৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭

১৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭

১৬৭. বাশার, আবুল; 'প্রকাশকের কথা'। *আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৭

১৬৮. বাশার, আবুল; 'অন্য নকসি', *আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩০

১৬৯. দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (২০ সংখ্যক সুরা-তোহা, আয়াত সংখ্যা ৪৭), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ১৭৯

১৭০. বাশার, আবুল; 'অন্য নকসি', *আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩১

১৭১. চক্রবর্তী, সুধীর; *বাউল ফকির কথা*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ১৯০-১৯১

১৭২. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Madhhab>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ২৭.০১.২০২২, সময়: ৪: ৫৬ pm

১৭৩. বাশার, আবুল; 'অন্য নকসি', *আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৬

১৭৪. দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (১০৮ সংখ্যক সুরা-কাওসার, আয়াত সংখ্যা ১-৩), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৩৪০

১৭৫. দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (১০৯ সংখ্যক সুরা-কাফেরুণ, আয়াত সংখ্যা ৬), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৩৪০

১৭৬. বাশার, আবুল; 'অন্য নকসি', আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪১

১৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১৭৮. দে, রামকৃষ্ণ; 'প্রসঙ্গ: পিতৃতন্ত্র' (সম্পাদনা) পুলক চন্দ, নারীবিদ্যা, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৮ পৃ. ৬১৮

১৭৯. বাশার, আবুল; 'অন্য নকসি', আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪৭

১৮০. চক্রবর্তী, সুধীর; বাউল ফকির কথা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ১৯৯

১৮১. শরীফ, আহমদ; বাংলার সূফী সাহিত্য, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, পৃ. ২৮

১৮২. চক্রবর্তী, সুধীর; বাউল ফকির কথা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ১৮৯

চতুর্থ অধ্যায়

ইহুদি ও খ্রিস্টীয় মিথ-পুরাণ: আবুল বাশারের উপন্যাস

চতুর্থ অধ্যায়

ইহুদি ও খ্রিস্টীয় মিথ-পুরাণ: আবুল বাশারের উপন্যাস

পৃথিবীর মানুষের ধর্মের ইতিহাস অবলোকন করলেই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর-গ্রন্থ হিসাবে ইহুদিদের *হিব্রু বাইবেল* সর্বাপ্রেক্ষা প্রাচীন। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে ইহুদি এবং খ্রিস্টান ধর্মের ধারাবাহিকতায় ইসলাম ধর্মের জন্ম। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সৃষ্ট এই তিন সেমেটিক ধর্মের প্রধান গ্রন্থগুলির মধ্যে অজস্র সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষ করে ঈশ্বর এবং তাঁর প্রেরিত দূত (নবি) বা পয়গম্বরগণের জীবনালেখ্য ও ঈশ্বর নিঃসৃত জ্ঞান অর্জন ও দীক্ষা— পরবর্তীকালের খ্রিস্টান এবং ইসলামি পুরাণের কাহিনির যে আদল তা আদিপুস্তক থেকেই অনুসৃত হয়েছে বলা যায়। তিন ধর্মেরই ঐশ্বরিক গ্রন্থে ঈশ্বরের নির্মিত প্রোটোগনিস্ট চরিত্রগুলি কমবেশি অভিন্ন হলেও ঈশ্বরীয় সত্তা, অর্থাৎ ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ বা উপস্থাপনে অনেক ফারাক লক্ষ করা যায়। ইহুদি ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বর অনেক বেশি রাজনৈতিক। রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে তিনি মরুভূমির মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, প্রতিষ্ঠা করছেন এবং সেইসঙ্গে বিতাড়িত করছেন। এমন কূটনীতিক দেবতার সন্ধান ভারতীয় পুরাণেও পাওয়া যায়। মহাভারতের কৃষ্ণের যে বৌদ্ধিক অনুশাসনের রীতিনীতি তার সঙ্গে আদিপুস্তকের ঈশ্বরের কিছুটা মিল রয়েছে। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের নাম *তানাখ*। *তানাখ* হল প্রধান নবিদের কাহিনি নিয়ে রচিত ২৪টি পুস্তক। এছাড়া ২৪ জন গৌণ-নবিদের বইগুলিও *তানাখ*-এর অন্তর্ভুক্ত। ‘তানাখ’— শব্দটি তিনটি হিব্রু অক্ষর দিয়ে গঠিত। যথা,

ত (Torah) - আইন বা শিক্ষা।

ন (Nevi'im) - নবিদের বই।

খ (Ketuvim) - পবিত্র লেখা।

পবিত্র বাইবেলের ‘পুরাতন নিয়ম’ (Old Testament)-এর অন্তর্গত প্রথম পাঁচটি পুস্তক হল— ‘আদিপুস্তক’ (Book of Genesis), ‘যাত্রাপুস্তক’ (Book of Exodus), ‘লেবীয় পুস্তক’ (Book of Leviticus), ‘গণনা পুস্তক’ (Book of Numbers), ‘দ্বিতীয় বিবরণ’ (Book of Deuteronomy)। ইহুদিরা এই পাঁচটি খণ্ডের সমন্বয়কে বলে ‘তোরাহ্’ এবং খ্রিস্টানরা একে বলে ‘পেন্টাটিউক’ (Pentateuch)। পেন্টাটিউক— শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ ‘পাঁচটি বই’। ইহুদিদের প্রচলিত সংস্কার ছিল ‘ঈশ্বর জগতের রাজা’, যিশু বলেছিলেন— ‘ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা’। মধ্যপ্রাচ্যের আরব মরুভূমির বুকে তিনটি প্রধান ধর্মের জন্ম— মোজেসের ইহুদি ধর্ম, যিশুর খ্রিস্টান ধর্ম ও হজরত মুহম্মদের ইসলাম ধর্ম। মরুভূমির এই প্রধান তিন ধর্মগোষ্ঠীগুলির আন্তঃসংযোগ ও দ্বন্দ্ব, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পাশাপাশি ঈশ্বর পূজার মধ্যকার বিরোধ ধর্মগুলিকে পৃথক করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

৪. ক. উপন্যাসে ইহুদি ও খ্রিস্টীয় মিথ-পুরাণ:

আধুনিক ঔপন্যাসিক আবুল বাশার তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে খ্রিস্টজন্মের সহস্র বছর পূর্বের প্রাচীন পৃথিবীর এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে বেছে নিয়েছেন। *রাজাবলি* (১৯৯৭) উপন্যাসের কাহিনির উৎস মূলত ইহুদিদের *হিব্রু বাইবেল* বা *ওল্ড টেস্টামেন্ট*। *কোরানের* সঙ্গে আদিপুস্তকে-র কাহিনির মিল থাকলেও লেখক এ উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করেছেন ইহুদি-গ্রন্থ *ওল্ড টেস্টামেন্ট* থেকে। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন:

আমি দুই মহান গ্রন্থের (আদিপুস্তক ও কোরান) ঐক্য এবং বিরোধ দেখেছি উপন্যাসের খাতিরে, কোরানকে কোথাও ব্যবহার করিনি। হজরত মুহম্মদ এই গ্রন্থের ত্রিসীমার মধ্যে নেই। কারণ মহানবি মুহম্মদের জন্মের চার-হাজার বৎসর পশ্চাতে চলে গেছি আমি।^১

ইহুদি পুরাণ-মিশ্রিত এই আখ্যানের পটভূমি হজরত মুহম্মদের জন্মের চার হাজার বছর পূর্বের প্রাচীন পৃথিবী। মরুদেশ কেনানের সম্রাট শলোমনের রাজসত্তা ও নবিসত্তার দ্বন্দ্বই এ উপন্যাসের উপজীব্য। শলোমন ‘আদিপুস্তক’-এর নবি হলেও তাঁর রাজসত্তাই সেখানে মুখ্য। অন্যদিকে ইসলামি পুরাণে শলোমনের (কোরানে সোলাইমান) নবিসত্তাই প্রধান। ‘আদিপুস্তক’-এ রয়েছে মরুদেশের মানুষের ভাষা সমস্যা এবং বিচ্ছিন্নতার গল্প। মানুষের ভাজক-প্রবৃত্তি ও মাটি দখল করে ঈশ্বরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং সেইসঙ্গে জ্ঞাতিনিধন— প্রাচীন পৃথিবীর এই পুরাণকথা আজকের পৃথিবীর তামাম সময়কে স্পর্শ করেছে।

রাজাবলি-র আখ্যানের পরতে-পরতে আছে দ্বন্দ্বের বীজ। যে বীজ উদ্গত হয়েছে দিব্যতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সংঘাত থেকে। শলোমনের রাজসত্তা ও নবিসত্তার দ্বন্দ্ব তাঁর হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করেছে। শুষ্ক মরুমর্ত্যে দাঁড়িয়ে রাজা শলোমনের হৃদয়ের ফ্ল্যাশব্যাকে ভেসে উঠেছে তাঁর পূর্বপুরুষ— আদম ও নোহ থেকে শুরু করে আব্রাহাম, ইস্রায়েল, যাকোব, যোশেফ, মোজেশের পরাক্রম এবং পিতা দাউদের কার্যাবলি ও রাজতন্ত্র। আরবি বর্ণমালার প্রথম অক্ষর আলিফ্ (ا) দেখতে লাঠির মতো। প্রাচীন পৃথিবীর মরুতে লাঠি পুঁতেই মানুষ মাটি দখল করত। মরুভূমির মাটিতে প্রথম লাঠি পোঁতেন অব্রাম, তখনও তিনি আব্রাহাম হননি। অব্রাম ছিলেন অব্রাক্ষণ অর্থাৎ বেদুইন বা বেদে, গোষ্ঠীপিতা এবং মোড়ল। অব্রাম কীভাবে আব্রাহাম হয়েছিলেন তার বর্ণনা উপন্যাসে রয়েছে। ‘আদিপুস্তক’-এর ঈশ্বর অব্রামকে নিজের দেশ, আত্মীয়স্বজন ও পৈতৃক নিবাস পরিত্যাগ করে নিয়ে এসেছিলেন মরুদেশে। অব্রামকে ঈশ্বর জানিয়েছিলেন:

আমি তোমাকে মহান এক জাতির জনক করব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করে তোমার নাম গৌরবান্বিত করব। আশীর্বাণী রূপে ব্যবহৃত হবে তোমার নাম। যারা তোমাকে

আশীর্বাদ করবে তাদের আমি আশীর্বাদ করব, আর যারা তোমাকে অভিশাপ দেবে
আমি তাকে করব শাপগ্রস্ত।^২

ইহুদি লৌকিক পুরাণে মোজেসের মতো আব্রাহামের জন্মকাহিনিতেও শিশুবন্ধ্যের
গল্পকথা ছড়িয়ে আছে। ‘আদিপুস্তক’-এর কাহিনি নিয়েই লেখক আব্রাহামের জীবনের
নানান ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। অব্রামের প্রধান শত্রু ছিল নিম্রোদ। আগুনের পূজো
করত নিম্রোদ। ‘আদিপুস্তক’-এর কাহিনিকেই উপন্যাসে সংযুক্ত করেছেন লেখক।
অব্রামকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল নিম্রোদ, কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতাবলে অব্রাম মিশর
ছেড়ে পালিয়ে আসেন মরুদেশ কেনানে। অব্রামের সঙ্গে ছিলেন ভাইপো লোত। লোত
যখন সদোম শহরে অবস্থান করেছিলেন সেইসময় সদোম এবং ঘমোরা শহর পাপে
পরিপূর্ণ। নগরের সমস্ত মানুষ সমকামী প্রেমে মেতে উঠেছিল। সদাপ্রভু মানুষের এই
বেখাপ্লা যৌনতা সহ্য করেননি, তিনি দেবদূতদের হাত দিয়ে দুই নগর ধ্বংস করে
দিয়েছিলেন।^৩ ঈশ্বরের দেবদূতরা লোত পরিবারকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, ছুটে
পালানোর সময় যেন পেছনে ফিরে না চায়, ঈশ্বরের শাপ লাগবে। অথচ লোতের স্ত্রী
পেছনে ফিরে দেখতে চেয়েছিলেন কীভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে তাঁর মরুভূমির পশুধন, তাঁর
তাবু, চুলা, গাছপালা এবং বসতি। ঔপন্যাসিক লোতের স্ত্রীর কথা লিখলেও ‘আদিপুস্তক’
তাঁকে নিয়ে নীরব। কেবলই তিনি পেছনে ফিরে তাকানোর শাস্তি স্বরূপ নুনের মূর্তিতে
পরিণত হয়েছিলেন— এইটুকুই লেখে ‘আদিপুস্তক’।^৪ দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে লোত সোর
পাহাড়ে বাসা বেঁধেছিলেন। স্ত্রী এবং ধনসম্পদ হারিয়ে এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা ও সর্বস্বান্ত
বিভীষিকা ছিল লোতের সঙ্গী। বংশরক্ষার তাগিদ অনুভব করে লোতের দুই কন্যা
মদিরাচ্ছন্ন পিতার সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়। আর তাদের কোলে জন্ম নেয় মোয়াব ও
অম্মোন।^৫ যাদের উত্তরপুরুষ পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে শলোমনের প্রতিপক্ষ।

‘আদিপুস্তক’-এ মোজেশের জন্মবৃত্তান্ত-এ শিশুবধের বর্ণনা রয়েছে। মোজেশ যখন মায়ের গর্ভে তখন মিশরের ফারাও কোনো নারীর পুত্র সন্তান জন্মালেই তাকে বধ করতেন। কারণ স্বপ্নবিদ্রা ফারাওকে জানিয়েছিল, এদের মধ্যে কোনো এক শিশুর হাত দিয়েই তার পতন ত্বরান্বিত হবে। আব্রাহামের জন্মবৃত্তান্ত-এ ইহুদি লোকপুরাণেও অনুরূপ গল্প প্রচলিত রয়েছে।^১ যদিও ‘আদিপুস্তক’-এ এই বিষয়ে কোনো বর্ণনা নেই। স্বপ্নে ঈশ্বর বা ইলোহের সাক্ষাৎ পেয়ে অব্রাম কেনানকে করে তুলতে চেয়েছিলেন মধু-দুধের দেশ। স্বপ্ন বোঝার ক্ষমতা সে যুগের খুবই কম মানুষেরই আয়ত্তে ছিল। স্বপ্নের ভাষা বোঝা ছিল পুরাযুগের ক্ষমতা ও কৌশল। ঈশ্বর ইলোহের কাছে অব্রাম পরীক্ষা দিয়ে সফল হন এবং তিনি অব্রাম থেকে হয়ে ওঠেন আব্রাহাম। অন্ধকার মরুমর্ত্যে হারিয়ে যায় তাঁর ভাইপো লোত। হারিয়ে যায় লোতের বংশধর। কারণ লোত স্বপ্ন পায়নি ইলোহের। সে যুগে কেবল স্বপ্নবিদ্রাই নবি হয়েছিলেন। স্বপ্নের মধ্যেই ছিল অনাগত জীবনের ইঙ্গিত। আখ্যানে আদমের পুত্র নোহকে বলা হয়েছে ‘উচ্চকোটির স্বপ্নবিদ’। নোহ ছিলেন একাধারে নৌ-কারিগর, গোষ্ঠীনেতা, চমৎকার নির্বাচক, পরিত্রাতা এবং সংরক্ষক। নোহের আমলেই পৃথিবীব্যাপী মহাপ্লাবন হয়েছিল। ইহুদি পুরাণ এবং মুসলিমদের *কোরান*-এ তার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এই মহাপ্লাবনের সংবাদ বয়ে এনেছিল নোহের স্বপ্ন। ‘নির্বাচন, ত্রাণ এবং সংরক্ষণ— এই তিন নীতিই যে ইতিহাস রচছে’— পৌরাণিক এবং বস্তু-ইতিহাসের সেই কথাই আর একবার পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন লেখক। সভ্যতার আদি থেকেই মুকুট দখলের লড়াই এবং জ্ঞাতিভাইয়ের মৃত্যুতে ইতিহাস যে রক্তাক্ত এবং সেই রক্তাক্ত ইতিহাসের উপেক্ষিত চরিত্রদের নিয়েই লেখক নতুন কাহিনি নির্মাণ করেছেন। মহাপ্লাবনের সময় নোহ তাঁর সন্তান কেনানকে তাঁর জাহাজে জায়গা দেননি, কেননা সে তার পিতার

স্বপ্নকে বিশ্বাস করেনি। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং স্বপ্নের কাছে সন্তানও যে তুচ্ছ সেই কঠিন সত্যকেই এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন লেখক। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন:

মানুষের মাংসেই গেঁথে আছে সেই নিয়ম। তোমার স্বপ্ন যে বিশ্বাস করে না, তাকে ফেলে দাও, মারো, তাড়াও, হত্যা কর।
ইতিহাস রক্তাক্ত, তোমারই পুত্র, পুত্রজাতি, তোমারই অংশীর রক্তে। যে এল না, সে কদর্য, ঘৃণ্য। যে এল না সে আক্রমণীয়, সে শত্রু।^৭

আজ এই একুশ শতকেও পৃথিবীর মূল আলোড়ন ও হত্যাগুলি ঘটে মূলত ধর্মকে কেন্দ্র করে। আদিপুস্তক-এর কাহিনি নিয়ে লেখকের যে বয়ান তা ইদানীং সময়কেও স্পর্শ করে। সাম্প্রতিক সময়ের মৌলবাদ এবং ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি সেই সত্যকেই তুলে ধরে। সমাজ সচেতন কথাসাহিত্যিক পুরা পৃথিবীর ধর্মীয় আগ্রাসন ও মানুষের কূটবুদ্ধির আক্রমণাত্মক খেলাকে মিলিয়ে দিয়েছেন আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে, যেখানে প্রমাণ হয় মরুদেশ হোক কিংবা ভারতীয় ভূখণ্ড— ধর্মীয় রাজনীতিই শেষ কথা। মানুষের স্বপ্ন এবং বিশ্বাসের ক্ষমতাই মানুষকে মানুষের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আরব মরুভূমির বুকে সৃষ্ট এই তিন ধর্মের গোড়াতেই রয়েছে পাপ ও অবাধ্যতা। বিচ্ছেদ ও ছিন্নতার বীজ নিহিত রয়েছে আদি মানব-মানবীর কাহিনিতে। সেখানেও ঈশ্বর সর্বসর্বা এবং বহুলাংশে রাজনৈতিক। আদম-ইভ নিজের ইচ্ছা বা স্বাধীনতার বীজ বপন করতে গিয়েই করে ফেলেছিলেন আদি পাপ (Original Sin)। পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের নিমিত্তে আদম-ইভ উভয়েই পতিত হয়েছিলেন মর্ত্যে— আদিপুস্তক-এর রাজনৈতিক ঈশ্বর এভাবেই মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। পরবর্তীকালে লোত, কেনান সবাই সেই বিচ্ছেদের অনিবার্য অংশীদার। নোহ, আব্রাহাম, মোজেশ— সবাই ছিন্নমূল তাড়া খাওয়া মানুষ। এঁদের স্বপ্ন যারা বিশ্বাস করেনি তাদের এঁরা খড়া দিয়ে বিদ্ধ করেছেন, হোক সে ‘জাতিমাংস’। পুরাণের খড়া বিদ্ধ মানুষরাই হলেন এষৌ বা ইদম এবং ইস্রায়েল।

শলোমনের মা বৎসেবা এ উপন্যাসের এক উজ্জ্বল চরিত্র। ‘আদিপুস্তক’ বৎসেবার কথা বেশি লেখেনি। বৎসেবা ছিলেন দাউদের অনুগত সেনা উরিয়র স্ত্রী। ইহুদি পুরাণের দাউদ-বৎসেবার কাহিনিকে উপন্যাসে ভবভূ তুলে ধরেছেন লেখক। শলোমনের মা বৎসেবা ছিলেন দাউদের পরকীয়া প্রেমের নারী। বৎসেবার স্বামী উরিয় ছিল হিত্তীয় বা হিটাইট জাতির লোক। রাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে স্নানের ঘাটে বৎসেবাকে দেখে দাউদের যৌনবোধ জাগ্রত হয় এবং তিনি বৎসেবাকে তাঁর শয্যাসঙ্গিনী করেন। এরপর বৎসেবা গর্ভবতী হন। অথচ দাউদের পূর্বপুরুষ আব্রাহাম থেকে শুরু করে কেউই হিত্তীয় স্ত্রী নির্বাচন করেননি। নিজের কামনাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে দাউদ উরিয়কে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেন। এমন যুদ্ধে তাকে পাঠান সে আর ফিরে আসে না। দাউদ বৎসেবাকে বিবাহ করেন। বৎসেবার সন্তান হয় এবং মারা যায়। পরবর্তীকালে বৎসেবার গর্ভে জন্ম নেন রাজা শলোমন। একথা লেখে ‘আদিপুস্তক’।^৮ অথচ উপন্যাসের শলোমন জানেন না তিনি কার সন্তান! তাঁর বাবা কি হিত্তীয় না দাউদ— নির্ণয় করতে পারেননি মহাজ্ঞানী শলোমন। অনুগত সেনার স্ত্রীকে দাউদ ক্ষমতাবলে অধিকার করেছিলেন। নবি নাথন বারবার তাঁকে বাধা দিলেও তিনি শোনে নেননি। সেকালের মিশরীয়রা হৃদয় দিয়ে চিন্তা করত। উপন্যাসে লেখক লোকপুরাণের সেই গল্পকে সংযুক্ত করেছেন দাউদের হৃদয়ের সত্যকে পরীক্ষা করার কৌশল হিসাবে। মিশরের অধিবাসীদের বলা হত কিবতি। রাজাদের বলা হত কাবুস। প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী কিবতিরাই প্রথম আবিষ্কার করে মানুষ হৃদয় দিয়ে চিন্তা করে। হৃদয় দিয়ে চিন্তা করার কারণ হিসাবে তারা জানিয়েছিল, মৃত্যুর পর সত্যের পালক দিয়ে মানুষের হৃদয়কে ওজন করা হবে। এক পাল্লায় চড়ানো হবে হৃদয়কে এবং অন্য পাল্লায় চড়ানো হবে সত্যের পালক। এভাবেই হৃদয়ের সত্যতা নির্ণয় হবে মরুমর্ত্যে। কাবুসরা ছিলেন অর্ধেক মানব ও অর্ধেক দেবতা। কিবতিদের

শাসন করার জন্যেই তারা মর্ত্যে এসেছেন বহুবার, কালে কালান্তরে। তাঁরা বাস করতেন বৃহৎ পুরীতে। দেখতে মানুষ হলেও তাঁরা আকাশ-প্রতিভা। মৃত্যুর পর দেহটাকে মরুভূমিতে ফেলে রেখে চলে যান এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দেবতার পোশাক পরে ফেলেন। হৃদয় নিয়ে চলে যেতেন আর কিবতিরা তাঁদের দেহটিকে যত্ন করে মমি বানিয়ে রাখতেন। কিবতিদের এই মহা-আবিষ্কার, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বমানবের কাছে চিরবিস্ময় হয়ে রয়েছে। হৃদয়কে আবিষ্কার করা চাকা আবিষ্কারের মতোই ছিল বিস্ময়কর ঘটনা। রাজা শলোমন মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে পিতার পাপের কথা ভাবছেন আর তাঁর হৃদয় দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। মানুষের হৃদয় তো লৌহরথ অপেক্ষা তেজস্বী। লৌহবিদ্যার পারদর্শী হলেন হিত্তীয়রা। শলোমনের মায়ের বংশের লোকেরা হলেন লৌহের আবিষ্কারক। অথচ শলোমনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লৌহের বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারেনি। ‘আদিপুস্তক’ কিংবা *কোরান* এবং অবশ্যই উভয় ধর্মের লোকপুরাণে শলোমনের অলৌকিক ক্ষমতা বা মোজেজার কথা উল্লেখিত হলেও উপন্যাস শলোমনের হাতের অস্ত্রগুলিকে দিব্যাস্ত্র বলে মান্য করেনি। কারণ শলোমনের আমলেই হিত্তীয়রা লোহা আবিষ্কার করেছিল। শলোমন স্বপ্নে যখন ঈশ্বর ইলোহের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেন তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছাড়া কিছুই চাননি ঈশ্বরের কাছে। এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েও শলোমন লৌহবিদ্যা অর্জন করতে পারেননি।

রাজা শলোমনের অবিকল ছায়ামূর্তি লেখকের নিজস্ব কল্পনা। ইহুদি কিংবা ইসলামি কোনো পুরাণই ছায়ামূর্তির কথা বলেনি। ইসলামি পুরাণে শলোমনের রাজসত্তার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে তাঁর নবিসত্তা। জ্বীন পোষা এবং কীটপতঙ্গের ভাষা বোঝার অলৌকিক ক্ষমতার (ইসলামি পরিভাষায় যাকে বলে মোজেজা) বর্ণনা রয়েছে। *ওল্ড টেস্টামেন্ট*-এ শলোমনের রাজসত্তা ছাপিয়ে গেছে নবিসত্তার উপরে। শলোমনের

ছায়ামূর্তির বাহ্যিক গঠনের সঙ্গে মিলে যায় কিবতিদের হৃদয় দিয়ে চিন্তার অদ্ভুত ক্ষমতা। ছায়ামূর্তিরা হৃদয় দিয়ে চিন্তা করে। দেহ নয়, হৃদয়ই যেন আসল বস্তু। ছায়ামূর্তিদের কথা বলতে গিয়ে লেখক ইসলামি পুরাণের হাবিল-কাবিল— এর প্রসঙ্গ এনেছেন। যারা ‘আদিপুস্তক’-এর কয়িন ও আবেল। নারীকে দখল এবং তার অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে প্রথম রক্তপাত ঘটিয়েছিল আদম-পুত্র কয়িন বা কাবিল। হত্যা করেছিল সহোদর ভ্রাতা আবেল বা হাবিলকে। শলোমনের প্রধান দুই ছায়ামূর্তির নাম হাবিল-কাবিল। তাদের নিয়ন্ত্রণে সহস্র ছায়ামূর্তি। কে আসল সম্রাট মরুভূমির মানুষ তা নির্ণয় করতে পারে না। আসলে রাজা শলোমনের আত্মপরিচয়ের সংকটকে প্রতিষ্ঠা করতেই লেখক যেন ছায়ামূর্তির অবতারণা করেছেন। আখ্যানে শলোমনের জন্মবৃত্তান্ত কুয়াশায় ঢাকা। তাঁর পরিচয় ও অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব তাঁকে ভুগিয়েছে বারংবার। ছায়ামূর্তি ও শলোমনের কথোপকথনে এই সত্য উন্মোচিত হয়েছে:

- আপনাকে ঘৃণা করে নাথন গোষ্ঠী। বলে...
- কী বলে? চুপ করে রইলে কেন আদম-পুত্র?
- ভয় করে সম্রাট।
- আমি আজ নিরস্ত্র হে ধর্মের পুত্রগণ।
- এভাবে বলবেন না মহাধিপতি! আমরা আপনার ছায়া হয়ে গর্বিত।
- বল আর কী বলে ওরা?
- আপনি... আপনি...
- বল ধর্ম-পুত্ররা, বলে দাও, ভয় ক'রো না।
- আপনি উরিয়ের সন্তান।
- কী? উরিয়ের সন্তান আমি?
- কেননা...
- কেননা? কী বলতে চাইছ তোমরা?
- অথবা আপনি অবৈধ। নাথন কখনওই মাতা বৎসেবার গর্ভ বিনষ্ট করেননি। একজন ভাববাদী এ কাজ করতেই পারেন না। আপনি ভেবে দেখুন, আপনি কে?

-আমি কে? কে আমি? বলে মরুমর্তে আব্রাহাম পুত্র ইস্রায়েলের মতো, দাসী পুত্র
ইস্রায়েলের মতো গগনভেদী আত্ননাদ করে উঠলেন মহামতি সম্রাট শলোমন।৯

শলোমনের পূর্বপুরুষ আব্রাহামের দাসী-পুত্র ইস্রায়েল যেমন প্রতিষ্ঠা পায় না ইহুদি
পুরাণে। দাসী-পুত্র হওয়ার কারণে তামাম ‘আদিপুস্তক’ খোঁজ করলেও তাদের সন্ধান
মেলে না। সম্ভানের দাবি নিয়ে সে কখনও আব্রাহামের সামনে দাঁড়াতে পারেনি।
শলোমনের দ্বন্দ্বময় হৃদয় পরিচয়হীন ইস্রায়েল সত্তার সঙ্গে মিশে যায়। রুধির-তমসায়
লিপ্ত ভূমরুর উপাখ্যানে শলোমন নিজেকে চিনতে পারে না কিছুতেই। শত সহস্র
ছায়ামূর্তির ভিড়ে শলোমনের নবিসত্তা এবং রাজসত্তা বিলীন হয়ে যায় ক্রমশ। হৃদয় দিয়ে
চিন্তা করেও মনুষ্যবল বা দিব্যবলেই হোক— সম্রাট নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা চালিয়ে
গেছেন আমৃত্যু। পিতা দাউদের স্বপ্নকে পূর্ণ রূপ দিতে চেয়েছেন সম্রাট। শলোমনের
পূর্বপুরুষ অর্থাৎ বনি-ইস্রায়েল গোত্রের লোকেরা চিরকাল একটি মন্দিরের স্বপ্ন দেখেছে।
জেরুজালেমে ইলোহের মন্দির। নবি নাথন রাজা দাউদকে অভিযোগ করেছেন মন্দিরের
জন্য। সম্পদ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দাউদ নির্মাণ করতে পারেননি জেরুজালেমে
সদাপ্রভুর মন্দির। সিনই পাহাড়ের মরুপ্রান্তরে অগ্নিসংকেতকারী ঈশ্বর যখন বনি-
ইস্রায়েলদের নেতা মোশি বা মোজেশকে দেখা দেন। মোজেশ জ্যোতির্ময় ঈশ্বরের রূপ
দর্শন করে বিহ্বল হয়ে পড়েন, জ্ঞান হারান। ঈশ্বর মোশিকে যে উপদেশ দেন তা দুটি
প্রস্তরে উৎকীর্ণ ছিল। সেই প্রস্তর দুটি ঈশ্বর-সিন্দুকে সুরক্ষিত থাকলেও একসময়
প্যালেস্টাইনি আর্যরা তা ছিনিয়ে নিয়ে সাতমাস নিজেদের কাছে রেখেছিল। দাউদ সেই
সিন্দুক উদ্ধার করে আনেন। অথচ মন্দির নির্মাণ করতে ব্যর্থ হন। বনি-ইস্রায়েলদের
ঈশ্বর আছে, মন্দির নেই। তারা আজীবন সিন্দুক বহন করে চলেছে, মন্দিরের স্বপ্ন পূরণ
হয়নি। শলোমনের হৃদয় চিন্তা করে উরিয় হত্যা এবং যুদ্ধের কালিমা তাঁর বাবার দুই

হাতকে প্রলিঙ করেছিল বলেই কি মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়নি! এ প্রশ্নের সুরাহা করতে পারেননি মহাজ্ঞানী শলোমন।

পূর্বপুরুষদের কৃত পাপ শলোমনের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছে বারবার। অতীতের সঙ্গে অনবরত কথা বলে চলেছেন সম্রাট। শলোমন লোক-পুরাণ থেকে আবিষ্কার করেছেন এক আশ্চর্য সত্য এবং সংগ্রহ করেছেন অত্যাশ্চর্য ঘটনা। নবি ও রাজারা তাঁদের পাপ ধোয়ার জন্য অভিশপ্তকেই ব্যবহার করেছেন। আব্রাহাম ব্যবহার করেছেন অভিশপ্ত পুত্র ইস্রায়েলকে। ইসহাক অভিশাপ দিয়েছেন পুত্র এষৌ বা ইদমকে। লোতের বংশকে ব্যবহার ও ধ্বংস করেছেন দাউদ। অভিশপ্তের কথা কেউ লেখে না। ইতিহাস-পুরাণ সর্বত্রই তারা উপেক্ষিত, অবহেলিত। ক্ষমতার স্বরের কাছে অভিশপ্তরা বাকহীন। এই সুর-অসুর দ্বন্দ্ব সমস্ত ঐশ্বরিক গ্রন্থ ও ইতিহাসে গচ্ছিত থাকলেও অভিশপ্তরা চিরদিনই সেখান থেকে পরিত্যক্ত, বিতাড়িত। পূর্বপুরুষদের পাপ বনাম শলোমনের রাজসত্তা— দ্বন্দ্ব বিদীর্ণ হয়েছেন সম্রাট। এ দ্বন্দ্ব তাঁরই পক্ষে হৃদয়বিদারক হয়েছে। পিতা দাউদের কূটকৌশলের চাপে এবং অনৈতিক কলুষের আঘাতে রাজা শৌল পাগল হয়েছিলেন এবং ফিলিস্তিনিদের হাতে না মরার ভয়ে কোনো পথ না পেয়ে তিনি শেষ অবধি আত্মহত্যা করেন।^{১০} শৌলের সিংহাসন কৌশলে অধিকার করেছিলেন দাউদ। নিরপরাধ অনুগত সেনা উরিয়ের স্ত্রী বৎসেবাকে কায়দা করে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন দাউদ। এসব ভাবতে ভাবতেই শলোমনের হৃদয় আর চিন্তা করতে পারে না। আখ্যানের খেতা গালিয়াৎ একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে রঙের কাজ করে। গালিয়াৎ একজন লিপিকার। সে শলোমনের দারোয়ান। খেতা গালিয়াৎ ফিলিস্তিনিদের শিবিরের বীরযোদ্ধা গালিয়াতের উত্তরাধিকার। যে গালিয়াৎ দাউদের সঙ্গে একদা যুদ্ধ করেন এবং প্রাণ হারান।^{১১} পিতার পাপ শলোমনের পিছু ছাড়ে না। ছায়ামূর্তির মতোই তারা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াতে চায়। ‘আদিপুস্তক’ গালিয়াতের স্ত্রী-পুত্রের

কথা লেখে না। ঔপন্যাসিক প্রাচীন পৃথিবীর এক অসম যুদ্ধে হেরে যাওয়া গালিয়াতের পুত্রকে দ্বন্দ্ববিদীর্ণ সম্রাটের প্রতিপক্ষ হিসাবে যেন নির্বাচন করেছেন। শলোমন শাম নামক ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটতে থাকেন আর তাঁর ব্যক্তি-ইতিহাস তাঁকে তাড়া করে ফেরে নিরন্তর।

এক তৃষ্ণার্ত সারমেয়কে জলপান করানো এবং একজন পতিতা নারীর স্বর্গে যাবার গল্পকথা মরুভূমির বুকে ছড়িয়ে আছে। ইহুদি ও ইসলামি লোক-পুরাণের যে গল্প লোক-পরম্পরায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যুগে যুগে। উপন্যাসের এমন এক পতিতা নারী সারিন। যে গালিয়াৎকে রাজা শলোমনের কীর্তির কাহিনি শুনিয়েছে। অন্যদিকে গালিয়াতের হৃদয় মানসে গেঁথে রয়েছে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের লিকলিকে আগুন। গালিয়াতের স্মৃতির কক্ষ-কক্ষান্তর জুড়ে রক্ত আর বীর পিতার ভাঙাচোরা কপাল ও ছিন্নভিন্ন দেহ ভেসে ওঠে। খেতার বাবার ঘাতক শলোমনের বাবা। এ কথা ভাবতেই গালিয়াতের মগ্নচেতন্য প্রবলভাবে নাড়া দেয়। সারিনকে শোনায় গালিয়াৎ পোশাকে মোড়া সম্রাট শলোমনের গোপন রূপ:

শলোমন সেই ধূর্ত কায়দাকারী দাউদের পুত্র। অধিকতর ধূর্ত তিনি। ছায়ামূর্তি দিয়ে মানুষকে হত্যা করেন, নিজে করেন না। সারিন, তুমি বুঝবে না আমার গোপন হৃদয়। আমিও জানি না সম্রাট মহানুভব, কিন্তু সর্বাংশে তিনি নবি নন। তাঁর কথা আমি নিজের কানে শুনেছি, অতি উপাদেয় সন্দেহ নাই। সারিন তুমি বুঝবে না, একই সঙ্গে একজন মানুষ রাজা এবং পয়গম্বর হতে পারেন না। অথচ মরুভূমিতে সেই চেষ্টায় চলছে।^{১২}

কথাকার প্রাচীন বাইবেলের একজন নবিকে রক্তমাংসের মানুষ রূপে নির্মাণ করেছেন— যিনি পুরাণের চরিত্রের মতো অপাপবিদ্ধ নন। শলোমন মরুভূমির উপর দাঁড়িয়ে পিপড়েদের চলাফেরা লক্ষ করেন। তিনি শুনতে পান পিপড়েদের বাক্যালাপ। এই আলৌকিক ক্ষমতা (মোজেজা) শলোমনের ঈশ্বর ইলোহে তাঁকে প্রদান করেছেন।

শলোমনের প্রতিপক্ষ দলের লোকের একথা অবিশ্বাস করলেও সম্রাট জানেন তিনি একাধারে নবি এবং রাজা। তাঁর অন্তর্সত্য এখন নবি শলোমন জেগে উঠেছেন। শলোমনের হৃদয়ে জাগরিত হচ্ছে পূর্বের নবিদের অলৌকিক কর্মকাণ্ড। অথচ মহাজ্ঞানী সম্রাট গালিয়াতের ভানকে ধরতে পারেননি। গালিয়াতের কোমরে রাখা ছিল ফিঙ্গা। এ ফিঙ্গা দিয়ে গালিয়াৎ চায় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ। শলোমন স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিশুর অগ্নিপরীক্ষা। একদা মোশি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন। শলোমনের স্বপ্ন লেখকের নিজস্ব কল্পনা। ইহুদি এবং ইসলামি পুরাণে কোথাও এ স্বপ্নের কথা নেই। শলোমনের দ্বন্দ্ব বোঝানোই লেখকের অভিপ্রায়। সেই দ্বন্দ্বকে প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তেই লেখক ইসলামি লোকায়ত মিথের গল্পকে তুলে এনেছেন শলোমনের স্বপ্নে। ইসলামি পুরাণে রয়েছে, মিশরের রাজা ফেরাউন স্বপ্নে দেখেছিলেন তাঁর রাজ্যে এক শিশু জন্ম নেবে এবং তার হাতেই ফেরাউনের পতন হবে। স্বপ্ন দেখার পর ফেরাউন তাঁর রাজ্যে পুত্র সন্তান জন্মালেই তাকে হত্যা করতেন। মুসা জন্মানোর পর তাঁর মা ঈশ্বরের আদেশে একটা ঝুড়িতে মুসাকে নীলনদে ভাসিয়ে দেন। ঝুড়িটি ভাসতে ভাসতে ফেরাউনের প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে থেমে যায়। ফেরাউনের লোকজন এটিকে উঠিয়ে নেয় এবং পরবর্তীতে ফেরাউনের স্ত্রী ‘আসিয়া’-র নিকট নিয়ে আসে। মুসা দেখতে ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর। ফেরাউনের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না, শুধু একটি কন্যা সন্তান ছিল, পরবর্তীকালে যে ফেরাউনের সিংহাসনে বসেন। শিশু দর্শনে সবার মন স্নেহসিক্ত হয়ে উঠে। বিশেষ করে, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার কোমল অন্তর মাতৃস্নেহে বিগলিত হয়। বিষয়টি ফেরাউনকে অবহিত করা হলে তিনি শিশুটিকে পরীক্ষা করেন। শিশুর সামনে একটি পাত্রে সোনা এবং একটি পাত্রে আগুন রাখেন। ঈশ্বরের দেবদূত জিব্রাইলের নির্দেশে মুসা আগুনে হাত দেন এবং তাঁর হাত পুড়ে যায়।^{১০} এছাড়াও লৌকিক পুরাণে রয়েছে, আগুনে হাত দেবার পর মুসা তাঁর হাত মুখে পুরে

দেন। ফলত তাঁর জিভ পুড়ে যায়। সেই কারণে তাঁর ভাষা ও উচ্চারণে আড়ষ্টতা ছিল। তিনি তোতলা ছিলেন। তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁর কথা বলতেন অনুজ ভ্রাতা হারুন। আখ্যানে দেখা যায়, ঘুম ভাঙলে শলোমন দেখতে পান তাঁর হাত পুড়ে গেছে। অতীতের মুসার মতোই পরীক্ষার কারাগারে বন্দি যেন সম্রাট শলোমন।

ইহুদি পুরাণ অনুসারে, মরুভূমির বৃকে শিশুবধ চিরাচরিত ঘটনা। শলোমনই এই শিশুহত্যা রদ করেছেন। মরুমর্ত্যের শৈল দুর্গে ধাতু ফলকে খোদাই করা আছে, ‘আব্রাহাম শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন।’ জাতির পিতা আব্রাহামকে ঠিকমতো বিশ্বাস করতে পারেন না শলোমন। আব্রাহামের আকাঙ্ক্ষা এবং পরীক্ষার কথা ভেবে একই সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে রাগ ও বেদনার উদ্বেক হয়। পূর্বপুরুষদের কথা ভাবলেই তাঁর কানে অনুরণিত হয়:

মনে কর শলোমন। মোশির কথাও মনে কর তুমি। আদম বললেন, আমি পশুবধ আর শিশুবধ দিয়ে আদিপুস্তক রচনা করেছি। আমিই অভিশপ্ত লোত, মোয়াব, অম্মোন, আমালেক, এষৌ তথা ইদম এবং ইস্রায়েলকে রচনা করেছি।

ইতিহাসের যন্ত্রণা বইবার জন্য আদম শলোমনকে নির্বাচন করেছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি এবং সবচেয়ে দুঃখি সম্রাট তিনি। ক্রমবর্ধমান জ্ঞানই অধিকতর দুঃখের কারণ। একথা আদিপুস্তকে শলোমন-সংহিতায় লিপিবদ্ধ করিয়েছি। শলোমনের গান মধুর। কেননা তাহা সর্বাধিক দুঃখময়। ওই যে তাঁহার আঙুল পুড়িয়া গেল, এই জ্বালা আমিই তাহাকে দিয়েছি।

শিশু অবস্থায় শলোমনকে হত্যার চেষ্টা কেউ কি করেছিল? তাহাকে দুঃখ দিলাম এইভাবে যে বৎসেবার গর্ভে সে কীভাবে উৎপন্ন হয় তাহা বস্তুত অপরিজ্ঞাত; এই সন্দিগ্ধ মন জ্ঞানেরই লক্ষণ এবং ইহা নিরসনহীন যন্ত্রণার কারণ। আমি তাহাকে মোশির সম্মান দিই নাই, নবির জীবন তাহার নহে, কিন্তু হৃদয়ে নবির আকাঙ্ক্ষা দিয়াছি। নবির আকাঙ্ক্ষা আর রাজার কর্তব্য। এই দুইটি ভিন্ন পদ একত্রে মেলে না। তাহাকে আমি মিলাইবার ভার দিলাম। তাহাকে আমি চতুর করিলাম, তাহাকে আমি কোমল করিলাম। তাহাকে ভোগী এবং ফকির করিলাম, তাহাকে তামসিক ও শুভ্র করিলাম, ধন দিয়া পূর্ণ এবং আসক্ত করিয়া দুঃখ দিলাম এবং হৃদয়কে সং করিলাম। তাহাকে সম্মান এবং অপমান সমান করিয়া মাপিয়া দিলাম।^{১৪}

মরুভূমির হাজারো সংকটের মাঝে এমন দুঃস্বপ্ন শলোমনের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে দেয়। দুর্ভাগা দেশের সম্রাট তিনি। তাঁর অতীত, তাঁর শৈশব, তাঁর স্মৃতি তাঁকে তাড়া করে বারংবার। তাঁর ব্যক্তি-ইতিহাস তাঁকে অপরাধবোধে বিদ্ধ করে, পীড়ন করে। তিনি যে হৃদয় দিয়ে চিন্তা করেন, সেই হৃদয়ের বৃত্ত জুড়ে দ্বন্দ্বের সমাহার। অতীত থেকে বর্তমান সবটুকুই ধারণ করে আছে শলোমনের হৃদয়। পূর্বপুরুষদের পাপ ও শাপকে মোচন করতে গেলে কী করতে হবে তিনি জানেন না। পিতৃদত্ত সাম্রাজ্য রক্ষা কীভাবে করবেন তাও তাঁর অজ্ঞাত। গালিয়াৎকে কর-সংগ্রাহক মন্ত্রী বানিয়ে কি ভুল করেছেন সম্রাট তাও তিনি নির্ণয় করতে পারছেন না। বনি-ইস্রায়েল জাতিকে বাঁচানোর জন্য কোন পথ বাতলাতে হবে— ঠিক করতে পারছেন না দ্বন্দ্ব ক্ষতবিক্ষত সম্রাট।

রাজাবলি-র দ্বিতীয় অধ্যায় ‘উৎসর্গ’-এ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আব্রাহামের পুত্রকে উৎসর্গ করার কথা বিধৃত করছেন লেখক। আব্রাহামের স্ত্রী এবং দাসী ও তাঁদের পুত্রদের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক সর্বাত্মক ইহুদি মিথ ব্যবহার করেননি। ইহুদি পুরাণে উপেক্ষিত চরিত্রকেই তিনি উপন্যাসে মহিমান্বিত করেছেন। ইহুদি ও ইসলামি পুরাণের দ্বন্দ্ব এই অধ্যায়ের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। ঈশ্বরের স্বপ্ন পেয়ে মরুভূমির বুকে তাবৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন আব্রাহাম। দুর্ভিক্ষের সময় শস্যের খোঁজে স্ত্রী সারাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে গেছিলেন আব্রাহাম। সারা ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। কাবুস বা ফ্যারাওদের কাছে নিজের স্ত্রীকে আব্রাহাম পরিচয় দেন বোন ব’লে। রাজা অবিমেলকের হৃদয়ে সারার প্রতি যৌনবাসনা জাগ্রত হলে ঈশ্বর ইলোহে তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমে সাবধান করে দেন। এভাবেই আব্রাহামের স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা করেছেন ঈশ্বর ইলোহে। মিশরের রাজা যখন জানতে পারলেন সারা আব্রাহামের স্ত্রী। তিনি খুশি হয়ে গোরু ভেড়া এবং দাসদাসী দান করলেন আব্রাহামকে। এঁদের মধ্যে এক দাসী ছিলেন, যার নাম হগার।^{১৫} ইসলামি পুরাণে

যাঁকে হাজেরা বলা হয়েছে। উপন্যাসে তিনিই ইগার। ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ দাসীর নাম রয়েছে হগার। হ-কে ই-এর মতো উচ্চারণ করা যায়। যেমন হিব্রোন > ইব্রোন। এই কারণে লেখক হগারকে ইগার হিসাবে ব্যবহার করেছেন।^{১৬} ইহুদি পুস্তক ইগারের কথা বেশি লেখেনি। প্রাচীন পৃথিবীর এই অবহেলিত দুঃখ লাঞ্ছিত অপমানিত সত্তার প্রতিমূর্তি ইগারকে উপন্যাসে তুলে এনেছেন লেখক। মিথ-পুরাণ মোড়া মরুভূমির বুকে তাঁকে মহিমান্বিত করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছিলেন:

আমি হাজেরা নামটা ব্যবহার করিনি, কারণ আমি যে মুসলিম মিথ ব্যবহার করছি না সেটা বোঝাতে চাই পাঠককে। আমি বোঝাতে চাই যে, এটা আমি ইহুদি মিথ হিসাবে ব্যবহার করছি। অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্টকেই ব্যবহার করছি। শুধু ওল্ড টেস্টামেন্টের নামটাকে একটু বদলে দিয়েছি।^{১৭}

তাঁবুর সাম্রাজ্য এবং বংশরক্ষার তাগিদে আব্রাহাম দাসীগমন করেন এবং ইগারের গর্ভে জন্ম নেয় ইস্রায়েল। আদি পৃথিবীর মরুভূমিই প্রথম সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্রের ধারণা প্রদান করে মানুষকে। আব্রাহাম নিঃসন্তান ছিলেন, আর সেই কারণেই তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের প্রয়োজনে দাসীগমন করেন। কয়েকবছর পরেই স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয় পুত্র ইসহাক। এভাবেই মরুভূমির ঈশ্বর ইলোহে যাযাবর তাম্বুধারীদের মরুসাম্রাজ্যের অধিকার তুলে দেন বেদুইন আব্রাহামের হাতে। ঈশ্বর চেয়েছিলেন আব্রাহাম মরুতে কর্তৃত্ব রচনা করুক। মহা-কূটবুদ্ধির অধিকারী রাজনৈতিক ঈশ্বর কী নিদারুণ খেলা খেলেছেন! মরুভূমির ইতিহাসকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন সুকৌশলে। শুরু হয় সারা এবং ইগারের মধ্যে মনোমালিন্য। সারার অনুরোধে আব্রাহাম পুত্র ইস্রায়েল এবং দাসী ইগারকে নির্বাসন দিলেন নির্জন মরুপ্রান্তরে। ঈশ্বর ইলোহে আব্রাহামের স্বপ্নে এসে বললেন:

ঐ বালক এবং ঐ দাসীটির ব্যাপারে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না, সারা তোমাকে যা বলছে তাই-ই করো। কারণ ইসহাকের দ্বারাই তোমার বংশধারা রক্ষিত হবে। তবে ঐ দাসীপুত্রের দ্বারাও আমি এক জাতি উৎপন্ন করব, কারণ সেও তোমার সন্তান।^{১৮}

আখ্যানের ঈশ্বর কী বিচক্ষণতায় এবং কূটকৌশলে আব্রাহামের হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ঈশ্বরের নির্দেশে আব্রাহাম দাসী ইগার এবং পুত্র ইস্রায়েলকে কিছু খাদ্য এবং জল দিয়ে বিদায় করে দিলেন। মা-ছেলে আশ্রয় নিল বের-শেবা নামক এক কূপের কাছে।^{১৯} এরপর ‘আদিপুস্তক’ ইগার আর ইস্রায়েলকে নিয়ে আর কিছুই বলেনি। আব্রাহামের দাসী এবং দাসী-পুত্র ইস্রায়েল মরুভূমির রুধির-তমসায় হারিয়ে যায়। তামাম ‘আদিপুস্তক’ সন্ধান করেও তাঁদের খোঁজ পাওয়া যায় না।

‘আদিপুস্তক’ থেকে বিতাড়িত এই ইস্রায়েলকেই ঔপন্যাসিক প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। পুরাণে যিনি অবহেলিত, উপেক্ষিত, উপন্যাসেই তিনিই প্রতিষ্ঠিত। আখ্যানের এই অংশের কাহিনির সঙ্গে ইসলামি পুরাণের কাহিনির সাদৃশ্য রয়েছে। আখ্যানের পটভূমি হজরত মুহম্মদের জন্মের চার হাজার বছর আগের প্রাচীন পৃথিবী হলেও মুহম্মদ চার হাজার বছর পর ইস্রায়েলকেই (কোরান-এ ইসমাইল) প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তাঁর ধর্মের অন্যতম প্রধান পুরুষ হিসাবে।^{২০} উপন্যাসের ইগার গর্ভাবস্থায় মরুভূমির বালুতে লুটোপুটি খান। তাঁকে সাহায্য করেন দেবদূত। সারার অত্যাচারে মরুভূমিতে নির্বাসিত হয়েছেন ইগার। মনিব আব্রাহাম তাবৎ সাম্রাজ্যের মালিক হয়েও দাসীর গর্ভযন্ত্রণা নিরসন করতে পারেননি। ঈশ্বরের দেবদূত ইগারকে জানিয়েছেন:

তোমাকে তোমার মনিব কি ভালবাসেন না? নিশ্চয় বাসেন। তুমি তার উষ্ট্রীর চেয়ে দামি, কাবুসের দেওয়া উপহার। আমরা তোমার মনিবকে অব্রাম থেকে আব্রাহাম বানাব। গোষ্ঠীবাবা থেকে মহাজাতির আদি জনক বানাব। তাকে ক্ষুদ্র থেকে মহৎ করব। সমস্ত জাতির পিতা হবেন আব্রাহাম।^{২১}

এভাবেই মরুভূমির বালিতে রহস্যময় নাটক অভিনীত হয়। পাশেই ছিল বীর-লহর-রোয়ী কূপ। (ইহুদি পুরাণে যা বের-শেবা এবং ইসলামি পুরাণে জমজম কূপ নামে পরিচিত)। এই মরু-কূপের পাশেই দেবদূতের সাহায্য নিয়ে সন্তান প্রসব করেন ইগার। দেবদূত তাঁর সন্তানের নাম দেন ইস্রায়েল। ইস্রায়েল অর্থ ঈশ্বরের কান। কারণ সদাপ্রভু শিশুর জন্মের আত্ননাদ মরুমর্ত্যেই শুনেছেন। দেবদূত ইগারকে আশ্বস্ত করেন, এই মরুমর্ত্যে তাঁর সন্তান বর্ধিত হবে, সম্মানিত হবে। অন্যদিকে ঈশ্বরের দেবদূত স্বপ্নে হানা দিলেন আব্রাহামের হৃদয়ে। দেবদূতের কথা মতো আব্রাহাম স্ত্রী গমন করলেন এবং স্ত্রী সারার গর্ভে জন্ম নিল ইসহাক। পুত্রের আকাঙ্ক্ষা তাড়িত করেছে মরুভূমির রাজাদের। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের জন্য বীরযোদ্ধার প্রয়োজন হয়েছে মরুভূমিতে। স্ত্রী সারার কথায় ইগারকে বিদায় করে দিয়েছিলেন আব্রাহাম। অথচ মনিবকেই স্বামীরূপে ভালোবাসতেন ইগার। উষ্ম মরুতে নির্বাসিত মা ও ছেলের সংগ্রামভরা যাপিত জীবন, প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই ‘আদিপুস্তক’ লেখে না। ইহুদি পুরাণে পরিত্যক্ত রমণীর এবং তাঁর দুর্ভাগ্য সন্তানের কথা উপন্যাসে স্থান পায়। ঈশ্বর ইলোহে পুনরায় স্বপ্নে হানা দেন আব্রাহামের কুটিরে। স্বপ্ন পেয়েই দাসী ইগারের কাছে ছুটে যান স্বপ্নদর্শী আব্রাহাম। ইগার ও আব্রাহামের কথোপকথনে উঠে এসেছে আব্রাহামের নতুন পরীক্ষার ইস্তাহার:

— সদাপ্রভু তোমাকে অনেক দিয়েছেন। তোমার অনেক তাঁবু, অনেক পশু, দাসদাসী অনেক।

— কিন্তু দেশ! আমার দেশ চাই। সদাপ্রভু বলেছেন, এই সব আমার। এই ভূমরু, চরাচর, কতকাল ধরে বলে আসছেন। হিব্রোন (ইশ্ফোন)-এর এলোন বনে দেখা দিয়ে একবার বললেন, বলিদান কর আব্রাহাম। এই যতদূর দৃষ্টি কর, যত দূরে সূর্য যায়, সবই তোমার। উৎসর্গ কর তোমার প্রিয়তম জীবকে। তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে অব্রাম।

...

...

...

- আমার প্রিয়তম কে ইগার?
- আমি নই।
- ইস্রায়েলকে আমার চাই ইগার! চাইতে গিয়ে আব্রাহামের গলা কেমন গাঢ় আর ফ্যাসফ্যাসে হয়ে ভেঙে গেল।
- না, না, এ আমি কিছুতেই পারব না। আমাকে নামিয়ে দাও।
- সদাশ্রু খাদ্য চান ইগার। আমি জানি, তোমার পুত্রই আমার প্রিয়তম।
- এ চিন্তা তোমার। তোমার স্বপ্ন এত নিষ্ঠুর হতে পারে না। আমি এইমাত্র এই প্রথম তোমাকে প্রিয়তম বলে ডেকেছি, এই লোভকে ক্ষমা করে দাও। আবার বলছি, আমি দাসী, আমাকে মরুভূমে ফেলে দাও। ছেলেকে নামিয়ে দাও। বলে ডুকরে উঠল দাসী ইগার। অথচ সে গো-শকট থেকে নেমে পড়তে পারল না।^{২৩}

স্বপ্নদর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষী দুর্ভেদ্য মানুষ আব্রাহামের অনুরোধের কাছে হার মানল দাসী ইগার। সে ইস্রায়েলকে স্নান করাল এবং নতুন পোশাক পরিধান করিয়ে বলে দিল— ‘বাবা যা বলবেন। তাই করবে।’— বিধাতার সমকক্ষ তাম্বুধারী মরুচারী যাযাবর আব্রাহামের স্বপ্নপূরণ করার নিমিত্তে নিজের গর্ভের সন্তানকে উৎসর্গ করলেন ইগার। পতিপ্রেমে উদ্ভাসিত ইগারের সন্তান মায়ের কথামতো পিতার দেওয়া হোমকাষ্ঠ মাথায় নিয়ে পাহাড়ে চড়তে শুরু করল। নিজের বলিদানের কাঠ সে নিজেই বয়ে নিয়ে চলেছে। মরুভূমির আকাশে এমনই পরীক্ষা দিতে হয়েছে আব্রাহামকে। বলিদানের আসন্ন মুহূর্তে আব্রাহাম দো-টোনায় পড়লেন। তিনি নির্ণয় করতে পারছেন না কে প্রিয়? দাসী-পুত্র ইস্রায়েল নাকি সারা-পুত্র ইসহাক। তখন মরুমর্ত্যে ঝড় বইছে। বায়ুবিক্ষোভে ইতিহাসের দুর্বোধ্য কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। জ্ঞানীপুত্র ইস্রায়েল পিতার অবস্থা দেখে তাঁকে চোখে পটি বেঁধে নিতে বলে। ইস্রায়েলের মনে পড়ছে মায়ের শেষ বাক্য— ‘বাবা যা বলবেন। তাই করবে।’ অথচ শেষ অবধি কিছুই নির্ণয় করতে পারলেন না আব্রাহাম। খড়া ছুঁড়ে দিয়ে মাটিতে নতজানু হয়ে ঈশ্বর ইলোহের কাছে আর্তনাদ করতে লাগলেন। আকাশ-প্রতিভা মহাকাশ থেকে বললেন:

তুমি চোখের আচ্ছাদন উন্মোচন কর আব্রাহাম। তোমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এই দেশসমূহ তোমাকে দিলাম। তুমি এখন ঝোপে আবদ্ধ একটি মেঘকে দেখো, তাকেই হোমার্থ বলিদান দিয়ে তাঁবুতে ফিরে যাও।^{২৪}

আব্রাহামের পরীক্ষা শেষ হল। অব্রাম থেকে তিনি আব্রাহামে উত্তীর্ণ হলেন। অব্রাম ছিলেন গোষ্ঠী পিতা, আব্রাহাম হলেন জাতির পিতা। ছেলে ইস্রায়েলকে আব্রাহামের হাতে তুলে দেওয়ার পর ইগারের অন্তরাত্তার কোলাহল, অস্থিরতা, ছটফটানি ইহুদি পুরাণে কোথাও নেই। মা-ছেলের নির্বাসনের পর তাঁরা উভয়েই ঘরে-বাইরে মুছে গেছে। সমগ্র ‘আদিপুস্তক’-এ ইস্রায়েলের জায়গা দখল করেছে সারা-পুত্র ইসহাক।

আব্রাহাম কাকে উৎসর্গ করেন?— এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইহুদি এবং ইসলামি পুরাণের আন্তঃসংযোগ ও দ্বন্দ্বের স্থানটি। ‘আদিপুস্তক’ ইসহাককেই গ্রহণ করেছে, কারণ সে আব্রাহামের স্ত্রী সারার সন্তান। দাসী-পুত্র ইস্রায়েলকে ‘আদিপুস্তক’ বাতিল করে দিয়েছে। শুধু *ওল্ড টেস্টামেন্ট*-ই নয়, ইহুদি লৌকিক পুরাণও একই সাক্ষ্য দেয়। সেখানেও ইসহাক এবং ইস্রায়েলকে আব্রাহামের সন্তান হিসাবে স্বীকার করলেও উৎসর্গের সম্মান পেয়েছে ইসহাক।

The theological problem of why God found it necessary to put Abraham through such an agonising experience is one that is still actively discussed. One of the main reasons proposed is that a public demonstration was required of faith in God in order to convince the unbelievers of divine sovereignty.

At the same time, however, God is portrayed in the aggadah as being sympathetic to Abraham's position. His opening command 'Take your son, your only one, whom you love, Issac' is seen as a carefully graded approach, meant to break the news in as gentle a fashion as possible. 'Your son' could have meant Isaac or Ismael: 'your only one' likewise, because Issac was the 'only' son of Sarah, and Ismael the 'only' son of Hagar; 'whom you love' did not make things clearer, because Abraham loved them both. It was only when the name 'Isaac' was pronounced that Abraham understood exactly what God demanded.^{২৫}

‘ইসহাক’— এই নাম শোনা মাত্রই আব্রাহামের হৃদয় জেনে ফেলেছিল ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা। দাসী পুত্র ইস্রায়েলকে ইহুদি লোক-পুরাণ এবং ইসলামিক শাস্ত্রীয়-লৌকিক উভয় পুরাণই ইসমাইল নামে সম্বোধন করেছে। ইহুদি লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় উভয় পুরাণেই ইস্রায়েল বা ইসমাইল উপেক্ষিত, বিতাড়িত, পরিত্যক্ত। উৎসর্গের যোগ্যতা দাসী পুত্রের ছিল না, অতএব সে সম্মান ইস্রায়েল পেতে পারেন না। আধুনিক ঔপন্যাসিক আবুল বাশার ইহুদি পুরাণের এই অবহেলিত, বর্জিত, উপেক্ষিত ইস্রায়েলকেই দিয়েছেন উৎসর্গের সম্মান। ইহুদি মিথ্যে ভেঙে তিনি ‘আদিপুস্তক’-এর কাহিনিকে নতুনভাবে দেখতে প্রণোদিত করেছেন। ‘আদিপুস্তক’-এর সদাপ্রভু যাঁদের নির্বাচন করেননি, উপন্যাস তাঁদেরই গ্রহণ করেছে। পুরাণে যিনি উপেক্ষিত, উপন্যাসে তিনিই মহিমান্বিত। কথাকারের মিথের পুনর্নির্মাণের নেপথ্যে কোনো পুরাণেরই প্রভাব নেই। আপাতভাবে দেখলে ইসলামি পুরাণের সঙ্গে মিল রয়েছে মনে হলেও ইসলামি পুরাণে সারা ইব্রাহিমের দ্বিতীয় পত্নী, দাসী নয়। ‘আদিপুস্তক’ রচিত হওয়ার প্রায় চার হাজার বছর পর ইসলাম ধর্মের নবি হজরত মুহম্মদ কোরানে দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ইসমাইলকে উৎসর্গের সম্মান দিয়েছেন। ‘আদিপুস্তক’-এর বিতাড়িত ইস্রায়েল *কোরান*-এ মহাত্মা। ইসলাম ধর্মের অবশ্যপালনীয় কৃত্য (ইসলামি পরিভাষায় যাকে ‘ফরজ’ বলা হয়) হল পাঁচটি, যা ইসলামের ‘পঞ্চম স্তম্ভ’ নামেও পরিচিত। প্রথম কৃত্য— কলেমা (মন্ত্রপাঠ অর্থাৎ ধর্মের উপর বিশ্বাস), দ্বিতীয় কৃত্য— নামাজ (দিন-রাত মিলিয়ে মোট পাঁচবার নামাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা করা), তৃতীয় কৃত্য— রোজা (আরবি বর্ষপঞ্জির ‘রমজান’ নামক মাসে ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিরমু উপবাস), চতুর্থ কৃত্য— জাকাত (স্বীয় সম্পদ এক বছরের বেশি সময় ভোগ করার পরেও যদি তার অতিরিক্ত সম্পদ থেকে যায়, তবে সেই সম্পদ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ দান করা), পঞ্চম কৃত্য— হজ্জ (শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকলে

মক্কা ও মদিনার ‘ইসলামি তীর্থ’ দর্শন এবং ধর্মীয় বিশেষ আচরণবিধি পালন করা, এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, যে ব্যক্তি হজ্জ যাত্রা করবেন তার কারণে বা তাঁর আসা-যাওয়ার আগে বা পরে তাঁর পরিবার যেন কোনোরকম আর্থিক সংকটের মধ্যে না পড়ে)। উল্লেখিত ইসলামি পুরাণ অনুসারে, এই পঞ্চম কৃত্যের ‘হজ্জ’— রীতি প্রচলিত হয় ইব্রাহিমের (কোরান-এ আব্রাহাম হলেন ইব্রাহিম) সময় থেকে। ‘আদিপুস্তক’-এর বেরশেবা এবং উপন্যাসের বীর-লহয়-রোয়ী কূপ হল ইসলামি পুরাণের জমজম কূপ। হাজেরাকে ইব্রাহিমের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে বর্ণনা করেছে ইসলামি পুরাণ। ধূ ধূ মরুপ্রান্তরে যখন হাজেরা জলের জন্য ছোট্টাছুটি করেছিলেন তখন শিশু ইসমাইলের পায়ের আঘাতে ভূমি থেকে জল নির্গত হয় এবং সেটিই পরবর্তীকালে জমজম কূপে পরিণত হয়।^{২৬} জমজম কূপের কথা কোরান-এ সুস্পষ্টভাবে নেই, তবে মুসলমানদের হাদিসে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা জমজম কূপের জল পবিত্র বলেই বিশ্বাস করেন। হজ্জ-যাত্রীরা এই জল পান করেন এবং সঙ্গে করে বোতলবন্দি নিয়ে আসেন। নির্বাসিতা ইগারের মর্মব্যথা ও যন্ত্রণা-বিষাদ উপন্যাসের মতো কোরান-এও রয়েছে। তৃষ্ণার্ত শিশুর জলের জন্য হাজেরা মক্কার সাফা ও মারওয়া নামক পাহাড়ে ছুটে বেড়িয়েছিলেন।^{২৭} হাজেরার কষ্ট ও যন্ত্রণাকে অনুভব করার জন্যই হজ্জ যাত্রীদের সাফা-মারওয়া পাহাড় প্রদক্ষিণ করতে হয়।^{২৮}

‘আদিপুস্তক’ রচিত হবার চার হাজার বছর পর কোরান-এ ইস্রায়েল এবং দাসী ইগার মহান হয়ে ওঠেন। ইসলাম ধর্মের প্রধান দুই উৎসবের মধ্যে দ্বিতীয়টি হল ঈদ-উল-আযহা, যার অর্থ ‘ত্যাগের উৎসব’। আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলা হয় ‘কোরবানির ঈদ’। ইব্রাহিমের বলিদানকে স্মরণ করে এই দিন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ঈশ্বরের কাছে পশু উৎসর্গ করেন। ‘আদিপুস্তক’ যাঁদেরকে উহ্য রেখেছিল, কোরান তাঁকে ‘অন্য পরিচিতি’

দিয়ে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আধুনিক আখ্যানে তাঁরা ‘আদিপুস্তক’-এর চরিত্র রূপেই গ্রহণযোগ্য, সম্মানিত।

রাজাবলি-র তৃতীয় অধ্যায় ‘নূতন ইস্রায়েল’— এ উপন্যাসের নায়িকা আনাথের প্রসঙ্গ রয়েছে। আনাথ লেখকের কল্পজাত চরিত্র। কোনো পুরাণেই তার উল্লেখ নেই। মরুভূমির বুকে ইগারের গল্প যেন ফুরোয় না, ফিরে ফিরে আসে। বনি-ইস্রায়েলের সঙ্গে হিত্তীয়দের যুদ্ধও থামে না। রিদি ইব্রোন ছিল হিত্তীয়, সে ভালোবেসেছিল একজন অম্মোন যুবককে। অম্মোনরা লোতের বংশধর। লোত ছিলেন আব্রাহামের ভাইপো, যাঁকে পেছনে ফেলে আব্রাহাম চলে এসেছিলেন মরুমর্ত্যে। অভিশপ্ত লোতের বংশধররা আজও মরুভূমির বুকে ওঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, হারিয়ে যায়। রিদির দাদার হাতে খুন হয় অম্মোন যুবক এবং রিদির দাদা আত্মঘাতী হয়। এ সবকিছুই ঘটে যায় রাজা শলোমনের সম্মুখে। একইসঙ্গে দু’জন কাছের মানুষের মৃত্যু রিদিকে নির্বাক করে দেয়। শলোমন রিদিকে আশ্রয় দেন দাউদ হারেমে। এই অধ্যায়ে এক রহস্যময় মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। খেতা গালিয়াৎ তার নাম দিয়েছিল ইব্রিয়া। খেতা গালিয়াৎ রহস্যময় মানুষটিকে নবির তকমা দেয়। ইব্রিয়ার ফিঙ্গার আঘাতে সম্রাট শলোমনের কপাল রক্তাক্ত হয়। ফিঙ্গা হল যুদ্ধের প্রতীক। ফিঙ্গা দিয়েই দাউদ গালিয়াৎকে হত্যা করেছিলেন। ইস্রায়েলীয়রা তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এই ফিঙ্গার আঘাত মারফত। সম্রাটকে ফিঙ্গা ছুঁড়ে কে মারল নির্ণয় করতে পারে না ছায়ামূর্তির দল। অন্যদিকে অম্মোন হত্যার ঘটনা মরুভূমির ইতিহাসে চাপা পড়ে যায়, জেগে ওঠে সারগন হত্যার অপচেষ্টা।

আনাথ উপন্যাসে গালিয়াতের কন্যা এবং খেতা গালিয়াতের যমজ বোন। কয়িন আনাথের স্বামী। কয়িন হিত্তীয়। ইব্রিয়া কয়িন এবং আনাথের বিয়ে দিয়েছিল। সে

শলোমনের প্রতিপক্ষ। ইব্রিয়া ধরা পড়লে শলোমন তাকে পাহাড় থেকে খাদে গাড়িয়ে দেওয়ার হুকুম দিলেন খেতা গালিয়াতের উপর। শলোমনের সতর্ক হৃদয় পরীক্ষা নেয় খেতা গালিয়াতের। রহস্যময় উন্মাদ ইব্রিয়াকে খেতা গালিয়াতের নবি মনে হয়। খেতা গালিয়াতের হৃদয় চিন্তা করে, এই উন্মাদের হাত দিয়েই শলোমনের পতন ত্বরান্বিত হবে। এই ঘটনার ফলে শলোমনের দ্বন্দ্ব আরও বেড়ে যায়। লেখকের হাতে শলোমন যেন একইসঙ্গে নায়ক এবং খলনায়ক, স্রষ্টা এবং ধ্বংসকারী। অতীতে কাবুস রামেশিসকে ধ্বংস করতে যেমন হাজির হয়েছিলেন মোশি বা মোজেশ। নিম্নোদের পতন হয়েছিল আব্রাহামের হাতে। সুর ও অসুর— এই দ্বন্দ্বেরই ইতিহাস মাখামাখি হয়ে রয়েছে গুরু মরুশলাকায়। কারণ নবিদের হাত ছিল রক্তলিপ্ত। সম্রাট দাউদ গালিয়াত বধ দিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ‘মানুষের তাবৎ পবিত্র গ্রন্থ রক্তাক্ত, শোণিত-লিপ্ত’। ভারতীয় পুরাণের মহাভারত-এর যুদ্ধে রয়েছে জ্ঞাতি-নিধনের আখ্যান। রামায়ণ-এ রাম-রাবণের যুদ্ধে আছে দেবতা-অসুরদের লড়াই। কৃষ্ণের অসুরবধ থেকে শুরু করে সমস্ত ভারতীয় পুরাণেই দেখা যায় দেবতার শক্তির বলে বলীয়ান। এমনকি ইসলামি ইতিহাস-পুরাণেও হজরত মুহম্মদের সঙ্গে বিরোধী-পক্ষের যুদ্ধ এবং ইসলামের উৎপত্তি ও বিকাশ। আদিপুস্তক-এর কয়িন-হেবেল এবং ইসলামি পুরাণের হাবিল-কাবিল— এর লড়াই এবং হেবেল বা হাবিলের মৃত্যু— অধিকারের লড়াই তো সভ্যতার আদি এবং অসমাপ্ত ট্রাজেডি। কালে কালে, যুগে যুগে হেরে যাওয়া মানুষের রক্তেই লিখিত হয়েছে পুরাণের ইতিহাস। নবি ইব্রিয়াকে নগ্ন করে তার জাতধর্ম দেখতে চেয়েছিল শলোমনের অনুচরেরা। আব্রাহাম নিজের এবং সন্তানদের লিঙ্গগ্রন্থক ছিন্ন করেছিলেন। লোতের বংশধররা অভিশপ্ত, তাদের লিঙ্গগ্রন্থক বোজা। নবিকে উলঙ্গ করলে দেখা যায় তার লিঙ্গগ্রন্থ বোজা। অতএব সে ভিন্নধর্মী। মরুভূমিতে শুরু হয় নতুন করে

আবার ধর্ম-অধর্মের লড়াই। ধর্ম-ধর্মহীনের লড়াই নিয়েই মরুভূমির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। কে এই নবি নিরূপণ করতে পারেন না সম্রাট। শলোমনের পূর্বপুরুষ আব্রাহাম লোতকে ফেলে এসেছিলেন, লোত অভিশপ্ত। এই নবি কি লোতের বংশের কেউ! অন্যদিকে নবি নাথন শলোমনের পিতা দাউদের পাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। এ কি নাথনের মতো কেউ! বস্তুত, মরুভূমির পাপ মানুষকে তাড়া করে ফেলে। পূর্বপুরুষের পাপ যেন সম্রাট শলোমনকেও তাড়া করেছে।

ইহুদি পুরাণের শলোমন শুধু রাজা বা নবি ছিলেন না। একজন সুযোগ্য বিচারকও ছিলেন। সন্তানের অধিকার নিয়ে দুই নারীর ঝগড়া এবং শলোমনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জাদুতে ন্যায়বিচার দেখেছিল ইস্রায়েলিরা।^{২৯} ‘আদিপুস্তক’-এর সেই কাহিনিকেই সারিন ও দিব্যার গল্পে সংযুক্ত করেছেন লেখক। সারিন বিচারক শলোমনের কথা শুনিয়েছে খেতা গালিয়াংকে। সারিনের মতে, ‘শলোমনের শিশুপ্রেম জগৎ বিখ্যাত’। অথচ পিতা দাউদের ক্রিয়াকলাপের কারণে শলোমনের স্বপ্নকে হিত্তীয়রা বিশ্বাস করে না। মরুভূমির অযুত ক্ষোভ ও বঞ্চনার প্রতিমূর্তি রূপে অবতীর্ণ হয় নবি ইব্রিয়া। সে মোজেশের মতো তোতলা, স্পষ্টভাবে শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। ইব্রিয়ার প্রয়োজন হয় বক্তার। যেমন মোজেশের বক্তা ছিলেন তাঁরই সহোদর ভাই হারন। পুরাণের ইতিহাস থেমে থাকে না, বৃত্তাকারে মরুভূমিতে ঘুরতে থাকে। খেতা গালিয়াং ইব্রিয়ার ভক্ত হয়ে ওঠে, সে বিশ্বাস করে মোশির মতো ইব্রিয়াও লাঠি হাতে লাল দরিয়া পার হবে একদিন। ইব্রিয়ার জেদই তার অলৌকিক ক্ষমতা। নবি ইব্রিয়ার স্পর্ধিত আড়ষ্ট উচ্চারণ:

আমি ছায়া। ছায়ামূর্তি, স্বয়ং জাদু, আমি নরদেবতা কাবুস। আমিই মহামারী, পশুর মোড়ক এবং ভূমিকম্প ঘটাই। আমি আকাশে নুনবৃষ্টি করি, অনাবৃষ্টি, প্লাবন আমার দান। আমিই নিম্নোদ। আগুন আমার ভাই এবং শ্যালক।^{৩০}

আখ্যানের নবি ইব্রিয়া যে শলোমনের প্রতিপক্ষ, তার অবভাস রয়েছে তার কথনে। নবির জবানিতে গেঁথে আছে শলোমনের পূর্বপুরুষদের পাপ। ইব্রিয়ার কর্মকাণ্ডে উল্লাসিত হয়ে ইব্রিয়াকে আশ্রয় দেয় গালিয়াৎ। বোন আনাথের কাছে রেখে আসে তাকে। অনাথের দুগ্ধপোষ্য পুত্রকে দেখে নবি ইব্রিয়া শলোমনের পতনের স্বপ্ন দ্যাখে। যেমন একদিন ঈশ্বরের ইলোহে মোজেশ নামক শিশুকে নিয়ে দেখেছিলেন কাবুস পতনের স্বপ্ন। ‘তোমারে বধিবে যে...’— ইব্রিয়ার কাছে আনাথের শিশুই শলোমনের পতনের অভিজ্ঞান।

চতুর্থ অধ্যায় ‘পাগি-শিবিকা’য় শলোমনের অন্য রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। এ অধ্যায়ের কাহিনি ‘আদিপুস্তক’ লেখে না। সম্রাটের হৃদয়ের গোপন অভিলাষ এবং তাঁর বিমূঢ় হৃদয়ের বিভ্রান্তিকর অবস্থার চিত্র রয়েছে এই অধ্যায়ে। আর্যরাজ টায়ার অধিপতি বিবলিসের কন্যাদের জোরপূর্বক বিবাহ করতে চেয়েছিলেন সম্রাট শলোমন। অথচ শলোমনের প্রেমকে অস্বীকার করে আঙনে আত্মহুতি দিয়েছে বিবলিসের বড়ো কন্যা। খেতা গালিয়াৎ মারফত ছোটো মেয়েকে বিবাহে রাজি করানোর দায়িত্ব দেন স্বয়ং সম্রাট। শুরু হয় পুনরায় খেতার পরীক্ষা। মহাজ্ঞানী শলোমনের হাতে খেতা গালিয়াৎ যেন ‘ব্যবহৃত হতে হতে শূকরের মাংস হয়ে যায়’। আসলে মরুভূমির সমুদয় সৈন্যরা শ্রমিক মৌমাছির মতো। তাদের দাম্পত্য নেই, প্রেম নেই। শলোমনের আদেশ সম্পাদনা করাই তাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। ঠিক যেন ইসলামি পুরাণের ফেরেশতা। যারা লিঙ্গহীন। পুরুষ ও নয়, নারীও নয়। ঈশ্বরের আদেশ পালনই তাদের প্রধান এবং প্রাথমিক কর্তব্য। সম্রাট শলোমন কি হয়ে উঠতে চাইছেন ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী? নাকি কোনো স্বৈরাচারী রাজা? তিনি তো একাধারে নবি এবং রাজা। অথচ তার অবৈধ কামনার ফলে আত্মহুতি দেয় অবলা নারী। শলোমনের এই কৃতকর্ম ভারতীয় ইতিহাস এবং লৌকিক পুরাণের স্মৃতিকে স্পর্শ করে। দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ও চিতোরের রাণী পদ্মাবতীর বৃত্তান্ত মিশে যায়

অতীতের প্রবৃত্তি-তাড়িত শুষ্ক মরুভূমির অযুত বালুকণায়। শলোমনের ইতিহাস থামে না কিছুতেই, তা যেন পদ্মাবতীর বেদনার্ত আত্মহননের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় বিবলিসের কন্যার আত্মহুতিতে। ‘আদিপুস্তক’-এও দেখতে পাওয়া যায় শলোমন বহু বিজাতীয় রমণীর প্রেমে পড়েছিলেন। তিনি মিশররাজের কন্যা ছাড়াও হিত্তীয়, মোয়াবি, অম্মোনি, ইদোমী ও সিদোনী নারীদের বিবাহ করেছিলেন। শলোমন সাতশো রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তিনশো জন উপপত্নী রেখেছিলেন।^{১১} ঈশ্বর ইলোহে এই সব জাতির সঙ্গে ইস্রায়েলিদের বৈবাহিক সম্পর্ক মেনে নেননি। কেননা এদের হাত দিয়েই শলোমন বিপদগামী হয়েছিলেন। যেভাবে শলোমনের পিতা দাউদ হিত্তীয় বৎসেবাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ এবং বিবাহ করেছিলেন। দাউদের কৃতকর্মে বিমুখ হয়েছিলেন ঈশ্বর। হিত্তীয়রা মূর্তিপূজা করে। শলোমনের মা বৎসেবা আজও বুকে আগলে রাখেন মূর্তি। ‘আদিপুস্তক’-এর বৎসেবাই স্বামী দাউদের কাছে আর্জি করেছিলেন শলোমনের রাজ্যভিষেকের। মা বৎসেবার সুপারিশেই আজ সমগ্র মরুসাম্রাজ্যের সম্রাট হয়েছেন শলোমন।^{১২} অথচ আজ পূর্বপুরুষদের পাপে আর হিত্তীয়-মিশরীয়দের অভিশাপে মসনদ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন সম্রাট শলোমন। মা বৎসেবা প্রাক্তন স্বামী হিত্তীয় উরিয়র আত্মগৌরব নিয়ে বেঁচে থাকতে চান। দাউদের হাতেই একদা খুন হয়েছে খেতা গালিয়াতের পিতা সিমন গালিয়াৎ, একথা সম্রাটকে স্মরণ করিয়ে দেন বৎসেবা। শলোমনের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ‘সে দাউদের হিত্তীয় পুত্র’— একথা ভাবলেই তাঁর আত্মজ্ঞান এবড়ো-খেবড়ো হয়ে যায়। তাঁর প্রভুত্বকামী হৃদয় কিছুতেই শান্ত হয় না। মা বৎসেবাকে তাঁর মরুভূমির দুর্বোধ্য রহস্যময় নারী মনে হয়। যেমনটা ছিলেন ইগার। ইস্রায়েলীদের আদি নারী-পুরুষদের ছায়া যেন ঘুরে ফিরে আসে শলোমনের জীবনে। তাঁর রাজসত্তা ও নবিসত্তার দ্বন্দ্বপীড়িত হৃদয়কে জটিলতার

পক্ষিল আবর্তে নিক্ষেপ করে দেয় পিতৃপুরুষের পাপ। শলোমনের হৃদয়ের দ্বন্দ্বময় বেদনার মনোলোগ:

বৎসেবা কখনও বুঝবেন না, স্বপ্নের ঈশ্বরের কাছে শলোমন কেন জ্ঞান প্রার্থনা করেছেন। শুধুমাত্র সিংহাসন রক্ষার কাজে জ্ঞানকে ব্যবহার করলে শলোমন কি সুখী হতে পারবেন? বৎসেবা তো জ্ঞানের আর কোনো সার্থকতা এবং উদ্দেশ্য রয়েছে বলে ভাবতে পারেন না। মরুভূমিতে কোনো অধিপতিই কখনও জ্ঞানের সাহচর্য চায়নি, তারা কখনও হৃদয় যে সত্য বলতে পারে এবং হৃদয়কে সত্যের পালক দিয়ে ওজন করা হবে বলে কোনো দিব্যতাকে নীতিরূপে প্রতিষ্ঠা করেনি। শলোমন নিজেকে বললেন, আমি বৎসেবার বক্ষোবল্ল মূর্তির মতো, আমি বৎসেবার খেলনা-রাজপুরুষ, আমি কেন হৃদয় নিয়ে চিন্তা করি?^{৩৩}

‘আদিপুস্তক’-এর শলোমন মরুভূমির বুকে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর পিতা যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকার কারণে মন্দির নির্মাণ করতে পারেননি, পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন সম্রাট। মন্দির নির্মাণ করতে সম্রাটের সাত বছর সময় লেগেছিল।^{৩৪} ‘আদিপুস্তক’-এর সম্রাটের হাতে ছিল নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। সম্রাট ছিলেন সর্বেসর্বা। একচ্ছত্র আধিপত্যের দাপটে মন্দির নির্মাণে তেমন বিঘ্ন ঘটেনি। অন্যদিকে আখ্যানের শলোমন পিতার স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে বারংবার বাধাপ্রাপ্ত হন। মা বৎসেবা চান, শুধু ইস্রায়েলী নয়, মরুভূমির সাতজাতির সম্মিলিত মন্দির, সবার দেবতা স্থান পাবে সে দেবালয়ে। পিতা দাউদের রক্তে, অস্থিমজ্জায় ছিল হিন্তীয়, অস্মোনদের প্রতি একরাশ ঘেন্না। সে ঘেন্না মুছতে পারেন না শলোমন। নিজের বিবেকের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ চলে তাঁর। নবি এবং রাজা কার কথা শুনবেন শলোমন— হৃদয় এবং মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো অবস্থা নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজেই লড়াই করে চলেন সম্রাট। এই মরুমর্ত্যেই আব্রাহাম দাসী-পুত্রকে নির্বাসন দেন। শলোমনের মনে হয়, সে বৎসেবাকে অস্বীকার করবে, সিংহাসন তাঁর, অতএব মন্দির নির্মাণের দায়িত্বও তাঁর। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়া মরুভূমির বালিতে

কখনও মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়নি। মন্দিরের চুড়াই তো সম্রাটের স্পর্ধার নিশান। শলোমনের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে লেখক সেই সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা সাম্প্রতিক পৃথিবীর, এমনকি ভারতবর্ষের শরীরের মহাসংকটকে স্পর্শ করেছে। ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণ দিয়েই আজও দেশে দেশে আলোড়ন ওঠে। জাতি-দাঙ্গার রক্তে ভেসে যায় মানুষের পথঘাট। সাহিত্যিক তো ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, ধর্মের বর্মধারীদের পৌরাণিক বিশ্বাসের আদ্যোপান্ত ট্রাজেডি তাঁর শব্দের গভীর থেকে গভীরে। সাবেককালের ইতিহাস ও পুরাণের সেই যুদ্ধকেই লেখক মিলিয়ে দিয়েছেন একালের ধর্ম-রাজনীতি-বিভেদ-বৈষম্যের বিড়ম্বিত সময়ের সঙ্গে।

শলোমনের ছায়ামূর্তিরা হৃদয় দিয়ে চিন্তা করে বুঝেছিল, বলপ্রয়োগ ছাড়া ধর্ম এবং আদর্শ কোনোটাই রক্ষা হয় না। শলোমনের ছায়ামূর্তি তো তাঁরই দেহান্তর। মিখা নামক এক বিধবাকে দেখে সম্রাটের কামেচ্ছা জাগে। পিতা দাউদ যেমন প্রাসাদের ছাদ থেকে বৎসেবাকে দেখেছিলেন। ধর্ষণ করেছিলেন বৎসেবাকে। সম্রাটের দু'জন ছায়ামূর্তি মিখাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায় সমুদ্রপারে। যেন ছায়ামূর্তিরা সম্রাট শলোমনেরই বাসনাকে বহন করে এগিয়ে চলেছে। সম্রাটের কামনাকেই চরিতার্থ করতে চলেছে একজোড়া ছায়ামূর্তি। পেছনে তাড়া করেন স্বয়ং সম্রাট। ক্ষুদ্র জাহাজে চড়ে তিনি পৌঁছে যান সমুদ্রপারে। পেছনে অজস্র জলসৈন্য। এখন তিনি পুরোদস্তুর সম্রাট। তাঁর পোশাক দেখে মনে হয় তিনি যুগপৎ নবি এবং পশু তাড়ানো লোক। সম্রাট দেখে ফেলেন ছায়ামূর্তি হাবিল-কাবিলের কুকীর্তি। মিখাকে ধর্ষণ করে গলাটিপে খুন করে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয় ছায়ামূর্তিরা। সারগনের নির্দেশে জলসৈন্যরা হাবিব-কাবিলের মস্তক ছিন্ন করে দেয়। মরুভূমির বুকে প্রেম আর যুদ্ধের এক দেবী বিনষ্ট হয়। রাজা বদল হয়, পাপ বদলায় না। তা বেড়েই চলে উত্তরোত্তর। পাপে ক্ষয়ে যাওয়া মরুমর্ত্যে কীভাবে মন্দির নির্মাণ করবেন!— কিছুই ঠাণ্ডা করতে পারে না সারগনের দ্বন্দ্বময় হৃদয়।

‘আদিপুস্তক’ যাকে উহ্য রেখেছে, ইহুদি পুরাণে যে উপেক্ষিত, বিতাড়িত। আখ্যানের পঞ্চম অধ্যায় ‘ফিঙ্গা কোথায়’-এ সেই খেতা গালিয়াতের উত্তরণ ঘটে কাবিল গালিয়াৎ রূপে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধের আশুনে যার মাথা সিরসির করে সেই খেতা গালিয়াৎ হয়ে ওঠে শলোমনের ছায়ামূর্তি। হাবিল-কাবিলের মৃত্যুর পর মরুভূমিতে নতুন হাবিল-কাবিল তৈরি হয়। পোশাক বদলানোর সময় গালিয়াতের কাছে উদ্ধার হয় নবি ইব্রিয়ার ফিঙ্গা। যে ফিঙ্গা দিয়ে ইব্রিয়া খুন করতে চেয়েছিল সম্রাটকে। সম্রাটের ছায়ামূর্তিরা কাবিল গালিয়াৎকে ‘শলোমন সংহিতা’ থেকে গুনিয়েছে শলোমনের পরিচয় এবং তাঁর জন্মবৃত্তান্ত। ইহুদি লৌকিক পুরাণ মতে, সৃষ্টির আদিতে শলোমন একমাত্র প্রাণ যিনি শিশুরূপে খোদার কোলে খেলা করতেন।^{৩৫} — একই কথা প্রচলিত রয়েছে ইসলামি লোকায়ত পুরাণে। হজরত মুহম্মদ হলেন সৃষ্টির প্রথমতম প্রাণ। তাঁকেই প্রথম সৃষ্টি করেন আল্লাহ্। আল্লাহ্ তাঁর নূর (জ্যোতি) থেকে হজরত মুহম্মদকে সৃষ্টি করেছিলেন। সেই নূরকে আল্লাহ্ এমন অলৌকিক শক্তি প্রদান করেছিলেন যে, তা আল্লাহ্র আদেশ অনুসারে যেখানে খুশি বিচরণ করত। সে সময় বেহেশত, দোজখ, ফেরেশতা, আকাশ, নীহারিকা, নক্ষত্রপুঞ্জ, ব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না। চরম শূন্যতার মধ্যে বিরাজ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ এবং মুহম্মদ।^{৩৬} পরবর্তীকালে হজরত মুহম্মদ নক্ষত্র রূপে বিরাজ করেছিলেন মহাশূন্যে। তাঁর আগে কিছুই সৃষ্টি হয়নি। মুসলমান সমাজের অন্দরে অন্তরেও এই কাহিনি প্রচলিত আছে।

শলোমনের ব্যক্তি-ইতিহাসে জমে আছে পূর্বজ যোশেফ^{৩৭} ও মুশার গল্প^{৩৮}। ‘আদিপুস্তক’-এর কাহিনিকেই এখানে সংযুক্ত করেছেন লেখক। ইগারের ঘটনাকে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন— ‘নির্বাসিতা নারীই আদিপুস্তকের নাটক সৃষ্টিকারিণী...’— পৃথিবীর আদি মানবী ইভ তিনিও নির্বাসিতা। পরবর্তীকালে লোতের স্ত্রী, ইগার, যোশেফের

প্রেম-প্রত্যাশী মিশর রাজের স্ত্রী, উরিয়ের স্ত্রী বৎসেবা— নির্বাসিতা নারীদের অশ্রুজলেই লেখা হয়েছে ‘আদিপুস্তক’-এর কাহিনি।

আখ্যানের নবি ইব্রিয়াকে নিয়ে মরুভূমিতে উন্মাদনা বেড়েই চলে। আনাথের বাড়িতে বসে বক্তৃতার আসর। আনাথের শিশু বিলালকে রঙ-গন্ধ মাখিয়ে ইব্রিয়া বসিয়ে দেয় বেদীর উপর। ফুলপাতা দিয়ে শিশু পূজা হয়। খেতা গালিয়াৎ যে উন্মাদ রহস্যময় মানুষটিকে নবি রূপে বিশ্বাস করেছিল এবং তার নাম দিয়েছিল ইব্রিয়া, সেই খেতা এখন কাবিল গালিয়াৎ, সে এখন শলোমনের ছায়ামূর্তি, অবিকল শলোমন। বোন আনাথের বাড়িতে এসে বক্তৃতা করতে নিষেধ করে কাবিল গালিয়াৎ। অন্যদিকে এই শিশুর চোখেই নবি ইব্রিয়া দেখেছে শলোমনের ধ্বংস, শলোমনের মন্দির নির্মাণের স্বপ্নের বিসর্জন। শিশু পূজা এবং ইব্রিয়ার বক্তৃতাই কার্যত আর্থ-হিত্তীয়দের ঐক্যবদ্ধ করেছে। মরুভূমির বুকে শলোমনের বিরোধী শক্তি গড়ে উঠছে ক্রমশ। জেরুজালেমে মন্দির নির্মাণের বিপক্ষে বধ্যভূমিতে একজোট হয়ে যায় পরাজিত দলের লোকসকল। তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ জনমত তৈরি করছে আনাথের উঠানে। আর মধ্যমণি হল আনাথের দুগ্ধপোষ্য শিশু বেলাল। আনাথকে সাবধান করে দেয় শলোমনের ছায়ামূর্তি কাবিল গালিয়াৎ। ইব্রিয়া গালিয়াতকে ইতর পশু ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। ইব্রিয়া চায় বিভাজিত, অপমানিত, ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত মানুষের সমর্থন। ইব্রিয়া ও সম্রাটের কথা ভেবে আনাথের মনে অনেক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার জন্ম হয়। যার সুরাহা করতে পারে না আনাথ। ইব্রিয়া নবি হতে চায়, তার শরীর-মনে নবি হবার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। মরুভূমির বুকে দিব্যতত্ত্বের সঙ্গে রাজতত্ত্বের লড়াই বহু পুরানো। শলোমন একই দেহে দুটোই ধারণ করে আছেন। শলোমনের পূর্বপুরুষ যাকোবই যাকোব নদীর তীরে ঈশ্বরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন। মল্লযুদ্ধে

ভেঙে গেছিল যাকোবের উরুর হাড়। ঈশ্বর ও মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছে বলেই তো যাকোবের আর এক নাম ইস্রায়েল।^{৩৯}

রাজাদের রাজতন্ত্রের পিপাসা তামাম মরুভূমিকে শুষ্ক করেছিল। কত অত্যাচার ও যুদ্ধের পর রাজত্ব কায়ম হয়েছে এই মরুপ্রদেশে। শলোমনের খেলা অতি ভয়ঙ্কর এবং জটিল। আনাথের ঘরে ঢুকে পড়ে এক ছায়ামূর্তি। অবিকল শলোমনের মতোই দেখতে ছায়ামূর্তিরা। আনাথের শিশুকে শূন্যে তুলে অসির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে উঠোনে ফেলে দিল ছায়ামূর্তি। আর তরবারিখানাকে মাটিতে গেঁথে খাড়া করে রাখল। এই তরবারিই যেন সেই লাঠি— আলিফ-এল-আলফা। যা আব্রাহাম প্রথম পুঁতেছিলেন মরুবালিতে। আরবি আলিফ-ই তো মরুভূমির আধিপত্যবাদের চিহ্ন। স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের নিশান। আলিফ-এর শরীরে এভাবেই লেপটে থাকে শিশুবন্ধ্যের ইতিহাস।

আখ্যানের শলোমনের রাজসত্তা কি কাবুস বা নিম্রোদের মতো?— পুরাণের নবিদের ধর্মপ্রচারে বারবার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলেন তৎকালীন কাবুসদের মতো সম্রাটের দল। আর কোনো এক শিশুই বড়ো হয়ে সেই রাজার পতন ত্বরান্বিত করবে— এমনই স্বপ্নাদেশ পেতেন রাজারা। মরুভূমির বুকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে শুরু হয়েছিল শিশু নিধনের আখ্যান। *হিব্রু বাইবেল*-এর মোজেশের কাহিনি, ইহুদি লৌকিক মিথে দাউদের গল্প, এমনকি ভারতীয় পুরাণেও কৃষ্ণের জন্ম এবং কংসবধেও সেই একই বৃত্তান্ত। শলোমনের রাজসত্তা ও নবিসত্তার লড়াই দ্বন্দ্বিকতায় ভরপুর।

উপন্যাসের ষষ্ঠ অধ্যায় ‘আনাথের ছায়া সরে যায়’-তে কোলের শিশুকে হারিয়ে আনাথের অচেতন অবস্থার কথা ‘আদিপুস্তক’ লেখে না। নবি ইব্রিয়ার স্বপ্নভঙ্গের ছটফটানি

‘আদিপুস্তক’-এ নেই। ইহুদি পুরাণের বাতিল মানুষরাই উপন্যাসে উৎসর্গের সমান সম্মান পায়। নবি ইব্রিয়া দেখতে পায়, মরুভূমির উচ্চ টিলার উপরে ধাতু-ফলকে খোদাই করা আছে— ‘আব্রাহাম শিশু বলিদান নিষিদ্ধ করেছেন, এখানে শিশুদের পরীক্ষা করা হয় না।’— অথচ শিশুবধ্য মরুভূমিতে নিয়মের বদল হয় না। অনুশাসনের রক্তাভ অক্ষর খোদিত হতেই থাকে। উপন্যাসের পাতায় ইব্রিয়ারা হেরে যায় বারবার, তবু খণ্ডিত ছিন্ন শিশুকে কাঁধে নিয়েই এগিয়ে চলে। সারিনের সেই অমোঘ উক্তি— ‘শলোমনের শিশুপ্রেম জগৎ বিখ্যাত’— সারিনের এই বাক্য তীব্র কটাক্ষের সুরে ভাসতে থাকে তপ্ত বালুতে। শিশুর হস্তারক কে! তা খুঁজে পায় না মরুভূমির সাধারণ মানুষ। সম্রাটদের রক্তেই যেন জমে আছে নিষ্পাপ শিশুর রক্ত। দাউদের পাপই যেন সবেগে তাড়িত করছে শলোমনকে, প্ররোচনা দিচ্ছে শলোমনের হৃদয়কে। শলোমন হৃদয় দিয়ে চিন্তা করে কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। উপন্যাসের এই অধ্যায়ে জিবরাইল নামক এক দর্জির দেখা পাওয়া যায়। উপন্যাসে দর্জি রক্ত-মাংসের মানুষ হলেও কিছুটা রহস্যময় গোছের ব্যক্তি। ইসলামি পুরাণে জিবরাইল হলেন দেবদূত (ফেরেশতা), যাঁর একমাত্র কাজ ঈশ্বরের বার্তা এনে মর্ত্যের নবিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। জিবরাইলের সঙ্গে কথা বলার সময় শলোমনের নবি ও রাজসত্তা মুছে যায়, হয়ে ওঠেন সামান্য মানুষ। দর্জির কথাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে তাঁর। জিবরাইলকে পোশাকের ফরমাশ দিয়ে সম্রাট ফিরে আসেন। এদিকে মরুভূমিতে শলোমনের প্রতিপক্ষ তৈরি হয়। দিব্যা যে শলোমনের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, সেও ইব্রিয়ার সঙ্গে ভিড়েছে। শিশুবধ্য মরুভূমির বুকে মন্দির নির্মাণের স্বপ্ন নিয়ে একাই দাঁড়িয়ে থাকেন দ্বন্দ্ব বিদীর্ণ শলোমন। তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায়। কখনও আব্রাহাম, কখনও মোজেশের কথা ভাবেন— ভাবেন অথচ কিছুই করতে পারেন না। মরুভূমি থেকে যারা হারিয়ে যায়, তাদের সকলের ছায়া রয়ে যায়। সব মানুষের ছায়া রয়ে যায় মরুভূমির

বুকে। অথচ শলোমনের পরমায়ুর জন্য শিশুর আয়ুকে চুরি করে এনেছে ছায়ামূর্তিরা। মরুভূমির সুর-অসুর সকলেই যেন আজ সম্রাটের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে। নিজের ছায়ামূর্তিকে আর বিশ্বাস হয় না সম্রাটের।

শলোমনের অজস্র রূপের মধ্যে আর এক রূপের সন্ধান পাওয়া যায় সপ্তম অধ্যায় ‘শলোমনের গান’-এ। ইহুদি-গ্রন্থের যিনি মরুভূমির মহীয়ান সম্রাট, সুপ্রিম লিজেন্ড, অদ্বিতীয় বাদশাহ্। আবার তিনিই ঈশ্বরের ইলোহের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিজাতীয় নারীদের প্রেমে পড়েছিলেন, ডেকে এনেছিলেন রাজ্যের জন্য সমূহ বিপদ। উপন্যাসের শলোমনেরও প্রেমিক সত্তার প্রকাশ ঘটেছে এবং সে প্রেমিক সত্তার উন্মেষে নিজেকে সংযত করা তাঁরই পক্ষে হৃদয়বিদারক হয়েছে। আনাথের শিশু খুন হবার পর শলোমন আনাথকে তাঁর গ্যালিলি হৃদের রাজবাড়িতে আশ্রয় দেন। এদিকে আনাথের স্বামী কয়িনকে কোথাও খুঁজে পায় না ছায়ামূর্তিরা। আনাথের প্রতি শলোমনের হৃদয় দুর্বোধ্যতার শেষপ্রান্তে পৌঁছে যায়। এক অদৃশ্য জাদুময় আকর্ষণে শলোমনকে টানতে থাকে আনাথের শরীর-মন। শলোমন বিয়ে করতে চান আনাথকে। পিতা দাউদের ব্যক্তি-ইতিহাসই যেন শলোমনের কাছে প্রত্যাবর্তন করেছে। বৎসেবা ছিলেন দাউদের পরকীয়া প্রেমের নারী। আনাথও শলোমনের কাছে তাই। শলোমন প্রেম নিবেদন করলে আনাথ তীব্র ধিক্কারে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কোলের সন্তান হারিয়ে আনাথের তখন দিব্যান্মাদ অবস্থা।

আমিই তোমার ভবিষ্যৎ বলব রাজচক্রবর্তী। আমি তোমাকে ছাড়ব না। তুমি আমার শিশুর পরমায়ু চুরি করে বেঁচে থেকেছ; যাও অনেক মহিষী আছে তোমার, কত উপপত্নী, কত দাসী, কত হারেম ভর্তি যুদ্ধের পাওনা মেয়েমানুষ। বলেই সম্রাটের হাতের উপর থেকে মুখ তুলে সম্রাটকে ছেড়ে দিয়ে বুকের কাপড় সামলে তুলল আনাথ। অতঃপর উপুড় হয়ে খাটে পড়ে ফোঁপাতে থাকল।^{৪০}

লেখক উপন্যাসে আনাথকে একইসঙ্গে প্রেম ও যুদ্ধের দেবী হিসাবে নির্বাচন করেছেন। শলোমনের মা বৎসেবা এবং আনাথ যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ। দুজনে একইসঙ্গে প্রেম আর যুদ্ধের দেবী। বৎসেবার প্রতি দাউদের প্রেমও ছিল অবৈধ। সে ছিল দাউদের কাছে যুদ্ধে পাওয়া উপহার। পিতার কামনা ধাওয়া করেছে পুত্রকে। বৎসেবা আর আনাথ যেন এক প্রেমের উপত্যকায় মিশে গেছেন। দুজনেই পরস্পরী। প্রথম সন্তানকে খুইয়ে দুজনেরই বিমর্ষ অবস্থা। শলোমন নবি যোশেফের মতো সুন্দর হলেও সর্বাঙ্গ সুন্দর নয়। শলোমনের অসুন্দর পা দেখে আঁতকে উঠেছিল আনাথ। মরুভূমি কখনও যুদ্ধ আর প্রেমের জন্য নীতি প্রস্তুত করেনি, কখনও ‘হৃদয়কে সত্যের পালকে ওজন’ করেনি। শলোমনের আত্মধিকারে তাঁর দ্বন্দ্বময় হৃদয় প্রকটিত। শলোমনের দ্বন্দ্ব ‘আদিপুস্তক’-এর কোথাও নেই, ঔপন্যাসিকের নিজস্ব কল্পনা। মা বৎসেবার কাছে শলোমনের অন্তরাত্তার কোলাহলের মধ্যে দিয়ে তাঁর দ্বন্দ্বময় হৃদয়ের হাহাকার ফুটে উঠেছে:

কেন আমি হৃদয়কে আবিষ্কার করতে চাইছি? একটি সুন্দরী নারীর পক্ষে আমার রূপই কি যথেষ্ট নয়? জ্ঞান কেন মানুষের হৃদয়ের মধ্যে আশ্রয় চায়? মানুষের জ্ঞানের পরিধি জানবার জন্য কি হৃদয়কেই ওজন করবেন ঈশ্বর? জ্ঞানী কেন রূপবান হয়? আমি কেন এত সুন্দর হলাম বৎসেবা? কেন তা হলে আমার পা দুটি এত কুৎসিত হল?^{৪১}

জ্ঞান ও প্রেম এবং যুদ্ধ ও যৌনতার জটিল ভূমিক্ষেত্রে শলোমনের হৃদয় চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে যেন। আনাথের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণের বীক্ষণবিন্দুর উপরিসৌধে রয়েছে নারীর জটিল মনস্তত্ত্ব। সম্রাট বিয়ে করেছেন, উপপত্নী রেখেছেন, কেবল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য, কোনো নারীই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। কার্যত সকলেই সম্রাটের মুখাপেক্ষী। অথচ আনাথ সম্রাটের প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছে অনায়াসে, নির্দিধায়। যে নারী সম্রাটকে প্রতিহত করেছে, যে নারী দুর্লভ। সেই নারীতেই টান অনুভব করেন সম্রাট। কারণ এই নারীর এক চোখে থাকে প্রেম এবং অন্য চোখে থাকে যুদ্ধ।

প্রেম ও যৌনতার অমোঘ তীব্রতায় রাজা শলোমন কিছুই নির্ণয় করতে পারেন না। আনাথের কাছে আশ্রয় চাইলেও নিজের ভেতরের অপরাধবোধ তাকে আনাথের কাছে থেকে শতযোজন দূরে নিষ্ক্ষেপ করে, হৃদয় দিয়ে চিন্তা করতে করতে একসময় সম্রাটের মনে পড়ে রিদি ইব্রোনের কথা। যাকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন পিতার হারেমে। দাউদের হারেমে পৌঁছে সম্রাট কোনো নারীকে স্পর্শ করতে পারেন না। সমস্ত নারীর শরীরে গেঁথে রয়েছে পিতা দাউদের অবৈধ কামনার উদগ্র চোরাশ্রোত। শলোমনের চিত্ত কিছুতেই শান্ত হয় না। নিরন্তর মরুভূমির বুকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে চলতে শেষপর্যন্ত কয়িনকে খুঁজে তার হাতে আনাথকে তুলে দিতে চান সম্রাট। মুহূর্তেই সম্রাটের অপর সত্তা জেগে ওঠে যৌনতার উত্তাল ঢেউয়ে। অতর্কিতে শলোমনের চোখে ভেসে ওঠে আনাথের নগ্ন বুক। আত্মবিক্ষোভে ফেটে পড়েন সারগন। আনাথের শরীর তীব্রভাবে শলোমনকে টানতে থাকে। মুহূর্তের দুর্বলতায় আনাথের কাছে ছুটে আসেন সম্রাট। আনাথ ও শলোমনের কথোপকথনে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের হৃদয়ের জটিল গোপন মনস্তত্ত্ব:

— আমি ঈশ্বর নই আনাথ। তবে আমি ঈশ্বরপুত্র অবশ্যই। আমি সৃষ্টির শুরুতে একা ঈশ্বরের কোলে খেলা করতাম। সেই থেকেই আমি নিঃসঙ্গ।

— তোমার কাঙালপনা দেখে আমার খুব লজ্জা করছে মহারাজা। ঘাতক তো নিঃসঙ্গই হয় শুনেছি! আমি জানি, কয়িনকে তুমি হত্যা করেছ।

— না, না! বিশ্বাস কর! আমি মৌমাছিদের মৃত্যুও সহ্য করতে পারি না। আমি সারারাত কোথাও শান্তি পাইনি।

— আমি জানি মৃত্যু ছাড়া কোথাও শান্তি নেই। তুমি কি আমার কাছে শান্তি চাও? একমাত্র নির্ভুর সম্রাট ছাড়া এই প্রস্তাব কে করবে। চাও তো দেহ। মাত্র একবার ভোগ করলেই আমি তোমার কাছে পুরনো হয়ে যাব। তুমি আব্রাহামের বংশ-গুপ্তি, তোমাকে চিনি।

— কী বলছ!

— হ্যাঁ। আমি ইগার এবং বৎসেবার মতো উর্বর। রাজকন্যাকে তুমি দাসী বানাতে চাও! কোলে সন্তান দিয়ে মরুভূমিতে নির্বাসন দিতে চাও। আর আমি? তোমার প্রেমে

কাল কাটাব, চোখের জল ফেলব! আমি দাসী ইগার নই মহাশয়! আমি আক্ষিলনের আর্যরাজ সিমনের পুত্রী, দাউদের চিরশত্রু আমি। আমার বাবাকে বধ করলে, আমার স্বামী ও পুত্রকে শেষ করে দিলে! তারপর শান্তি চাও আমারই কাছে! আমি কি বৎসেবা? নিশ্চয়ই তোমার জ্ঞানের খুব তারিফ করতে হয় মহারাজা! গালিয়াংকে তোমার ছায়ার দাসত্ব দিয়ে ধন্য করেছে! তাই না?

— সমস্ত যুদ্ধ এবং হত্যার পরিণাম বুঝি আমি?

— তুমিই বললে, ঈশ্বরের প্রথম শিশু তুমি! আব্রাহামের আগে জন্মে তুমি ঈশ্বরের কাছে ছিলে, এসেছ অনেক পরে। কেন? আমার শিশুকে হত্যা করবে বলে?

— ঈশ্বর চাইতেন বলেই আমি...

— আসলে তুমি কে?

— জানি না আনাথ। আমি তোমার শিশুর পরমায়ু চুরি করা চোর। আমি এই আয়ু নিয়ে এখন কী করব?

— মন্দির!

— হ্যাঁ, মন্দির! ঠিক আছে। কিন্তু কয়িন যদি আমার সাম্রাজ্যের সমস্ত গোপনীয়তা আসিরিয়ায় পাচার করে দেয়?

— জানি, তুমি যার কাছে শান্তি চাও, তাকেও বিশ্বাস কর না।

— আমার জ্ঞান আমাকে অবিশ্বাসী করেছে আনাথ। অথচ ওই জ্ঞান দিয়ে ভালবাসা পাওয়ার কথা ছিল।^{৪২}

নবি থেকে রক্ত-মাংসের মানুষে উত্তরণ ঘটে শলোমনের। মরুভূমির তাবৎ সাম্রাজ্যের মালিক হয়েও সে ভিখারির মতো দু'দণ্ড প্রেমের জন্য ছুটে যায় আনাথের কাছে। মন তাঁর কোনো কিছুতেই শান্ত হয় না। সম্রাটের জ্ঞান তাঁকে কোনো স্থিরতর প্রত্যয়ে পৌঁছে দিতে পারে না। উষার আলোতে দুই চোখ দেখে তাঁকে রহস্যময় কাবুস মনে হয়। ঈশ্বর ইলোহে শলোমনকে জ্ঞান দান করলেও মালাটিয়ার হিন্তীয় রাজা ইষানুলদের কাছে থেকে লৌহবিদ্যার গোপন সূত্র আয়ত্ত করতে পারেননি। এই ইষানুলই আনাথের স্বামী কয়িনকে তাঁর লৌহ কারখানার ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে। সম্রাট শলোমন কয়িন হত্যার আদেশ দেন তাঁর ছায়ামূর্তিকে। ছায়ামূর্তি হাবিল ইস্রায়েলকে আত্মরক্ষার নামে প্রকারান্তরে কয়িনকে হত্যা করতে চাইলেন না হাবিলকে উৎসর্গ করলেন—

‘আদিপুস্তক’ এসব কিছুই লেখে না। দ্বন্দ্বপীড়িত সম্রাটের অন্তর্সত্তার হাহাকারকে ফুটিয়ে তুলতে ঔপন্যাসিক এমন জটিল লড়াইয়ের মানচিত্র নির্মাণ করেছেন। একদা হিত্তীয়কে হত্যা করে বৎসেবাকে বিবাহ করেছিলেন দাউদ। শলোমন কি আনাথকে বিবাহ করতে চান বলেই কয়িনকে হত্যার জন্য মেতে উঠলেন? মন্দির বা সাম্রাজ্য রক্ষা কি অজুহাত?— একদিকে নিরাশ্রয় যন্ত্রণাদগ্ধ আনাথ এবং অন্যদিকে শলোমনের প্রবৃত্তি— যুদ্ধ আর প্রেম মরুভূমির বালিতে রক্তের নিশান উড়িয়ে এভাবেই ফিরে ফিরে আসে।

উপন্যাসের অষ্টম অধ্যায় ‘দর্জির পোশাক’-এর বেশিরভাগ ঘটনা ইহুদি পুরাণে নেই, এ কাহিনি লেখকের নিজস্ব সংযোজন। আনাথের ঘরে এক ছায়ামূর্তি প্রবেশ করে। ছায়ামূর্তি নতজানু হয় আনাথের কাছে। ছায়ামূর্তি গভীর আবেশে আনাথকে নগ্ন করে। আনাথ ‘এ অন্যায়, এ পাপ’ বলে চিৎকার করলেও ছায়ামূর্তি শোনে না। তীব্র যৌনবোধে ছায়ামূর্তি গমন করে আনাথের শরীর থেকে শরীরান্তরে। ঘোর স্বর্ণসন্ধ্যায় তাকে সম্রাট ভাবে আনাথ। প্রেমের কী অপরাজেয় শক্তি! মহাপাপী সম্রাটের কাছেই তার হারানো সম্ভানকে তারই পেটে ফিরিয়ে দিতে বলে আনাথ। অথচ ঘোর কাটলে আনাথ বুঝতে পারে, সম্রাট নয়, এ ছায়ামূর্তি তার স্বামী কয়িন। হাবিল ইস্রায়েলকে খুন করে শলোমনের ছায়ামূর্তির রূপ গ্রহণ করে কয়িন। আনাথের মুখে শত্রু শলোমনের নাম শোনামাত্রই কয়িন আনাথকে অবিশ্বাস করে এবং ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। শলোমন যেন জ্ঞান আর সৌন্দর্যের জ্বলন্ত শিখা। আনাথের মা মিন্দা গালিয়াৎ দর্জি জিবরাইলকে সঙ্গে নিয়ে আনাথের কাছে আসে। দর্জি দিয়ে যায় তার হাতে বোনা শলোমনের পোশাক। মিন্দা গালিয়াতই নিয়ে এসেছেন দর্জিকে তার রথে চড়িয়ে। মিন্দা গালিয়াৎ বেরিয়ে গেলে আনাথ পিছু পিছু গিয়ে কিছুই দেখতে পায় না। রথ-দর্জি সবকিছুই উধাও হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। বাক্সের পোশাক দেখে আঁতকে ওঠে আনাথ। তাতে ছিল এক টুকরো কাফন।

কাফন মৃতের পোশাক। যে সম্রাটকে আনাথ মনে মনে ঘেন্না করত কাফন দেখে তাঁর প্রতি আনাথের সহানুভূতি ও আন্তরিকতা বেড়ে যায় আকস্মিকভাবে। আনাথের আত্মকথনে প্রকাশ পেয়েছে তার মানসিক অবস্থান্তর:

আমি কিছুতেই এ কফন শলোমনকে দেব না। আমি প্রেমের দেবী, আমি কি পারি না কফন লুকোতে! হায় সোহাগ-রাত্রির বেগনি রামধনু, হে মধুযামিনীর কেনান, আমার কণ্ঠে গান দাও লিবাননের শিবিকা। তুমি আমার জন্য পাণি-শিবিকা পাঠাও শলোমন। আমাকে বিবাহ কর হেতপুত্র শলোমন। তোমার সপ্তজাতি এবং জ্ঞাতি-সমষ্টি জয়যুক্ত হোক অমর শলোমন, তোমার আর্ঘ্যপ্রেম দ্রাক্ষালতার মধুপের সঙ্গীত শোনাতে প্রিয়তম। আমি তোমার ভালবাসা সঙ্গে করে লুকিয়ে পড়ব মরুমর্তের আঁধারে, কেউ খুঁজে পাবে না। কেউ জানবে না মৃত্যুর পোশাক সেলাই করা দর্জি কী করে পরাস্ত হয়ে ফিরে গেছে। প্রেমের হাতে কখনও কি মৃত্যুকে তুলে দিতে হয়, হায় দেবতা এল! যুদ্ধের দেবীকে কেন কফন দিয়ে অপমান করেছ? আমি যে আর বইতে পারি না আমারই হৃদয়কে শলোমন! তুমি গ্রহণ কর, এসো আমি তোমাকে পূর্ণ করি দাউদ-পুত্র!^{৪০}

আখ্যানের শুরুতে যে আনাথ ছিল প্রেমের দেবী, সে ক্রমশ হয়ে উঠল যুগপৎ যুদ্ধ এবং প্রেমের দেবী। জ্ঞান ও প্রেম এবং যুদ্ধ ও যৌনতার জটিল ভূমিক্ষেত্র থেকে নিস্তার চায় আনাথের যমজ ভাই কাবিল গালিয়াৎ। সে শৌলদুর্গ খুলে দেয়। দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে শত সহস্র ছায়ামূর্তি। শত শত ছায়ামূর্তি পায়চারি করে মরুমর্ত্যে। মরুতে নতুন করে জাতিদাঙ্গা বাঁধবে এবার। নতুন করে লেখা হবে মানুষের ইতিহাস। এই জাতিদাঙ্গা রুখতে মহাজ্ঞানী শলোমনের মানবিক সত্তা জেগে ওঠে। পূর্বপুরুষদের হাত ধরে যে মরুভূমি যুদ্ধবাজদের খাসতালুকে পরিণত হয়েছে, তাকে এবার মুক্ত করতে তৎপর হন মানবদরদী শলোমন। এখানে শলোমন রাজা-নবি কোনোটাই নন, নেই তাঁর কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা, নেই কোনো অলৌকিকত্বের বহর। তিনি নিতান্ত রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ। আনাথকে বলা কথার প্রতিটি অক্ষরে শলোমনের ধুরন্ধর প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত হয়েছে:

আমি কোনো সম্রাট নই আনাথ। মরুভূমিতে আজ থেকে অষ্টোরৎ দেবীর পূজা সাড়ম্বরে চালু হল। মোয়াবের দেবতা কামোশ এবং অস্মোনদের দেবতা মিলকম পূজিত হবেন আজ থেকে। ইদোমের এক বংশ ইদদ আমার শত্রু, মিসরের রাজা ফরৌনের অনুগ্রহপ্রাপ্ত। যোশেফকুলের যারবিয়াম আমার প্রতিপক্ষ, ইলোহে আমার রাজত্ব চিরে নিয়ে বারো ভাগের দশ ভাগ তাঁরই হাতে তুলে দিতে চান। জেরুজালেমের এক ভাগ মাত্র আমার জন্য অবশিষ্ট রয়েছে, সেখানেও যিবুযরা মাটি কামড়ে রয়েছে। ইব্রিয়াকে হটানোর সাধ্যও আমার নেই। আমার ছায়ার উপর আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। আমি সামান্য মানুষ।

আমি দাউদের মতো যুদ্ধের লোক নই। আমার পরমায়ু কম। আমি কারও আয়ু চুরি করে বাঁচতে চাইনি। মন্দিরের জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করেছি। এক ভাগ মাত্র অংশ আমার, সেখানেই মন্দির হবে। জ্ঞান আমাকে বারবার এই এই মরুতে পবিত্র করেছে রাজকন্যা! জাতিদাঙ্গা কখনও পৃথিবীতে শেষ হবে না, যুদ্ধ বার বার হবে। কখনও কোনো সভ্যতা আমার কৌশলের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে না। কারণ অস্মোন আর হিন্তীয় চির-অপরাধী এবং সম্মানিত। প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র এবং অহংকারী। তারা আমারই ছায়ার মতো ক্ষুধার্ত।

...আমি মোয়াবিয়া, ইদোমীয়া, সীদোনীয়া, হিন্তীয়া সকল জাতির নারীকে সম্মান দিয়েছি, তাঁদের দেবতাদের অসম্মান করিনি আমি আমার মন্দির সকল দেবতার অনুগ্রহে নির্মাণ করতে চাই। সকল দেবতার জন্য জেরুজালেমে আমি পর্বতের উপর উচ্চস্থলী নির্মাণ করে দেব।^{৪৪}

ইহুদি পুরাণের শলোমনও প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন না। তিনি মরুভূমির সকল জাতির জন্য পুজোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই কারণে সদাপ্রভু তাঁর প্রতি বিরাগভাজন হয়ে তাঁকে শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন।^{৪৫} আব্রাহাম স্ত্রী সারার কবরের জন্য হিন্তীয়দের কাছে মাটি কিনেছিলেন। ওই মাটিটুকুই ছিল আব্রাহামের আধিপত্যবাদের সূচনা ও স্মারক। এখান থেকেই আব্রাহামের জয়যাত্রা। জ্ঞাতিনিধন এবং যুদ্ধ-দাঙ্গার মধ্যে দিয়েই আব্রাহাম থেকে দাউদ— তাবৎ সাম্রাজ্যের গর্ভগৃহে যুদ্ধ আর রক্তের ঢক্কানিনাদ, প্রেম আর শিশুবধের নান্দীরোল। শলোমন সমুদয়

রাজত্ব ও যুদ্ধ ছেড়ে প্রেমের পথে দীক্ষিত হলেন। এই জায়গাতে ‘আদিপুস্তক’-এর চেয়েও উপন্যাসের শলোমন অনেকবেশি মানবিক, প্রাণবন্ত।

সবকিছু হারিয়ে আনাথের কাছে আশ্রয় চেয়েছেন সারগন। সারিন বাধা দিলেও সম্রাট শোনে ননি। সারিনকে শুনিয়েছেন সম্রাট তাঁর পূর্বজ থেকে বর্তমান সময়ক্রম— এই ধারা বেয়ে কীভাবে মানুষের লালসা মরুভূমির প্রেমকে বিষাক্ত করেছে:

সেই কবে থেকে যুদ্ধটা চলছে সারিন। মোশির যুগ থেকে আজ পর্যন্ত। কিন্তু কী হল সেই যুদ্ধের পাওনা! বারো গোষ্ঠীর বারো ভাগ। এই বিভক্ত মানুষের উপর যিনি প্রভুত্ব করেন তিনিই কি রাজা? লোহা আর ঘোড়ার শক্তিই কি শেষ কথা? সেই বারো ভাগের মাত্র এক ভাগ ইলোহের জন অবশিষ্ট রইল। শুধু সেইটুকু রক্ষা করতে গিয়ে আমি শিশুহত্যা করেছি ধ্রুব-জহুরা। যুদ্ধ, মড়ক, দুর্ভিক্ষ, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প পেরিয়ে এ কোথায় পৌঁছেছি আমি? আলিফ আর বে— এই দুটি অক্ষর ছাড়া কিছুই আর আমার হাতে রইল না। আলিফ হলেন ঈশ্বর, বে হল বাড়ি বা ঘর। ঈশ্বরের ঘর গড়ে না দিলে সেই নিরাশ্রয় ঈশ্বর লাল মরুতেই ঘুরে বেড়াবেন।^{৪৬}

‘আদিপুস্তক’ রাজা শলোমনের চরিত্রের এই গুণাবলীকে আড়াল করে রেখেছিল। পুরোপুরিভাবে শলোমনের রাজসভার প্রকাশ ঘটে নি। উপন্যাসিক ‘আদিপুস্তক’-এর অপ্রকাশিত অংশকেই উপন্যাসে উদ্ভাসিত করেছেন। যেখানে গণিকা সারিনের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করতেও দ্বিধা নেই মহাজ্ঞানী শলোমনের। এখানেই শলোমন অদ্বিতীয়, একক। আনাথের আশ্রয়েই বাঁচতে চেয়েছেন সম্রাট। যার শিশুকে তিনি হত্যা করেছেন তাকেই ভোগ করার জন্যে স্নানে-সুগন্ধে সুবাসিত করেছেন নিজেকে। যেন অতীত ইতিহাসই বৃত্তাকারে ফিরে এসেছে শলোমনের কাছে। যেমনটা করেছিলেন তাঁর পিতা দাউদ। বৎসেবার প্রথম সন্তান বাঁচেনি। শলোমন কার সন্তান ছিল— ‘আদিপুস্তক’ লিখলেও উপন্যাস স্পষ্ট করে লেখেনি। আখ্যানের শলোমনের দ্বন্দ্বের মাত্রা সেই কারণে অনেকবেশি। চারিদিকে মৃত্যুর ভয় তবু আনাথকে নিয়ে শলোমন বেরিয়ে পড়েন মরুভূমির

পথে। সম্রাট এখনও যেন তাঁর কৌশল ভোলেননি। কাবুসরা যেমন দেহ ছেড়ে দেবতার পোশাক পরে মরুমর্ত্যে ঘুরে বেড়াতেন। শলোমনও তেমনি রাজসত্তা ছাড়লেও রাজার কৌশল হৃদয় নিয়ে ঘুরছেন। আনাথকে নিয়েই তিনি শুরু করলেন যাত্রা। অতীতে আব্রাহাম যেমন সারাকে বোন পরিচয় দিয়ে ব্যবহার করেছিলেন। এখানে আনাথ যেন সারার প্রতিক্রম। মরুভূমির ইতিহাস তো নারীদের যন্ত্রণা আর দেহ সৌন্দর্যে ভরা। নারীদের আত্ম চিৎকার এবং আনন্দের শীৎকারেই মরুভূমির নগর এবং হারেম পরিপূর্ণ।

উপন্যাসের নবম তথা শেষ অধ্যায় ‘মাটির সন্ধানে শলোমন’-এর কাহিনি ইহুদি পুরাণ ও লোকায়ত মিথের উপর নির্ভর করেই রচিত। এছাড়া ইসলামি শাস্ত্রীয় মিথেরও প্রসঙ্গ রয়েছে। ইহুদি এবং ইসলামি পুরাণের কাহিনি হলেও তাতে লেখকের নিজস্ব কল্পনাশক্তির আভাস পাওয়া যায়। রাজা শলোমনের সাম্রাজ্যের ভাগাভাগি হয়ে যাবার পরের অবস্থা এবং জেরুজালেমের মন্দির নির্মাণ এই অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয়। সাম্রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেলে শলোমন ক্রমশ তাঁর সৈন্যবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। শলোমনের বিরুদ্ধ শক্তি তাঁকে উৎখাত করতে চাইছে। আর এই বিরুদ্ধ শক্তির নারীকেই শলোমন বহন করে নিয়ে চলেছেন। প্রেম ও যুদ্ধের এমন অমোঘ পরাক্রম— শলোমন বহন করে চলেছেন যুদ্ধ ও প্রেমের দেবী আনাথকে। আনাথের কোলের বাক্সে রয়েছে কাফন। প্রেম ও যুদ্ধের নিয়তি যেন মৃত্যু। শলোমন সেই মৃত্যুকেই বহন করছেন মরুমর্ত্যে।

ঔপন্যাসিক ইহুদি মিথ ভেঙে শলোমনকে এক বিস্ময়কর সম্রাট করে তুলেছেন। তাঁর মতো জ্ঞানী মরুভূমিতে কখনও সৃষ্টি হয়নি। তিনিই একমাত্র জ্ঞানী যিনি প্রেমের হাতে তাঁর মৃত্যুকে সাজিয়ে তুলেছেন। যুদ্ধ ও প্রেমকে তিনি নারী-আধারে রেখে নিজের

জন্য রচনা করেছেন এক আশ্চর্য মরু-সরণি। ক্ষমতাচ্যুত হয়েও তিনি নির্লিপ্ত, শান্ত।
নিরস্ত্র, নিঃসহায় হয়েও তিনি বহন করছেন আনাথের অপরূপ সৌন্দর্য। অথচ আনাথের
কাছে রয়েছে তাঁর মৃত্যুর পোশাক। সারগন-জ্ঞানী শলোমন থেকে তিনি হয়ে উঠেছেন
ধীর-স্থির-শান্ত মহাত্মা।

উটকে এলাতলে কূপের কাছে রেখে শলোমন আনাথকে সঙ্গে করে এগিয়ে যায়।
আনাথ দেখতে পায় সম্রাটের পায়ে পাদুকা নেই। খালি পায়ে যাযাবরী পায়ের ক্ষিপ্ত গতি
দেখে আঁতকে ওঠে আনাথ। প্রেমের দেবী আনাথ সমস্ত ভয় ও বাধা জয় করে সম্রাটের
পায়ের কাছে মাথা রেখে অবোরে কাঁদতে থাকে। আনাথের চোখের জলে শলোমনের
অসুন্দর পা ভিজ়ে যায়। তপ্ত অশ্রুর স্পর্শে শলোমনের রাজকীয় যৌনবোধ জেগে ওঠে।
পায়ের তলা থেকে ক্রমশ উপরে উঠে আসে কামনা। নির্জন মরুভূমিতে আনাথকে কাছে
পেয়ে সম্রাটের শরীরে বিদ্যুৎ দৌড়াদৌড়ি করে। আনাথ শলোমনকে ‘দাউদপুত্র’ সম্বোধন
করতেই শলোমনের শরীরের সমস্ত বিদ্যুৎ আকাশে মিলিয়ে যায়। দুজনেই দেখে
মরুভূমিতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মৃতদেহ। সব ছায়ামূর্তি। মৃতের মুখ দেখতে দেখতে
কয়িনকে খোঁজে আনাথ। বারবার খোঁজে চলে দুজনেই কয়িনকে। হঠাৎ একটি মৃতদেহের
মুখ দেখে আনাথের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। কার মৃতদেহ উপন্যাসে তার উল্লেখ নেই।
লেখক কেবল কৌশলে জানিয়েছেন, ‘কয়িন কাছে না থাকলে এই মুখটির অভাবে বিনীত
রাত কাটত তার’। আমরা আনন্দাজ করতে পারি, এ দেহ উন্মাদ রহস্যময় নবি ইব্রিয়ার।
সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেও তাকে দেখতে দেয় না আনাথ এবং বলেও না কার মৃতদেহ।
কয়িন না কয়িন নয়— শলোমন নিঃসংশয় হতে পারে না। শলোমন বারংবার জানতে
চায়, অথচ আনাথ নিশ্চিত করে কিছুই বলে না। নিঃসংশয় না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানী থামতে
জানে না। সম্রাট থামে না। আনাথ জানায়, ‘চুরি করা পরমায়ুর প্রতিটি পল নিবিড়ভাবে

বিঁধল তোমাকে’। এমতাবস্থায় উটের ডুলিতে আনাথকে উঠিয়ে শলোমন উদভ্রান্তের মতো তাকে সম্ভোগ করলেন। উটপূজা এবং উটের পিঠে কাম-নিবৃত্তি করা— এ বিষয়ে ইসলামি শাস্ত্রীয় ও লৌকিক পুরাণে বিস্তর আলোচনা রয়েছে।^{৪৭} সম্ভোগ শেষে আনাথের কোলে শিশুর মতো মুখ গুঁজে রইলেন শলোমন। ‘আদিপুস্তক’-এর শলোমন ঈশ্বর ইলোহের দিব্যদর্শন লাভ করেছিলেন দু’বার। প্রথমবার তিনি চেয়েছিলেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। দ্বিতীয়বার সদাপ্রভু তাঁকে বলেছিলেন, ঈশ্বরের পথে ন্যায়নিষ্ঠভাবে অটুট থাকতে।^{৪৮} অন্যদিকে উপন্যাসের শলোমনের প্রথম দিব্যদর্শন মিললেও দ্বিতীয়টি মেলে না। শলোমনের দ্বিতীয় দিব্যদর্শন লেখকের নিজস্ব কল্পনা। শলোমন আনাথকে জানিয়েছেন:

ইলোহে আমাকে স্বপ্নে মাত্র দু’বার দেখা করেছেন আনাথ। প্রথমবার আমার প্রার্থনা শুনে অবাক হয়েছিলেন, কেননা আমি তাঁর কাছে জ্ঞান ছাড়া কিছুই চাইনি। দ্বিতীয়বার দেখা হল বিগত প্রত্যুষে, উনি আমায় সাম্রাজ্য চিরে নিয়ে বললেন, তুমি মৃত্যুর জন্য তৈরী হও জ্ঞানী শুলায়মান। এখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বক্ষণ তোমাকে অনুসরণ করবে। ওরা হবে সংখ্যায় এগারো জন। আমারই মতো তারা; অবিকল শলোমনের রূপ ধরে আসবে শলোমনের মৃত্যু। কারণ এতদিন আমিই মৃত্যুকে বিভ্রান্ত করেছি। মরুভূমিতে আসল শলোমন কে বুঝতে না পেরে মৃত্যুই বারংবার গেছে ফিরে। এবার মৃত্যুই জ্ঞানীর কৌশলকে জ্ঞানীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে। আমি মৃত্যুকেও পথ দেখিয়েছি, এই আমি বর্ণহীন সৈনিক।^{৪৯}

শলোমনের মৃত্যু নিয়ে ইহুদি পুরাণে তেমন কিছুই বলা হয়নি। ঔপন্যাসিক শলোমনের দ্বন্দ্ব-বিদীর্ণ হৃদয়কে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার প্রয়োজনে এমন কাহিনি সংযুক্ত করেছেন। মহাজ্ঞানী সম্রাট তাঁর মুখের আদলে শত সহস্র ছায়ামূর্তি গড়ে তাবৎ সাম্রাজ্য রক্ষা করেছেন। মরুভূমির মানুষ নির্ধারণ করতে পারেনি কোনটি শলোমন এবং কোনটি শলোমনের ছায়া! কোনটি শলোমনের মূর্তি এবং কোনটি শলোমন নিজে! কিছুই নির্ধারণ করতে পারেনি কেউই। এমনকি মৃত্যুও আবিষ্কার করতে পারেনি প্রকৃত শলোমনকে।

বারবার মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েছেন সম্রাট। অথচ এখন মৃত্যুই ছদ্মবেশে সম্রাটকে ধাওয়া করছে। শলোমন আনাথের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদিকে আনাথ দেখতে পায়, এগারো জন ছায়ামূর্তি এগিয়ে চলেছে। একজন জেরুজালেমের মন্দির নির্মাণের ভিত্তি-প্রস্তাব ঘোষণা করছে। শলোমন এবং তাঁর পিতার স্বপ্নপূরণ হচ্ছে, অথচ মহাজ্ঞানী শলোমন কিছুই টের পাচ্ছেন না। স্বপ্ন না মৃত্যু নির্ণয় করতে পারেন না আদম পুত্র মহাজ্ঞানী শলোমন।

মন্দির গড়ার কাজ শুরু হতেই সবাই দেখতে পেল, উচ্চ টিলার উপর একা দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং সম্রাট শলোমন। একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে তিনি মন্দির নির্মাণের তদারকি করছেন। তাঁর পিঠের উপর খাড়া হয়ে আকাশের তলে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাড়। সম্রাট অনড়, নিষ্পলক, বিনিদ্ৰ। কখন তিনি ওখানে উঠেছেন কেউ জানে না। জননী বৎসেবা বারোজন ছায়ামূর্তি নিয়ে উপরে উঠেছিলেন তাদের মধ্যে এগারো জন নিচে এসেছে। একজন আসেননি, তিনিই সম্রাট। মন্দিরের মিস্ত্রিরা নিরন্তর কাজ করে চলেছে। কেননা সম্রাট সদা জাগ্রত। তিনি দেখছেন। মন্দিরের কাছে উচ্চস্থলীর সরণির গোড়ায় একটি সুবৃহৎ ফলকে লেখা রয়েছে— ‘চক্ষু অবগত করে কাজ কর, কারণ স্বয়ং শলোমন তোমাকে দেখছেন।’

শ্রমিকদের দল অনবরত মন্দির নির্মাণের কাজ করতে থাকে। সম্রাটের আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের কথা কেউ জানে না। বৎসেবা উচ্চ টালির উপর উঠতে গিয়ে পড়ে যান এবং তাঁর মৃত্যু হয়। উচ্চস্থলীতে বৎসেবার সমাধি হয়েছে। সমাধির পাশেই একইভাবে সম্রাট দাঁড়িয়ে রয়েছেন। লাঠিতে ভর দিয়ে সম্রাট দেখছেন মন্দির নির্মাণ। দিন, মাস অতিক্রান্ত হয়। ধীরে ধীরে মন্দির গড়ার কাজ শেষ হয়। মরুভূমির শত সহস্র মানুষ

অভিবাদন জানায় সম্রাটকে। দূর থেকেই সকলে প্রণাম করছে সম্রাটকে। শলোমনের একটি হাত লাঠির উপর, অন্য হাতটি তুলে তিনি আশীর্বাদ করতে পারেন, অথচ কিছুই করছেন না মহামতি সারগন। শলোমন অনড়, অবিচল।

এই একটি দিনের জন্যই অপেক্ষা করেছিল খেতা গালিয়াৎ। পিতৃহত্যার প্রতিশোধের নেশায় আজও তার মাথা সিরসির করে। গালিয়াৎ স্থির করে, বিশাল জনসমুদ্রের ভেতর থেকেই সে ছায়ামূর্তির বেশ ধরে ফিঙ্গা ছুঁড়ে হত্যা করবে শলোমনকে। এগিয়ে আসে গালিয়াৎ। সম্রাটের ছায়ামূর্তি ভেবে তাকে কেউ বাধা দেয় না। তারপর যা ঘটল তার জন্য গালিয়াৎ প্রস্তুত ছিল না। শলোমনের লাঠিতে গালিয়াৎ হাত স্পর্শ করা মাত্রই তা মাটিতে পড়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে যায় গালিয়াৎ। সে চেয়ে দেখে, লাঠির শেষ প্রান্তে উই ধরেছে এবং সম্রাট খেয়াল করেননি। গালিয়াৎ সম্রাটকে বলে— ‘সম্রাট আপনি চুপ করে রয়েছেন কেন? আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি কাবিল গালিয়াৎ, মহারাজা!’ এরপর আপনা-আপনিই শলোমনের মমি মাটিতে কাত হয়ে পড়ে যায়। গালিয়াৎ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। কোমর থেকে ফিঙ্গা নিয়ে শলোমনের পায়ের কাছে ফেলে দিল। মৃত সম্রাট শুয়ে রইলেন উচ্চস্থলীতে।

শলোমনের এমন রহস্যময় ও বিস্ময়কর মৃত্যু নিয়ে *হিব্রু বাইবেল* বা *ওল্ড টেস্টামেন্ট*-এ কোনো বর্ণনা নেই। উপন্যাসে শলোমনের মৃত্যুর প্রসঙ্গের অনুরূপ কাহিনি রয়েছে ইসলামি পুরাণে। ইহুদি কিংবদন্তিতে বলা হয়েছে:

The Bible does not tell us the circumstances of Solomon's death. He simply 'slept with his fathers'. And Jewish legend is also strangely silent on the subject. The Muslim, however, relate a fascinating story. ... Solomon died crouched over his staff. Everyone was passed by, including the Jinn, thought that he was deep in prayer, as was his wont, and they would not disturb him. Days, weeks, and months went by, and

all this while a white ant gnawed its way into the staff and began eating it little by little from the inside. After a year had passed the staff collapsed into powder and Solomon fell, and the people and the Jinn realised that he was dead. But by that time the Temple, Solomon's great masterpiece, stood finished in all its glory.^{৫০}

শলোমনের এমন চমকপ্রদ মৃত্যুর উল্লেখ ইহুদি পুরাণে নেই। মুসলমানদের *কোরান*-এ এই ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।^{৫১} উপন্যাসের মন্দির নির্মাণের মিস্ত্রি-শ্রমিকরা ইসলামি পুরাণে জ্বিন। ইসলামি পুরাণ মতে, জ্বিন হল মানুষের মতোই এক প্রজাতি। তাদের খালি চোখে মানুষ দেখতে পায় না। এরা আগুন থেকে সৃষ্ট এবং আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী।^{৫২} ইহুদি পুরাণ বা উপন্যাসের শলোমনের মন্দির হল ইসলামি পুরাণে উল্লেখিত ‘বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদ’।

রাত্রি গভীর হলে উটের পিঠে চড়ে উচ্চস্থলীতে উঠল আনাথ। শলোমনের গায়ে কাফনখানা পরিয়ে দিল। উপন্যাসের শলোমন শেষ পর্যন্ত তাঁর কবরের জন্য মাটিটুকুও পেলেন না। এমনই দুর্ভাগা দেশের সম্রাট তিনি। উপন্যাসের শেষ পঙ্ক্তিতে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন:

আদম বললেন, লেখো ভাই লিপিকার, সবই ভূমন্ডলের ছায়া বটে, কিন্তু আনাথের তলপেটে যে মানবপিণ্ড ঘাই মেরে উঠল তা মানুষেরই মূর্তি, তা বাস্তব।^{৫৩}

আনাথের গর্ভের মানবপিণ্ডের ‘জন্মদাতা পুরুষ’ কি কয়িন না শলোমন? — ইহুদি পুরাণ শলোমনের এ কাহিনি বর্ণনা করেনি। স্বামীকে হারিয়ে বৎসেবা যেমন দাউদের সন্তানকে তলপেটে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তেমনই কি আনাথও স্বামী কয়িনকে হারিয়ে শলোমনের অনাগত সন্তানকে তলপেটে বহন করে চলেছেন অভিশপ্ত মরুভূমিতে? যুদ্ধ আর প্রেম মরুভূমির বালিতে রক্তের নিশান উড়িয়ে এভাবেই ফিরে ফিরে আসে। পুরাণ ও ইতিহাসের গর্ভগৃহে জ্ঞান আর প্রজ্ঞাই মানুষের প্রেম ও যুদ্ধকে জটিল করে তুলেছে।

আশ্রয়হীন একাকী নারী যৌন-প্রহারে অভিভূত হয়ে তার কামার্ত অশ্রুকে বিজেতার জন্যেই উৎসর্গ করেছে এই মরুতে। মরুভূমির তপ্ত ক্ষুধা সেই অশ্রুকে গিলে গুষে নিয়েছে। তবুও এরপরে প্রবল পরাক্রম বাস্তব বাসা বাঁধে মানুষের মাংসে, শরীরের অভ্যন্তরে। সেই ভার নারী একাই বহন করে নির্জন মরুপ্রান্তরে, যেমনভাবে দাসী ইগার তাঁর তলপেটের মানবপিণ্ড নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছিলেন একদা তামাম মরুতে। আর ইহুদি পুরাণের উপেক্ষিত ইস্রায়েল প্রতিষ্ঠা পান চার হাজার বছর পর ইসলামি পুরাণ ও আধুনিক আখ্যানে। ঈশ্বরের নিমিত্তে আব্রাহামের উৎসর্গ এবং তাঁর উত্তরপুরুষ শলোমনের স্বপ্ন-প্রেম-মৃত্যুর যে উপসংহার *রাজাবলি* বুনেছে, ইহুদি পুরাণ এবং ইতিহাস কেউই তার নাগাল পায় না।

মহিষ মঙ্গলা কাব্য (২০১৩) উপন্যাসে রয়েছে খ্রিস্টীয় পুরাণের *বাইবেল*-এর ‘নতুন নিয়ম’-এ উল্লেখিত যিশু ও মেরির প্রসঙ্গ। *কোরানে* মেরি মরিয়ম নামে পরিচিত, নবি ঈশার সঙ্গেও যিশুর সাযুজ্য লক্ষণীয়। *কোরান*-এর বয়ান অনুযায়ী, মরিয়ম কুমারী অবস্থায় আল্লাহর অলৌকিক লীলায় গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং তার গর্ভেই জন্ম নিয়েছিলেন নবি ঈশা। *কোরানে* অতি অল্পসংখ্যক নারীদেরই নামের উল্লেখ আছে, কিন্তু মরিয়ম একমাত্র নারী যার নামে *কোরানে* একটি সুরা রচিত হয়েছে। *মহিষ মঙ্গলা কাব্য* উপন্যাসে আদিবাসী উদ্ভিন্ন যৌবনা মঙ্গলা মরিয়মকে অলি চৌধুরী ধর্ষণ করে এবং কুমারী মরিয়ম গর্ভবতী হয়। ধর্ষিতা মরিয়ম আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বাইবেলের দর্শনকে আশ্রয় করে নতুন করে বাঁচতে চেয়েছে। লেখক অপাপবিদ্ধা নারীর যন্ত্রণাময় জীবনকে আলোকিত করেছেন মানবতার দৃষ্টিতে। যেখানে খ্রিস্টীয় ও ইসলামি পুরাণের মরিয়ম ও আখ্যানের মরিয়ম একসূত্রে গ্রথিত হয়ে যায়।

৪. খ. ছোটোগল্পে ইহুদি ও খ্রিস্টীয় মিথ-পুরাণ:

আবুল বাশারের ছোটোগল্পেও ইহুদি মিথকথার সঙ্গে একালের সমাজজীবনের অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে। আদি পৃথিবীতে মানবজাতির আবির্ভাব থেকে শুরু করে জাদুময় অলৌকিক বিশ্বাস এবং পরবর্তীকালে ছিন্নমূল মানুষের জীবনসংগ্রামের প্রতিভাস পরিলক্ষিত হয়। ইহুদি পুরাণের ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’-এর কাহিনিকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে লেখক অতীত বিশ্বকে তুলে এনেছেন তাঁর আখ্যানে। বাইবেলীয় পুরাণের মানব সৃষ্টির ইতিকথা, যুদ্ধ যাত্রার কাহিনি, জাতি নিধনের উপাখ্যান এবং সেই রক্তাক্ত ইতিহাসের বুকে মানুষ তার ‘বুদ্ধিমান হৃদয়’কে পশুবধ্য ও শিশুবধ্য মরুতে স্থাপন করে কী পেল— বাইবেলীয় পুরাণের এই গল্পকে ভেঙে কথাকার নতুন ডিসকোর্স নির্মাণ করেছেন। যা সাম্প্রতিক সময়কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নানাভাবেই স্পর্শ করেছে।

‘উৎসর্গ’ গল্পটি বাইবেলের-এর ‘Book of Genesis’ অংশে ‘The History of Abraham’ শীর্ষক ১২-তম অধ্যায় থেকে শুরু করে ‘Abraham’s death’ শীর্ষক ২৫-তম অধ্যায় পর্যন্ত এসে কাহিনি শেষ হয়েছে। Old Testament-এর অনুরূপ কাহিনির বিবরণ পবিত্র কোরানেও রয়েছে, যদিও বাইবেল ও কোরানের ঘটনার মূল কাঠামো প্রায় অভিন্ন হলেও আবুল বাশারের ‘উৎসর্গ’ গল্পে এ ঘটনা পুনর্গঠিত হয়েছে।

‘উৎসর্গ’-গল্পে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আব্রাহামের পুত্রকে উৎসর্গ করার কথা বিধৃত করছেন গল্পকার। আব্রাহামের স্ত্রী এবং দাসী ও তাঁদের পুত্রদের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক সর্বাংশে ইহুদি মিথ ব্যবহার করেননি। ইহুদি পুরাণে উপেক্ষিত চরিত্রকেই তিনি গল্পে মহিমান্বিত করেছেন। ইহুদি ও ইসলামি পুরাণের দ্বন্দ্ব এই গল্পের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। মরুভূমির মাটিতে প্রথম লাঠি পোঁতেন আব্রাম, তখনও তিনি

আব্রাহাম হননি। অব্রাম ছিলেন অব্রাম্ফণ অর্থাৎ বেদুইন বা বেদে, গোষ্ঠীপিতা এবং মোড়ল। অব্রাম কীভাবে আব্রাহাম হয়েছিলেন তার বর্ণনা ইহুদি পুরাণে বিস্তৃত আকারে রয়েছে। আরবি বর্ণমালার প্রথম অক্ষর আলিফ (ا) দেখতে লাঠির মতো। প্রাচীন পৃথিবীর মরুতে লাঠি পুঁতেই মানুষ মাটি দখল করত। ‘আদিপুস্তক’-এর ঈশ্বর অব্রামকে নিজের দেশ, আত্মীয়স্বজন ও পৈতৃক নিবাস পরিত্যাগ করে নিয়ে এসেছিলেন মরুদেশে। অব্রামকে ঈশ্বর জানিয়েছিলেন:

আমি তোমাকে মহান এক জাতির জনক করব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করে তোমার নাম গৌরবান্বিত করব। আশীর্বাণী হিসাবে ব্যবহৃত হবে তোমার নাম। যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে তাদের আমি আশীর্বাদ করব, আর যারা তোমাকে অভিশাপ দেবে আমি তাকে করব শাপগ্রস্ত।^{৫৪}

ইহুদি লৌকিক পুরাণে মোজেসের মতো আব্রাহামের জন্মকাহিনিতেও শিশুবধের গল্পকথা ছড়িয়ে আছে। আদিপুস্তকের কাহিনি নিয়েই লেখক আব্রাহামের জীবনের নানান ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। অব্রামের প্রধান শত্রু ছিল নিম্রোদ। আগুনের পূজো করত নিম্রোদ। ‘আদিপুস্তক’-এর কাহিনিকেই গল্পে সংযুক্ত করেছেন লেখক। অব্রামকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল নিম্রোদ, কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতাবলে অব্রাম মিশর ছেড়ে পালিয়ে আসেন মরুদেশ কেনানে। অব্রামের সঙ্গে ছিলেন ভাইপো লোত। লোত যখন সদোম শহরে অবস্থান করেছিলেন সেইসময় সদোম এবং ঘমোরা শহর পাপে পরিপূর্ণ। নগরের সমস্ত মানুষ সমকামী প্রেমে মেতে উঠেছিল। সদাপ্রভু মানুষের এই বেখাপ্লা যৌনতা সহ্য করেননি, তিনি দেবদূতদের হাত দিয়ে দুই নগর ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।^{৫৫} দেবদূতরা লোত পরিবারকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, ছুটে পালানোর সময় যেন পেছনে ফিরে না চায়, ঈশ্বরের শাপ লাগবে। অথচ লোতের স্ত্রী পেছনে ফিরে দেখতে চেয়েছিলেন কীভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে তাঁর মরুভূমির পশুধন। তাঁর তাবু, চুলা, গাছপালা এবং বসতি।

ঔপন্যাসিক লোতের স্ত্রীর কথা লিখলেও ‘আদিপুস্তক’ তাঁকে নিয়ে নীরব। কেবলই তিনি পেছনে ফিরে তাকানোর শান্তি স্বরূপ নুনের মূর্তিতে পরিণত হয়েছিলেন— এইটুকুই লেখে ‘আদিপুস্তক’।^{৫৬} দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে লোত সোর পাহাড়ে বাসা বেঁধেছিলেন। স্ত্রী এবং ধনসম্পদ হারিয়ে এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা ও সর্বস্বান্ত বিতীষিকা ছিল লোতের সঙ্গী। বংশরক্ষার তাগিদ অনুভব করে লোতের দুই কন্যা মদিরাচ্ছন্ন পিতার সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়। আর তাদের কোলে জন্ম নেয় মোয়াব ও অম্মোন।^{৫৭}

ঈশ্বরের স্বপ্ন পেয়ে মরুভূমির বুকে তাবৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন আব্রাহাম। দুর্ভিক্ষের সময় শস্যের খোঁজে স্ত্রী সারিকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে গেছিলেন আব্রাহাম। সারি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। কাবুস বা ফ্যারাওদের কাছে নিজের স্ত্রীকে আব্রাহাম পরিচয় দেন বোন ব’লে। রাজা অবিমেলকের হৃদয়ে সারির প্রতি যৌনবাসনা জাগ্রত হলে ঈশ্বর ইলোহে তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমে সাবধান করে দেন। এভাবেই আব্রাহামের স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা করেছেন ঈশ্বর ইলোহে। মিশরের রাজা যখন জানতে পারলেন সারি আব্রাহামের স্ত্রী। তিনি খুশি হয়ে গোরু ভেড়া এবং দাসদাসী দান করলেন আব্রাহামকে। এঁদের মধ্যে এক দাসী ছিলেন, যাঁর নাম হগার।^{৫৮} ইসলামি পুরাণে যাঁকে হাজেরা বলা হয়েছে। গল্পে তিনিই ইগার। ওল্ড টেস্টামেন্টে দাসীর নাম রয়েছে হগার। হ-কে ই-এর মতো উচ্চারণ করা যায়। যেমন হিব্রোন > ইব্রোন। এই কারণে লেখক হগারকে ইগার হিসাবে ব্যবহার করেছেন।^{৫৯} গল্পকারের ব্যবহৃত ‘সারি’ (আব্রাহামের স্ত্রী) নামটিও ইহুদি পুরাণে ‘সারা’ নামে উল্লেখিত। ইহুদি পুরাণ ইগারের কথা বেশি লেখেনি। প্রাচীন পৃথিবীর এই অবহেলিত দুঃখ লাঞ্চিত অপমানিত সত্তার প্রতিমূর্তি ইগারকে গল্পে তুলে এনেছেন লেখক। মিথ-পুরাণ মোড়া মরুভূমির বুকে তাঁকে মহিমান্বিত করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছিলেন:

আমি হাজেরা নামটা ব্যবহার করিনি, কারণ আমি যে মুসলিম মিথ ব্যবহার করছি না সেটা বোঝাতে চাই পাঠককে। আমি বোঝাতে চাই যে, এটা আমি ইহুদি মিথ হিসাবে ব্যবহার করছি। অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্টকেই ব্যবহার করছি। শুধু ওল্ড টেস্টামেন্টের নামটাকে একটু বদলে দিয়েছি।^{৬০}

তাবুর সাম্রাজ্য এবং বংশরক্ষার তাগিদে আব্রাহাম দাসীগমন করেন এবং ইগারের গর্ভে জন্ম নেয় ইস্রায়েল। আদি পৃথিবীর মরুভূমিই প্রথম সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্রের ধারণা প্রদান করে মানুষকে। আব্রাহাম নিঃসন্তান ছিলেন, আর সেই কারণেই তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের প্রয়োজনে দাসীগমন করেন। কয়েকবছর পরেই স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয় পুত্র ইসহাক। এভাবেই মরুভূমির ঈশ্বর ইলোহে যাযাবর তাম্বুধারীদের মরুসাম্রাজ্যের অধিকার তুলে দেন বেদুইন আব্রাহামের হাতে। ঈশ্বর চেয়েছিলেন আব্রাহাম মরুতে কর্তৃত্ব রচনা করুক। মহা-কূটবুদ্ধির অধিকারী রাজনৈতিক ঈশ্বর কী নিদারুণ খেলা খেললেন। মরুভূমির ইতিহাসকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন সুকৌশলে। শুরু হয় সারি এবং ইগারের মধ্যে মনোমালিন্য। সারি আব্রাহামের চোখের সামনেই ইগারের উপর অত্যাচার করত, অথচ মুখে কুলুপ এঁটে থাকতেন গোষ্ঠীপিতা। ‘এত প্রকাণ্ড বলবান মানুষ যিনি কিনা ব্যাবিলনের উর নগরী ছেড়ে এসেছেন নিম্নোদের অত্যাচারে, যাঁকে কর্মকার ইবলিশ হাপরের অনিবার্ণ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিল নিম্নোদকে, সেই আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েও যে অব্রাম বেঁচে রইলেন, যে আগুন সদাপ্রভুর ইচ্ছায় শান্তিনিকেতন হয়ে গুলবাগিচায় আগলে রাখল মোড়লকে’, সেই তিনিই সারির অনুরোধে পুত্র ইস্রায়েল এবং দাসী ইগারকে নির্বাসন দিলেন নির্জন মরুপ্রান্তরে। ‘সব যুগেই স্বপ্নের ভিতর দিয়ে মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্ন ছাড়া আদর্শ বা ঈশ্বর আসতে পারে না। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর বা জ্ঞানের নিয়ম মানুষের মাংসে গেঁথে যায়। অব্রামই সেই মানুষ যিনি প্রথম মরুবিশ্বে স্বপ্নের এই সদাচার উপলব্ধি করেন, স্বপ্নের আনাগোনায তিনি তাঁর অস্তিত্বকে অর্থবান

করেছিলেন। তিনি অপেক্ষা করতেন স্বপ্নের জন্য। স্বপ্নই তখন ধ্যানাশ্রয়ী, ধ্যানই তখন স্বপ্নের অন্তর্গত। ঈশ্বর ইলোহে আব্রাহামের স্বপ্নে এসে বললেন:

ঐ বালক এবং ঐ দাসীটির ব্যাপারে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না, সারা তোমাকে যা বলছে তাই-ই করো। কারণ ইসহাকের দ্বারাই তোমার বংশধারা রক্ষিত হবে। তবে ঐ দাসীপুত্রের দ্বারাও আমি এক জাতি উৎপন্ন করব, কারণ সেও তোমার সন্তান।^{৬১}

‘আদিপুস্তক’-এর ঈশ্বর কী বিচক্ষণতায় এবং কূটকৌশলে আব্রাহামের হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন। ঈশ্বরের নির্দেশে আব্রাহাম দাসী ইগার এবং পুত্র ইস্রায়েলকে কিছু খাদ্য এবং জল দিয়ে বিদায় করে দিলেন। মা-ছেলে আশ্রয় নিল বের-শেবা নামক এক কূপের কাছে।^{৬২} এরপর ‘আদিপুস্তক’ ইগার আর ইস্রায়েলকে নিয়ে আর কিছুই বলেনি। আব্রাহামের দাসী এবং দাসী-পুত্র ইস্রায়েল মরুভূমির রুধির-তমসায় হারিয়ে যায়। তামাম ‘আদিপুস্তক’ সন্ধান করেও তাঁদের খোঁজ পাওয়া যায় না।

‘আদিপুস্তক’ থেকে বিতাড়িত এই ইস্রায়েলকেই গল্পকার প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। পুরাণে যিনি অবহেলিত, উপেক্ষিত, গল্পে তিনিই নায়ক। গল্পের কাহিনির সঙ্গে ইসলামি পুরাণের কাহিনির সাদৃশ্য রয়েছে। আখ্যানের পটভূমি হজরত মুহম্মদের জন্মের চার হাজার বছর আগের প্রাচীন পৃথিবী হলেও মুহম্মদ চার হাজার বছর পর ইস্রায়েলকেই (কোরান-এ উল্লেখিত ইসমাইল) প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তাঁর ধর্মের অন্যতম প্রধান পুরুষ হিসেবে।^{৬৪} ‘আদিপুস্তক’ যা দিতে পারল না তা কোরান তা কোন বিচারে দিল!— গল্পের ইগার গর্ভাবস্থায় মরুভূমির বালুতে লুটোপুটি খান। নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে সারি বলেছে— ‘আমার লালসা, আমার লোভ, আমার আকাঙ্ক্ষা। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশের মেয়ে, আমি দাসী হলেও রূপসী, আমি নির্বোধ নই, আমি কাবুসের হারেমে ছিলাম’। দুর্ভাগ্যপীড়িতা ইগারকে সাহায্য করেন দেবদূত। সারির অত্যাচারে মরুভূমিতে

নির্বাসিত হয়েছেন ইগার। মনিব আব্রাহাম তাবৎ সাম্রাজ্যের মালিক হয়েও দাসীর গর্ভযন্ত্রণা নিরসন করতে পারেননি। ঈশ্বরের দেবদূত ইগারকে জানিয়েছেন:

তোমাকে তোমার মনিব কি ভালবাসেন না? নিশ্চয় বাসেন। তুমি তার উষ্টীর চেয়ে দামি, কাবুসের দেওয়া উপহার। আমরা তোমার মনিবকে অব্রাম থেকে আব্রাহাম বানাব। গোষ্ঠীবাবা থেকে মহাজাতির আদি জনক বানাব। তাকে ক্ষুদ্র থেকে মহৎ করব। সমস্ত জাতির পিতা হবেন আব্রাহাম।^{৬৫}

এভাবেই মরুভূমির বালিতে চমকপ্রদ নাটক অভিনীত হয়। পাশেই ছিল বীর-লহয়-রোয়ী কূপ। (ইহুদি পুরাণে যা বের-শেবা এবং ইসলামি পুরাণে জমজম কূপ নামে পরিচিত)। এই মরুপ্রস্রবণযুক্ত কূপের পাশেই দেবদূতের সাহায্য নিয়ে সন্তান প্রসব করেন ইগার। দেবদূত তাঁর সন্তানের নাম দেন ইস্রায়েল। ইস্রায়েল অর্থ ঈশ্বরের কান। কারণ সদাপ্রভু শিশুর জন্মের আর্তনাদ মরুমর্ত্যেই শুনেছেন। দেবদূত ইগারকে আশ্বস্ত করেন, এই মরুমর্ত্যে তাঁর সন্তান বর্ধিত হবে, সম্মানিত হবে। অন্যদিকে ঈশ্বরের দেবদূত স্বপ্নে হানা দিলেন আব্রাহামের হৃদয়ে। দেবদূতের কথা মতো আব্রাহাম স্ত্রী গমন করলেন এবং সারির গর্ভে জন্ম নিল ইসহাক। পুত্রের আকাঙ্ক্ষা তাড়িত করেছে মরুভূমির রাজাদের। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের জন্য বীরযোদ্ধার প্রয়োজন হয়েছে মরুভূমিতে। সারির কথায় ইগারকে বিদায় করে দিয়েছিলেন আব্রাহাম। অথচ মনিবকেই স্বামীরূপে ভালোবাসতেন ইগার। উষর মরুতে নির্বাসিত মা ও ছেলের সংগ্রামে ভরা যাপিত জীবন, প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই। ‘আদিপুস্তক’ লেখে না। ইহুদি পুরাণে পরিত্যক্ত রমণীর এবং তাঁর দুর্ভাগ্য সন্তানের কথা আধুনিক আখ্যানে স্থান পায়। ঈশ্বর ইলোহে পুনরায় স্বপ্নে হানা দেন আব্রাহামের কুটিরে। স্বপ্ন পেয়েই দাসী ইগারের কাছে ছুটে যান স্বপ্নদর্শী আব্রাহাম। ইগার ও আব্রাহামের কথোপকথনে উঠে এসেছে আব্রাহামের নতুন পরীক্ষার ইস্তাহার:

— সদাপ্রভু তোমাকে অনেক দিয়েছেন। তোমার অনেক তাঁবু, অনেক পশু, দাসদাসী অনেক।

— কিন্তু দেশ! আমার দেশ চাই। সদাপ্রভু বলেছেন, এই সব আমার। এই ভূমরু, চরাচর, কতকাল ধরে বলে আসছেন। হিব্রোন (ইফ্রোন)-এর এলোন বনে দেখা দিয়ে একবার বললেন, বলিদান কর আব্রাহাম। এই যতদূর দৃষ্টি কর, যত দূরে সূর্য যায়, সবই তোমার। উৎসর্গ কর তোমার প্রিয়তম জীবকে। তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে অব্রাম।

... ..

— আমার প্রিয়তম কে ইগার?

— আমি নই।

— ইস্রায়েলকে আমার চাই ইগার! চাইতে গিয়ে আব্রাহামের গলা কেমন গাঢ় আর ফ্যাসফ্যাসে হয়ে ভেঙে গেল।

— না, না, এ আমি কিছুতেই পারব না। আমাকে নামিয়ে দাও।

— সদাপ্রভু খাদ্য চান ইগার। আমি জানি, তোমার পুত্রই আমার প্রিয়তম।

— এ চিত্তভ্রম তোমার। তোমার স্বপ্ন এত নিষ্ঠুর হতে পারে না। আমি এইমাত্র এই প্রথম তোমাকে প্রিয়তম বলে ডেকেছি, এই লোভকে ক্ষমা করে দাও। আবার বলছি, আমি দাসী, আমাকে মরুভূমে ফেলে দাও। ছেলেকে নামিয়ে দাও। বলে ডুকরে উঠল দাসী ইগার। অথচ সে গো-শকট থেকে নেমে পড়তে পারল না।^{৬৬}

স্বপ্নদর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষী দুর্ভেদ্য মানুষ আব্রাহামের অনুরোধের কাছে হার মানল দাসী ইগার। সে ইস্রায়েলকে স্নান করাল এবং নতুন পোশাক পরিধান করিয়ে বলে দিল— ‘বাবা যা বলবেন। তাই করবে।’— বিধাতার সমকক্ষ তাম্বুধারী মরুচারী যাযাবর আব্রাহামের স্বপ্নপূরণ করার নিমিত্তে নিজের গর্ভের সন্তানকে উৎসর্গ করলেন ইগার। পতিপ্রেমে উদ্ভাসিত ইগারের সন্তান মায়ের কথামতো পিতার দেওয়া হোমকাষ্ঠ মাথায় নিয়ে পাহাড়ে চড়তে শুরু করল। নিজের বলিদানের কাঠ সে নিজেই বয়ে নিয়ে চলেছে। মরুভূমির আকাশে এমনই পরীক্ষা দিতে হয়েছে আব্রাহামকে। বলিদানের আসন্ন মুহূর্তে আব্রাহাম দো-টানায় পড়লেন। তিনি নির্ণয় করতে পারছেন কে প্রিয়? দাসী-পুত্র ইস্রায়েল নাকি সারি-পুত্র ইসহাক। তখন মরুভূমিতে ঝড় বইছে। বায়ুবিক্ষোভে ইতিহাসের দুর্বোধ্য

কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। জ্ঞানীপুত্র ইস্রায়েল পিতার অবস্থা দেখে তাঁকে চোখে পটি বেঁধে নিতে বলে। ইস্রায়েলের মনে পড়ছে মায়ের শেষ বাক্য— ‘বাবা যা বলবেন। তাই করবে।’ অথচ শেষ অবধি কিছুই নির্ণয় করতে পারলেন না আব্রাহাম। খড়া ছুঁড়ে দিয়ে মাটিতে নতজানু হয়ে ঈশ্বর ইলোহের কাছে আর্তনাদ করতে লাগলেন। আকাশ-প্রতিভা মহাকাশ থেকে বললেন:

তুমি চোখের আচ্ছাদন উন্মোচন কর আব্রাহাম। তোমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এই দেশসমূহ তোমাকে দিলাম। তুমি এখন ঝোপে আবদ্ধ একটি মেষকে দেখো, তাকেই হোমার্থ বলিদান দিয়ে তাঁবুতে ফিরে যাও।^{৬৭}

আব্রাহামের পরীক্ষা শেষ হল। অব্রাম থেকে তিনি আব্রাহামে উত্তীর্ণ হলেন। অব্রাম ছিলেন গোষ্ঠী পিতা, আব্রাহাম হলেন জাতির পিতা। ছেলে ইস্রায়েলকে আব্রাহামের হাতে তুলে দেওয়ার পর ইগারের অন্তরাত্মার কোলাহল, অস্থিরতা, ছটফটানি ‘আদিপুস্তক’-এ নেই। গল্পকথকের বয়ানে:

কিন্তু তামাম আদিপুস্তক খুঁজলাম আমরা। কোথায়ও আর ইগারকে তালাশ করা গেল না। মরুতে নির্বাসিতাকে মরুভূমিই তবে কোথাও লুকিয়ে ফেলল।^{৬৮}

মা-ছেলের নির্বাসনের পর তাঁরা উভয়েই ঘরে-বাইরে মুছে গেছে। ‘আদিপুস্তক’-এ ইস্রায়েলের জায়গা দখল করেছে সারি-পুত্র ইসহাক। আব্রাহাম কাকে উৎসর্গ করেন?— এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইহুদি এবং ইসলামি পুরাণের আন্তঃসংযোগ ও দ্বন্দ্বের স্থানটি। ‘আদিপুস্তক’ ইসহাককেই গ্রহণ করেছে, কারণ সে আব্রাহামের স্ত্রী সারির সন্তান। দাসী-পুত্র ইস্রায়েলকে ‘আদিপুস্তক’ বাতিল করে দিয়েছে। শুধু ওল্ড টেস্টামেন্ট-ই নয়, ইহুদি লৌকিক পুরাণও একই সাক্ষ্য দেয়। সেখানেও ইসহাক এবং

ইস্রায়েলকে আব্রাহামের সন্তান হিসাবে স্বীকার করলেও উৎসর্গের সম্মান পেয়েছে
ইসহাক।

The theological problem of why God found it necessary to put Abraham through such an agonising experience is one that is still actively discussed. One of the main reasons proposed is that a public demonstration was required of faith in God in order to convince the unbelievers of divine sovereignty. At the same time, however, God is portrayed in the aggadah as being sympathetic to Abraham's position. His opening command 'Take your son, your only one, whom you love, Issac' is seen as a carefully graded approach, meant to break the news in as gentle a fashion as possible. 'Your son' could have meant Isaac or Ismael: 'your only one' likewise, because Issac was the 'only' son of Sarah, and Ismael the 'only' son of Hagar; 'whom you love' did not make things clearer, because Abraham loved them both. It was only when the name 'Isaac' was pronounced that Abraham understood exactly what God demanded.^{৬৯}

‘ইসহাক’— এই নাম শোনা মাত্রই আব্রাহামের হৃদয় জেনে ফেলেছিল ঈশ্বরের আকাজক্ষা। দাসী পুত্র ইস্রায়েলকে ইহুদি লোক-পুরাণ এবং ইসলামিক শাস্ত্রীয়-লৌকিক উভয় পুরাণই ইসমাইল নামে সম্বোধন করেছে। ইহুদি লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় উভয় পুরাণেই ইস্রায়েল বা ইসমাইল উপেক্ষিত, বিতাড়িত, পরিত্যক্ত। উৎসর্গের যোগ্যতা দাসী পুত্রের ছিল না, অতএব সে সম্মান ইস্রায়েল পেতে পারেন না। আধুনিক গল্পকার আবুল বাশার ইহুদি পুরাণের এই অবহেলিত, বর্জিত, উপেক্ষিত ইস্রায়েলকেই দিয়েছেন উৎসর্গের সম্মান। ইহুদি মিথ ভেঙে তিনি ‘আদিপুস্তক’-এর কাহিনিকে পাঠককে নতুনভাবে দেখতে প্রণোদিত করেছেন। ‘আদিপুস্তক’-এর সদাপ্রভু যাঁদের নির্বাচন করেননি, আধুনিক আখ্যান তাঁদেরই গ্রহণ করেছে। পুরাণে যিনি উপেক্ষিত, গল্পে তিনিই মহিমান্বিত। লেখকের নবমিথ নির্মাণের নেপথ্যে কোনো পুরাণেরই প্রভাব নেই।

আব্রাহামের চার হাজার বছর পর ইসলাম ধর্মের নবি হজরত মুহম্মদ *কোরান-এ* দাসী-পুত্র ইসমাইলকে উৎসর্গের সম্মান দিয়েছেন। ‘আদিপুস্তক’-এর বিতাড়িত ইস্রায়েল কোরানে মহাত্মা। ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভ— কলেমা (মন্ত্রপাঠ অর্থাৎ ধর্মের উপর বিশ্বাস), নামাজ, রোজা, জাকাত (দান করা) এবং হজ্জ। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, এই পঞ্চম স্তম্ভের ‘হজ্জ’— রীতি প্রচলিত হয় ইব্রাহিমের (কোরানে আব্রাহাম হলেন ইব্রাহিম) সময় থেকে। ‘আদিপুস্তক’-এর বের-শেবা এবং উপন্যাসের বীর-লহয়-রোয়ী কূপ হল ইসলামি পুরাণের জমজম কূপ। হাজেরাকে ইব্রাহিমের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে বর্ণনা করেছে ইসলামি পুরাণ। ধূ ধূ মরুপ্রান্তরে যখন হাজেরা জলের জন্য ছোট্ট ছুটি করেছিলেন তখন শিশু ইসমাইলের পদাঘাতে ভূমি থেকে জল নির্গত হয় এবং সেটিই পরবর্তীকালে জমজম কূপে পরিণত হয়।^{৭০} জমজম কূপের কথা *কোরান-এ* সুস্পষ্টভাবে নেই, তবে মুসলমানদের হাদিসে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা জমজম কূপের জল পবিত্র বলেই বিশ্বাস করেন। হজ্জ-যাত্রীরা এই জল পান করেন এবং সঙ্গে বোতলবন্দি অবস্থায় নিয়ে আসেন। নির্বাসিতা ইগারের মর্মব্যথা ও যন্ত্রণা-বিষাদ গল্পের মতো *কোরান-এ*ও রয়েছে। তৃষ্ণার্ত শিশুর জলের জন্য হাজেরা মক্কার সাফা ও মারওয়া নামক পাহাড়ে ছুটে বেড়িয়েছিলেন।^{৭১} হাজেরার কষ্ট ও যন্ত্রণাকে অনুভব করার জন্যই হজ্জ যাত্রীদের সাফা-মারওয়া পাহাড় প্রদক্ষিণ করতে হয়।^{৭২}

‘আদিপুস্তক’ রচিত হবার প্রায় চার হাজার বছর পর *কোরান-এ* ইস্রায়েল এবং দাসী ইগার মহান হয়ে ওঠেন। ইসলাম ধর্মের প্রধান দুই উৎসবের মধ্যে দ্বিতীয়টি হল ঈদ-উল-আয্হা, যার অর্থ ‘ত্যাগের উৎসব’। আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলা হয় ‘কোরবানির ঈদ’। ইব্রাহিমের বলিদানকে স্মরণ করে এই দিন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ঈশ্বরের কাছে পশু উৎসর্গ করেন।

‘আদিপুস্তক’ যাঁদেরকে উহ্য রেখেছিল, কোরান তাঁকে ‘অন্য পরিচিতি’ দিয়ে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আধুনিক আখ্যানে তাঁরা ‘আদিপুস্তক’-এর চরিত্র রূপেই গ্রহণযোগ্য, সম্মানিত।

‘হবা’ গল্পে রয়েছে পৃথিবীর আদি মানবী ইভের প্রসঙ্গ। ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর ‘Book of Genesis’-এর শুরুর তিনটি অধ্যায় জুড়ে পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী আদম-ইভের কথা রয়েছে। আদিপুস্তক-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইভের জন্মবৃত্তান্তের বর্ণনা রয়েছে:

And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh in- stead thereof; and the rib, which the Lord God had taken from man, made him a woman, and brought her unto the man. And Adam said, this is now, bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man. Therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.^{৭৩}

আদমের বাঁ পাঁজরের হাড় থেকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন ইভকে। এই একই পুরাণকথা ইসলাম ধর্মের গ্রন্থগুলিতেও পাওয়া যায়। আদম এবং ইভ মহানন্দে স্বর্গে দিনাতিপাত করতেন। ঈশ্বর তাঁদের জ্ঞানবৃক্ষ নামক এক গাছের ফল খেতে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় ইভ প্রলুব্ধ হয়ে আদমকে সে ফল খেতে প্ররোচিত করলেন। শয়তান এসেছিল সাপের ভেক ধরে। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার কারণে ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হলেন এবং সাপকে অভিশাপ দিলেন, সেইসঙ্গে আদম-ইভকে তার স্বর্গ থেকে বহিস্কার করলেন। আদিপুস্তক-এর তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে:

And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life: And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.

Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life; Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field; In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return. And Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living. Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins, and clothed them. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever: Therefore, the Lord God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken. So, he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.^{৭৪}

‘হবা’ গল্পের সুনেত্র একজন আর্টিস্ট। সে আদিম জীবনের বলিষ্ঠতাকে তার হাতের তুলিতে নির্মাণ করতে চায়। মানুষের সফিস্টিকেশন, ছলতা ও সারল্যহীনতা তার অপছন্দ। অন্যদিকে সুনেত্রের স্ত্রী অরুন্ধতী আধুনিক ‘ফ্যাশন’ জগতের নারীদের মতোই নিজের শরীরের গঠন সম্পর্কে ভীষণ সচেতন। আধুনিক সমাজের ভাবনায় নারীর যে শারীরিক গঠন বা ‘ফিগার’কে শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত করা হয়, তেমনই শরীরের প্রত্যাশী অরুন্ধতী। এমনকি স্বামীর সঙ্গে শারীরিক মিলনেও অরুন্ধতীর আপত্তি, কার্যত শারীরিক গঠনের বিভঙ্গ নষ্ট হবার ভয়ে। অরুন্ধতী নিজের শরীরী ইমেজ নিয়ে এতটাই মুগ্ধ, সন্তানকে বুকের দুধ পান করানো, যৌনতা নিয়ে সামাজিক সংস্কার, স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক— এসবই তার কাছে ‘স্লিম ফিগার’ নষ্টের কারণ বলে ঠাহর হয়। অরুন্ধতী ও তার বোন অনসূয়ার শারীরিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা, পুরুষের শরীর সন্ধানে বিরূপতা,

নিজের শরীর নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত অবসেশন— আর্টিস্ট সুনেত্রকে অবাক করে। আদি
পৃথিবীর মানব-মানবীর প্রতি তীব্র একটা আসক্তি অনুভব করে সুনেত্র:

আজ থেকে হাজার হাজার বছর পেছনে তুমি আমাকে ঠেলে দিয়েছ, আমি তোমাদের
সভ্যতা চিনতে পারি না হয়তো তোমরাই ঠিক। অতীতের মায়ায় মজে থাকা ঠিক নয়
তবু এইটুকু কেবল আমার সামনের নাতনীটিকে বলব যে তার স্লিম-ফিগারের দিকে
আমার কোনো আর্টিস্টিক অ্যাট্রাকশন নেই। না। একদম না। কোনো দুখে আর্দ্র করুণ
নারীই আমার সন্তানের জননী হবে। সেই স্বপ্ন আদিম, সেই একটা স্মৃতি দিয়েই আমি
আমার মাকে দেখতে পাই। আর এদিকে তলোয়ারের মতন তীক্ষ্ণ দেহ আমাকে কাটে।
আমার সন্তানকেও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করবে। আমি আমার সন্তান ও আমার মাঝখানে
কোনো ধারালো তরবারি শুইয়ে রাখতে চাই না। একজন আধুনিকারও যৌন-সংস্কার
কিন্তু খুব কুৎসিত হয়। সন্তানকে একলা করে। স্বামীকে পর করে। তারপর সেই স্ত্রী
নিজেও একা হয়। আত্মরতির পূজা করে। ছিঃ!^{৭৫}

সুনেত্র তার সময়কে, তার সময়ের মানুষকে সে মিথ্যেক্যাল চিরন্তনত্ব দিতে চায়।
আদি স্বপ্নের স্রোত বয়ে যায় তার কারুকীর্তির আনাচে-কানাচে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে
যে আদিমতাকে মানুষ লালন করে চলেছে, শত বিবর্তনের পরেও মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষে
যে স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে। সেই স্বপ্নকেই ধরে রাখতে চেয়েছে সুনেত্র। দাম্পত্যে বনিবনার
অভাব, জগৎ ও জীবনকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাৎ এসব নিয়ে সুনেত্র যখন তীব্র
দোটানায় পড়ে, তখনই সে আবিষ্কার করে ধূলিগ্রামের ঈভকে। যার অন্য নাম হবা। এক
খেতমজুরের কন্যা হবা। ঈভ ইসলামি পুরাণে হাওয়া বিবি নামে পরিচিত। গল্পের হবা
বিবিকে লেখক আদি মানবী ঈভ বা হওয়া বিবির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। হবা বিবির
সুপুষ্টি শরীর ও রূপকে সুনেত্র তার তুলির আঁচড়ে অনন্ত কার্পেটের মতো প্রসারিত করতে
চায়। এইভাবে ‘ঈভের দেহ থরথর করে রেখায় রেখায় চুরমার হয়ে অজস্র তরঙ্গ তৈরি
করে শিল্পীর স্মৃতিতে আন্দোলন তোলে।’

ঈভের ছবি দেখে অরুন্ধতীর প্রবল ঈর্ষা হয়। স্বামী পরিত্যক্তা রমণী অরুন্ধতী স্বামীর সঙ্গে যৌনতায় মেতে উঠতে চায়। তার ঈভের ছবি তার মধ্যে হীনমন্যতার জন্ম দেয়। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অরুন্ধতী ঈভের ছবি পুড়িয়ে দেয় এবং নিজের গায়েও আগুন ধরিয়ে দেয়। আধুনিকতার বাতাসে পুড়তে থাকে সুনেত্রর আদিমতা-আধুনিকা, স্মৃতি ও বাস্তব। এদিকে সুনেত্র হবার খোঁজ করলে জানতে পারে তার স্বামী ত্যাগ করেছে তাই সে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। শেষমেশ সুনেত্র অরুন্ধতীর জন্য কাঁদতে থাকে। এখানেই গল্প শেষ হয়।

পুরাণের ঈশ্বর আদমের শরীর থেকে ঈভকে সৃষ্টি করেছিলেন। আর গল্পের সুনেত্র তার মানস প্রতিমা নারী ঈভকে হাতের তুলিতে নির্মাণ করেছিল। আধুনিকতার উপত্যকায় দাঁড়িয়ে অরুন্ধতীও স্বামীর মানস প্রতিমা হয়ে উঠতে পারেনি। পুরাণের গল্পের মতোই যেন দৈব আদেশ বা নিয়তির খেলায় সুনেত্র হেরে যায়। নারী বিচ্ছিন্ন জীবন শুরু হয় তার। ঈশ্বরের থেকে অভিশাপগ্রস্ত হবার পর আদম ঈভের দেহ হয়েছিল নিরাবরণ, গল্পের দারিদ্র্যপীড়িত ঈভের অর্ধনগ্ন চিত্র মুসলিম সমাজের বিবাহ-বিচ্ছিন্না নারীর অবহেলিত সত্তারই যেন প্রতিমূর্তি। আদমের সার্থকতম নারী মিলনের নিমিত্তেই জন্ম হয়েছিল ঈভের। গল্পের শেষ বাক্যে সুনেত্রর ‘সার্থকতম নারী মিলনের’ আকাঙ্ক্ষা পিতৃতান্ত্রিকতা ও নারীকে ভোগ্যবস্তুর আধার হিসাবে বিবেচনা করে যে সমাজ— তার মুখ ও মুখোশের দ্বন্দ্বকে প্রকট করে তুলেছে। অরুন্ধতীর প্রতি সুনেত্রর মোহমুগ্ধকর দৌরাভ্যের নেপথ্যে জমে আছে ক্লাসিক্যাল মিথ-পুরাণের নারী-পুরুষের সম্পর্কের সমীকরণ। যা সমকালীন সমাজ ও মানসিকতার কাঠামোটি স্পষ্ট করে দেয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৫
২. ‘আব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের আহ্বান’, *পবিত্র বাইবেল* (আদিপুস্তক, পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ১৩
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
৬. Goldstein, David; *Jewish Legends*, Chancellor Press, First Edition 1996, page- 49
৭. বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৯
৮. ‘শমুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক’, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ৪০৫
৯. বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ২৯-৩০
১০. ‘শমুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক’, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ৩৮৯
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৮-৩৭১
১২. বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ৪২
১৩. *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (২৮ সংখ্যক সুরা ক্বাসাস, আয়াত সংখ্যা ৩-১৩), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২১৮

১৪. বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ৪৪

১৫. ‘আব্রাহামের বিদেশ যাত্রা’, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ২২-২৩

১৬. সরকার, পার্থ; (সম্পাদিত) *কারুবাসনা*, প্রথম বছর, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৭, পৃ. ৪৫

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

১৮. ‘হাগার ও ইস্রায়েলের বিদায়’, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ২৩

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

২০. দাশ, জীবনানন্দ; ‘পিরামিড’, *ঝরাপালক*, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, (সম্পাদনা) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৫, পৃ. ৪৯

২১. গনী, ড. ওসমান; *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ*, (৩৭-নং সূরা-আফফাত, আয়াত- ৯৯-১১১), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২৪৯

২২. বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ৪৮

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

২৫. Goldstein, David; *Jewish Legends*, Chancellor Press, First Edition 1996, page- 57

২৬. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zamzam_Well, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ২৭.১২.২০২১, সময়: ১: ৩২ am

২৭. https://en.wikipedia.org/wiki/Safa_and_Marwa, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ২৮.১২.২০২১, সময়: ১৫৫ am

(কোরানের ১৪-নং সূরা ইব্রাহিম ও ৩৭-নং সূরা সাফফাত্- এ ইব্রাহিম এবং হাজেরা বিবির কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে।) দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

২৮. *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (২ সংখ্যক সূরা বাকারাহ, আয়াত সংখ্যা ১৫৮), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২৯

২৯. ‘শলোমনের সুবিচার’, ‘আদিপুস্তক’, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ৪৩৪-৪৩৫

(কথাকার ইহুদি পুরাণের কাহিনিকেই এখানে সংযুক্ত করেছেন সারিন ও দিব্যার গল্পে। আদিপুস্তকে-র কাহিনিতে রয়েছে, একদিন দু'জন গণিকা শলোমনের দরবারে এসে উপস্থিত হয়। তাদের প্রথমজন বলে, তারা দুজন একই ঘরে থাকে এবং তাদের দুজনের একটি করে পুত্র সন্তান রয়েছে। দ্বিতীয়জন ঘুমের ঘোরে তার ছেলের উপর গড়িয়ে পড়ে এবং তার ছেলে মারা যায়। সেই রাতে দ্বিতীয়জন প্রথমজনের ছেলেকে চুরি করে এবং মরা ছেলেটিকে প্রথমজনের পাশে শুইয়ে দেয়। এরপর শুরু হয় সন্তানের অধিকার নিয়ে দুজনের ঝগড়া। সব শোনার পর সম্রাট শলোমন হুকুম দেন, সন্তানটিকে তরবারি দ্বারা কেটে দু-টুকরো করা হোক এবং দুজনকে ভাগাভাগি করে দেওয়া হোক। একথা দ্বিতীয়জন শুনে রাজি হলেও প্রথমজন কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং সন্তানটিকে দ্বিতীয়জনকে নিতে বলে। এরপর শলোমন সন্তানকে দু-টুকরো করতে নিষেধ করেন এবং সন্তানটিকে প্রথমজনের হাতে তুলে দেন। উপন্যাসের গল্পে প্রথমজন হল সারিন, দ্বিতীয়জন দিব্যা।)

৩০. বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ৮৩

৩১. ‘শলোমনের অবাধ্যতা ও তার ফল’, ‘আদিপুস্তক’, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ৪৪৮-৪৪৯

৩২. ‘শলোমনের রাজ্যভিষেক’, ‘আদিপুস্তক’, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ৪২৯-৪৩০

৩৩. বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ৯১

৩৪. ‘মন্দির নির্মাণ’, ‘আদিপুস্তক’, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ৪২৯-৪৩০

৩৫. বাশার, আবুল; ‘প্রারম্ভের গোড়ার কথা’, *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৫

৩৬. ‘সর্বপ্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মদী (সাঃ)’, *সহীহ কাসাসুল আফিয়া*, হোসাইনিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৯

৩৭. ইহুদি পুরাণে আব্রাহামের পুত্র ইসহাক, ইসহাকের পুত্র যাকোব, যাকোবের পুত্র ছিলেন যোশেফ। যোশেফকে যাকোবের অন্যান্য পুত্ররা ঈর্ষা করত। মেঘ চরাতে গিয়ে যোশেফকে কূপের মধ্যে ফেলে তাকে মারতে চেয়েছিল ভাইয়েরা। অথচ কূপে পড়ে গিয়েও যোশেফ মরেননি। সেইসময় কূপের পাশ দিয়ে একদল ইস্রায়েলীয় বণিক যাচ্ছিলেন। তারা যোশেফকে কূপ থেকে উদ্ধার করে মিশরে নিয়ে যান। মিশরে এনে বণিকেরা যোশেফকে ফারাও-এর কাছে বিক্রি করে দেয়। পরে ফারাও-এর স্ত্রী যোশেফের প্রতি অনুরক্ত হন। এই নারীর কথা আদিপুস্তক বেশি লেখেনি। আদিপুস্তক থেকে তিনি একরকম নির্বাসিতা। ইহুদি পুরাণে যোশেফের জীবনের আদ্যোপান্ত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

৩৮. ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর ‘যাত্রাপুস্তক’-এ মুশার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। মোশি বা মুশা মিশরে থাকাকালীন যুবক বয়সে এক মিশরী লোককে খুন করে বালির মধ্যে পুঁতে রেখেছিলেন। এরপর বিষয়টি চারিদিকে জানাজানি হলে ফারাও-এর ভয়ে মোশি মিদয়ন দেশে পালিয়ে যান। মুশা না বাঁচলে আদিপুস্তক লেখা হত না। উপন্যাসে সেই কথাই বলতে চেয়েছেন লেখক।

৩৯. ‘ঈশ্বরের সঙ্গে যাকোবের মল্লযুদ্ধ’, ‘আদিপুস্তক’, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ৪২-৪৩

৪০. বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৩৯

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১

৪৫. ‘শলোমনের অবাধ্যতা ও তার ফল’, আদিপুস্তক, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ৪৪৮-৪৪৯

৪৬. বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৬২

৪৭. ইসলামি পুরাণে উটের নবি ছিলেন সালেহ। সামুদ জাতির লোকেরা নবি সালেহের বাণী বিশ্বাস করত না। এমনকি তারা সালেহকে আল্লাহ্র নবি বলে স্বীকার করেনি। নবি সালেহ তখন আল্লাহ্র সাহায্যে সামুদ জাতির লোকদের তাঁর মোজেজা (অলৌকিক ক্ষমতা) দেখিয়েছিলেন। তিনি পাহাড় থেকে একটি উট নির্গত করেন এবং উটটি একটি বাচ্চা প্রসব করে। এই ঘটনা দেখে অনেকেই তাঁকে নবি বলে স্বীকার করলেও অধিকাংশ মানুষ নবি সালেহের কথা বিশ্বাস করেনি। যারা বিশ্বাস করল না, তাদের কয়েকজন একদিন গোপনে উটটিকে হত্যা করে। এরফলে আল্লাহ্র আদেশে ফেরেশতা জিবরাইল সামুদ জাতিকে ধ্বংস করে দেন। নবি সালেহকে বলা হয় উটের নবি এবং পাহাড় ফেটে বেরিয়ে আসা উটকে বলা হয় আল্লাহ্র উট। এই ঘটনার বর্ণনা বিস্তারিতভাবে কোরানে রয়েছে। যেমন- ৭-নম্বর সূরা আরাফ(৭৩-৭৯ আয়াত), ১১-নম্বর সূরা হুদ(৬১-৬৯ আয়াত), ১৫-নম্বর সূরা আল হিজর(৮০-৮৪ আয়াত), ২৬-নম্বর সূরা শোয়ারা (১৪১-১৫৮ আয়াত), ৫৪-নম্বর সূরা রুমার (২৩-৩১ আয়াত), ৮৮-নম্বর সূরা গাশিয়াহ্ (৬-১৩ আয়াত), ৯১-নম্বর সূরা শামস্ (১১-১৫ আয়াত)। এছাড়া মুসলমানদের বুখারী, তিরমিজি, মুসলিম ইত্যাদি হাদীসেও এই ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণিত হয়েছে।

উট নিয়ে ইসলামি লোকায়ত মিথ হল, নবি সালেহ মারা গেলে তাঁর কবর দেয়নি কেউ। মারা যাবার পর তাঁর মৃতদেহ লোকেরা উটের পিঠে চাপিয়ে দিয়েছিল। উট মৃত নবিকে নিয়ে পাহাড়ের কোলে উঠে যায়। তিনদিন ওই উটকে কেউ দেখতে পায় না। তিনদিন পর উট ফিরে এলে দেখা যায় তার পিঠে মৃতদেহ নেই। উটের পিঠে একটি কুঁজ উঠেছে। মৃতদেহ কুঁজের মধ্যে রয়েছে। এই কুঁজই হল নবি সালেহের সমাধি। লোকায়ত এই মিথের ঘটনায় ঔপন্যাসিক উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। ইসলামি শরিয়ত কিংবা শাস্ত্র এই ঘটনাকে মান্য করে না। কেবলমাত্র কোরানের ঘটনাকেই মান্যতা দেয়।

৪৮. ‘শলোমনের দ্বিতীয়বার দিব্যদর্শনলাভ’, আদিপুস্তক, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ৫৬১-৫৬২

৪৯. বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৭০

৫০. Goldstein, David; ‘Solomon's Death’, *Jewish Legends*, Chancellor Press, First Edition 1996, page- 126-128

৫১. *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (৩৪ সংখ্যক সুরা- সাবা, আয়াত সংখ্যা ১৪), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২৪০-২৪১

৫২. কোরানে জ্বিন-জাতিদের নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কোরানের ৭২-নং সুরার নামই জ্বিন। দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (২০ সংখ্যক সুরা- তোহা, আয়াত সংখ্যা ৪৭), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

৫৩. বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৭৭

৫৪. ‘আব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের আহ্বান’, *পবিত্র বাইবেল* (আদিপুস্তক, পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ১৩

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৫৮. ‘আব্রাহামের বিদেশ যাত্রা’, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ২২-২৩

৫৯. সরকার, পার্থ; (সম্পাদিত) *কারুণ্যসনা*, প্রথম বছর, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৭, পৃ. ৪৫

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৬১. ‘হাগার ও ইস্রায়েলের বিদায়’, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ২৩

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৬৩. দাশ, জীবনানন্দ; ‘পিরামিড’, *ঝরাপালক, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র*, (সম্পাদনা) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৫ পৃ. ৪৯

৬৪. *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (৩৭ সংখ্যক সূরা- আফফাত, আয়াত সংখ্যা ৯৯-১১১), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২৪৯

৬৫. বাশার, আবুল; ‘উৎসর্গ’, *আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১০২

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২-১১৩

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

৬৯. Goldstein, David; *Jewish Legends*, Chancellor Press, First Edition 1996, page- 57

৭০. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zamzam_Well তথ্য গ্রহণের তারিখ: ২৭.১২.২০২১, সময়: ৩: ৫৬ am

৭১. <https://zamzam.com/blog/safa-and-marwa> তথ্য গ্রহণের তারিখ:

২৮.১২.২০২১, সময়: ৪: ২০ am (কোরানের ১৪ সংখ্যক সূরা ইব্রাহিম ও ৩৭ সংখ্যক সূরা সাফফাত- এ ইব্রাহিম এবং হাজেরা বিবির কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে।) দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

৭২. দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (২ সংখ্যক সূরা- বাকারাহ্, আয়াত সংখ্যা ১৫৮), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২৯

৭৩. *The Holy Bible* (Old and New Testaments), ‘Book of Genesis’, Chapter- 3, The church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City, Utah, USA, 2013, P. 3-4

৭৪. *The Holy Bible* (Old and New Testaments), 'Book of Genesis', Chapter- 3, The church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City, Utah, USA, 2013, P. 4-5

৭৫. বাশার, আবুল, 'হবা', *আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৫০-৫১

পঞ্চম অধ্যায়

আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে নবমিথ নির্মাণ

আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে নবমিথ নির্মাণ

ইতিহাস ও মিথ-পুরাণের মধ্যকার দ্বন্দ্বিকতা যেমন বিরুদ্ধ স্বর তৈরি করে, আবার দুইয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টিও বেশ মজাদার। পৃথিবীর একাধিক ধর্মের ঈশ্বর, দেবতা, উপদেবতা বা অতিপ্রাকৃত মানুষের বৃত্তান্ত এসবের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তির ঘোর বিরোধ। মিথ-পুরাণের পেছনে কী বিশ্ববিশ্কা কাজ করে— তা নিয়ে তর্কের শেষ নেই। বস্তু ইতিহাস যখন মিথকে কল্প-ইতিহাস ব'লে বাতিল করে তখন মিথের সত্যতা ও প্রতিষ্ঠার দাবি সংশয়ের মুখে পড়ে। শুরু হয় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির লড়াই, ধর্মযুদ্ধ, আস্তিক-নাস্তিক তর্ক।

একজন সাহিত্যিক যখন মিথ-পুরাণকে আশ্রয় করে সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি সেই আদিম পুরাকথার সঙ্গে যুক্ত করেন সমকালীন জীবনজিজ্ঞাসার বিষয়টি। দেশকালের পটভূমিতে মানুষের 'Creative fantasy'-ই একটি মিথকে ভেঙে আর একটি মিথকে গড়ে। আর মিথ-পুরাণের এই ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়েই অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে গড়িয়ে চলে মানুষের গল্পের প্রবাহ। যেহেতু আর্কেটাইপগুলি সর্বকালের ও সর্বদেশের সমস্ত মানুষেরই সাধারণ সম্পদ, তাই মিথের মধ্যে একটা কিছু রয়েছে যা, যা একই বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে বহু ফুল ফোটে, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।^১ তাই মিথ শুধু মানুষের 'মজ্জায় মিশে থাকা পিতামহদের কাহিনি'ই নয়, মিথ একইসঙ্গে মানুষের বর্তমান আর ভবিষ্যতের কাহিনি।^২ মিথ-পুরাণ আদিম মানুষের ফসল হলেও তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আবহমান কাল ধরে পৃথিবীর মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তার কায়া ও জীবাশ্ম। 'ইতিহাসের বাস্তবতা

কিংবা মনস্তাত্ত্বিক অন্বেষণে যে উপাদানই হোক না কেন ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে যে মিথকাহিনি মানুষের মনের মধ্যে সমাহৃত থাকে তার অবস্থান ত্রি-মাত্রিক। তা হল—অন্তর্লীন প্রেক্ষিত, মূল উপজীব্য এবং বহির্বিব্যাখ্য। মিথের অন্তর্লীন প্রেক্ষিতটি হল ‘শিকড়’, মিথের কাহিনিটি হচ্ছে ‘ঐতিহ্য’ আর তার বহির্বিব্যাখ্যস’টি হল আধুনিক রূপান্তর। অর্থাৎ মিথের প্রত্নপ্রতিমার অবস্থান স্তর হল Context, তার ওপর গড়ে ওঠা কাহিনির অবস্থান স্তর হল Text (উপজীব্য); আর সেই কাহিনিকে ভেঙে গড়ে নতুন কাহিনি যখন সৃষ্টি করা হয়, তখন সেটি হল Texture (বিব্যাখ্য) স্তরের অন্তর্ভুক্ত।^৭ ‘রঁলা বার্তের ব্যাখ্যা অনুযায়ী Context, Text ও Texture-কে যথাক্রমে Signifier, Signified এবং Sign বলা হয়েছে।^৮ কারণ মিথ-পুরাণের গভীরে রয়েছে ক্ষমতার রাজনীতি (Power politics)। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের পৌরাণিক ঘটনা বা কাহিনির মূলেই আছে দেব-দানব ভাবনা এবং শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব, স্বরের প্রতিস্বর।

ভারতীয় পুরাণ (বিশেষত হিন্দু পুরাণ) নিয়ে বাংলা ভাষায় অজস্র সাহিত্য সৃষ্টি হলেও বিদেশি পুরাণ, বিশেষত ইহুদি ও ইসলামি পুরাণ নিয়ে বাংলা রচনা খুব বেশি নেই। একালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কথাকার আবুল বাশার ইহুদি ও ইসলামি পুরাণের কাহিনি নিয়ে বেশকিছু গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। কেবল পুরাণের গল্পকেই লেখক অনুসরণ করেননি, নিজস্ব মৌলিকতার ছাপ রয়েছে তাঁর কথাসাহিত্যে। যেমন- তাঁর *মরুস্বর্গ* উপন্যাসে আছে একইসঙ্গে ইতিহাস ও মিথের ব্যবহার। খ্রিস্ট জন্মের হাজার বছর আগের প্রাচীন পৃথিবীর প্রাচীন নগর সভ্যতার বিলুপ্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয় *মরুস্বর্গ*। ইসলামিক পুরাণে বর্ণিত, শাদ্দাদ বিন আদ নামের রাজা তৎকালীন নগর সভ্যতার নির্মাণ ও ভাস্করের বাস্তব সৌন্দর্য দেখে মর্ত্যে স্বর্গ গড়েছিল। পুরাণে শাদ্দাদ নিন্দিত। কেননা সে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে স্বর্গ নির্মাণ করেছিল। আর তার ফলে যমদূত আজরাইল ঈশ্বরের আদেশে

শাদ্দাদের প্রাণ হরণ করেছিল। নির্মিত স্বর্গ দেখার সৌভাগ্য হয়নি শাদ্দাদের। আধুনিক ঔপন্যাসিক আবুল বাশার পুরাণে অভিশপ্ত, নিন্দিত সেই চরিত্রের কাহিনি এবং ইতিহাসকে ও সেই অতীত বিশ্বকে বিনির্মাণ করছেন আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে।

আরব মরুভূমির বুকে একাধিক ধর্মের উদ্ভব এবং ঈশ্বর পূজার একাধিক মতভেদের মধ্যকার সংঘর্ষ ও যাযাবর- কৃষক গোষ্ঠীর সংকট— এই ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পরিবেশকে সামনে রেখে লেখক স্বপ্ন সম্ভাবনাময় মানবিকতা ও মানবপ্রেমের জয়গান করতে চেয়েছেন সাদইদ নামক একজন সৈনিকের মধ্যে দিয়ে। সাদইদ এ উপন্যাসের নায়ক। ধর্মগ্রন্থে সাদইদ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, অতএব নিন্দিত। আর উপন্যাসের সাদইদ বিভেদ ও সংঘর্ষময় পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে মানবতার বন্ধন রচনা করতে বদ্ধপরিকর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পৌরাণিক কাহিনি ও মিথ ভেঙে আবুল বাশার মরুভূমির অতীত বিশ্বের ইতিহাস ও মিথকে পাঠককে অন্য চোখে দেখতে প্রণোদিত করেছেন। লেখক ইতিহাস ও পুরাণের কাহিনি নিয়ে আখ্যান নির্মাণ করলেও সেই কাহিনির গভীরে আজকের মতোই মানুষের জাতধর্মের লড়াই, ঈশ্বর পূজার তারতম্য, মানুষের বিশ্বাস ও দ্বন্দ্বের অবয়ব আছে।

রাজাবলি উপন্যাসে আছে মরুদেশ কেনানের সারগন বা রাজা শলোমনের বৃত্তান্ত। ইতিহাসের শলোমন ছিলেন ইহুদিদের রাজা। আবার অন্যদিকে এই শলোমনই ইহুদি ও ইসলামি পুরাণে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বা নবি (Prophet) হিসাবে মান্য। উল্লেখিত দুই ধর্মের ধর্মীয় পুরাণে শলোমনের কিছু অলৌকিক ক্ষমতার (মোজেজা) বর্ণনা আছে। যেমন- পাখিদের ভাষা বোঝার ক্ষমতা এবং জ্বিন জাতিকে শাসন করার ক্ষমতা।

কথাকার আবুল বাশার তাঁর *রাজাবলি* নামক আধুনিক আখ্যানে রাজা শলোমন এবং নবি শলোমনের দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্বকে বিবৃত করেছেন। *রাজাবলি*-র পরতে-পরতে দিব্যতন্ত্র আর রাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বের বীজ। রাজসত্তা এবং নবি সত্তার দ্বন্দ্ব শলোমনের পক্ষে হৃদয় বিদারক হয়েছে। যদিও এই হৃদয়কে দিব্য বলে হোক বা মনুষ্য চেতনা থেকেই হোক আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন শলোমন। শলোমনের জীবনের ঘটনাবলী ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’ এবং লোকায়ত পুরাণ নির্ভর হলেও উপন্যাসের প্রতিটিই চরিত্রই উঠে এসেছে রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে। পুরাণে শলোমনের দ্বৈতসত্তা গৃহীত হলেও ইতিহাসে তিনি শুধুই রাজা। কেননা শলোমনের হাতের অঙ্গুলি কখনও দিব্যাস্ত্র ছিল না, তা ছিল লোহার তৈরি। কারণ তাঁর যুগেই লোহা আবিষ্কার করেছে মানুষ। যাঁরা মরুভূমিতে প্রথম লোহা বানায় তারা ‘আদিপুস্তক’-এর অতি গৌণ চরিত্র কিন্তু ইতিহাসের চোখে তারা সম্মানিত। লোহার আবিষ্কর্তা এবং ঘোড়ার প্রথম ব্যবহারকারী হিটাইট জাতির সঙ্গে শলোমনের পূর্বপুরুষদের সংসর্গ অতি প্রাচীন।

প্রাচীন পুরাণে এবং ইতিহাসে উপেক্ষিত চরিত্রদের আবুল বাশার তাঁর উপন্যাসে ঠাঁই দিয়েছেন। ইতিহাস ও পুরাণের চরিত্রদের সঙ্গে লেখকের কল্পজাত চরিত্র এবং মৌখিক পুরাণ মিশে গিয়ে *রাজাবলি* হয়ে উঠেছে প্রকৃতপক্ষে এপিক, যার গভীরে সমকালীন যুগযন্ত্রণার চাপে মানুষের বিচ্ছেদপ্রবণ মানসিকতা, ভাষা আর ধর্মের কারণে মানুষের ছিন্নমূল অবস্থা ও মানুষে মানুষে নিরন্তর দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রভৃতি সমস্যা জ্বলন্ত হয়ে আছে।

উনিশ শতকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১)-তে যেমন ভারতীয় পুরাণের রাম-রাবণ-ইন্দ্রজিতের গল্পকে ভেঙে অন্য চোখে দেখতে প্রণোদিত করেছিলেন। *রামায়ণ*-এর অংশ নিয়ে নির্মিত গল্পকথা মাইকেলের আধুনিক চিন্তন ও

তর্জনির ছটায় রাবণ হয়ে উঠেছিলেন ‘Grand fellow’ এবং ইন্দ্রজিৎ হয়ে উঠেছিলেন ‘Favorite’। তেমনি আবুল বাশারের মরুস্বর্গ উপন্যাসের পৌরাণিক চরিত্র সাদইদ লেখকের হাতে হয়ে উঠেছেন মহিমান্বিত।

ইহুদি ও ইসলামি পুরাণ, প্রাচীন পৃথিবীর লোককথা, কিংবদন্তি ও লোককল্পনার বিবিধ উপাদান নিয়ে ঔপন্যাসিক আবুল বাশার মরুস্বর্গ (১৯৯১) নামক আধুনিক আখ্যান নির্মাণ করেছেন। ইহুদি ও ইসলামি পুরাণ-মিশ্রিত এই আখ্যানের পটভূমি খ্রিস্টের জন্মের হাজার বছর আগের এক প্রাচীন পৃথিবী— প্রাচীন পৃথিবীর এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। যে ভূখণ্ডের একদিকে মরুভূমি, অন্যদিকে সমুদ্র তীরবর্তী শস্যশ্যামল ভূমিক্ষেত্র। আরব মরুভূমির বুকে তিনটি প্রধান ধর্মের জন্ম— মোজেসের ধর্ম, যীশুর ধর্ম ও হজরত মুহম্মদের ধর্ম। এই মরুভূমির বুক থেকে তিনটি প্রধান ধর্মগোষ্ঠীগুলি অর্ধবৃত্তাকার জমির কোলে আশ্রয় পেয়েছিল এবং সেখান থেকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। মরুস্বর্গ-এর আখ্যান পুরাণকথাকে আশ্রয় করে নির্মিত হলেও এ উপন্যাসে সাম্প্রতিক ইতিহাস ও ঘটনাবলীর প্রতিফলন ঘটেছে। ভাষা এবং ধর্ম— এই দুই জৈবনিক উপাদান কেবল প্রাচীন পৃথিবী নয়, আজকের পৃথিবীকেও গোত্রাসে গিলে খাচ্ছে, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্ম ও ভাষা সংকট এবং পরবর্তীকালে অখণ্ড রাষ্ট্র ভেঙে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ক্ষমতাশীল মানুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের লড়াই— সমকালীন বহু ঘটনাবলীকে স্পর্শ করেছে এ উপন্যাস।

ইসলামি পুরাণ অনুসারে, শাদ্দাদ বাদশাহ সেদিনের পৃথিবীতে স্বর্গ নির্মাণ করেছিল অহংকারের বশবর্তী হয়ে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ ক’রে। ইহুদি ও ইসলামি পুরাণে শাদ্দাতকে নিন্দা করা হয়েছে। পুরাণের গল্পে শাদ্দাদ ভিলেন। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী শাদ্দাদ স্বর্গ নির্মাণ ক’রে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছিল নিজেকে। পুরাণের ঈশ্বর শাদ্দাদের এই স্পর্ধিত স্বপ্নকে সহ্য করেননি। স্বর্গে প্রবেশ করার আগেই ঈশ্বরের আদেশে যমদূত আজরাইল

প্রাণ হরণ করে শাদ্দাদের। ইহুদি ও ইসলামি পুরাণের সেই অহংকারী বাদশাহকেই আবুল বাশার তাঁর উপন্যাসের নায়ক করে তুলেছেন। পুরাণের শাদ্দাদের বাদশাহ আখ্যানের সাদইদ। সে সেনাধিপতি, মানুষের রক্ষক। যে ‘হিতেনের ভাড়াটে সেনা’ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে বারবার। যে যুদ্ধ বিদীর্ণ মরুভূমির জন্ম-যাযাবর মানুষকে নিয়ে পাড়ি দিতে চেয়েছে শস্যশ্যামল ভূমিক্ষেত্রে। মানুষের জন্য গড়তে চেয়েছে মন্দির ও স্বর্গ। রোধ করতে চেয়েছিল কৃষি জীবন নির্ভর বহু দেবদেবীর ধর্মের মধ্যকার বিরোধ। প্রাচীন বাইবেল ও কোরানে যে মরু-যাযাবর ও কৃষিজীবী-গোষ্ঠীর ধর্ম ও জীবনগত দ্বন্দ্ব রয়েছে, উপন্যাসে সেই দ্বন্দ্বকেই মূর্তিহীন ঈশ্বর ও মূর্তিমান ঈশ্বরের দ্বন্দ্ব রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মরুভূমির তিন ধর্মের এই কল্পনা ও বিশ্বাসের লড়াই-যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে এক নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিল সাদইদ।

ইসলামি পুরাণের আকরগ্রন্থ কোরান এবং হাদিসে শাদ্দাদের জীবনবৃত্তান্ত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। ইসলামি পুরাণের নীতিকথামূলক আখ্যান এবং মিথ হিসাবে এ কাহিনি *কাসাসুল আফিয়া* জাতীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। কাসাসুল বা কিসাস উল-আফিয়া হল— ইসলামি পুরাণে নবি এবং রসুল হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিদের জীবনের গল্পের একটি সংকলন যা তাফসির (কোরানের ব্যাখ্যা) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কাসাসুল শব্দের আরবি অর্থ হল গল্প এবং আফিয়া হল নবি শব্দের বহুবচন। যার অর্থ নবিগণ। এই গ্রন্থে হজরত হুদ নবি এবং আদ জাতির বর্ণনা প্রসঙ্গে শাদ্দাদের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। কোরান শরীফে হুদ এবং আদ জাতিকে নিয়ে বিস্তারিত কথাবার্তা থাকলেও শাদ্দাদ এবং তার নির্মিত বেহেশতের উল্লেখ নেই। তবে স্পষ্টভাবে কোরানে শাদ্দাদের বেহেশতের কথা উল্লেখিত না হলেও আদ জাতির গল্পের অন্তরেই নিহিত রয়েছে শাদ্দাদের বৃত্তান্ত। কোরানের ২৬-সংখ্যক সুরা শোয়ারা ১২৮-১২৯ ও ১৩৯ সংখ্যক আয়াতে রয়েছে:

তোমরা তো অযথা প্রতিটি উচ্চস্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করেছ। তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করেছ
এই ভেবে যে তোমরা চিরস্থায়ী হবে।... অতঃপর ওরা তাঁকে (হুদ) প্রত্যাখ্যান করল
এবং আমি (আল্লাহ) ওদের ধ্বংস করলাম।^৬

ইসলামি পুরাণ অনুসারে বাদশাহ শাদ্দাদ যে স্থানে তার বেহেশত নির্মাণ করেছিল,
মরুপ্রদেশের সেই স্থানটির নাম ছিল ইরাম নগরী। চলতি ভাষায় যাকে বলা হত মরুর
আটলান্টিস। *কোরান*-এ ইরাম নগরীর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। *কোরান*-এর ৮৯-
সংখ্যক সুরার ৬-৮ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে:

তুমি কি দেখনি তোমার আল্লাহ আদ জাতির ইরামে কী করেছিলেন? তাদের ছিল
সুউচ্চ সব প্রাসাদ, যেমনটি আগে কোনো দেশে নির্মিত হয়নি।^৭

ইবনে কাসিরের *আল বিদায়া* গ্রন্থ থেকেও জানা যায়, আদ জাতি প্রতাপশালী ও
ধনী ছিল, নির্মাণ করেছিল সুউচ্চ সব অটালিকা। তারা একসময় একেশ্বরবাদ বর্জন করে
এবং মূর্তিপূজা শুরু করে, যেমন সামদ, সামুদ এবং হারা ছিল তাদের তিন উপাস্য। হুদ
অনেক দিন তাদের মাঝে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, আল্লাহ্র পথে ডাকেন। কিন্তু তারা
না ফেরায় এক ঝড় তাদের ধ্বংস করে দেয়, আর সকাল বেলা জনশূন্য ইরাম পড়ে
থাকে।^৮ তবে শাদ্দাদের উপকথা এ নগরী ধ্বংসের আগের ঘটনা। বলা হয়, শাদ্দাদ আর
তার ভাই শাদ্দিদ পালা করে এক হাজার আদ গোত্রের ওপর রাজত্ব করত। পুরো আরব
আর ইরাকের রাজা ছিল শাদ্দাদ। এমনকি, কিছু আরবি লেখকের মতে, যে শাদ্দাদের
অভিযানের কারণে কানানের দেশান্তর হয়েছিল। শাদ্দাদের কাহিনি এবং ইরাম নগরীর
কথা *আরব্য রজনী*-র মধ্যেও সংকলিত হয়েছিল। *আরব্য রজনী* গ্রন্থের ২৭৭ থেকে ২৭৯-
তম রাতে বলা হয়। উপকথা অনুযায়ী, হুদ শাদ্দাদকে পরকালের বেহেশতের প্রতিশ্রুতি
দেন, কিন্তু শাদ্দাদ জানায় দুনিয়াতেই বানাবে সে নিজস্ব বেহেশত, পরকালের বেহেশতের
প্রতি তার কোনো বিশ্বাস ছিল না। এরপর ইয়েমেনের আদানের কাছে এক বিশাল

এলাকা জুড়ে শাদাদের বেহেশত নির্মাণ শুরু হয়। প্রাচীর দেয়ালগুলি ৭৫০ ফুট উঁচু ছিল, আর প্রস্থে ৩০ ফুট। চারদিকে চারটি ফটক। ভেতরে তিন লক্ষ প্রাসাদবাড়ির কথা বর্ণিত আছে, উপকথা অনুযায়ী যার নির্মাণ কাজ শেষ হয় ৫০০ বছরে। আল বায়যাওয়ি থেকে আমরা আব্দুল্লাহ ইবন কিলাবাহ এর বর্ণনা করা একটা ঘটনা জানা যায়, তিনি ইয়েমেনের আদানে এক আরবের দেখা পেয়েছিলেন, যিনি কিনা হাদ্রামুতের পশ্চিমে মরুভূমির গহীনে এক রহস্যময় শহরের দেখা পেয়েছিলেন, যা ইরাম নগরীর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। অন্য বর্ণনায় আব্দুল্লাহ নিজেই সেই শহরে যান। সেখান থেকে জহরতও নিয়ে আসেন। এ অভিযানের কথা তখনকার খলিফা মুয়াবিয়ার কানে পৌঁছায়। নিজের অভিযানের সত্যতা প্রমাণের জন্য তিনি খলিফাকে ইরামের কিছু মুক্তো দেখান, যেগুলি এখন হলুদ রূপধারণ করে হারিয়েছে তার সৌন্দর্য। খলিফা তখন সাহাবি কাব আল আহবারকে জিজ্ঞেস করেন এ শহরের কথা, তিনি তখন উপকথার কাহিনিগুলি বর্ণনা করেন।^৯ তবে কোরান বা নবি হজরত মুহম্মদের কোনো কথায় শাদাদের বেহেশতের কোনো কাহিনি পাওয়া যায় না, তাই এ ঘটনার কোনো হাদিসি দলিল নেই ইসলামি পুরাণে। ইসলামি পুরাণের (কাসাসুল আশ্বিয়া) গল্প অনুযায়ী, হুদ নবির কাছে ঈশ্বরের স্বর্গের বর্ণনা শুনেছিল বাদশাহ সাদইদ। কাসাসুল আশ্বিয়া গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী, হুদ নবির ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে শাদাদ বাদশাহ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে স্বর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। স্বয়ং ঈশ্বর নাকি নবি মুহম্মদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন:

হে মুহম্মদ! শাদাদ পৃথিবীতে এমন বেহেশত নির্মাণ করেছিল, দুনিয়ার কোনো বাদশাহ কোনোদিনই ঐরূপ প্রাসাদ বানাতে পারেনি। হে মুহম্মদ! তুমি তো দেখনি তোমার প্রতিপালক সে বিরাট বিরাট প্রাসাদ নির্মাণকারীদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছিলেন।^{১০}

শরিয়তি ইসলাম যদিও এমন কথাকে মান্যতা দেয় না। আদ জাতি এবং তৎকালীন নানান উচ্চ অটালিকা ও প্রাসাদ ধ্বংসের কথা কোরান-এর বহু জায়গায় স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হলেও বিশেষভাবে শাদাদের বেহেশতের কথা কোথাও নেই। পরবর্তীকালে এ ঘটনা সংযোজিত হয়েছে কাসাসুল আফিয়া জাতীয় গ্রন্থাবলীতে। এই গ্রন্থেও শাদাদের পরিণতির সঙ্গে কোরান-এর প্রাসাদ ধ্বংসের ঘটনা মিলে যায় অনেকখানি। বহু স্বর্ণ, রৌপ্য এবং হীরা-জহরতসহ দেশ-বিদেশের বহু অতি উজ্জ্বল পাথর সহযোগে নির্মিত হয়েছিল শাদাদের বেহেশত। হুদ ঈশ্বরের বেহেশতের যেরূপ বর্ণনা দিয়েছিলেন শাদাদকে, শিল্পী-মিস্ত্রীসহ সমস্ত শ্রেণির কারিগরদের সেই মতো স্বর্ণ নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছিল শাদাদ। কথিত আছে, শাদাদের স্বর্ণ নির্মাণের জন্য প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বস্তা সোনা এবং রূপা নিঃশেষ হয়ে যেত। এভাবে টানা তিনশো বছরে তার নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। এরপর সমস্ত শিল্পীরা অনুরোধ করে বাদশাহ শাদাদের কাছে, হুজুর! আপনার বেহেশত নির্মাণ আমরা শেষ করেছি। শাদাদ শুনে খুব খুশি হয়ে সৈন্যদের আদেশ করে যে, এখন রাজ্যের সমস্ত সুন্দর বালক-বালিকাদের বেহেশতে এনে একত্রিত কর। আদেশ অনুসারে সৈন্যরা দেশের অসংখ্য সুন্দর বালক-বালিকাদের নিয়ে এল এবং তাদেরকে সুন্দর পোশাক পরিধান করে হু^{১১} ও গেলেমানদের^{১২} মতো সাজিয়ে বেহেশতের নানান জায়গায় মোতায়েন করল। এইভাবে শাদাদ তার বেহেশতকে ঈশ্বরের বেহেশতের অনুরূপ তৈরি করতে চাইল। স্বর্ণ নির্মাণ পুরোপুরি সম্পূর্ণ হওয়ার পর যখন শাদাদ তাবৎ সৈন্য-সামন্ত ও লোক-লস্কর নিয়ে স্বর্ণ দর্শন করতে এল তখন একজন অপরিচিত লোক বাদশাহ শাদাদের পথ অবরোধ করে দাঁড়াল। শাদাদ তাকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি উত্তর দিলেন— আমি মালাকুল মওত (অর্থাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা বা মৃত্যুর দূত)। স্বর্গে প্রবেশ করার আগেই ঈশ্বরের ইচ্ছায়

মৃত্যুর দূত আজরাইল শাদাদের প্রাণহরণ করেন। কত সাধের স্বর্গ শাদাদের অদেখায় রয়ে যায়।^{১৩}

পুরাণের বাদশাহ শাদাদের মতো উপন্যাসের সাদইদেরও তার নির্মিত স্বর্গ দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। বিভেদ ও সংঘর্ষময় পৃথিবীতে শান্তির আশ্রয় নির্মাণ করতে গিয়ে সাদইদ ট্রাজেডির অতলান্তে গভীরে তলিয়ে যায়। মৃত্যুর দূত আজরাইল ঈশ্বরের আদেশে কত শত কোটি প্রাণ হত্যা করেছেন। সে নির্দয় বলেই তাকে প্রাণ হরণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ঈশ্বর।^{১৪}

ইসলামি পুরাণে রয়েছে, একটি সাগরে একবার নৌকাডুবিতে সমস্ত যাত্রী মারা যায়, কেবল একজন গর্ভবতী নারী নৌকার একটা তকতায় ভাসতে ভাসতে একটা দ্বীপে আশ্রয় নেয়। কিছুক্ষণ পর সেই নির্জন দ্বীপে মহিলাটি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। সদ্যোজাত সন্তানকে দেখামাত্র মহিলাটি তার সমস্ত দুঃখ দুর্দশা ভুলে যায়। আর তখনই ঈশ্বর নির্দেশ দিলেন, মৃত্যুর দূত আজরাইলকে যে, ওই মহিলার প্রাণ হরণ করতে হবে। তখন মৃত্যুর দূত এ কথা ভেবে কেঁদেছিল যে, এখন এই দুঃখপোষ্য শিশুটির কী অবস্থা হবে? শিশুটি হয়তো না খেতে পেয়ে মারা যাবে অথবা কোনো হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলবে।

দ্বিতীয়বার মৃত্যুর দূত আজরাইল কেঁদেছিল শাদাদ বাদশাহর মৃত্যুর সময়। কেননা সে বহু বছর ধরে তৈরি করা তার সাধের স্বর্গ দেখতে পায়নি। ঈশ্বরকে বলেছিল, এত আশা আকাঙ্ক্ষা ও সাধ নিয়ে একজন রাজা স্বর্গ নির্মাণ করল অথচ নিজের চোখে দেখতে পেল না। ঈশ্বর তখন মৃত্যুর দূত আজরাইলকে জানিয়েছিলেন, ‘সেই দুঃখপোষ্য শিশুই বাদশাহ শাদাদ, যার মায়ের মৃত্যুর সময় তুমি কেঁদেছিলে আজরাইল।’

পুরাণের কাহিনি পড়লে কোথাও প্রশ্ন ওঠে, মৃত্যুর দূত আজরাইলের কান্না কোথাও যেন ঈশ্বরের আইন, বিচার বা ক্ষমতার প্রতিস্বর। ঈশ্বরের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা স্বর তৈরি করেছে। পুরাণের কাহিনি স্বাভাবিকভাবেই প্যারাবল্ জাতীয়। সেখানে নীতিকথাই বেশি। উপন্যাসের সাদইদ কোনো বাদশাহ নয়, সে সাধারণ সৈনিক। নিজেকে বারবার বলেছে ‘রাজা হিতেনের ভাড়াটে সেনা’। আখ্যানেও পুরাণের মতো সাদইদের জন্মের পরেই তার মা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। নিজের আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে সাদইদ রিবিবিকাকে জানিয়েছে:

ক্ষুধার্ত মেয়েকে বলাৎকার করা কাপুরুষতা। সমকামিতার চেয়ে নোংরা জিনিস। আমি যদি সারগন হতাম, আমার নাগরিক অনুশাসনে একথা লিখতাম। অবশ্য সারগনের মতো আমার জন্মমুহূর্তেই মা আমাকে ত্যাগ করেছিলেন। হয় আমি জারজ ছিলাম। কোনো সৈনিক আমার পিতা ছিলেন, যার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না— নতুবা মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। আমার মাকে তোমাদের ঈশ্বর হত্যা করেছিলেন। নইলে নবজাতক সাদইদ কেন ঝুড়িতে করে জলে ভেসে যাবে।

একজন ভিস্তি— ভিস্তি বোঝো তো! দ্রাক্ষাকুলের মালি। তিনি কে? তিনি এক ক্রীতদাস। বস্তুত তিনিই আমার পিতা— আসল বাপটি কে জানি নে। এইরকম দিশেহারা নিরাশ্রয় জন্ম আমার। সারগনের মতো। কিন্তু আমি সারগন নই।^{১৫}

ইসলামি পুরাণে নিন্দিত, এমনকি যাকে অহঙ্কারী-পাপী-নরকবাসী বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই চরিত্রকে আখ্যানে পুরোপুরি বিপরীতভাবে নির্মাণ করেছেন লেখক। উনিশ শতকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১)-তে যেমন ভারতীয় পুরাণের রাম-রাবণ-ইন্দ্রজিতের গল্পকে ভেঙে অন্য চোখে দেখতে প্রণোদিত করেছিলেন। *রামায়ণ*-এর ঘটনা নিয়ে নির্মিত গল্পকথা মাইকেলের আধুনিক চিন্তন ও তর্জনির ছটায় রাবণ হয়ে উঠেছিলেন ‘Grand fellow’ এবং ইন্দ্রজিৎ হয়ে উঠেছিলেন ‘Favorite’। *মরুস্বর্গ* উপন্যাসের সাদইদ চরিত্রটিও লেখকের নিজস্ব ভাবনায় পুরাণকথা ছাড়িয়ে পাঠকের প্রিয় উঠেছে। পুরাণে সাদইদের কোনো গুণের কথা নেই,

সে দোষযুক্ত পাপী। আর আখ্যানের সাদইদ এমন সৈনিক, জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে যে সর্বদা সজাগ, মানুষের প্রতি আস্থা ও পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা— এসবই যেন সাদইদ চরিত্রের মূল সত্তারই রূপান্তর। সৈনিক সমেরুকে বলা কথার মধ্যেই সেই রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়:

মনে রেখো সমেরু, একজন সৈনিক আমার কাছে আমার এই সাদা ঘোড়াটার মতোই দামী। অথথা কোনো প্রাণের বাজে খরচ পিতা নোহ পছন্দ করেন না। রাজা হিতেনের কাছে একশটি সুন্দরী দেবদাসীর মূল্য যেরকম, আমার কাছে ক্ষুদ্র একজন সৈন্য তারও চেয়ে শতগুণ মূল্যবান। আমি তোমাদের শপথ করে বলতে পারি, কখনও যদি একটি গ্রামও আমি অধিকার করি, তোমাদের মতো সৈনিকদের আমি সেখানে সংসার গড়বার ব্যবস্থা করব।^{১৬}

যুদ্ধবিধ্বস্ত মরুমর্ত্যের মানুষকে সুস্থ ও উন্নত জীবন দিতে চেয়েছে সাদইদ। সে স্বর্গ নির্মাণ করতে চেয়েছিল সেদিনের নগরগুলির নির্মাণ ও ভাস্কর্যের সৌন্দর্য দেখে— নগরগুলিই ছিল তার স্বর্গ-কল্পনার ভিত্তি। মরুভূমির বিচরণশীল মানুষ ভাষা আর ধর্মের কারণে বারবার নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এত বিচ্ছেদ ও ছিন্নতার মধ্যেও সাদইদ মানুষের জন্যে স্বর্গ গড়তে চেয়েছিল। আশ্রয়হীন মানুষকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল, বিভেদ ও সংঘর্ষময় পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এই ছিল তার স্বর্গ নির্মাণের অভিপ্রায়। কেবল সৈনিকদের জন্যে নয়, শিশুদের প্রতি সাদইদের স্বার্থহীন ও অকৃত্রিম স্নেহ ভারাক্রান্ত হৃদয় সৃজন করেছে এমন এক চারিত্রিক কাঠামো, যা পুরাণের গল্পের মূল কাঠামোকেই করে তুলেছে দ্বন্দ্বিকতায় ভরপুর। যুদ্ধে মৃত লাশের ভেতরে যখন হেরার শিশুপুত্রকে আবিষ্কার করে সাদইদ, তখন তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। শিশুর গলার লকেটের প্রতীকী সংকেত এবং চিরকুটে শিশুর আত্মপরিচয় জানার পর সাদইদের স্নেহশীল সত্তা জাগ্রত হয়েছে। ‘শিশুটিকে কোলে তুলে নেবার সময় সাদইদের বারবারই মনে হচ্ছিল আরও একটি শিশুর কথা। তার মা তাকে প্রসব করা মাত্রই আজরাইল মাকে

হত্যা করেন। সে ভেসে যেতে থাকে ঝুড়িতে। যে দ্বীপে তার জন্ম সেই দ্বীপ নাকি সমুদ্রের তলায় তারপর তলিয়ে যায়। কুফর দ্বীপে তার জন্ম— সে দ্বীপ আর নেই। তাকে তার ভিত্তি পিতা কাফেরের পুত্র বলে ডাকত। কুফর এক অভিশপ্ত দ্বীপ।^{১৭}

এই শিশু যেন সাদইদের প্রতিরূপ। শিশুর উপস্থিতি ও অস্তিত্বের সর্বস্ব জুড়ে সাদইদের অতীত ও শৈশবের স্মৃতি নিরবিচ্ছিন্ন রেখাচিত্র তৈরি করেছে। শিশুর অনাগত ভবিষ্যৎ, সাদইদের অতীতের রূঢ় বাস্তবতা, তার জীবনের উপলব্ধি ও ঈশ্বরের প্রতি অভিমান— সবমিলিয়ে সাদইদ যেন ভবিষ্যতের আয়নায় দেখে অনাথ-বেওয়ারিশ শিশুদের মুখ:

এই শিশুটি তারই মতো কাফের নিশ্চয়। কোনো স্বপ্নদর্শী এই শিশুকে দেখলে হয়তো বলতে পারতেন, এ বেচারি ঈশ্বর বিশ্বাস করবে না, আকাশের দেবতাদের অবজ্ঞা করবে, নবিদের করবে উপহাস। কেননা এর জন্ম আর শৈশব মৃতদেহ স্তূপে এসে ঠেকেছে, এতদূর হতভাগ্য শিশু কোথাওই তার আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না— বরং সে নিজেকেই ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে। সে তার নিজেরই মতো করে একটি একটি আকাশ, সূর্য, চন্দ্র এবং অজস্র তারকাগুঞ্জ আর পাহাড় বন নদী সৃষ্টি করে আপন মনে। তার কেবলই মনে হয় এই আকাশ, বন, নদী, সমুদ্র কোনো দেবতার সৃষ্টি নয়— এরা সূর্যের মতো আপনাতে আপনি পূর্ণ— এদের কোনো নির্মাতা নেই। মানুষও জন্মের পর নিজেকে বানায়— নিজেকে সে খাদ্য দেয়, বস্ত্র দেয়, গৃহ দেয়— সে নিজেই তবে জীব-দেবতা।^{১৮}

সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে একজন শিশুর বড়ো হয়ে ওঠার প্রস্তুতি-প্রক্রিয়া শুরু হয়। তার মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে চারপাশের পরিস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায়, চারপাশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাগ, ক্ষোভ, বিরক্তি ও ঘৃণার সম্মিলিত একটি আবেগের তরঙ্গ তার মন ও মাথাকে নিয়ন্ত্রণ করে। পিতৃ-মাতৃহীন জীবন ও আজন্ম টিকে থাকার লড়াই তার ভেতরে ঈশ্বরবোধের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়। ঔপন্যাসিক সাদইদের এই ভাবনার মধ্যে দিয়ে ‘সমাজের চোখে

অপরাধ’ এবং তার মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির উদ্ঘাটন করে অভিনব মাত্রা সন্নিবিষ্ট করেছেন। একজন অনাথ সৈনিকের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুই হয়ে ওঠে মহামূল্যবান সম্পদ, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। পুরাণের অহঙ্কারী ও দাস্তিক বাদশাহ শাদ্দাদ থেকে উপন্যাসের এমন বাস্তববাদী, আত্মসচেতন, দায়িত্বশীল সৈনিক— মিথ থেকে বাস্তবে রূপান্তরের যাত্রাপথে সাদইদ চরিত্রের মূল অবয়বটিকে লেখক ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছেন। ইহুদ নোহের মতো কিস্তি বানিয়ে তার দলের লোকেদের কেবল বাঁচানোর কথা উল্লেখ করলে সাদইদ সুতীব্রভাবে তার প্রতিবাদ করেছে। পাপী-পুণ্যবানের ভেদাভেদ নেই তার কাছে, তার স্বর্গে সবার সমান অধিকার। এখানেই উপন্যাসের কল্পিত নবি হুদের থেকে মহান হয়ে ওঠে ‘ভাড়াটে সেনা’ সাদইদ।

ইহুদ নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ঈশ্বরের নির্মিত পরকালের স্বর্গে বিশ্বাসী। সাদইদ স্বর্গ নির্মাণ করতে চাইলে সে বারবার বাধা দিয়েছে। সাদইদের স্বর্গ নির্মাণের কারিগর ছিল হেরা। যার কাছে মূর্তিহীন ও মূর্তিমান দ্বন্দের চেয়েও বড়ো ছিল শিল্পীর স্বাধীনতা। নান্দনিকতার দিক থেকে, আর্টের চোখ দিয়ে সে সবকিছুকে দেখে, গড়ে। সে বিশ্বাস করে মূর্তি না গড়লে মানুষ দেবতা হতে পারে না, যেমনটা হয়েছে পিরামিডের ক্ষেত্রে। মিশরের রাজাদের বলা হয়েছে অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক দেবতা। সাদইদ সাধারণ সৈনিক হয়ে হেরার হাত দিয়ে তৈরি করতে চেয়েছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের চিরকালীন আশ্রয়। মরুভূমির মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছে, মাটি ফুঁড়ে ফসল উৎপাদন, উন্নত চাষের সম্ভাবনা, পাশাপাশি মানুষকে সুরক্ষা এবং নিরাপদ জীবন দান করাই সৈনিক সাদইদের স্বপ্নের অভীষ্ট লক্ষ্য। হেরাকে বলা কথার মধ্যে দিয়ে সেই সত্য উন্মোচিত হয়েছে:

সমস্ত উদ্ভূত, যা দিয়ে নগর এবং মূর্তি তৈরি হয়, সব বিলি করে দেব। যত মূল্যবান ধাতু, দামী পাথর বাইরে থেকে আনা হয়েছিল, সব বিক্রি করে বস্ত্র কিনে নেব। সবই বিলি করতে হবে।^{১৯}

স্বর্গ নির্মাণের কাজ স্থগিত রেখে দামী পাথর অল্প মূল্যে বিক্রি করে দেয় সাদইদ। সৈন্যদের কথা ভাবে মানবদরদী সাদইদ। স্বর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা ও তার সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়, অপরাধবোধে তাড়িত করে তাকে নিরন্তর। রিবিচার সৌন্দর্যে বিভোর তার শরীরের অন্দরমহলে যৌনতার উদগ্র চোরাস্রোত বয়ে চলে।

আখ্যানের সাদইদের স্বর্গ আসলে একটা নগরের সার্থক রূপ। যেখানে যুদ্ধবিদীর্ণ মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। এই স্বর্গ যেন যুদ্ধ-দাঙ্গা বিমুক্ত একটি মহানগর, ঘরহীন মানুষগুলি যেখানে আশ্রয় পায়। অথচ সাদইদের স্বর্গকে কেউ বিশ্বাস করেনি, ইহুদ তার দলবল নিয়ে সে স্বর্গ ভেঙে দেয়, পুরাণের গল্পে একদা যেমনভাবে ভেঙে ছিলেন ঈশ্বরের দূত জিবরাইল। সাদইদের স্বপ্নকে কেউ বিশ্বাস করেনি। ইহুদের ক্ষমতার কাছে হেরে গেছে সাদইদ। ইহুদ গোপন সংগঠন গড়ে তাকে ‘হত্যাকারী’, ‘লুণ্ঠনকারী’ ঘোষণা করেছেন। জনমানসের অন্তর্গৃহে সাদইদে প্রতি অবিশ্বাসের বীজ বুনে দিয়েছিলেন ইহুদ। সাদইদের স্বর্গকে বিশ্বাস হয়নি বলেই তার স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করেছেন ইহুদ। অতীতে যেমন নোহের পুত্র নোহের স্বপ্নকে বিশ্বাস করেনি বলেই তাকে কিস্তিতে জায়গা দেননি নোহ। ‘মানুষের মাংসেই তো গেঁথে আছে এই নিয়ম। তোমার স্বপ্ন যে বিশ্বাস করে না, তাকে মারো, তাড়াও, কেটে ফ্যালো।’^{২০} পুরাণ ও ইতিহাসের সর্বত্রই চলে বলপ্রয়োগের খেলা। ভাষা ও ধর্মের এই আধিপত্যবাদের খেলা চলতেই থাকে। অধিকারের লড়াই সভ্যতার আদি ও অসমাপ্ত ট্রাজেডি। এই অধিকারের বলেই ইহুদের বিশাল সৈন্যবাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাদইদের স্বর্গের উপর। স্বর্গ গড়ার কারিগর শিল্পী হেরার আঙুল কেটে নেয় ইহুদের অনুগামীরা, কাটা আঙুলের রক্তে রাঙিয়ে

দেয় স্বর্গের মাটি। যুগে যুগে হেরে যাওয়া মানুষের রক্তেই লিখিত হয়েছে পুরাণের ইতিহাস। মিশালের নৌকায় ঘুমিয়েছিল সাদইদ। ঘুমন্ত সাদইদের নৌকার নোঙরের দড়ি খুলে দেয় এক রহস্যময় কিশোর। ইহুদ ও তার অনুগামীদের জয় হয়, আর মানবতার পূজারী সাদইদ ট্রাজেডির অতল গভীরে তলিয়ে যায়। সমুদ্র পরম সমাদরে টেনে নেয় সাদইদকে। যেমনভাবে জন্মের মুহূর্তে নির্জন দ্বীপে তাকে ঠেলে দিয়েছিল সমুদ্র। নির্জন দ্বীপে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের মৃত্যুর সময় সেখানে আজরাইল (মৃত্যুর দূত) ছাড়া আর কেউ ছিল না। এই মৃত্যুর নিঃসঙ্গতা ছিল বড়োই ভয়াবহ। অন্ধকার সমুদ্রে এক ক্লান্ত সৈনিকের অন্তর্ধান যেন তার মায়ের কোলে ফিরে যাওয়ার অভিযাত্রা। এই তার নিয়তি। বস্তুত লেখক পুরাণের বাদশাহ শাদাদের কাহিনির মূল মিথের গল্প ভেঙে যে নবমিথ নির্মাণ করেছেন তাতে মিশে আছে আধুনিকতার ছোঁয়া, সাম্প্রতিক সময়ের বহু চিহ্ন ও নিশান। রাষ্ট্র যেমন স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে দিয়ে চারপাশের সবকিছুকেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়। ইহুদ ও তার অনুগামীরাও সেইভাবে বারবার বাধা দিয়েছে সাদইদের স্বর্গ নির্মাণে। আরব মরুভূমি থেকে একাধিক ধর্মের উদ্ভব এবং ঈশ্বর পূজার একাধিক মতভেদ এবং তা নিয়ে যাযাবর ও কৃষকগোষ্ঠীর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব-সংঘাত— এই ঐতিহাসিক পরিবেশকে সামনে রেখেই লেখক সাদইদ নামক চরিত্রের মাধ্যমে বিভেদ ও সংঘর্ষময় পৃথিবীতে চেয়েছিলেন মানবতার বন্ধন রচনা করতে। *মরুস্বর্গ* এক অর্থে লেখকের কাক্ষিত আদর্শ— যেখানে ইতিহাস, পুরাণ ও একালের সমাজজীবন— এই তিনেরই ঘটেছে মেলবন্ধন।

রাজাবলি উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায় ‘উৎসর্গ’-এ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আব্রাহামের পুত্রকে উৎসর্গ করার কথা বিধৃত করছেন লেখক। উপন্যাসের এই অধ্যায়কে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করে কথাকার ‘উৎসর্গ’ নামক ছোটোগল্পও লিখেছেন। *রাজাবলি*-র আখ্যানের

পরত পরতে আছে দ্বন্দের বীজ। যে বীজ উদ্গত হয়েছে দিব্যতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সংঘাত থেকে। শলোমনের রাজসত্তা ও নবিসত্তার দ্বন্দ্ব তাঁর হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করেছে। শলোমনের মা বৎসেবা এ উপন্যাসের এক উজ্জ্বল চরিত্র। ইহুদি পুরাণে বৎসেবার কথা বেশি নেই। বৎসেবা ছিলেন দাউদের অনুগত সেনা উরিয়র স্ত্রী। ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’-এর দাউদ-বৎসেবার কাহিনিকে হুবহু উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লেখক। কিন্তু উপন্যাসের শলোমন নির্ণয় করতে পারেননি তিনি কার ঔরসজাত সন্তান! শলোমনের মা বৎসেবা ছিলেন দাউদের পরকীয়া প্রেমের নারী। বৎসেবার স্বামী উরিয় ছিল হিত্তীয় বা হিটাইট জাতির লোক। রাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে স্নানের ঘাটে বৎসেবাকে দেখে দাউদের যৌনবোধ জাগ্রত হয় এবং তিনি বৎসেবাকে তাঁর শয্যাসঙ্গিনী করেন। তারপর বৎসেবা গর্ভবতী হন। অথচ দাউদের পূর্বপুরুষ আব্রাহাম থেকে শুরু করে কেউই হিত্তীয় স্ত্রী নির্বাচন করেননি। নিজের কামনা বাসনাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে দাউদ উরিয়কে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেন। এমন যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে পাঠান সে আর ফিরে আসে না। দাউদ বৎসেবাকে বিবাহ করেন। বৎসেবার সন্তান হয় এবং মারা যায়। পরবর্তীকালে বৎসেবার গর্ভে জন্ম নেন রাজা শলোমন এ বৃত্তান্ত ইহুদি পুরাণে রয়েছে।^{২১}

ইহুদি পুরাণ	রাজাবলি উপন্যাস
☐ বৎসেবা হলেন শলোমনের বাবা দাউদের পরকীয়া প্রেমের নারী। বৎসেবার গর্ভে শলোমনের জন্ম হয়।	☐ পিতা দাউদের স্ত্রী মিখেল না পরস্ত্রী বৎসেবা— কে শলোমনের মা!— উপন্যাসে তা নির্ণয় করতে পারেননি রাজা শলোমন। শলোমনের আত্মপরিচয়ের সংকটকে প্রতিষ্ঠা করতেই লেখল এমনভাবে কাহিনি নির্মাণ করেছেন।
☐ ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ শলোমন প্রথমে নবি (ঈশ্বর প্রেরিত দূত বা পয়গম্বর), তারপর রাজা।	☐ উপন্যাসে শলোমন প্রথমে রাজা, তারপর নবি। তিনি রক্ত মাংসের মানুষ।

অথচ উপন্যাসের শলোমন জানেন না তিনি কার সন্তান! তাঁর বাবা কি হিব্রীয় না দাউদ—
নির্ণয় করতে পারেননি মহাজ্ঞানী শলোমন।

আব্রাহামের স্ত্রী এবং দাসী ও তাঁদের পুত্রদের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক সর্বাংশে ইহুদি মিথ ব্যবহার করেননি। ইহুদি পুরাণে উপেক্ষিত চরিত্রকেই তিনি উপন্যাসে মহিমান্বিত করেছেন। ইহুদি ও ইসলামি পুরাণের দ্বন্দ্ব এই অধ্যায়ের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। ঈশ্বরের স্বপ্ন পেয়ে মরুভূমির বৃকে তাবৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন আব্রাহাম। দুর্ভিক্ষের সময় শস্যের খোঁজে স্ত্রী সারাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে গেছিলেন আব্রাহাম। সারা ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। কাবুস বা ফ্যারাওদের কাছে নিজের স্ত্রীকে আব্রাহাম পরিচয় দেন বোন ব'লে। রাজা অবিমেলকের হৃদয়ে সারার প্রতি যৌনবাসনা জাগ্রত হলে ঈশ্বর ইলোহে তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমে সাবধান করে দেন। এভাবেই আব্রাহামের স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা করেছেন ঈশ্বর ইলোহে। মিশরের রাজা যখন জানতে পারলেন সারা আব্রাহামের স্ত্রী। তিনি খুশি হয়ে গোরু ভেড়া এবং দাসদাসী দান করলেন আব্রাহামকে। এঁদের মধ্যে এক দাসী ছিলেন, যার নাম হগার।^{২২} ইসলামি পুরাণে যাকে হাজেরা বলা হয়েছে। উপন্যাসে তিনিই ইগার। ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’-এ দাসীর নাম রয়েছে হগার। হ-কে ই-এর মতো উচ্চারণ করা যায়। যেমন হিব্রোন > ইব্রোন। এই কারণে লেখক হগারকে ইগার হিসাবে ব্যবহার করেছেন।^{২৩} ইহুদি পুস্তক ইগারের কথা বেশি লেখেনি। প্রাচীন পৃথিবীর এই অবহেলিত দুঃখ লাঞ্ছিত অপমানিত সন্তার প্রতিমূর্তি ইগারকে উপন্যাসে তুলে এনেছেন লেখক। মিথ-পুরাণ মোড়া মরুভূমির বৃকে তাঁকে মহিমান্বিত করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছিলেন:

আমি হাজেরা নামটা ব্যবহার করিনি, কারণ আমি যে মুসলিম মিথ ব্যবহার করছি না সেটা বোঝাতে চাই পাঠককে। আমি বোঝাতে চাই যে, এটা আমি ইহুদি মিথ হিসাবে

ব্যবহার করছি। অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্টকেই ব্যবহার করছি। শুধু ওল্ড টেস্টামেন্টের নামটাকে একটু বদলে দিয়েছি।^{২৪}

তাঁবুর সাম্রাজ্য এবং বংশরক্ষার তাগিদে আব্রাহাম দাসীগমন করেন এবং ইগারের গর্ভে জন্ম নেয় ইস্রায়েল। আদি পৃথিবীর মরুভূমিই প্রথম সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্রের ধারণা প্রদান করে মানুষকে। আব্রাহাম নিঃসন্তান ছিলেন, আর সেই কারণেই তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের প্রয়োজনে দাসীগমন করেন। কয়েকবছর পরেই স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয় পুত্র ইসহাক। এভাবেই মরুভূমির ঈশ্বর ইলোহে যাযাবর তাম্বুধারীদের মরুসাম্রাজ্যের অধিকার তুলে দেন বেদুইন আব্রাহামের হাতে। ঈশ্বর চেয়েছিলেন আব্রাহাম মরুতে কর্তৃত্ব রচনা করুক। মহা-কূটবুদ্ধির অধিকারী রাজনৈতিক ঈশ্বর নিদারুণ খেলা খেলেছেন! মরুভূমির ইতিহাসকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন সুকৌশলে। শুরু হয় সারা এবং ইগারের মধ্যে মনোমালিন্য। সারার অনুরোধে আব্রাহাম পুত্র ইস্রায়েল এবং দাসী ইগারকে নির্বাসন দিলেন নির্জন মরুপ্রান্তরে। ঈশ্বর ইলোহে আব্রাহামের স্বপ্নে এসে বললেন:

ঐ বালক এবং ঐ দাসীটির ব্যাপারে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না, সারা তোমাকে যা বলছে তাই-ই করো। কারণ ইসহাকের দ্বারাই তোমার বংশধারা রক্ষিত হবে। তবে ঐ দাসীপুত্রের দ্বারাও আমি এক জাতি উৎপন্ন করব, কারণ সেও তোমার সন্তান।^{২৫}

‘আদিপুস্তক’-এর ঈশ্বর কী বিচক্ষণতায় এবং কূটকৌশলে আব্রাহামের হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন। ঈশ্বরের নির্দেশে আব্রাহাম দাসী ইগার এবং পুত্র ইস্রায়েলকে কিছু খাদ্য এবং জল দিয়ে বিদায় করে দিলেন। মা-ছেলে আশ্রয় নিল বের-শেবা নামক এক কূপের কাছে।^{২৬} এরপর ‘আদিপুস্তক’ ইগার আর ইস্রায়েলকে নিয়ে আর কিছুই বলেনি। আব্রাহামের দাসী এবং দাসী-পুত্র ইস্রায়েল মরুভূমির রুধির-তমসায় হারিয়ে যায়। তামাম ‘আদিপুস্তক’ সন্ধান করেও তাঁদের খোঁজ পাওয়া যায় না।

‘আদিপুস্তক’ থেকে বিতাড়িত এই ইস্রায়েলকেই ঔপন্যাসিক প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। পুরাণে যিনি অবহেলিত, উপেক্ষিত, উপন্যাসেই তিনিই নায়ক। উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে ইসলামি পুরাণের কাহিনির সাদৃশ্য রয়েছে। আখ্যানের পটভূমি হজরত মুহম্মদের জন্মের চার হাজার বছর আগের প্রাচীন পৃথিবী হলেও মুহম্মদ চার হাজার বছর পর ইস্রায়েলকেই (কোরান-এ ইসমাইল) প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তাঁর ধর্মের অন্যতম প্রধান পুরুষ হিসাবে।^{২৭}

‘আদিপুস্তক’ যা দিতে পারল না তা কোরান তা কোন বিচারে দিল? — এ নিয়ে লেখক প্রশ্ন তুলেছেন উপন্যাসের ‘ভূমিকা’ অংশে। উপন্যাসের ইগার গর্ভাবস্থায় মরুভূমির বালুতে লুটোপুটি খান। তাঁকে সাহায্য করেন দেবদূত। সারার অত্যাচারে মরুভূমিতে নির্বাসিত হয়েছেন ইগার। মনিব আব্রাহাম তাবৎ সাম্রাজ্যের মালিক হয়েও দাসীর গর্ভযন্ত্রণা নিরসন করতে পারেননি। ঈশ্বরের দেবদূত ইগারকে জানিয়েছেন:

তোমাকে তোমার মনিব কি ভালবাসেন না? নিশ্চয় বাসেন। তুমি তার উষ্টীর চেয়ে দামি, কাবুসের দেওয়া উপহার। আমরা তোমার মনিবকে অব্রাম থেকে আব্রাহাম বানাব। গোষ্ঠীবাবা থেকে মহাজাতির আদি জনক বানাব। তাকে ক্ষুদ্র থেকে মহৎ করব। সমস্ত জাতির পিতা হবেন আব্রাহাম।^{২৮}

এভাবেই মরুভূমির বালিতে চমকপ্রদ নাটক অভিনীত হয়। পাশেই ছিল বীর-লহর-রোয়ী কূপ। (ইহুদি পুরাণে যা বের-শেবা এবং ইসলামি পুরাণে জমজম কূপ নামে পরিচিত)। এই মরু-কূপের পাশেই দেবদূতের সাহায্য নিয়ে সন্তান প্রসব করেন ইগার। দেবদূত তাঁর সন্তানের নাম দেন ইস্রায়েল। ইস্রায়েল অর্থ ঈশ্বরের কান। কারণ সদাপ্রভু শিশুর জন্মের আর্তনাদ মরুমর্ত্যেই শুনেছেন। দেবদূত ইগারকে আশ্বস্ত করেন, এই মরুমর্ত্যে তাঁর সন্তান বর্ধিত হবে, সম্মানিত হবে। অন্যদিকে ঈশ্বরের দেবদূত স্বপ্নে হানা দিলেন আব্রাহামের হৃদয়ে। দেবদূতের কথা মতো আব্রাহাম স্ত্রী গমন করলেন এবং সারার

গর্ভে জন্ম নিল ইসহাক। পুত্রের আকাঙ্ক্ষা তাড়িত করেছে মরুভূমির রাজাদের। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের জন্য বীরযোদ্ধার প্রয়োজন হয়েছে মরুভূমিতে। সারার কথায় ইগারকে বিদায় করে দিয়েছিলেন আব্রাহাম। অথচ মনিবকেই স্বামীরূপে ভালোবাসতেন ইগার। উষর মরুতে নির্বাসিত মা ও ছেলের সংগ্রামে ভরা যাপিত জীবন, প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই। ‘আদিপুস্তক’ লেখে না। ইহুদি পুরাণে পরিত্যক্ত রমণীর এবং তাঁর দুর্ভাগ্য সন্তানের কথা উপন্যাসে স্থান পায়। ঈশ্বর ইলোহে পুনরায় স্বপ্নে হানা দেন আব্রাহামের কুটিরে। স্বপ্ন পেয়েই দাসী ইগারের কাছে ছুটে যান স্বপ্নদর্শী আব্রাহাম। ইগার ও আব্রাহামের কথোপকথনে উঠে এসেছে আব্রাহামের নতুন পরীক্ষার ইস্তাহার:

— সদাপ্রভু তোমাকে অনেক দিয়েছেন। তোমার অনেক তাঁবু, অনেক পশু, দাসদাসী অনেক।

— কিন্তু দেশ! আমার দেশ চাই। সদাপ্রভু বলেছেন, এই সব আমার। এই ভূমরু, চরাচর, কতকাল ধরে বলে আসছেন। হিব্রোন (ইশ্ফোন)-এর এলোন বনে দেখা দিয়ে একবার বললেন, বলিদান কর আব্রাহাম। এই যতদূর দৃষ্টি কর, যত দূরে সূর্য যায়, সবই তোমার। উৎসর্গ কর তোমার প্রিয়তম জীবকে। তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে অব্রাম।

... ..

— আমার প্রিয়তম কে ইগার?

— আমি নই।

— ইস্রায়েলকে আমার চাই ইগার! চাইতে গিয়ে আব্রাহামের গলা কেমন গাঢ় আর ফ্যাসফ্যাসে হয়ে ভেঙে গেল।

— না, না, এ আমি কিছুতেই পারব না। আমাকে নামিয়ে দাও।

— সদাপ্রভু খাদ্য চান ইগার। আমি জানি, তোমার পুত্রই আমার প্রিয়তম।

— এ চিন্তভ্রম তোমার। তোমার স্বপ্ন এত নিষ্ঠুর হতে পারে না। আমি এইমাত্র এই প্রথম তোমাকে প্রিয়তম বলে ডেকেছি, এই লোভকে ক্ষমা করে দাও। আবার বলছি, আমি দাসী, আমাকে মরুভূমে ফেলে দাও। ছেলেকে নামিয়ে দাও। বলে ডুকরে উঠল দাসী ইগার। অথচ সে গো-শকট থেকে নেমে পড়তে পারল না।^{২৯}

স্বপ্নদর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষী দুর্জয় মানুষ আব্রাহামের অনুরোধের কাছে হার মানল দাসী ইগার। সে ইস্রায়েলকে স্নান করাল এবং নতুন পোশাক পরিধান করিয়ে বলে দিল— ‘বাবা যা বলবেন। তাই করবে।’— বিধাতার সমকক্ষ তাম্বুধারী মরুচারী যাযাবর আব্রাহামের স্বপ্নপূরণ করার নিমিত্তে নিজের গর্ভের সন্তানকে উৎসর্গ করলেন ইগার। পতিপ্রেমে উদ্ভাসিত ইগারের সন্তান মায়ের কথামতো পিতার দেওয়া হোমকাষ্ঠ মাথায় নিয়ে পাহাড়ে চড়তে শুরু করল। নিজের বলিদানের কাঠ সে নিজেই বয়ে নিয়ে চলেছে। মরুভূমির আকাশে এমনই পরীক্ষা দিতে হয়েছে আব্রাহামকে। বলিদানের আসন্ন মুহূর্তে আব্রাহাম দো-টানায় পড়লেন। তিনি নির্ণয় করতে পারছেন কে প্রিয়? দাসী-পুত্র ইস্রায়েল নাকি সারা-পুত্র ইসহাক। তখন মরুমর্ত্যে ঝড় বইছে। বায়ুবিক্ষোভে ইতিহাসের দুর্বোধ্য কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। জ্ঞানীপুত্র ইস্রায়েল পিতার অবস্থা দেখে তাঁকে চোখে পটি বেঁধে নিতে বলে। ইস্রায়েলের মনে পড়ছে মায়ের শেষ বাক্য— ‘বাবা যা বলবেন। তাই করবে।’ অথচ শেষ অবধি কিছুই নির্ণয় করতে পারলেন না আব্রাহাম। খড়া ছুঁড়ে দিয়ে মাটিতে নতজানু হয়ে ঈশ্বর ইলোহের কাছে আর্তনাদ করতে লাগলেন। আকাশ প্রতিভা মহাকাশ থেকে বললেন:

তুমি চোখের আচ্ছাদন উন্মোচন কর আব্রাহাম। তোমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এই দেশসমূহ তোমাকে দিলাম। তুমি এখন ঝোপে আবদ্ধ একটি মেঘকে দেখো, তাকেই হোমার্থ বলিদান দিয়ে তাঁবুতে ফিরে যাও।^{৩০}

আব্রাহামের পরীক্ষা শেষ হল। অব্রাম থেকে তিনি আব্রাহামে উত্তীর্ণ হলেন। অব্রাম ছিলেন গোষ্ঠী পিতা, আব্রাহাম হলেন জাতির পিতা। ছেলে ইস্রায়েলকে আব্রাহামের হাতে তুলে দেওয়ার পর ইগারের অন্তরাগ্নির কোলাহল, অস্থিরতা, ছটফটানি ‘আদিপুস্তক’-এ নেই। মা-ছেলের নির্বাসনের পর তাঁরা উভয়েই ঘরে-বাইরে মুছে গেছে। ‘আদিপুস্তক’-এ ইস্রায়েলের জায়গা দখল করেছে সারা-পুত্র ইসহাক।

আব্রাহাম কাকে উৎসর্গ করেন?— এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইহুদি এবং ইসলামি পুরাণের আন্তঃসংযোগ ও দ্বন্দ্বের স্থানটি। ‘আদিপুস্তক’ ইসহাককেই গ্রহণ করেছে, কারণ সে আব্রাহামের স্ত্রী সারার সন্তান। দাসী-পুত্র ইস্রায়েলকে ‘আদিপুস্তক’ বাতিল করে দিয়েছে। কেবল ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’-ই নয়, ইহুদি লৌকিক পুরাণও একই সাক্ষ্য দেয়। সেখানেও ইসহাক এবং ইস্রায়েলকে আব্রাহামের সন্তান হিসাবে স্বীকার করলেও উৎসর্গের সম্মান পেয়েছে ইসহাক।

The theological problem of why God found it necessary to put Abraham through such an agonising experience is one that is still actively discussed. One of the main reasons proposed is that a public demonstration was required of faith in God in order to convince the unbelievers of divine sovereignty.

At the same time, however, God is portrayed in the aggadah as being sympathetic to Abraham's position. His opening command 'Take your son, your only one, whom you love, Issac' is seen as a carefully graded approach, meant to break the news in as gentle a fashion as possible. 'Your son' could have meant Isaac or Ismael: 'your only one' likewise, because Issac was the 'only' son of Sarah, and Ismael the 'only' son of Hagar; 'whom you love' did not make things clearer, because Abraham loved them both. It was only when the name 'Isaac' was pronounced that Abraham understood exactly what God demanded.^{৩১}

ইহুদি পুরাণ	ইসলামি পুরাণ	রাজাবলি উপন্যাস
☐ আব্রাহাম ☐ আব্রাহামের স্ত্রীর নাম সারা ☐ দাসী- হগার ☐ আব্রাহাম ও স্ত্রী সারার পুত্র ইসহাক ☐ আব্রাহাম ও দাসী হগারের পুত্র ইস্রায়েল ☐ উৎসর্গের সম্মান পান স্ত্রী সারার পুত্র ইসহাক	☐ ইব্রাহিম ☐ প্রথম স্ত্রী- সারা বিবি ☐ দ্বিতীয় স্ত্রী- হাজেরা ☐ ইব্রাহিম ও সারার বিবির পুত্র- ইসাহাক ☐ ইব্রাহিম ও হাজেরার পুত্র ইসমাইল ☐ উৎসর্গের সম্মান পান দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার পুত্র ইসমাইল	☐ আব্রাহাম ☐ স্ত্রী- সারা ☐ দাসী- ইগার ☐ আব্রাহাম ও স্ত্রী সারার পুত্র ইসহাক ☐ আব্রাহাম ও দাসীর পুত্র ইস্রায়েল ☐ উৎসর্গের সম্মান পান দাসী-পুত্র ইস্রায়েল

‘ইসহাক’— এই নাম শোনা মাত্রই আব্রাহামের হৃদয় জেনে ফেলেছিল ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা। দাসী পুত্র ইস্রায়েলকে ইহুদি লোক-পুরাণ এবং ইসলামিক শাস্ত্রীয়-লৌকিক উভয় পুরাণই ইসমাইল নামে সম্বোধন করেছে। ইহুদি লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় উভয় পুরাণেই ইস্রায়েল বা ইসমাইল উপেক্ষিত, বিতাড়িত, পরিত্যক্ত। উৎসর্গের যোগ্যতা দাসী পুত্রের ছিল না, অতএব সে সম্মান ইস্রায়েল পেতে পারেন না। আধুনিক ঔপন্যাসিক আবুল বাশার ইহুদি পুরাণের এই অবহেলিত, বর্জিত, উপেক্ষিত ইস্রায়েলকেই দিয়েছেন উৎসর্গের সম্মান। ইহুদি মিথ ভেঙে তিনি ইহুদি পুরাণের কাহিনিকে নতুনভাবে দেখতে প্রণোদিত করেছেন। ‘আদিপুস্তক’-এর সদাপ্রভু যাঁদের নির্বাচন করেননি, উপন্যাস তাঁদেরই গ্রহণ করেছে। পুরাণে যিনি উপেক্ষিত, উপন্যাসে তিনিই মহিমান্বিত। লেখকের নবমিথ নির্মাণের নেপথ্যে কোনো পুরাণেরই প্রভাব নেই। আপাতভাবে দেখলে ইসলামি পুরাণের সঙ্গে মিল রয়েছে মনে হলেও ইসলামি পুরাণে সারা ইব্রাহিমের দ্বিতীয় পত্নী, দাসী নয়। ‘আদিপুস্তক’ রচিত হবার প্রায় চার হাজার বছর পর ইসলাম ধর্মের নবি হজরত মুহম্মদ *কোরান*-এ দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ইসমাইলকে উৎসর্গের সম্মান

দিয়েছেন। ‘আদিপুস্তক’-এর বিতাড়িত ইস্রায়েল কোরান-এ মহাত্মা। ইসলাম ধর্মের
 অবশ্যপালনীয় কৃত্য (ইসলামি পরিভাষায় যাকে ‘ফরজ’ বলা হয়) হল পাঁচটি, যা ইসলামের
 পঞ্চম স্তম্ভ নামেও পরিচিত। প্রথম কৃত্য— কলেমা (মন্ত্রপাঠ অর্থাৎ ধর্মের উপর বিশ্বাস),
 দ্বিতীয় কৃত্য— নামাজ (দিন-রাত মিলিয়ে মোট পাঁচবার নামাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা
 করা), তৃতীয় কৃত্য— রোজা (আরবি বর্ষপঞ্জির ‘রমজান’ নামক মাসে ভোর থেকে সূর্যাস্ত
 পর্যন্ত নিরমু উপবাস), চতুর্থ কৃত্য— জাকাত (স্বীয় সম্পদ এক বছরের বেশি সময় ভোগ
 করার পরেও যদি তার অতিরিক্ত সম্পদ থেকে যায়, তবে সেই সম্পদ থেকে একটি
 নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ দান করা), পঞ্চম কৃত্য— হজ্জ (শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকলে
 মক্কা ও মদিনার ‘ইসলামি তীর্থ’ দর্শন এবং ধর্মীয় বিশেষ আচরণবিধি পালন করা, এক্ষেত্রে
 বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, যে ব্যক্তি হজ্জ যাত্রা করবেন তার কারণে বা তাঁর আসা-
 যাওয়ার আগে বা পরে তাঁর পরিবার যেন কোনোরকম আর্থিক সংকটের মধ্যে না পড়ে)।
 উল্লেখিত ইসলামি পুরাণ অনুসারে, এই পঞ্চম কৃত্যের ‘হজ্জ’— রীতি প্রচলিত হয়
 ইব্রাহিমের (কোরান-এ আব্রাহাম হলেন ইব্রাহিম) সময় থেকেই। ‘আদিপুস্তক’-এর বের-
 শেবা এবং উপন্যাসের বীর-লহয়-রোয়ী কূপ হল ইসলামি পুরাণের জমজম কূপ।
 হাজেরাকে ইব্রাহিমের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে বর্ণনা করেছে ইসলামি পুরাণ। ধূ ধূ মরুপ্রান্তরে
 যখন হাজেরা জলের জন্য ছোট্টাছুটি করেছিলেন তখন শিশু ইসমাইলের পদাঘাতে ভূমি
 থেকে জল নির্গত হয় এবং সেটিই পরবর্তীকালে জমজম কূপে পরিণত হয়।^{৩২} জমজম
 কূপের কথা কোরান-এ সুস্পষ্টভাবে নেই, তবে মুসলমানদের হাদিসে এ নিয়ে বিস্তারিত
 আলোচনা রয়েছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা জমজম কূপের জল পবিত্র বলেই বিশ্বাস করেন।
 হজ্জ-যাত্রীরা এই জল পান করেন এবং সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। নির্বাসিতা ইগারের
 মর্মব্যথা ও যন্ত্রণা-বিষাদ উপন্যাসের মতো কোরান-এও রয়েছে। তৃষ্ণার্ত শিশুর জলের

জন্য হাজারো মক্কার সাফা ও মারওয়া নামক পাহাড়ে ছুটে বেড়িয়েছিলেন।^{৩৩} হাজারের কষ্ট ও যন্ত্রণাকে অনুভব করার জন্যই হজ্জ যাত্রীদের সাফা-মারওয়া পাহাড় প্রদক্ষিণ করতে হয়।^{৩৪}

‘আদিপুস্তক’ রচিত হওয়ার প্রায় চার হাজার বছর পর *কোরান*-এ ইস্রায়েল এবং দাসী ইগার মহান হয়ে ওঠেন। ইসলাম ধর্মের প্রধান দুই উৎসবের মধ্যে দ্বিতীয়টি হল ঈদ-উল-আয্হা, যার অর্থ ‘ত্যাগের উৎসব’। আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলা হয় ‘কোরবানির ঈদ’। ইব্রাহিমের বলিদানকে স্মরণ করে এই দিন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ঈশ্বরের কাছে পশু উৎসর্গ করেন। *হিব্রু বাইবেল* যাঁদেরকে উহ্য রেখেছিল, *কোরান* তাঁকে ‘অন্য পরিচিতি’ দিয়ে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আধুনিক আখ্যানে তাঁরা *হিব্রু বাইবেল*-এর চরিত্র রূপেই গ্রহণযোগ্য, সম্মানিত।

আবুল বাশার মূলত মানুষের ঐতিহ্যের শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত গল্পের নব-রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। ইহুদি পুরাণ বা ইসলামি পুরাণের কাহিনির আভাস তাঁর কথাসাহিত্যে থাকলেও তা মিথকেন্দ্রিক সাহিত্য হয়ে ওঠেনি, মিথের চরিত্র এখানে বিবর্তিত হয়েছে। ধর্মের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে তা আপামর সমাজের দীর্ঘকালীন অনুভূতিগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. বসু, বুদ্ধদেব; *মহাভারতের কথা*, এম সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭
২. জোন্স, ডেভিড; ও কট্রিল, আর্থুর; *দ্য গ্রেট মিথোলজি* (অনুবাদ ড. মনজুর রহমান), সৃজনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ১২

৩. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী; *মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২২

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৫. Montefiore, Simon Sebag; *Jerusalem (A history of the Middle East)*, Weidenfeld and Nicolson, First edition, January 2011, P. 62

৬. *কোরানে* শাদাদের বেহেশতের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত না হলেও আদ জাতির গল্পের অন্তরেই নিহিত রয়েছে শাদাদের বৃত্তান্ত। *কোরান*-এর ২৬-সংখ্যক সূরা শোয়ারা ১২৮-১২৯ ও ১৩৯ সংখ্যক আয়াতে রয়েছে: “তোমরা তো অযথা প্রতিটি উচ্চস্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করেছ। তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করেছ এই ভেবে যে তোমরা চিরস্থায়ী হবে।... অতঃপর ওরা তাঁকে (হুদ) প্রত্যাখ্যান করল এবং আমি (আল্লাহ) ওদের ধ্বংস করলাম।”

দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

৭. *কোরানে* ইরাম নগরীর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। *কোরানের* ৮৯-সংখ্যক সূরা ফজর-এর ৬-৮ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে: “তুমি কি দেখনি তোমার আল্লাহ আদ জাতির ইরামে কী করেছিলেন? তাদের ছিল সুউচ্চ সব প্রাসাদ, যেমনটি আগে কোনো দেশে নির্মিত হয়নি।”

দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

৮. <https://archive.roar.media/bangla/main/history/lost-city-of-eram-shaddads-heaven>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ১২.০১.২০২৪, সময়: ১: ৪৩ pm

৯. <https://archive.roar.media/bangla/main/history/lost-city-of-eram-shaddads-heaven>, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ১২.০১.২০২৪, সময়: ১: ৪৩ pm

১০. ‘শাদাদের বেহেশত’, *সহীহ কাসাসুল আফিয়া*, হোসাইনিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২২৬

১১. *কোরান*-এর বহু জায়গায় হুরদের রূপ ও গুণের বর্ণনা রয়েছে। বিশেষত, *কোরান* শরিফের ৫৫-সংখ্যক সূরা ‘রহমান’-এ হুরদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। (আয়াত সংখ্যা- ৫৬, ৫৮, ৭২, ৭৪, ৭৬)। এছাড়াও ৩৬-সংখ্যক সূরা ‘ইয়াসিন’, (আয়াত সংখ্যা-

৫৫), ৩৭-সংখ্যক সূরা 'সাফ্যাত', (আয়াত সংখ্যা- ৪৮), ৩৮-সংখ্যক সূরা 'সোয়াদ', (আয়াত সংখ্যা- ৫২), ৪৪-সংখ্যক সূরা 'দোখান', (আয়াত সংখ্যা- ৫৪), ৫৬-সংখ্যক- সূরা 'ওয়াকিয়া', (আয়াত সংখ্যা- ৮), ৭৪ সংখ্যক সূরা- 'মুদাসসির', (আয়াত সংখ্যা- ৩৩)।

‘হুর’— শব্দের আরবি অর্থ হল- ‘উজ্জ্বল সাদা-কালো চোখধারী’ অর্থাৎ উজ্জ্বল চোখের অধিকারী। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, জান্নাতের ঈমানদার (পুণ্যবান) ব্যক্তিদের সঙ্গিনী হবে হুরেরা। হাদিসে রয়েছে, এক একজন পুরুষকে সত্তরজন হুর প্রদান করা হবে। জান্নাতি পুরুষদের সেবা করাই হবে হুরদের প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ।

দ্রষ্টব্য: কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

১২. গেলেমান বা গিল্‌মান (বিশেষ্য) আরবি ভাষার একটি শব্দ। মুহম্মদ পূর্ববর্তী সময়ে যার অর্থ ছিল ক্রীতদাস বা সেনাবাহিনীর ভাড়াটিয়া সৈন্য। কোরান রচিত এবং সংকলিত হবার পর কোরানের ভাষ্য অনুযায়ী, গেলেমান বলতে বোঝায়, বেহেশতের সেবকবৃন্দ। যাদের মূলত চিরকিশোর বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোরানের বর্ণনা অনুযায়ী, তাদের উজ্জ্বলতা ও উপস্থিতি হবে ছড়িয়ে থাকা মুক্তোর মতো। জান্নাতে পুরুষদের জন্য যেমন হুর প্রদান করা হবে, তেমনি নারীদের জন্য থাকবে গেলেমান। স্বর্গবাসী নারীদের আনন্দ দেওয়াই হবে গেলেমানদের প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ। কোরানের ৫২ সংখ্যক সূরা তুর-এর ২৪ সংখ্যক আয়াত, ৫৬ সংখ্যক সূরা ওয়াকিয়া-র ১৭ সংখ্যক আয়াত, ৭৬ সংখ্যক সূরা দাহর-এর ১৯ সংখ্যক আয়াতে গেলেমান বা চিরকিশোরদের বর্ণনা রয়েছে।

দ্রষ্টব্য: কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

১৩. ‘শাদাদের আশাভঙ্গ এবং জীবনের যবনিকা’, সহীহ কাসাসুল আফিয়া, হোসাইনিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২২৭-২২৮

১৪. ইসলামি পুরাণের ভাষ্য অনুযায়ী, ঈশ্বরের প্রধান চার ফেরেশতার (ঈশ্বরের দূত এবং বার্তাবাহক) অন্যতম হজরত আজরাইলকে ঈশ্বর প্রাণীদের প্রাণহরণ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আজরাইলকে ইসলামি পুরাণে ‘মালাকুল মউত’ (মৃত্যুর দূত) নামে সম্বোধন করা হয়েছে। কথিত আছে, জ্বিন জাতির পরে মানুষ জাতি সৃষ্টি করার ইচ্ছে হয় ঈশ্বরের। জ্বিনরা হল আগুন থেকে সৃষ্ট, ঈশ্বর চেয়েছিলেন মাটি থেকে মানুষ নামক এক জাতি উদ্ভূত করবেন। সেই কারণে প্রধান ফেরেশতাদের ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু মাটির কান্নার কাছে পরাভূত হয়ে আজরাইল ব্যতীত সকল ফেরেশতাই মাটি আনতে অসমর্থ

হয়েছিলেন। ঈশ্বরের নির্দেশ পালনই ছিল আজরাইলের অভীষ্ট লক্ষ্য। আজরাইলের দুঃসাহস, কর্তব্যপরায়ণ মানসিকতা ও অনুগত মনোভাব প্রত্যক্ষ করে ঈশ্বর ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। ঈশ্বর মাটি থেকে সৃষ্টির প্রথম প্রাণী এবং মানুষ ‘আদম’কে সৃষ্টি করেছিলেন। এবং মানুষের প্রাণ হরণের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন আজরাইলের উপর। কোরান-এর ৩২ সংখ্যক সূরা সিজদাহ্-এর ১১-সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে: “মৃত্যুর ফেরেশতা (আজরাইল) তোমাদের সকলের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।”

দ্রষ্টব্য: কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

১৫. বাশার, আবুল; মরুস্‌গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১৬, পৃ. ৪৪-৪৫

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২-৫৩

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

২০. বাশার, আবুল; রাজাবলি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৯

২১. ‘শমুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক’, পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ৪০৫

২২. ‘আব্রাহামের বিদেশ যাত্রা’, পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ২২-২৩

২৩. সরকার, পার্থ; (সম্পাদিত) কারুবাসনা, প্রথম বছর, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৭, পৃ. ৪৫

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

২৫. ‘হাগার ও ইস্রায়েলের বিদায়’, *পবিত্র বাইবেল* (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ব্যাঙ্গালোর, পৃ. ২৩

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

২৭. দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (৩৭ সংখ্যক সূরা-আফফাত, আয়াত সংখ্যা ৯৯-১১১) বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২৪৯

২৮. বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ৪৮

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

৩১. Goldstein, David; *Jewish Legends*, Chancellor Press, First Edition 1996, page- 57

৩২. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zamzam_Well, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ২৭.১২.২০২১, সময়: ১: ৩২ am

৩৩. https://en.wikipedia.org/wiki/Safa_and_Marwa, তথ্য গ্রহণের তারিখ: ২৮.১২.২০২১, সময়: ১৫৫ am

(*কোরান*-এর ১৪ সংখ্যক সূরা ইব্রাহিম ও ৩৭ সংখ্যক সূরা সাফফাত্- এ ইব্রাহিম এবং হাজেরা বিবির কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে।) দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০

৩৪. দ্রষ্টব্য: *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), (২ সংখ্যক সূরা বাকারাহ্, আয়াত সংখ্যা ১৫৮), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২৯

উপসংহার

উপসংহার

আমরা শেষাবধি দেখলাম যে, ইতিহাস বা পুরাণের কাহিনির সঙ্গে একজন কথাকারের ইতিহাস বা পুরাণ-নির্ভর আখ্যানের মূল ফারাক বস্তুত, পক্ষপাতিত্ব বা নিরপেক্ষতার প্রশ্নে। পুরাণ বলতে আমরা এখানে কেবল গ্রন্থবদ্ধ কাহিনিকে ধরছি, যেমন- *হিব্রু বাইবেল* বা *কোরান* কিংবা ভারতীয় পুরাণের কাহিনি। কোনও লেখক যখন ইতিহাস বা পুরাণকথাকে আশ্রয় করে সাহিত্য সৃষ্টি করেন তখন তার সঙ্গে সমকালীন জীবনজিজ্ঞাসা ও কথাকারের প্রত্যক্ষ সময়ের একটা যোগসূত্র নির্মিত হয়। পুরাণ মাত্রই তার সঙ্গে ধর্মের একটা সংযোগ থাকে, একথা যতই জোর গলায় আমরা বলে থাকি, পুরাণের কাহিনি কি কেবলই আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর? তার সঙ্গে কি বিনোদনের সম্পর্ক নেই? তা কি আমাদের শৈশবের কৌতূহল নিবৃত্তির আকর বা আধার নয়? যখন শিশু-বয়সের বাচ্চাদের বড়োরা পুরাণের গল্প শোনায়, যে, ‘জানিস, অনেক অনেক কাল আগের কথা। অযোধ্যায় একজন রাজা ছিলেন।’ কিংবা ‘ওই যে এখন মিশরের পিরামিড দেখছিস, তার তলায় কী আছে জানিস? ফেরাউনের লাশ শুয়ে আছে। সে কত কত যুগ আগের কথা।’— অদেখা সুদূর অতীত শৈশবের স্মৃতিতে এমনভাবেই প্রবেশ করে, ঈশ্বরের ঐন্দ্রজালিকতা আমাদের মোহিত করে। অথচ উপরোক্ত গল্পদুটিকে পুরাণ নামে আমরা দাগিয়ে দিলেও তার একটা ইতিহাস রয়েছে, আবিস্কৃত বা অনাবিস্কৃত যাই-ই হোক। অযোধ্যার রাজা যে আখ্যানের চরিত্র সেই আখ্যান বা আখ্যানকারের ইতিহাস এবং পিরামিড সৃষ্টির রহস্য ও ইতিহাস দুই-ই গল্পের উপরিসৌধে ‘প্রশ্নচিহ্ন’ নিয়ে কড়া নাড়ে। তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ধর্ম-অনুসারীদের বিস্তর বিভেদ থাকলেও একজন লেখক তাঁর কল্পনার জগতে থাকেন মুক্ত এবং স্বাধীন। অথচ এই স্বাধীনতা কখনও কখনও লেখকের বিরুদ্ধে ধর্ম-অবমাননার রায় দেয়।

কথাকার আবুল বাশার যখন ইহুদি-গ্রন্থ *হিব্রু বাইবেল*-এর কাহিনিকে ‘বিশ্বমানবের সম্পত্তি’ হিসাবে গ্রহণ করে মরুমর্ত্যের পৌরাণিক চরিত্রদের ভেঙেচুরে স্বতন্ত্রভাবে নির্মাণ করেন তখন তাঁর মুক্তমনা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু ইসলামি পুরাণের হরেকরকম নিয়ম প্রণালী এবং অযৌক্তিক প্রথাকে আখ্যানের উপাদান হিসাবে নির্বাচন করে যখন উপন্যাস রচনা করেন, তখন তাঁকে অতর্কিত আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়। শাস্ত্রের একরৈখিক নিয়মের বিরোধিতা করে তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা যখন নারী স্বাধীনতার পক্ষ নিয়েছিল, তখনও ঘটেছিল বিপত্তি। অথচ কথাকারের যুক্তিবাদ ধর্ম বা শাস্ত্রবিরোধী ছিল না কখনও। হয়তো এই কারণেই আমরা ‘গ্রামীণ মুসলিম নারীর’ সংরক্ষিত প্রতিবাদের আরও বেশি বেশি বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখলাম না। স্বামীর মুখে ‘তালাক’— উচ্চারণ শোনামাত্রই তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্র বিরক্তির সুরে বলে উঠেছিল— ‘তালাক আসলে হাদিসি অসুখ। হিস্টরিয়া! পুরুষের দাঁত খিচুনি বদ-হওয়ার দোষ।’— একজন নিতান্ত গ্রামীণ গৃহবধূ, অল্পশিক্ষিত মেয়ের শব্দচয়ন সামাজিক প্রতিবাদের ক্ষেত্রটিকে চিহ্নিত করে দিয়েছিল।

যখন কোনও কথাকার পৌরাণিক গল্পকে পরিগ্রহণ করে সাহিত্য-সৃষ্টি করেন তখন তাঁর ‘ক্রিয়েটিভ ফ্যান্টাসি’-র সঙ্গে তার দৃশ্যমান জগতের মেলবন্ধন ঘটে। কথাকার আবুল বাশার তাঁর পুরাণ-মিশ্রিত আখ্যানে সুদূর অতীতের দিকে যাত্রা করেছেন, পক্ষান্তরে ইতিহাস-নির্ভর আখ্যানের তলদেশের ইতিহাস তাঁর ‘টাটকা স্মৃতি’— প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বয়ান। আবার সুদূর অতীতকে তিনি বর্তমানের পটেও নির্মাণ করেছেন। তাই তার নির্মিত ইতিহাস ও মিথ-পুরাণের কারবালার যুদ্ধ মিশে যায় ভাগীরথীর মোহনায় আর আদিম সময়ের ধারা বেয়ে নারীর জীবন হয়ে ওঠে স্বজনহারা কারবালার বিষাদ-সংগীত। অতীত কেবল উর্বর কল্পনা নয়, তার মূল্যবোধ ও ভাব-অনুভূতি আজকের দুনিয়ার সঙ্গে না মিললেও মানুষ ও তার সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাসটুকু আমাদের বুঝতে সাহায্য করে

নিঃসন্দেহে। *হিব্রু বাইবেল*-এর ভাষা-সংকট এবং তাঁর আখ্যানে মরুভূমির মানুষদের ভাষা সমস্যা আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসকে বেঁধে দেয় একসূত্রে। তাঁর পুরাণ-মিশ্রিত আখ্যানের বিষয়বস্তু, ভাবাদর্শ, লেখনশৈলী বা লেখনভঙ্গি আমাদের অতীতের দিকে যেমন ধাবিত করে সেইসঙ্গে আচমকা মোচড় দিয়ে টেনে নিয়ে আসে বাস্তবের দ্বন্দ্ববিদীর্ণ আঙিনায়। *মরুস্বর্গ* বা *রাজাবলি*-র মতো মধ্যপ্রাচ্যের পুরাণের পুনর্কথন-মূলক উপন্যাস আমরা আর পেলাম না, *হিব্রু বাইবেল*-এর সমস্যার আদিতে গিয়ে লেখকের এ উপন্যাস রসদ সংগ্রহ করে বিশ্বব্যাপ্ত সমগ্রতায় পৌঁছতে চেয়েছিল— বাংলা ভাষায় প্রাচীন পুরাণের পুনর্কথন-মূলক এমন উপন্যাস আর কখনও লেখা হবে কিনা মহাকাল তার উত্তর দেবে নিশ্চয়। কিংবা সাতের দশকের একশ্রেণির বামপন্থী যুবাদের প্রতিবাদ, ক্লান্তি এবং শেষমেশ টিকে থাকার ভয়াবহ অস্থিরতাকে তিনি প্রত্যক্ষদর্শী বয়ানের মতো করে বিবৃত করে শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছিলেন, জরুরি অবস্থার সমাপ্তি ঘোষণা হওয়ার পর তাঁর আখ্যানের নায়ক, সেই বিক্ষুব্ধ যুবা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে গ্রামের পথে পাড়ি দিয়েছিল, আমরা অপেক্ষায় ছিলাম তার পরবর্তী সময়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একরাশ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, সে সম্ভাবনাও হয়তো অধরাই রয়ে গেল।

মিথ-পুরাণ নির্ভর সাহিত্য এত বেশি রচিত হলেও মিথ-পুরাণের জনপ্রিয়তা কি সেই তুলনায় বাড়ছে? এইসময়ে বিজ্ঞানের দৌলতে বিশ্বায়ন মানুষের বোধ ও বোধির চারপাশে থাকা বসিয়ে সামনের জগৎটাই পাল্টে দিচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। যদিও গ্রামীণ সমাজ তার প্রভাব ব্যাপক আকারে পড়েনি। নাগরিক সমাজে যৌথ পরিবার ভেঙে ‘নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি’ গড়ার প্রবণতা, মিথ-পুরাণের গল্প বলার মানুষের থেকে বর্তমানের শিশুদের ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, পাশাপাশি মিথ-পুরাণের গল্পের বিকল্প হিসাবে দেশ-বিদেশের হাজারো শিশুসাহিত্য তাদের সামনে এলেও শোনার আনন্দ থেকে কি বঞ্চিত হচ্ছে না?

অন্যদিকে শিশু বা কিশোরদের (গ্রামীণ জনমানসে অত্যাধিক) মনোজগৎ-কে গ্রাস করেছে প্রযুক্তি নির্ভরতা— যা গল্প শোনার আগ্রহ ক্রমশ কমিয়ে দিচ্ছে। পক্ষান্তরে, একইসঙ্গে স্বীকার করতে হয়, বিশেষত, সাম্প্রতিক সময়ের ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি আবার যেন কোথাও পৌরাণিক গল্পের গৌরবময়তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে শিশুদের চেতনাবিশ্বে। ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে রাজনীতির দৌড়ঝাঁপ, সাধারণ মানুষের ভক্তিকে আশ্রয়, ধর্ম-ব্যবসায়ীদের ভয়কে অস্ত্র ইত্যাদি বিষয়গুলির কারণে পুরাণ-নির্ভরতা যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাশাপাশি একটা ‘ডিসকোর্স’ এর ‘কাউন্টার’ হিসাবে বিরুদ্ধ বা ‘কাউন্টার ডিসকোর্স’ নির্মাণ হচ্ছে।

আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভ-এ কথাকার আবুল বাশারের পুরাণ-মিশ্রিত আখ্যানগুলির পুরাকথার পরিগ্রহণের উপরই আমরা জোর দিয়েছিলাম। বস্তুত, তত্ত্বগত দিকটি অনালোচিত রয়ে গেছে। ভবিষ্যতে কোনও গবেষক সেইদিকে দৃষ্টিপাত করবেন, সে সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করবেন— এই আশাবাদী প্রত্যয় রেখে আমরা আমাদের আলোচনার ইতি টানলাম।

পরিশিষ্ট

ক. আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি ও উর্দু শব্দের তালিকা

- আউলিয়া - আরবি শব্দ। বৈরাগী বা দরবেশ, আল্লাহর প্রিয় সিদ্ধ পুরুষ।
- আকিকা - আরবি শব্দ। নবজাত শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠানে পশু উৎসর্গ (পশু জবাই) করে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও দীন-দুঃখীদের মধ্যে মাংস বন্টন।
- আখেরাত - আরবি শব্দ। মৃত্যু পরবর্তী জীবন। পরকাল।
- আজরাইল - আরবি শব্দ। ইসলামি ধর্ম মতে, মৃত্যুর ফেরেশতা, যিনি ‘মালাকুল মউত’ নামে পরিচিত। যিনি জীবের প্রাণ সংহার করেন।
- আজাজিল - আরবি শব্দ। শয়তান বা জ্বিনদের সর্দার। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করার পর আজাজিল নামক জ্বিনকে আদমকে সিজ্দা (মাথা নত করা) করতে বললে আজাজিল তা অস্বীকার করে এবং আল্লাহর অভিশাপগ্রস্ত হয়ে পৃথিবীতে নির্বাসিত হয়। একসময় আজাজিল ছিলেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম দাস। এমন বিচক্ষণ জ্বিন খোদার অবাধ্যতা করার ফলস্বরূপ আল্লাহর আসমান থেকে বিতাড়িত হয়। খোদাকে সে হারাতে পারে না, আবার নিজেও পরাজিত হয় না, অর্থাৎ পরাজয়কে মেনে না নিয়ে যুদ্ধ করে খোদার বিরুদ্ধে। ইবলিশের প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ প্রজাতিকে পথভ্রষ্ট করে তাদের দলভুক্ত করা। আজাজিল হলেন ইবলিশদের সর্দার। পরকালে ইবলিশের স্থান হবে জাহান্নাম বা নরক।
- আজাজিলের ছাওয়াল - আজাজিলের সন্তান বা অনুসারী। গ্রামীণ মুসলমান সমাজে ‘অবাধ্য ছেলেদের’ প্রতি ‘স্ল্যাং’ অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- আজান - আরবি শব্দ। এর অর্থ ঘোষণা বা আহ্বান। মুসলমানদের নামাজ পড়ার জন্য উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করা।
- আজাব - আরবি শব্দ। শাস্তি, সাজা, দুর্ভোগ।
- আতর - আরবি ‘ইতর’ শব্দ থেকে উদ্ভূত। পুষ্পনির্যাস বা সুগন্ধি।

- আদব কায়দা - আরবি শব্দবন্ধ। শিষ্টাচার, ভদ্রতা, সভ্য সমাজের রীতিনীতি।
- আদমি - আরবি শব্দ। আদম সন্তান থেকে উদ্ভূত। মূলত পুরুষ মানুষ বা ব্যক্তি বোঝায়।
- আপা - উর্দু শব্দ। বড়ো বোন বা দিদি। বয়োজ্যেষ্ঠা অপরিচিতা মহিলা বা শিক্ষয়িত্রীর প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ।
- আবদাল - আরবি শব্দ। দরবেশ বা সাধু ব্যক্তিবৃন্দ।
- আবরু - ফার্সি শব্দ। মর্যাদা, আভিজাত্য, সম্মান, পর্দা, ইজ্জত। বিশেষত নারীর সম্মান অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- আবাবিল - আরবি শব্দ। আক্ষরিক অর্থ ঝাঁক বা দল। একপ্রকার ছোট পাখি বিশেষ। কোরানের ১০৫-তম সূরা ফিল-এ আবাবিল পাখির কথা রয়েছে।
- আবে জমজম - ফার্সি ‘আব’ এবং আরবি ‘জমজম’-এর যুগ্ম শব্দবন্ধ। ফার্সি ‘আব’ শব্দের অর্থ জল। জমজম হল মক্কার সুপ্রসিদ্ধ কূপ। ইসলাম ধর্ম মতে, নবি হজরত ইব্রাহিম ও হাজেরা বিবির পুত্র শিশু ইসমাইলের পদাঘাতে এ কূপের সৃষ্টি হয়। সন্তান প্রসবের পর যখন হাজেরা বিবি জলের জন্য ছোট্টাছুটি করেছিলেন তখন আল্লাহ শিশু ইসমাইলের পায়ের আঘাতে এ কূপের সৃষ্টি করেন। সারা বিশ্বের মুসলমান অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এ জল পান করেন। হজ্জ যাত্রীরা এ জল বোতলবন্দি করে নিয়ে আসেন।
- আমপারা - আরবি ‘আম্মাহ্’ ও ফার্সি ‘পারা’-র যুগ্ম শব্দবন্ধ। কোরানের ত্রিশতম বা শেষ খণ্ড যার প্রথম শব্দ আম, তা থেকে এই খণ্ডের নাম আমপারা।
- আমলনামা - আরবি ‘আমল’ ও ফার্সি ‘নামাহ্’-এর মিলিত রূপ। ইসলাম ধর্ম মতে, মানুষ ও জ্বীন প্রজাতির ভালো-মন্দ কার্যাবলির বা পাপপুণ্যের হিসাবপত্র বা প্রমাণপঞ্জি। কথিত আছে, শেষ বিচারের দিন যাদের ডানহাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা স্বর্গে প্রবেশ করবে এবং যাদের বামহাতে দেওয়া হবে তারা নরকবাসী হবে।
- আমিরুল মোমেনিন - আরবি ‘আমির-আল-মু মিনিন’-এর অর্থ বিশ্বাসী বা মুমিনদের নেতা। হজরত মুহম্মদের প্রতিনিধি বা খলিফা।

- আশিয়া - আরবি শব্দ। নবি শব্দের বহুবচন। নবিগণ বা পয়গম্বরগণ।
- আন্মা - আরবি 'উম্মিন' বা 'উম্মি' শব্দ থেকে আন্মা শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ জননী বা মাতা।
- আয়াত - আরবি শব্দ। কোরানের বাক্য বা বাক্যাংশ বা শ্লোককে আয়াত বলা হয়।
- আরশ - আরবি শব্দ। আল্লাহ্র সিংহাসন।
- আলহামদুলিল্লাহ্ - আরবি শব্দবন্ধ। এর অর্থ হল 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য'। আল্লাহ্-কে ধন্যবাদ জানানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। মুসলিমরা তাদের ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা বর্ণনা ও প্রশংসার জন্য এই বাক্যাংশটি ব্যবহার করেন।
- আলামত - আরবি শব্দ। লক্ষণ বা চিহ্ন।
- আল্লাহ্র আরশ - আরবি শব্দবন্ধ। আল্লাহ্র সিংহাসন। স্বর্গের উচ্চতম স্থান।
- আল্লাহ্র কালাম - আরবি শব্দবন্ধ। 'কালাম' শব্দের অর্থ বাণী, কথা, উক্তি বা বাক্য। 'আল্লাহ্র কালাম' বলতে মূলত মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরানকে বোঝানো হয়।
- আল্লাহ্র কিরা - কিরা শব্দের অর্থ শপথ বা দিব্যি। অর্থাৎ আল্লাহ্র নামে শপথ বা দিব্যি।
- আশরাফি - আরবি শব্দ। মোহর বা স্বর্ণমুদ্রা।
- আশরাফুল মাখলুকাত - আরবি 'আশরাফুল' শব্দের অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 'মাখলুকাত' শব্দের অর্থ প্রজাতি। ইসলামি শাস্ত্রে মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বলা হয়েছে। অর্থাৎ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাতি।
- আশুরা - আরবি 'আশুরা' শব্দের অর্থ দশ। আরবি বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস মহরম-এর দশম দিন। এই দিনে হজরত ইমাম হোসেন কারবালা যুদ্ধে শহীদ হন।
- আসর - ফার্সি 'আসর' বলতে মূলত সভা, বৈঠক বা মজলিস, আড্ডা বোঝায়। আরবিতে 'আসর' শব্দের অর্থ চিহ্ন বা প্রভাব। এছাড়া আসর হল বিকেলের নামাজ। মুসলমানদের অবশ্যপালনীয় কৃত্য।

- আসহাবে কাহাফ - আরবি শব্দবন্ধ। এর অর্থ গুহার যুবকগণ। কোরানের ১৮-তম সূরাতে উল্লেখিত সাতজন যুবক যারা অত্যাচার থেকে বাঁচতে এবং ধর্ম রক্ষার্থে একটি গুহায় প্রবেশ করে দীর্ঘকাল ঘুমিয়েছিল। ইসলাম পূর্ববর্তী ইহুদি ও খ্রিস্টীয় লোককথায় এ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।
- আহজাব - আরবি শব্দ। দল, গোষ্ঠী, বাহিনী।
- আহলে হাদিস - ইসলাম ধর্ম মতে, কোরান ও হাদিসের একচ্ছত্র অনুসারী।
- ইকরার - আরবি শব্দ। অঙ্গীকার বা স্বীকার।
- ইত্তেফাক - আরবি শব্দ। ঘটনা বা দুর্ঘটনা, আকস্মিকতা, মিল বা ঐক্য।
- ইদত/ইদত পালন - আরবি শব্দ। ইসলামি শরিয়ত অনুসারে, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম নারীর পুনর্বিবাহের পূর্ববর্তী তিন মাস দশ দিন ইদতকাল।
- ইনসান - আরবি শব্দ। মূলত মানুষ বোঝায়।
- ইনসানিয়াত - আরবি শব্দ। মনুষ্যত্ব বা মানবতা।
- ইনাম - আরবি শব্দ। পুরস্কার বা বকশিস।
- ইন্তেকাল - আরবি শব্দ। মৃত্যুবরণ করা।
- ইন্তেজার - আরবি শব্দ। অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা।
- ইন্না আতায়না কল্ কওসার - কোরানের ১০৮-তম সূরার প্রথম বাক্য। এর অর্থ- নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউসার (বা প্রভূত কল্যাণ) দান করেছি। আল্লাহ্ হজরত মুহম্মদের উদ্দেশ্যে একথা বলেছেন।
- ইবলিশ - আরবি শব্দ। কোরানে উল্লেখিত শয়তানের আর এক নাম। যারা মূলত আজাজিলের অনুসারী। দ্রষ্টব্য আজাজিল।
- ইমাম - আরবি শব্দ। এর অর্থ নেতা। জামাতের নামাজে যে ব্যক্তি নামাজ পরিচালনা করেন এবং মুক্তাদির (যাঁরা ইমামের পেছনে থাকেন) যাঁকে অনুসরণ করেন। নামাজে নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি।

- ❑ ইমামতি - আরবি ইমামাত। নামাজের নেতৃত্ব দান করা। ইমামের কাজকে ইমামতি বলা হয়।
- ❑ ইয়া-নফসি - আরবি 'ইয়া-নফসি'-র অর্থ 'হায়! আমার নিজের কী হবে'। ইসলাম ধর্ম মতে, কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের দিন প্রতিটি মানুষ এ শব্দ মুহূর্মুহ উচ্চারণ করবে।
- ❑ ইল্লত - আরবি শব্দ। নোংরা, মলিন।
- ❑ ইল্লিন - আরবি শব্দ। জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান। পুণ্যবানদের আত্মা বা রুহ যে স্থানে রাখা হয়।
- ❑ ইসমাইল লুঙ্গি - 'ইসমাইল' নামক ব্রাহ্মের লুঙ্গি।
- ❑ ইস্ক - আরবি 'ইশক্' শব্দের অর্থ প্রেম, প্রণয়, ভালোবাসা, আসক্তি বা অনুরাগ।
- ❑ ঈদগাহ্ - আরবি 'ঈদ' ও ফার্সি 'গাহ্' শব্দের মিলিত রূপ। ঈদের নামাজ পড়ার জন্য উন্মুক্ত ও বিস্তীর্ণ ময়দান বা মসজিদ।
- ❑ উজির - আরবি 'ওয়াজির' থেকে উদ্ভূত। অমাত্য বা মন্ত্রী।
- ❑ উম্মত - আরবি শব্দ। শিষ্য, অনুগামী, অনুসারী, জাতি, সম্প্রদায়।
- ❑ এক লাখ ২৪ পীর পয়গম্বর - ইসলামি ধর্মীয় পুস্তকগুলিতে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার (মতান্তরে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার) নবি-রসুলের পৃথিবীতে আগমনের কথা বলা হয়েছে। গ্রামীণ মুসলমান সমাজে ধর্মীয় পুস্তকের কথা ধরেই এমন শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- ❑ একিন - আরবি ইয়াক্বীন, অর্থ- প্রত্যয় বা অবিচল বিশ্বাস।
- ❑ এখলাস/ইখলাস - আরবি শব্দ। বিশুদ্ধ বিশ্বাস বা আনুগত্য। কোরানের ১১২-তম সুরার নাম এখলাস। এই সুরাতে আল্লাহ্র একত্ববাদের কথা বলা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম মতে, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুরা।
- ❑ এজিন - আরবি শব্দ। মুসলমানদের বিয়েতে কনে প্রদত্ত সম্মতি বা অনুমতি।

- এৎকাফ - আরবি শব্দ। ধ্যানমগ্ন উপাসনা। কোনও কক্ষে নির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান। বিশেষত, আরবি বর্ষপঞ্জির রমজান মাসের (রোজার মাস) শেষভাগে নির্দিষ্টকালের জন্য মসজিদে অবস্থান।
- এতিম - আরবি 'ইয়াতিম' থেকে উদ্ভূত। পিতৃমাতৃহীন সন্তান, অনাথ।
- এবাদত - আরবি শব্দ। উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা।
- এশা - আরবি শব্দ। রাতের নামাজ। দিনের পাঁচবার নামাজের শেষতম নামাজ। মুসলমানদের অবশ্যপালনীয় কৃত্য।
- ওজু - আরবি শব্দ। এর অর্থ পবিত্রতা বা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। নামাজের পূর্বে মুখ হাত পা ধোয়াকে ওজু বলে।
- ওজু ভাঙা - ওজু সম্পূর্ণ করার পর যে বিধিগুলি ভঙ্গ করলে ওজু নষ্ট হয়ে যায়। ইসলামি শরিয়তে ওজু ভাঙার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।
- ওয়াক্তি নামাজ - আরবি 'ওয়াক্ত' শব্দের অর্থ সময়। নির্ধারিত সময়ের নামাজকে ওয়াক্তি নামাজ বলা হয়।
- ওয়াক্তি মুসল্লি - যিনি প্রতি ওয়াক্তের নামাজ পড়েন।
- ওয়াজ - আরবি শব্দ। ইসলামি ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা।
- ওয়াদা - আরবি শব্দ। অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, কথা দেওয়া।
- ওয়ারিশ - আরবি শব্দ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তি। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি।
- ওষুধ করা - গ্রামীণ মুসলমান সমাজে তাবিজ-মন্ত্রের দ্বারা বশীকরণ। মন্ত্রের সাহায্যে মানুষের উপর জাদুটোনার ইতিহাস ইসলামি পুরাণের কোরানেও উল্লেখ রয়েছে। স্বয়ং হজরত মুহম্মদ জাদুটোনার কবলে পড়েছিলেন তাঁর নবি জীবনের সময়ে। কোরানের শেষতম দুই সূরা- ১১৩ সংখ্যক সূরা ফালাক এবং ১১৪ সংখ্যক সূরা নাস-এ এ ঘটনার বিশদ বর্ণনা রয়েছে। গ্রামীণ মুসলিম সমাজে একে 'বাণ মারা'ও বলা হয়।

- ❑ ওহি - আরবি শব্দ। ‘ওহি’ শব্দের অর্থ বার্তা বা প্রত্যাদেশ। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফেরেশতা জিবরাইলের মাধ্যমে নবি-রসুলদের নিকট প্রেরিত বার্তা।
- ❑ ঔরত - আরবি শব্দ। নারী, মহিলা, স্ত্রীলোক।
- ❑ কউম - আরবি ‘ক্বওম’-এর অর্থ গোষ্ঠী, গোত্র, জাতি বা সম্প্রদায়।
- ❑ কতল - আরবি শব্দ। হত্যা, খুন।
- ❑ কদমবুশি - ‘কদম’ শব্দের অর্থ পা এবং ‘বুশি’ শব্দের অর্থ চুম্বন। কদমবুশি বলতে পদচুম্বন বোঝায়।
- ❑ কফু - আরবি শব্দ। সমকক্ষ বা সমতুল্য।
- ❑ কবরের তিনটি প্রশ্ন - ইসলামি ধর্ম মতে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করানোর পর আল্লাহ্র দু’জন ফেরেশতা (মুনকার ও নকির) ৩-টি প্রশ্ন করবেন, যথা- ১. মান রাব্বুকা (তোমার রব কে?), ২. মান দ্বীনুকা (তোমার ধর্ম কী?), ৩. মান নাবীয়ুকা (তোমার নবি কে?)।
- ❑ কবুল - আরবি শব্দ। সম্মতি, স্বীকার বা অনুমোদন। বিয়ের প্রস্তাবে বা চুক্তিতে সম্মতি।
- ❑ কলব্ - আরবি শব্দ। এর অর্থ হৃদয় বা মন।
- ❑ কলমা সিদ্ধ সহধর্মিনী - ইসলাম ধর্মে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতিক্রমে (কবুল উচ্চারণ) বিবাহ হয়। সম্মতি জ্ঞাপনের সময় বর-কনেকে ইসলামের মূলমন্ত্র পাঠ করানো হয়। শাস্ত্র অনুমোদিত মুসলমান পুরুষের বিবাহিতা স্ত্রীকে ‘কলমা সিদ্ধ সহধর্মিনী’ বলা হয়।
- ❑ কলেমা - আরবি শব্দ। ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র ও মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসজ্ঞাপক বাক্য।
- ❑ কসম - আরবি শব্দ। শপথ বা দিব্যি।
- ❑ কাফন - আরবি শব্দ। মুসলমানদের মৃতদেহ স্নান করানোর পর যে সাদা কাপড় পরানো হয়।

- কাফ্ফারা - আরবি শব্দ। এর অর্থ জরিমানা। ইসলামি শাস্ত্র অনুসারে, পাপ স্বলনের জন্য শরিয়ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট জরিমানা বা কৃত অপরাধের জন্য অর্থ বা অন্যবিধ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।
- কাবা শরীফ - আরবি শব্দবন্ধ। মক্কার পবিত্র ঘর, যাকে ‘আল্লাহর ঘর’ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের সিজ্‌দা নির্দেশক কেন্দ্র। ইসলাম ধর্ম মতে, কাবাসরীফ বা মহান কাবাগৃহ প্রথম নির্মাণ করেছিলেন নবি হজরত ইব্রাহিম।
- কাবিরাহ্ গুনাহ্ - আরবি ‘কাবিরাহ্’ ও ফার্সি ‘গুনাহ্’-এর যুগ্ম শব্দবন্ধ। কাবিরাহ্ অর্থ বড়ো এবং গুনাহ্ অর্থ পাপ। ইসলামি শাস্ত্র অনুসারে যে গুনাহ্ (পাপ) তওবা (বিশেষভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করা) ব্যতীত মাফ হয় না। যেমন- মিথ্যে কথা বলা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষ খুন করা প্রভৃতি কাবিরাহ্ গুনাহ্-র অন্তর্ভুক্ত।
- কাবুস - আরবি শব্দ। প্রাচীন মিশরের রাজাদের উপাধি বিশেষ।
- কামিয়াব - ফার্সি শব্দ। সফল বা কৃতকার্য হওয়া।
- কামেল - আরবি শব্দ। সিদ্ধ বা পূর্ণাঙ্গ। সিদ্ধপুরুষ বা সাধুব্যক্তি বোঝায়।
- কায়েদা - আরবি শব্দ। আরবি বর্ণমালা ও বানান শিক্ষার প্রাথমিক পুস্তক।
- কারবালা - আরবি শব্দ। ইরাক দেশে অবস্থিত ইতিহাসখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র।
- কালাম - আরবি শব্দ। বাণী, কথা, উক্তি বা বাক্য।
- কাসিদ - আরবি শব্দ। দূত, বার্তা বা পত্রবাহক।
- কিতাব - আরবি শব্দ। পুস্তক, গ্রন্থ, বই।
- কিতাব কোরান - আরবি শব্দবন্ধ। ইসলামি ধর্মীয় গ্রন্থ। কোরান এবং হাদিস জাতীয় গ্রন্থ।
- কিব্‌তি - আরবি শব্দ। প্রাচীন মিশরের জাতি-বিশেষ। বিশেষত নবি মুসার সময়কালের মিশরীয় জাতিদের ‘কিবতি’ নামে অভিহিত করা হয়েছে।
- কিমত - আরবি শব্দ। দাম বা মূল্য।

- কিরা - শপথ বা দিব্যি।
- কিশ্তি টুপি - ফার্সি 'কাশ্তি' এবং উর্দু 'টুপি'-র যুগ্ম শব্দবন্ধ। যে টুপি নৌকার মতো দেখতে। নৌকা আকারের টুপি।
- কিসসা - আরবি শব্দ। গল্প বা কাহিনি বোঝায়, আবার কুৎসা বা নিন্দাও বোঝায়।
- কিসিম কেছা - আরবি শব্দবন্ধ। কিসিম অর্থ রকম, প্রকার, ধরন। হরেকরকম গল্পের সমাহার।
- কিস্তি - ফার্সি 'কিস্তি' বলতে ডিঙি, নৌকা বা জাহাজ বোঝায়।
- কুদরত - আরবি শব্দ। এর অর্থ মহিমাবিশেষ। ক্ষমতা বা অলৌকিক শক্তি।
- কুন্ - আরবি 'কুন্' শব্দের অর্থ হওয়া বা ঘটা। ইসলামি ধর্ম মতে, আল্লাহ্ কোনও কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে কুন্ শব্দ উচ্চারণ করেন এবং তৎক্ষণাৎ তা সৃষ্টি হয়ে যায়।
- কুরবানি - আরবি 'করব' বা 'কুরবান' শব্দের উর্দু ও ফার্সি রূপ হল 'কুরবানি'। ইসলামি শাস্ত্র অনুসারে, আরবি বর্ষপঞ্জির জিলহজ্জ মাসের ১০-১১-১২ তারিখে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পশু জবাই বা উৎসর্গ করা। জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম উৎসব ঈদুল-আজ্হা বা ঈদুজ্জোহা বা বকরিদ অনুষ্ঠিত হয়। যাকে চলতি কথায় 'কোরবানির ঈদ'ও বলা হয়।
- কুলখতম - মুসলমান পরিবারে কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার আত্মার শান্তি কামনায় কোরান পাঠ। সাধারণত তিন দিন, চার দিন বা সাত দিন পর 'কুলখতম বা 'কুলখানি'-র আয়োজন করা হয়। স্থানভেদে কুলখতম পালনের নিয়মে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।
- কেয়ামত - আরবি 'কিয়ামাহ্' থেকে কিয়ামত শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। শেষ বিচার বা মহাপ্রলয়ের দিনকে কেয়ামত বলা হয়। ইসলামি ধর্ম মতে, মৃতদের পুনরুত্থানের পর আল্লাহ্ মানুষ ও জ্বীন জাতির পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন।
- কেয়াত - আরবি শব্দ। আরবি ব্যাকরণের রীতি মেনে বিশুদ্ধ কোরান পাঠ।
- কেব্লা - আরবি শব্দ। দুর্গ, সেনানিবাস।

- কোরান খতম - খতম আরবি শব্দ। যার অর্থ শেষ বা সমাপ্ত। কোরানের ত্রিশটি পারা (খণ্ড বা অনুচ্ছেদ)-র পাঠ ধারাবাহিকভাবে শেষ করাকে কোরান খতম বলা হয়।
- কাজা নামাজ - ‘কাজা’ শব্দের আরবি অর্থ দেরি করা। ধর্মীয় অবশ্যপালনীয় কৃত্য বা নামাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পাদনা করতে না পারলে তা পরে পালন করলে তাকে কাজা নামাজ বলে।
- ক্বারি - আরবি শব্দ। এটি একটি উপাধি। যিনি আরবি ব্যাকরণ মেনে বিশুদ্ধ উচ্চারণে এবং সুমিষ্ট স্বরে কোরান পাঠ করেন।
- খতনা - আরবি শব্দ। ইসলাম ধর্মাবলম্বী পুত্র সন্তানদের লিঙ্গগ্রভাগের ত্বকছেদন (Circumcision)। ইসলামি ধর্ম মতে, সুন্নত। যাকে চলতি কথায় মুসলমানিও বলা হয়। প্রধানত ইহুদি ও ইসলাম ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী লিঙ্গগ্রভাগের ত্বকছেদন।
- খতিব - আরবি ‘খতিব’ অর্থ বক্তা বা ধর্মবক্তা, মূলত যিনি ‘খুৎবা’ পাঠ করেন। এবং ইমামের অনুপস্থিতিতে যিনি ইমামের কাজ সম্পাদনা করেন। সহকারী ইমাম।
- খবিশ - আরবি শব্দ। অপরিচ্ছন্ন বা নোংরা। বাঙালি মুসলমান সমাজে ‘স্ল্যাং’ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- খয়রাত - আরবি শব্দ। ভিক্ষা বা দান। পরকালে পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে দরিদ্র মানুষকে দান করা।
- খলিফা - আরবি শব্দ। এর অর্থ প্রতিনিধি। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর মুসলিম রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রধান শাসনকর্তা ও ধর্মীয় নেতা।
- খাদিজা-তুল-কুবরা - আরবি শব্দবন্ধ। খাদিজা ছিলেন হজরত মুহম্মদের প্রথম স্ত্রী। মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ‘কুবরা’ শব্দের অর্থ হল সফল বা বিজয়ী। ‘খাদিজা-তুল-কুবরা’ বলতে মূলত মহীয়সী বা বিজয়িনী নারীকে বোঝানো হয়।
- খায়েশ - ফার্সি ‘খাহিশ’ থেকে উদ্ভূত। তীব্র ইচ্ছা, কামনা, বাসনা।

- ❑ খারিজি মাদ্রাসা - আরবি শব্দবন্ধ। সরকার পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা বহির্ভূত মুসলমানদের নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে অবশ্য বহু খারিজি মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষাদানের পাশাপাশি অন্যান্য সাধারণ বিষয়ও পড়ানো হয়।
- ❑ খালাস - আরবি শব্দ। মুক্তি, শান্তি, তৃপ্তি। বাংলার গ্রামীণ মুসলমান সমাজে সন্তান প্রসব বা গর্ভমোচন অর্থেও ব্যবহৃত হয়।
- ❑ খুৎবা - আরবি শব্দ। শুক্রবার জুম্মা নামাজের পূর্বে এবং ঈদের নামাজের পরে ইমাম প্রদত্ত আরবি অভিভাষণ।
- ❑ খুয়াব - ফার্সি ‘খোয়াব’ -এর আঞ্চলিক উচ্চারণ। স্বপ্ন, অলীক কল্পনা।
- ❑ খোদা - ফার্সি শব্দ। যিনি নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সমার্থক শব্দ।
- ❑ খোদা হাফেজ - ফার্সি ‘খোদা’ এবং আরবি ‘হাফিজ’ শব্দ সহযোগে গঠিত। আল্লাহ্র রক্ষাকারী। মুসলমানদের বিদায় সম্ভাষণ।
- ❑ খোদার ওয়ালি - আরবি ‘ওয়ালি’ শব্দের অর্থ শাসনকর্তা বা শাসক। ‘খোদার ওয়ালি’ অর্থাৎ আল্লাহ্র মনোনীত শাসক।
- ❑ খোদার কালাম - আরবি ‘কালাম’ শব্দের অর্থ বাণী, কথা, উক্তি বা বাক্য। ‘খোদার কালাম’ বলতে মূলত মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরানকে বোঝায়।
- ❑ খোদার কিরা - খোদার নামে দিব্যি বা শপথ।
- ❑ খোদার মক্কর - আরবি ‘মক্কর’ শব্দের অর্থ লীলা বা ছলনা। অর্থাৎ খোদার লীলা।
- ❑ খোদার হামদ - আরবি ‘হামদ’ শব্দের অর্থ প্রশংসা। খোদা বা আল্লাহ্র প্রশংসামূলক কবিতা বা গজলকে খোদার হামদ বলা হয়।
- ❑ গজল - আরবি শব্দ। মূলত ধর্মীয় সংগীত বা কবিতা বোঝায়। আল্লাহ ও হজরত মুহম্মদের প্রতি প্রেমমূলক প্রশংসা।
- ❑ গুনা/গুনাহ - ফার্সি শব্দ। এর অর্থ- পাপ, অপরাধ, দোষ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ।
- ❑ গুনাহ্গার - ফার্সি শব্দ। পাপী বা অপরাধী।

- গেলেমান/গিলমান - গেলেমান বা গিলমান (বিশেষ্য) আরবি ভাষার একটি শব্দ। হজরত মুহম্মদ পূর্ববর্তী সময়ে যার অর্থ ছিল ক্রীতদাস বা সেনাবাহিনীর ভাড়াটিয়া সৈন্য। কোরান রচিত এবং সংকলিত হওয়ার পর কোরানের ভাষ্য অনুযায়ী, গেলেমান বলতে বোঝায়, বেহেশতের সেবকবৃন্দ। যাদের মূলত চিরকিশোর নামে অভিহিত করা হয়েছে। কোরানের বর্ণনা অনুযায়ী, তাদের উজ্জ্বলতা ও উপস্থিতি হবে ছড়িয়ে থাকা মুক্তোর মতো। জান্নাতে পুরুষদের জন্য যেমন হুর প্রদান করা হবে, তেমনি নারীদের জন্য থাকবে গেলেমান। স্বর্গবাসী নারীদের আনন্দ দেওয়াই হবে গেলেমানদের প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ।
- গোর আজাব - ফার্সি ‘গোর’ হল কবর বা সমাধি এবং আরবি ‘আজাব’ বলতে শাস্তি বোঝায়। পাপের ফল হিসাবে কবরের শাস্তি।
- গোরস্তান - ফার্সি শব্দবন্ধ। কবরস্থান বা সমাধিক্ষেত্র।
- গোসল - আরবি ‘গুসল্’ অর্থ স্নান বা অবগাহন।
- গোসলখানা - স্নানকক্ষ বা স্নানের ঘর।
- ছুটকারা - মুক্তি, নিকৃতি বা অব্যাহতি।
- জবাই - আরবি ‘যবহ্’ থেকে উদ্ভূত। আল্লাহর নামে ধর্মীয় মন্ত্র (বিসমিল্লাহ্ আল্লাহু আকবর) পাঠ করে হালাল পশু-পাখির গলার কিছু অংশ কাটা। ইসলামি শাস্ত্রে ‘অবৈধ’ এবং বলি দেওয়া পশু-পাখির মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ।
- জমজম - দ্রষ্টব্য আবে জমজম।
- জলসা - আরবি শব্দ। আসর, বৈঠক, মজলিস, সমাবেশ। মুসলমানদের ধর্মীয় জনসভা।
- জলের ফেরেশতা - ইসলামি মিথ অনুসারে হজরত খিজিরকে ‘জলের ফেরেশতা’ বলা হয়। কথিত আছে, খিজির ‘আবে হায়াত’ (জীবনবারি বা অমৃতবারি) পান করার পর অমরত্ব লাভ করেছেন। বর্তমানে তাঁর আবাস জলের তলদেশে।
- জহর কহর - ফার্সি ‘জহর’ অর্থ বিষ বা গরল এবং আরবি ‘কহর’ অর্থ অত্যাচার বা উপদ্রব। কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা এবং হজরত মুহম্মদের দৌহিত্রদ্বয় হাসান-হোসেনের মৃত্যুকে ঘিরে এ শব্দবন্ধ মুসলমানদের কাছে খুব পরিচিত।

হাসানের মৃত্যু হয় বিষপানে এবং হোসেন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। এ শব্দবন্ধের ব্যবহার কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাতেও রয়েছে: ‘হাসানের মতো পি’ব পিয়ালা সে জহরের/ হোসেনের মতো নিব বুকে ছুরি কহরের’।

- জাকাত - আরবি শব্দ। ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ বা অবশ্যপালনীয় কৃত্যের মধ্যে অন্যতম। কোনও মুসলমান যদি তার নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের মালিকানা কমপক্ষে এক বৎসর (আরবি বর্ষপঞ্জি অনুসারে ৩৫৪ দিন) ভোগ করে তাহলে সেই সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দান করাটা তার আবশ্যিক কর্তব্য।
- জান কবজ - আরবি শব্দবন্ধ। প্রাণ হস্তগত বা প্রাণ হরণ করা। মৃত্যুর দূত আজরাইল কর্তৃক মানুষের প্রাণ সংহার।
- জান বাঁচানো ফরজ - ফরজ হল ইসলাম অনুসারীদের অবশ্যপালনীয় কৃত্য। ইসলামি শাস্ত্র অনুসারে, নিজের প্রাণ রক্ষাও এই কৃত্যের অন্তর্ভুক্ত। সেই কারণে ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা মহাপাপ বলে গণ্য।
- জানাজা - আরবি শব্দ। কফিনে শোয়ানো মৃতদেহকে সামনে রেখে একজন ইমামের পরিচালনায় মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনার জন্য দাঁড়িয়ে যে নামাজ পড়া হয়।
- জান্নাত - আরবি শব্দ। আক্ষরিক অর্থ বাগান বা উদ্যান। মৃত্যুর পর পুণ্যবানদের বাসস্থান। যার অন্য নাম স্বর্গ বা বেহেস্ত। কোরানের বর্ণনা অনুসারে, জান্নাতের সংখ্যা আট। জান্নাতুল ফিরদাউস, দারুল মাকাম, দারুল কারার, দারুস সালাম, জান্নাতুল মাওয়া, দারুল নাদিম, দারুল খুলদ, জান্নাতুল আদন। এই আটটি জান্নাতের মধ্যে ‘জান্নাতুল ফিরদাউস’ হল সর্বশ্রেষ্ঠ।
- জামাত - আরবি শব্দ। জনসমাবেশ। মুসলমানদের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদ, ময়দান বা কোনও স্থানে সমাবেশ।
- জামাত-ই-ইসলাম - মুসলিমদের একাংশ দ্বারা পরিচালিত বিশেষ সংগঠন।
- জায়নামাজ - ফার্সি ‘জায়-নামাজ’। যে আসন পেতে নামাজ পড়া হয় তাকে জায়নামাজ বলে।
- জায়েজ - আরবি। এর অর্থ বৈধ বা আইনসংগত।

- জারি - আরবি শব্দ। প্রবর্তন, প্রয়োগ বা প্রচলন।
- জারিগান - ফার্সি জারি থেকে উদ্ভূত। কারবালা যুদ্ধের ঘটনাকে স্মরণ করে শোক কাহিনি-সংবলিত গান।
- জারিয়াত - আরবি শব্দ। ঝড় বা ঝোড়ো হাওয়া।
- জাহান - ফার্সি শব্দ। জগৎ, দুনিয়া, বিশ্ব।
- জাহিল - আরবি শব্দ। বোকা, নির্বোধ, নিরক্ষর বা মূর্থ।
- জিকির - আরবি শব্দ। উচ্চকণ্ঠে একটানা আল্লাহর নাম উচ্চারণ।
- জিনাহ্/জেনাহ্ - আরবি শব্দ। ইসলামি পরিভাষায় অবৈধ সম্পর্ককে ‘জিনাহ্’ বা ‘জেনাহ্’ বলা হয়। ইসলামি আইনশাস্ত্র অনুসারে, জিনাহ্-এর অন্তর্ভুক্ত হল ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ, অবৈধ যৌনমিলন, সমকামিতা, অজাচার এবং পাশবিকতা প্রভৃতি। বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত নয়। একমাত্র বিবাহিত নারী-পুরুষের যৌনতাই ইসলামি শাস্ত্র অনুমোদন করে। ইসলাম ধর্মে ‘বেশ্যাবৃত্তি’ বা ‘দেহ ব্যবসা’ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
- জিন্দেগি - ফার্সি শব্দ। জীবন বা আয়ুষ্কাল।
- জিবরাইল - আরবি শব্দ। প্রধান চার ফেরেশতার মধ্যে অন্যতম। জিবরাইল ফেরেশতার কাজ হল আল্লাহর আদেশ বা বাণী নবি-রসুলদের নিকট পৌঁছে দেওয়া।
- জিয়াফত - আরবি ‘দ্বিয়াফাহ্’ থেকে উদ্ভূত। ভোজের নিমন্ত্রণ, আহ্বান বা দাওয়াত।
- জিয়ারত - আরবি শব্দ। মৃতের কবর দর্শন ও কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃতের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা।
- জুবান - ফার্সি ‘জবান’ শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ। এর অর্থ ভাষা, কথা, বাণী, বাক্য বা প্রতিশ্রুতি।
- জুম্মা - আরবি ‘জুম্মাহ্’ শব্দের অর্থ একত্রিত হওয়া বা সম্মিলিত হওয়া। শুক্রবার দুপুরের বাধ্যতামূলক বিশেষ নামাজ। ইসলাম ধর্ম মতে, অবশ্যপালনীয় কৃত্য।

- জুম্মাবার - ইসলামি শরিয়ত অনুসারে শুক্রবার।
- জেহাদ/জিহাদ - আরবি শব্দ। ধর্মরক্ষার জন্য আন্দোলন বা যুদ্ধ।
- জোহর - আরবি ‘জুহর’ শব্দের অর্থ অপরাহ্ন। দুপুরের নামাজ। মুসলমানদের অবশ্যপালনীয় কৃত্য।
- জ্বিন - আরবি শব্দ। মানুষের মতোই একপ্রকার প্রজাতি। ইসলামি পুরাণ মতে, এরা আগুন থেকে সৃষ্ট। যারা আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী।
- তওবা/তৌবা - আরবী ‘তাওবাহ্’ অর্থ প্রত্যাবর্তন বা ফিরে আসা। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, কোনও পাপ কাজ করে ফেলার পর গভীরভাবে অনুশোচনাপূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে এমন পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করাকে তওবা বলে।
- তক্দির - আরবি শব্দ। ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল।
- তসবির - আরবি শব্দ। ছবি, চিত্র, প্রতিমূর্তি।
- তসবিহ্ - আরবি শব্দ। মুসলমানদের ব্যবহৃত আল্লাহর নাম বা ধর্মীয় মন্ত্র পাঠ করার জপমালা বিশেষ। গণনার জন্য তসবিতে দানা বা গুটি থাকে।
- তহমেন - ফার্সি ‘তহবন্দ’-এর আঞ্চলিক উচ্চারণ। নিম্নাঙ্গের পরিচ্ছদ, লুঙ্গি।
- তাবিজ কবচ্ - আরবি শব্দবন্ধ। মাদুলি বা মন্ত্রপূত কবচ্।
- তামাদি - আরবি শব্দ। দাবি করার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত।
- তায়াম্মুম - আরবি শব্দ। এর অর্থ হল সংকল্প বা উদ্দেশ্য। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, জল না পাওয়া গেলে বা জল ব্যবহারে অক্ষম হলে পবিত্র মাটি দ্বারা ওজু করার পদ্ধতি। তায়াম্মুম করার জন্য ইসলামি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে।
- তারাবিহ্ - আরবি শব্দ। আক্ষরিক অর্থ বিশ্রাম। রোজার চাঁদ দেখার পর থেকে ঈদের চাঁদ দেখার পূর্বে পর্যন্ত প্রতি রাতে এশার নামাজের পর অতিরিক্ত নামাজ। শরিয়তি ভাষায় এ নামাজ সুন্নত।

- ❑ তালাক - আরবি ‘ত্বলাক’ শব্দের অর্থ হল- বিচ্ছিন্ন হওয়া বা ত্যাগ করা। ইসলামি শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ-বিচ্ছেদ।
- ❑ তালশ - ফার্সি শব্দ। অনুসন্ধান।
- ❑ তালিব - আরবি শব্দ। শিক্ষার্থী বা অন্বেষক।
- ❑ তালিম - আরবি শব্দ। শিক্ষা, উপদেশ, জ্ঞানদান।
- ❑ তালেবুল এলেম - আরবি ‘ইলম্’ শব্দের অর্থ জ্ঞান এবং ‘তালিব’ শব্দের অর্থ শিক্ষার্থী। মসজিদে বা মাদ্রাসায় অবস্থান করে যাঁরা ইসলামি ধর্ম বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করেন তাঁদের তালেবুল এলেম বলা হয়। বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক উচ্চারণে তালবিলিম বলা হয়।
- ❑ তাহাজ্জুদ - আরবি শব্দ। এর অর্থ রাত জাগা। রাত দ্বিপ্রহরের পর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যে নামাজ পড়া হয় তাকে তাহাজ্জুদ নামাজ বলে। ইসলাম ধর্ম মতে, এটি অতিরিক্ত পুণ্য, ইসলামি শাস্ত্রের অবশ্যপালনীয় পঞ্চম কৃত্য বা পাঁচবারের নামাজের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- ❑ তিলাওয়াত - আরবি শব্দ। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে কোরান পাঠ করাকে তিলাওয়াত বলে।
- ❑ তুর পাহাড়ের সূর্য - মিশরের সিনাই পর্বতের অপর নাম তুর পাহাড়। ইসলামি ধর্ম মতে, নবি মুসা এই পর্বতে আল্লাহ্র রূপ দর্শন করেছিলেন। আল্লাহ্র জ্যোতির ছটায় পাহাড় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। কোরানের এ ঘটনা থেকেই মিথ তৈরি হয়েছে যে এই ভস্মীভূত পাহাড় থেকেই সৃষ্টি সূর্যের উৎপত্তি ও ব্যবহার। যদিও ইসলামি শাস্ত্র সূর্য উৎপত্তির ঘটনাকে মান্যতা দেয় না।
- ❑ তোয়াজ - আরবি ত্বওয়াজ। এর অর্থ- সেবায়ত্ত্ব করা, তোষামোদ করা। এছাড়াও স্বার্থসিদ্ধির জন্য খাতির করাও বোঝায়।
- ❑ তৌবাতুন নসিহা - আরবি ‘তৌবা’ কথার অর্থ হল ফিরে আসা। অর্থাৎ পাপ বা অন্যায় কাজ পুনরায় না করার অঙ্গীকার নিয়ে ঈশ্বরের পথে প্রত্যাবর্তন করা। আর যে এই কাজ করে তাকে ‘তাওবাতুন নসুহা’ বলে। ইসলামি শাস্ত্র অনুসারে, আল্লাহ্ শিরক্ (একেশ্বরবাদকে অস্বীকার করা) ব্যতীত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন।

মিথের গল্প হিসাবে কথিত আছে, নসুহা ডাকাত কবর থেকে কফিন চুরি করে বিক্রি করত, এমনকি কবরে ঢুকে মৃত মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করত, সেই নসুহা যখন ‘তৌবা’ করেছিল, তখন খোদা তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যদিও শরিয়তি ইসলাম এই গল্পকে মান্যতা দেয় না।

- দশ পারার হাফেজ - কোরান ত্রিশটি পারা (খণ্ড বা পরিচ্ছেদ) নিয়ে গঠিত। কোরানের প্রথম দশ পারা বা খণ্ড যাঁর কণ্ঠস্থ তাকে দশ পারার হাফেজ বলা হয়। সম্পূর্ণ কোরান কণ্ঠস্থ করলে তিনি হাফেজ উপাধি পান।
- দাজ্জাল - আরবি শব্দ। আক্ষরিক অর্থ মিথ্যাবাদী। বাংলা ভাষায় দুরন্ত বা দস্যও বোঝায়। ইসলামি পুরাণ অনুসারে, পৃথিবীতে যখন বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসবে তখন ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। সর্বসাধারণের কাছে সে ‘মসীহ’ নামে পরিচিত হবে। সে একটি গাধায় চড়ে পরিভ্রমণ করবে। তার মাথার চুল লম্বা ও কোঁকড়ানো থাকবে এবং ডান চোখ অন্ধ হবে। ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী কোনও এক স্থান থেকে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। সে নিজেকে নবি বলে দাবি করবে। বহু মানুষ ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে তার দলভুক্ত হবে। দাজ্জালের কপালে আরবি ভাষায় পরিষ্কারভাবে লেখা থাকবে— কাফ, ফে, র— অর্থাৎ কাফের। হাদিসের বয়ান অনুযায়ী, আল্লাহ্ মানুষের বিশ্বাস (ঈমান) পরীক্ষার জন্য দাজ্জালকে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করবেন। সেই অলৌকিক ক্ষমতার বলে দাজ্জাল বহু মানুষকে তার দলভুক্ত করে পথভ্রষ্ট করবে। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীগণ (ঈমানদার) দাজ্জালকে বিশ্বাস করবে না।
- দাদি - উর্দু শব্দ। ঠাকুমা। পিতামহী।
- দাদি - ঠাকুমা।
- দাদো - উর্দু দাদা থেকে দাদোর উৎপত্তি। ঠাকুরদা। পিতামহ।
- দাফন - আরবি শব্দ। মৃতদেহকে কবরস্থ করা।
- দার-উল-হার্ব - আরবি শব্দবন্ধ। যুদ্ধের এলাকা বা ময়দান। দারুল ইসলাম হল ইসলামের আবাসভূমি আর দারুল হার্ব ইসলামিক বিধিবিধান মানে এমন স্থান বা দেশ।

- দিগর - ফার্সি শব্দ। এর অর্থ অঞ্চল বা তল্লাট।
- দিদার - ফার্সি শব্দ। সাক্ষাৎ, দর্শন, সাক্ষাৎকার।
- দিয়াড় - আরবি শব্দ। উচ্চভূমি।
- দুলদুল - আরবি শব্দ। এর অর্থ দোল বা মৃদু আন্দোলন। ইসলাম ধর্মের চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর ঘোড়ার নাম।
- দেনমোহর - আরবি শব্দ। মুসলমানদের বিয়েতে স্বামী শরিয়তের বিধান মেনে স্ত্রীকে যে অর্থ বা উপঢৌকন দিতে অঙ্গীকার করেন।
- দেল - ফার্সি দিল্ শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ। এর অর্থ মন বা হৃদয়।
- দেহেজ - আরবি শব্দ। বিবাহ অনুষ্ঠানে কনের পরিবার বা কনে কর্তৃক বরকে উপহার।
- দোজখ - ফার্সি শব্দ। জাহান্নাম বা দোজখ ইসলাম শাস্ত্রের খুব পরিচিত শব্দ। ইসলামি পরিভাষায় দোজখ হল পরকালের জন্য পাপীদের আবাসস্থল। কোরান ও হাদিসে দোজখ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। কোরানে দোজখের সাতটি ভাগ বা স্তরের কথা বলা হয়েছে। যথা- জাহান্নাম, হুত্বামা (চূর্ণবিচূর্ণকারী বহ্নিশিখা), সাকার (ঝলসানো বা গলানো), জাহিম (জ্বলন্ত আগুন), লাযা (লেলিহান অগ্নিশিখা), সাঈর (উজ্জ্বল অগ্নিকাণ্ড), হাবিয়া (অতল গহ্বর)। এর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নরক হল হাবিয়া। নরকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর হল হাবিয়া।
- দোয়া - আরবি শব্দ। এর অর্থ মঙ্গল কামনা বা আশীর্বাদ।
- দোয়া দরুদ - আরবি 'দোয়া' ও ফার্সি 'দরুদ'-এর যুগ্ম শব্দবন্ধ। দরুদ একটি সম্ভাষণ, যা মুসলমানরা নির্দিষ্ট বাক্যাংশ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পড়ে ইসলামের শেষ নবি হজরত মুহম্মদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে পাঠ করে থাকে।
- দ্বীন - আরবি শব্দ। এর অর্থ ধর্ম। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরানে দ্বীন অর্থে একজন ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিমের জন্য পালনীয় পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

- ❑ দ্বীনের খাদেম - আরবি শব্দবন্ধ। খাদেম মানে ভৃত্য বা সেবক বোঝায়। যিনি ধর্মের কাজ বা খেদমত করেন তাঁকে দ্বীনের খাদেম বলা হয়।
- ❑ ধড়িবাজ - ফার্সি শব্দ। প্রতারক, ধূর্ত, শঠ, ফন্দিবাজ, দক্ষ বা কূটকৌশলী।
- ❑ নখরা - উর্দু শব্দ। রঙ্গ, কৌতুক, ঠাট্টা, তামাশা। ছলকলাপূর্ণ হাবভাব এবং ন্যাকামিও বোঝায়।
- ❑ নফল - আরবি 'নফল' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। ইসলামি শাস্ত্র অনুসারে, যে সমস্ত কৃত্যগুলি করলে পুণ্য হয়, কিন্তু না করলে পাপ হয় না, তাকে নফল বলা হয়।
- ❑ নবি - আরবি শব্দ। আল্লাহর প্রেরিত দূত বা পয়গম্বর, বাণীবাহক।
- ❑ নবির কিরা - নবি হজরত মুহম্মদের নামে শপথ বা দিব্যি।
- ❑ নমরুদ - ফার্সি শব্দ। ইসলাম ধর্ম মতে, একজন মহাপরাক্রমশালী অত্যাচারী নাস্তিক রাজা। নবি ইব্রাহিমকে যিনি পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন।
- ❑ নসিব - আরবি শব্দ। অদৃষ্ট, ভাগ্য, কপাল।
- ❑ নসিহত - আরবি শব্দ। ধর্মীয় বিষয়ক উপদেশ।
- ❑ নাজায়েজ - ফার্সি 'নাহ্' ও আরবি 'জায়েজ'-এর যুগ্ম শব্দবন্ধ। নিষিদ্ধ বা অবৈধ। ধর্মবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও শরিয়ত বিরোধী কার্যাবলী।
- ❑ নাজেল - আরবি শব্দ। অবতরণ বা উপস্থিতি। বিশেষণ-এ অবতীর্ণ।
- ❑ নাতে রসুল - আরবি 'নাত'-এর অর্থ গান বা প্রশস্তি। হজরত মুহম্মদের প্রশংসামূলক কবিতা বা গান।
- ❑ নানিমা - দিদিমা।
- ❑ নামাজ কায়েম - নামাজ পড়া বা নামাজ আদায় করা।
- ❑ নামাজ - ফার্সি শব্দ, যার অর্থ- প্রার্থনা। ইসলাম ধর্মের অবশ্যপালনীয় কৃত্য। যেমন- ফজর (ভোরের নামাজ), জোহর (দুপুরের নামাজ), আসর (বিকেলের নামাজ), মাগরিব (সন্ধ্যার নামাজ) এবং এশা (রাত্রির নামাজ) দৈনিক পাঁচবার নামাজ ছাড়াও অতিরিক্ত আরও নামাজের বর্ণনা রয়েছে কোরান-হাদিসে।

- নামাজি - যিনি দিনে-রাতে পাঁচবারের নামাজ পড়েন, তাঁকে নামাজি বলা হয়।
- নামাজের আমল - নামাজের পুণ্যের পঞ্জি।
- নাস্তা - ফার্সি শব্দ। এর অর্থ জলযোগ। বিশেষত সকালের খাবার (Breakfast) কে নাস্তা বলা হয়।
- নিকাহ্ - আরবি শব্দ। এর অর্থ বিবাহ বা পরিণয়।
- নিয়ত - আরবি শব্দ। সংকল্প, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মানত। আল্লাহ্র নামে কোনও বিষয়ে মনস্থির করা।
- নিশান - ফার্সি শব্দ। পতাকা, বাণ্ডা, ধ্বজা, চিহ্ন বা অভিজ্ঞান।
- নিসা সুরা - কোরানের চতুর্থ সংখ্যক সুরা। নিসা শব্দের অর্থ নারী। এ সুরাতে ইসলামি নারী-পুরুষের সম্পর্ক, দাম্পত্য জীবন, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।
- নূরে নবি - আরবি 'নূর' শব্দের অর্থ জ্যোতি, আলোক বা উজ্জ্বল দীপ্তি। হজরত মুহম্মদের আর এক নাম নূরে নবি। ইসলামি ধর্ম মতে, তিনি নূর অর্থাৎ জ্যোতি দ্বারা সৃষ্ট। তাই তাঁকে নূরে নবি বলা হয়।
- নেক ইনসান - পুণ্যবান ব্যক্তি।
- নেক দিল - পুণ্যাত্মা।
- নেকি - ফার্সি 'নেকি' আরবি 'সওয়াব'-এর প্রতিশব্দ বলা যায়। সৎকর্ম বা পুণ্যের কাজের পুরস্কার হল নেকি।
- নোকতা - আরবি শব্দ। এর অর্থ বিন্দু। আরবি-ফার্সি অক্ষরে যে বিন্দু যুক্ত থাকে।
- পয়গম্বর - ফার্সি শব্দ। আল্লাহ্র প্রেরিত দূত বা রসুল।
- পরওয়ারদিগার - ফার্সি শব্দবন্ধ। পালনকর্তা বা রক্ষাকর্তা।
- পরহেজগার - ফার্সি শব্দ। ধর্মনিষ্ঠ ও ধার্মিক মুসলমান। ধর্মবিরোধী ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে থাকেন যে ব্যক্তি।

- পরি - ফার্সি শব্দ। পাখির মতো পাখাবিশিষ্ট কল্পিত সুন্দরী নারী বিশেষ।
- পাক জুবান - ফার্সি ‘পাক’ ও ‘জুবান’ এর মিলিত রূপ। পবিত্র ও বিশুদ্ধ ভাষা, কথা, বাণী, বাক্য বা প্রতিশ্রুতি।
- পারা - ফার্সি শব্দ। খণ্ড বা টুকরো। ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত কোরানের একটি পারা একটি খণ্ড।
- পির - ফার্সি শব্দ। মুসলিম দীক্ষাগুরু, পুণ্যবান ও পণ্ডিত ব্যক্তি।
- পুলসিরাত - ফার্সি ‘পুল’ এবং আরবি ‘সিরত’-এর মিলিত রূপ। পরলোকের সাঁকো বিশেষ। ইসলামি ধর্ম মতে, নরকের ওপরে অবস্থিত বিরাজমান পুল যা চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম এবং তলোয়ারের চেয়েও ধারালো। ধার্মিক বা পুণ্যবান ব্যক্তির বিদ্যুৎবেগে উক্ত পুল অতিক্রম করে স্বর্গে প্রবেশ করবেন এবং পাপীরা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে অগ্নিময় নরকে পড়ে যাবে।
- প্রথম নবি আদম - ইসলাম ধর্ম মতে, প্রথম নবি বা পয়গম্বর হলেন আদম। ইহুদি ও খ্রিস্টীয় পুরাণেও আদম প্রথম মানব হিসাবে পরিচিত।
- ফজর - আরবি শব্দ। এর অর্থ প্রভাত বা প্রাতঃকাল। সূর্যোদয়ের পূর্বে ভোরের নামাজ যা মুসলমানদের জন্য অবশ্যপালনীয় কৃত্য।
- ফজর/ফজরের নামাজ - আরবি ‘ফাজর’-এর অর্থ উষাকাল বা প্রাতঃকাল। সূর্যোদয়ের পূর্বে ভোরের নামাজ যা ইসলামি শাস্ত্রে অবশ্যপালনীয় কৃত্য।
- ফতোয়া - আরবি শব্দ। এর অর্থ হল বিধান বা নির্দেশ। ইসলামি শাস্ত্র অনুসারে প্রদত্ত রায় বা ব্যবস্থাপত্র। কোনও ঘটনা বা অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামি শরিয়তি দলিলের আলোকে ইসলামি আইন-বিশেষজ্ঞ ফতোয়া প্রদান করে থাকেন।
- ফরিয়াদ - ফার্সি শব্দ। নালিশ বা অভিযোগ। বিচারের জন্য প্রার্থনা।
- ফরিয়াদি - ফার্সি শব্দ। বিচারপ্রার্থী বা অভিযোগকারী।
- ফাজিল - আরবি ‘ফাদিল’ থেকে উদ্ভূত শব্দ। আদি অর্থ পণ্ডিত বা বিদ্বান ব্যক্তি। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় অর্থ বিপর্যয় ঘটে ‘বখাটে’ বা ‘বাচাল’ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

- ফারাজেজ - আরবি শব্দ। ইসলামি শাস্ত্র অনুসারে, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যবস্থার বিলিবন্টন প্রণালী।
- ফি নারে জাহান্নামা খলিদিনা ফিহা - কোরানের ৯৮ সংখ্যক সূরা 'বাইয়েনা'-র ৬ সংখ্যক আয়াতের অংশবিশেষ। এর অর্থ- যারা একেশ্বরবাদে অবিশ্বাস করে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।
- ফুপু/ফুফু- পিসি। বাবার বোন বা দিদি।
- ফেকাহ্ - আরবি শব্দ। ইসলামি শাস্ত্রের বহুবিধ আইন, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ।
- ফেজ টুপি - তুর্কি শব্দ 'ফেজ' এবং উর্দু 'টুপি'র যুগ্ম শব্দবন্ধ। ফেজ টুপি হল একপ্রকার নরম নলাকার টুপি, যা সাধারণত লাল রঙের হয়। 'ফেজ' নামটি এসেছে মরক্কোর ফেজ শহরকে কেন্দ্র করে। তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের সময়ে এই টুপি খুবই জনপ্রিয় ছিল।
- ফেরাউন - আরবি শব্দ। প্রাচীনযুগের মিশরের রাজাদের উপাধি। ইসলামি ধর্ম মতে, নবি মুসার সময়কালে মিশরের অধিপতি বা ফ্যারাও হলেন ফেরাউন, যিনি ছিলেন একজন নাস্তিক রাজা।
- ফেরেশতা - ফার্সি শব্দ। ফেরেশতা হল স্বর্গীয় দূত। আল্লাহ্র আদেশ পালন করাই এদের প্রধান ও প্রাথমিক কাজ।
- বদনসিব - ফার্সি 'বদ' এবং আরবি 'নসিব' সহযোগে গঠিত শব্দবন্ধ। দুর্ভাগ্য, হতভাগ্য।
- বদনা - আরবি 'বদন'-এর বিশেষণ। বদন বা মুখবিশিষ্ট। বাংলার গ্রামীণ মুসলমান সমাজে বদনা বলতে এক ধরনের জলপাত্র বোঝায়।
- বদি - ফার্সি 'বদি' হল নেকি শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ। এর অর্থ অশুভ বা মন্দকর্ম। অর্থাৎ ইসলামি শাস্ত্রে যে কাজগুলিকে পাপ বলে গণ্য করা হয়েছে।
- বন্দেগি - ফার্সি শব্দ। উপাসনা, আনুগত্য, দাস্যভাব, বশ্যতা।

- ❑ বরাত - আরবি অর্থ বরযাত্রী দল বা বিবাহের মিছিল। ফার্সি অর্থ ভাগ্য, কপাল, নিয়তি, বিধিলিপি।
- ❑ বহত - হিন্দি শব্দ। অত্যাধিক বা অনেক।
- ❑ বাণ মারা - দ্রষ্টব্য ওষুধ করা।
- ❑ বাত - উর্দু শব্দ। কথা বা বাক্য।
- ❑ বান্দা - ফার্সি বান্দাহ্। দাস বা গোলাম। ইসলামি শাস্ত্রে মানুষ বা ব্যক্তি বোঝায়।
- ❑ বায়েন তালাক - ইসলামি শাস্ত্র অনুসারে যে তালাক দ্বারা স্ত্রী চূড়ান্তভাবে পৃথক হয়ে যায়, তাকে বায়েন বা বিচ্ছিন্নকারী তালাক বলে।
- ❑ বালা মসিবত - আরবি শব্দবন্ধ। বিপদ, আপদ, দুর্যোগ।
- ❑ বাহাস্ - আরবি শব্দ। তর্ক-বিতর্ক বা আলোচনা। বিশেষত, ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত তাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্ক।
- ❑ বিতানা - ফার্সি শব্দ। সময় অতিবাহিত করা।
- ❑ বিদআত - আরবি শব্দ। ইসলামি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ।
- ❑ বিসমিল্লাহ্ - আরবি শব্দবন্ধ। সূচনা বা আরম্ভ করা। কাজ শুরু করার পূর্বে ‘বিসমিল্লাহ্’ পাঠের অর্থ হল ‘আল্লাহর নামে শুরু করছি’।
- ❑ বিহান - সকাল বা প্রত্যুষকাল।
- ❑ বুজ্‌দিল - ফার্সি শব্দ। ভীরা বা কাপুরুষ।
- ❑ বুরাক/ বুরআক - আরবি শব্দ। ইসলামি পুরাণে উল্লেখিত খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধা অপেক্ষা বড়ো একপ্রকার প্রাণী, যার পিঠে আরোহন করে হজরত মুহম্মদ আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন।
- ❑ বেআক্কেল - ফার্সি ‘বে’ এবং আরবি ‘আক্বল্’-এর মিলিত রূপ। এর অর্থ নির্বোধ বা বুদ্ধিহীন ব্যক্তি।
- ❑ বেওয়া - ফার্সি শব্দ। বিধবা বা পতিহীনা নারীকে বেওয়া বলা হয়।

- ❑ বেওয়াকুফ - ফার্সি শব্দ। বোকা বা নির্বোধ।
- ❑ বে-দিল - হৃদয়হীন।
- ❑ বে-রহম - দয়াহীন।
- ❑ বেহেস্ত - ফার্সি শব্দ। ইসলামি ধর্ম মতে মৃত্যুর পর পুণ্যবানদের বাসস্থান, স্বর্গ।
- ❑ বোরখা - আরবি 'বুরকাহ' শব্দের অর্থ আবরণ বা ঘেরাটোপ। ইসলামি শাস্ত্র অনুসারে, মুসলিম নারী কর্তৃক ব্যবহৃত আপাদমস্তক আবৃত একপ্রকার পোশাক।
- ❑ মওলানা - আরবি 'মাওলা' শব্দ থেকে মওলানা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এটি একটি উপাধি। ইসলামি শাস্ত্রবিশারদ বা ইসলামি শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিকে মওলানা উপাধি প্রদান করা হয়।
- ❑ মকান - আরবি 'মাকান'-এর আঞ্চলিক উচ্চারণ। এর অর্থ ঘর, বাড়ি বা আবাস।
- ❑ মক্কা - আরবি শব্দ। হজরত মুহম্মদের জন্মস্থান, মুসলিমদের পবিত্র তীর্থভূমি। সৌদি আরবের অন্যতম প্রধান শহর, এখানেই পবিত্র কাবা শরীফ অবস্থিত।
- ❑ মক্তব - আরবি 'মাক্তাব' হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিশব্দ। মুসলিম বালক-বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়।
- ❑ মজবুর - আরবি শব্দ। নিরুপায়, বাধ্য, অপারগ। দায়ে পড়ে যে কাজ করতে হয়।
- ❑ মজলিস - আরবি শব্দ। আসর, আড্ডা, বৈঠক বা সভা।
- ❑ মরদ/মর্দ - ফার্সি শব্দ। পুরুষ। বীরপুরুষ বা পুরুষোচিত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি।
- ❑ মর্সিয়া/মরসিয়া - আরবি শব্দ। মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত শোকসূচক গান। বিশেষত মহরমের লোকগীতি।
- ❑ মসলা মাসায়েল - আরবি শব্দবন্ধ। ইসলামি শাস্ত্রের বহুবিধ নিয়ম সম্পর্কিত প্রশ্ন-উত্তর, সমস্যা এবং তার সমাধান।
- ❑ মহরম - আরবি শব্দ। আরবি বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস। এই মাসের দশ তারিখে হজরত মুহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেন কারবালার মরুপ্রান্তরে মৃত্যুবরণ (শহিদ)

করেন। মুসলমান সম্প্রদায় এই দিনটিকে শোক উদযাপন পর্ব হিসাবে পালন করেন।

- ❑ মছরি - আরবি শব্দ। লেখক বা কেরানি। ঘরবাড়ি-জমি-সম্পত্তির দলিল-স্বত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।
- ❑ মাওলানা - আরবি শব্দ। এটি একটি উপাধি। আরবি ব্যাকরণসহ যাঁরা কোরান-হাদিস ব্যাখ্যা করেন তাঁদের মৌলানা বা মাওলানা বলা হয়।
- ❑ মাগরিব - আরবি শব্দ। এর অর্থ সন্ধ্যা। সূর্য অস্ত যাওয়ার অব্যবহিত পরের নামাজ। মুসলমানদের অবশ্যপালনীয় কৃত্য।
- ❑ মাজার - আরবি শব্দ। সমাধিস্থান।
- ❑ মাটি দেবার দোয়া - ইসলামি শাস্ত্র অনুসারে, মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর তিনবার মাটি দেওয়ার বিধান রয়েছে। প্রথম বার মাটি দেওয়ার সময় বলতে হয়— ‘মিনহা খালাকনাকুম’, দ্বিতীয়বার বলতে হয়— ‘ওয়া ফিহা নুইয়িডুকুম’ এবং তৃতীয়বার বলতে হয়— ‘ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা’। অর্থাৎ এই মাটি থেকেই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এই মাটিতেই তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল এবং পুনরায় এই মাটি থেকেই একদিন তোমার পুনরুত্থান হবে।
- ❑ মাতম - ফার্সি শব্দ। এর অর্থ শোক, বেদনা, বিলাপ, ক্রন্দন। মহরমের সময় বুক চাপড়িয়ে যে শোক ঘোষণা করা হয়।
- ❑ মাবুদ - আরবি শব্দ। উপাস্য। আল্লাহ্র আর এক নাম।
- ❑ মারেফতপন্থী - আরবি ‘মারিফাৎ’ শব্দের অর্থ হল সাধনা। আল্লাহ্-কে সম্যকভাবে জানার জন্য মরমি সাধনা।
- ❑ মালাউন - আরবি শব্দ। অভিশপ্ত ও বিতাড়িত। ইসলামি পুরাণে শয়তানদের মালাউন বলা হয়।
- ❑ মালাকুল মউত - আরবি শব্দবন্ধ। ইসলামি পুরাণের মৃত্যুর দূত বা ফেরেশতা আজরাইলের অন্য নাম। যিনি জীবের প্রাণ সংহার করেন।
- ❑ মাশাল্লাহ্ - আরবি শব্দবন্ধ। অর্থ- আল্লাহ্ যেমনটি চেয়েছেন।

- ❑ মিলতা জুলতা - উর্দু শব্দবন্ধ। সাযুজ্য বা মিল।
- ❑ মিলাদ - আরবি শব্দ। ইসলামি শাস্ত্র ও হজরত মুহম্মদের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক বক্তৃতা বা আলোচনাসভা।
- ❑ মিলাদ-উন্-নবি - আরবি শব্দবন্ধ। হজরত মুহম্মদের জন্মদিবস। আরবি বর্ষপঞ্জির তৃতীয় মাস রবিউল আউয়াল-এর ১২ তম দিন।
- ❑ মিসকিন - আরবি শব্দ। দুঃস্থ, গরিব বা নিঃস্ব ব্যক্তি।
- ❑ মুজরা - আরবি শব্দ। পারিশ্রমিকের বদলে নাচগান, প্রাপ্য টাকার ছাড় বিশেষ, সম্মান প্রদর্শন।
- ❑ মুতা - আরবি শব্দ। অস্থায়ী বিয়ে। শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন বিবাহের প্রচলন রয়েছে।
- ❑ মুনকার-নকির - ইসলামি ধর্ম মতে, কবরের দু'জন ফেরেশতা। যাঁরা মূলত মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার পর তিনটি প্রশ্ন করবেন।
- ❑ মুনাজাত/মোনাজাত - আরবী শব্দ। চুপিচুপি বা গোপনে প্রার্থনা করা।
- ❑ মুনাক্ফেক/মোনাক্ফেক - আরবি শব্দ। প্রবঞ্চক, প্রতারক, ভণ্ড, শঠ, ঠগ।
- ❑ মুয়াজ্জিন/মোয়াজ্জিন - আরবি 'মুআজ্জিন' শব্দের অর্থ হল ঘোষণাকারী। মোয়াজ্জিন একটি উপাধি। যিনি আজান দেন তাঁকে মোয়াজ্জিন বলা হয়।
- ❑ মুরিদ - আরবি শব্দ। মুসলমান তাপস বা ধর্মপুরুষের শিষ্য। ভক্ত বা অনুরাগী।
- ❑ মুর্দা - ফার্সি শব্দ। মৃতদেহ, লাশ, শব।
- ❑ মুর্শিদ - আরবি শব্দ। আধ্যাত্মিক গুরু, পির বা পথপ্রদর্শক।
- ❑ মুর্শিদি - আরবি 'মুর্শিদ' এবং ফার্সি 'ই'-যোগে উদ্ভূত। আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধীয়, মরমি লোকগান।
- ❑ মুসলমানি - দ্রষ্টব্য খৎনা।

- ❑ মুসল্লি - আরবি শব্দ। যিনি ইসলাম ধর্মের প্রতি আস্থা রাখেন এবং ধর্মের বিধান মেনে দিনযাপন করেন।
- ❑ মুসাবিদা - আরবি শব্দ। খসড়া বা পাণ্ডুলিপি।
- ❑ মেহফিল - আরবি শব্দ। কোনও উৎসবের জন্য বিনোদন বা কারো প্রশংসা করার জন্য জমায়েত।
- ❑ মেহমান - ফার্সি শব্দ। অতিথি।
- ❑ মেহেরবান - ফার্সি শব্দ। দয়ালু।
- ❑ মেহেরবানি - ফার্সি শব্দ ‘মেহেরবান’-এর বিশেষ্য। দয়া বা অনুগ্রহ।
- ❑ মোজেজা - আরবি শব্দ। অলৌকিক ক্ষমতা। নবি ও রসুলদের দ্বারা সংঘটিত অলৌকিক ঘটনা।
- ❑ মোমিন - আরবি শব্দ। ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। ইসলামি পরিভাষায় ঈমানদার ব্যক্তি।
- ❑ মোলাকাত - আরবি শব্দ। সাক্ষাৎ।
- ❑ মোহরানা - আরবি শব্দ। মুসলমানদের বিয়েতে স্বামী শরিয়তের বিধান মেনে স্ত্রীকে যে অর্থ বা উপটোকন দিতে অঙ্গীকার করেন। দেনমোহর এবং মোহরানা একই বিষয়।
- ❑ মৌৎ - আরবি মউত বা মৌৎ শব্দের অর্থ মৃত্যু।
- ❑ মৌলবী - আরবি শব্দ। ইসলামি শাস্ত্রে পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ।
- ❑ রসুল - আরবি শব্দ। আল্লাহর প্রেরিত দূত। ইসলামি ধর্ম মতে নবিও আল্লাহর প্রেরিত দূত। নবি ও রসুলের মধ্যকার পার্থক্যটি হল, যে মহাপুরুষদের হাত দিয়ে আল্লাহ তাঁর বাণীকে গ্রন্থবদ্ধ রূপ (ঐশী গ্রন্থ) দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁদের রসুল নামে অভিহিত করা হয়েছে। নবিদের পক্ষ থেকে কোনও ঐশ্বরিক গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ হয়নি। সমস্ত রসুলই নবি, কিন্তু সকল নবি রসুল নন।
- ❑ রুজির মালিক - ফার্সি ‘রুজি’ শব্দের অর্থ জীবিকা, উপার্জন বা দৈনন্দিন খাদ্য সংস্থান। ইসলামি শাস্ত্রে রুজির মালিক বলা হয় আল্লাহ-কে।

- রুহ্ - আরবি রুহ্ শব্দের অর্থ আত্মা।
- রুহুউল্লাহ্ - আরবি ‘রুহ্’ ও ‘আল্লাহ্’ শব্দের মিলিত রূপ হল রুহুউল্লাহ। যার অর্থ আল্লাহর রুহ্। রুহুউল্লাহ্ ইসলাম ধর্মের নবি হজরত ঈশার উপাধি। খ্রিস্টীয় বাইবেল-এ যিনি যিশু। আল্লাহর কৃপায় মৃতকে জীবিত করার অলৌকিক ক্ষমতা (মোজেজা) ছিল হজরত ঈশার। তাই তাঁকে রুহুউল্লাহ বলা হয়।
- রেজেক বা রিজিক - আরবি শব্দ। জীবনোপকরণ, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ইত্যাদি।
- রেহেল - আরবি শব্দ। পুস্তক ধারক, অর্থাৎ কাঠের তৈরি ক্ষুদ্র তাকবিশেষ যার ওপর কোরান রেখে পাঠ করা হয়।
- রোকন - আরবি শব্দ। এর অর্থ খুঁটি বা স্তম্ভ। ‘পাঁচ রোকন’ বলতে মূলত ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভ বা অবশ্যপালনীয় কৃত্য বোঝায়। যথা - কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত।
- রোজা - ফার্সি ‘রোজাহ্’ শব্দের অর্থ বিরত থাকা। আরবি বর্ষপঞ্জি অনুসারে সমগ্র রমজান মাসে ভোরের (ফজর) আজানের পূর্ব-মুহূর্ত থেকে সন্ধ্যার (মাগরিব) আজান পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সঙ্গম, শাস্ত্র কথিত অশ্লীল কোনও কিছু দেখা-শোনা-বলা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা।
- রোজাদার - যিনি রোজাব্রত পালন করেন।
- লজ - আরবি। কথা, বাক্য, শব্দ।
- লানত্ - আরবি শব্দ। অভিশাপ, ধিক্কার, ভৎসনা।
- লেবাস - আরবি ‘লিবাস’-এর আঞ্চলিক উচ্চারণ। পোশাক পরিচ্ছদ বা জামাকাপড়।
- শবে কদর - ফার্সি ‘শব’ শব্দের অর্থ রাত্রি এবং আরবি ‘কদর’ শব্দের অর্থ সম্মান মা মর্যাদা। একে ইসলামি পরিভাষায় ‘লাইলাতুল কদর’ও বলা হয়। আরবি ভাষায় ‘লাইলাতুল’ শব্দের অর্থ হল রাত্রি বা রজনী। হাজার বছরের উপাসনার চেয়েও এই রাতের উপাসনাকে উত্তম বলা হয়েছে কোরানে। আরবি বর্ষপঞ্জির আরবি রমজান মাসের (মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের রোজার মাস) শেষ দশ দিনের ২১,২৩,২৫,২৭,২৯- এর মধ্যে একটি রাত্রি হল শবে কদর। নির্দিষ্ট দিনের উল্লেখ

নেই কোথাও। ইসলাম ধর্মপ্রচারক নবি হজরত মুহম্মদের অনুসারীদের সম্মান বৃদ্ধি করা হয় এই রাতে। শবেকদর সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইসলামি পুরাণে বলা হয়েছে, হজরত মুহম্মদের পূর্ববর্তী নবি এবং তাঁদের অনুসারীগণ দীর্ঘায়ু লাভ লাভ করার ফলে বহু বছর আল্লাহর উপাসনা (এবাদত) করার সুযোগ পেতেন। কিন্তু মুহম্মদ থেকে শুরু করে তাঁর পরবর্তী অনুসারীগণের আয়ু অনেক কম হওয়ায় তাদের পক্ষে স্রষ্টার আরাধনা করে পূর্ববর্তীদের সমকক্ষ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয় বলে তাদের মাঝে আক্ষেপের সৃষ্টি হয়। এই আক্ষেপের প্রেক্ষিতে তাদের চিন্তা দূর করার জন্যে ‘সুরা কদর’ রচিত হয়। শবেকদরের রাতের উপাসনা তাই হাজার রাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এই রাতে ফেরেশতারা পৃথিবীতে অবতরণ করে। সমস্ত গাছ ও বৃক্ষলতাপাতা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজ্জা করে।

- শবে বরাত - ফার্সি ‘শব’ এবং আরবি ‘বরাত’ শব্দের মিলিত রূপ। এর অর্থ পাপমুক্তির রজনী বা ভাগ্য লিখনের রজনী। আরবি বর্ষপঞ্জির শাবান মাসের (রমজান মাসের পূর্বের মাস) চতুর্দশ দিবাগত রাত।
- শয়তানের দুররা - ইসলামি পুরাণ অনুসারে, জ্বিন বা শয়তান আগুন থেকে সৃষ্ট। গ্রামীণ মুসলমান জনমানসে আকাশে উল্কাপাত জাতীয় ঘটনাকে ‘শয়তানের দুররা’ বলে বিশ্বাস করা হয়।
- শরম - ফার্সি শব্দ। লজ্জা, সম্ভ্রম।
- শরিকানা - আরবি ‘শরিক’ এবং ফার্সি ‘আনা’-র মিলিত রূপ। ভাগীদারের প্রাপ্য অংশ।
- শাদি - ফার্সি শব্দ। বিবাহ বা পরিণয়।
- শারাব - আরবি শব্দ। মদ বা সুরা জাতীয় পানীয়।
- শাহেনশাহ্ - ফার্সি শব্দবন্ধ। সম্রাট বা রাজাধিরাজ।
- শিয়া - আরবি শব্দ। মুসলিম সম্প্রদায় বিশেষ। যারা প্রথম তিন খলিফার (হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান) প্রতি আনুগত্যহীন। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর যারা হজরত আলীকেই হজরত মুহম্মদের উত্তরাধিকার বলে বিশ্বাস করে।

- ❑ শিরক্ - আরবি শব্দ। ইসলাম ধর্মে পৌত্তলিকতা বা বহুঈশ্বরবাদ চর্চা করা পাপ ব'লে গণ্য। শিরক্ হল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য হিসাবে নির্ধারিত করা বা তার উপাসনা করা। শাব্দিকভাবে এর দ্বারা এক বা একাধিক কোনও কিছুকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও কর্তৃত্বের অংশীদার বোঝায়।
- ❑ শুকরিয়া - উর্দু শব্দ। কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা, ধন্যবাদ।
- ❑ শেহরি - আরবি শব্দ। আরবি বর্ষপঞ্জির রমজান মাসে রোজা পালনের উদ্দেশ্যে ভোরের আজানের পূর্বের আহার।
- ❑ সওয়াব - আরবি 'সওয়াব্' শব্দের অর্থ হল পুণ্য, পারলৌকিক মঙ্গল বা পুরস্কার।
- ❑ সওয়ার - ফার্সি শব্দ। আরোহী বা অশ্বারোহী।
- ❑ সওয়াল - আরবি শব্দ। এর অর্থ জেরা বা প্রশ্ন।
- ❑ সচ্ - উর্দু শব্দ। সত্য বা সত্যবাদী।
- ❑ সদ্কা - আরবি শব্দ। আল্লাহ্র নামে দান। বিপদ মুক্তি বা পাপ মুক্তির নিমিত্তে দান করা।
- ❑ সবুদ - আরবি শব্দ। প্রমাণিত।
- ❑ সরান্ - ফার্সি শব্দ। বাঙালি মুসলমানরা বড়ো রাস্তা বা সড়ক অর্থে ব্যবহার করে।
- ❑ সহবত - আরবি শব্দ। সাহচর্য বা সান্নিধ্য। নিয়মকানুন ও পদ্ধতি।
- ❑ সহি - আরবি শব্দ। অকাট্য, প্রমাণিত, স্বীকৃত।
- ❑ সাত তবক আসমান - ইসলামি পুরাণ অনুসারে, জান্নাতের সাতটি স্তর।
- ❑ সালাত - আরবি শব্দ, এর অর্থ প্রার্থনা, ফার্সিতে যাকে নামাজ বলা হয়, আরবিতে তাই-ই সালাত। দ্রষ্টব্য নামাজ।
- ❑ সালাম - আরবি শব্দ। ইসলামি নিয়মানুযায়ী অভিবাদন।

- সিজ্‌দার দাগ - যাঁরা নিয়মিত নামাজ পড়েন তাঁদের কপালে সিজ্‌দার দাগ দেখা যায়। ইসলাম ধর্মের হাদিসে বলা হয়েছে, সিজ্‌দার দাগে নরকের আগুন স্পর্শ করবে না।
- সিন্‌জিল - আরবি 'সিজ্‌জিন'-এর আঞ্চলিক উচ্চারণ। পাপীদের আত্মা বা রুহ্ যে স্থানে রাখা হয়।
- সিয়াম - আরবি 'সিয়াম' শব্দের অর্থ রোজা। দ্রষ্টব্য রোজা।
- সুন্নত - আরবি শব্দ। হজরত মুহম্মদের নীতি, আদর্শ ও আচরণবিধি। হজরত মুহম্মদের নির্দেশিত, অনুমোদিত ও অনুমতিপ্রদত্ত ধর্মকর্ম পদ্ধতি। যারা সুন্নতের অনুসারী তাদের সুন্নি বলা হয়।
- সুবহানাল্লাহ্ - আরবি শব্দবন্ধ। এর অর্থ হল আল্লাহ্ মহান। 'সুবহান্' শব্দটি এসেছে 'সাবাহ্' থেকে, যার অর্থ হল 'মহিমাস্থিত করা'। সাধারণত বাঙালি মুসলমানরা অকস্মাৎ কোনও ঘটনার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করতে এ শব্দবন্ধ ব্যবহার করে।
- সুরমা/সূর্মা - ফার্সি 'সুরমাহ্'। চোখে দেওয়ার বিশেষ প্রসাধন।
- সুরা কওসর - কোরান শরীফের সবচেয়ে ছোট সুরা। ১০৮ সংখ্যক সুরা।
- সুরা কালাম - কোরানের প্রতিটা অধ্যায় বা পরিচ্ছেদকে সুরা বলে। আরবি 'কালাম' শব্দের অর্থ বাণী, কথা, উক্তি, বাক্য। 'সুরা কালাম' বলতে মূলত কোরানের বাক্য বা অধ্যায়কে নির্দেশ করা হয়।
- সিজ্‌দা/সেজদা - আরবি 'সিজ্‌দাহ্' -এর অর্থ মাথা নত করা। দুই পা, দুই হাত, দুই হাঁটু, কপাল ও নাকের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিয়ে আল্লাহ্র কাছে আত্মনিবেদনের ইসলামি রীতি।
- সোয়াস্তি - শান্তি, উদ্বেগহীনতা।
- হক্ - আরবি শব্দ। ন্যায্য অধিকার বা দাবি।
- হকদার - আরবি 'হক্' এবং ফার্সি 'দার'-এর মিলিত রূপ। ন্যায্য অধিকারী বা উচিত দাবিদার।

- হজ্জ - আরবি শব্দ। ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ বা অবশ্যপালনীয় কৃত্যের মধ্যে অন্যতম। শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকলে মক্কা ও মদিনার তীর্থ দর্শন এবং ধর্মীয় বিশেষ আচরণবিধি পালন করা, এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি হজ্জ যাত্রা করবেন তার কারণে বা তাঁর আসা-যাওয়ার আগে বা পরে তাঁর পরিবার যেন কোনোরকম আর্থিক সংকটের মধ্যে না পড়ে।
- হদ - আরবি শব্দ। এলাকা, সীমা, প্রান্ত।
- হাজাম - আরবি শব্দ। মুসলমান ছেলেদের যাঁরা খৎনা করেন তাঁদের হাজাম বলা হয়।
- হাজারে আসওয়াদ - আরবি শব্দ। এর অর্থ কালো পাথর। মক্কার কাবাগৃহে রক্ষিত একটি কালো পাথর যা হজ্জ যাত্রীরা চুম্বন করেন। ইসলাম ধর্ম মতে, এই পাথর আদম ও হাওয়ার সময় থেকেই পৃথিবীতে রয়েছে। এ পাথর স্পর্শ করলে পাপ ক্ষয় হয়।
- হাবিয়া দোজখ - আরবি শব্দ। ইসলামি পুরাণে বর্ণিত সপ্ত নরকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং নিকৃষ্ট নরক হল হাবিয়া।
- হায়াৎ - আরবি শব্দ। জীবন আয়ু বা আয়ুষ্কাল।
- হায়াৎ-মৌৎ - আরবি শব্দবন্ধ। জন্ম-মৃত্যু।
- হাশর/রোজ হাশর - আরবিতে 'হাশর' হল 'কেয়ামত' শব্দের সমার্থক। এর অর্থ সমাবেশ। শেষ বিচার বা মহাপ্রলয়ের দিনকে হাশর বলা হয়। ইসলাম ধর্ম মতে, এই দিন মৃতদের পুনরুত্থানের পর আল্লাহ মানুষ ও জ্বীন জাতির পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন।
- হাশরের ময়দান - আরবি শব্দবন্ধ। যে মাঠে হাশর হবে, অর্থাৎ যে স্থানে মহাপ্রলয়ের দিন মানুষ ও জ্বীন প্রজাতির পাপ-পুণ্যের হিসাব করবেন আল্লাহ।
- হিদায়েত - আরবি শব্দ। সৎ উপদেশ, সত্যপথ প্রদর্শন বা ন্যায়ের পথে পরিচালিত হওয়া।
- হুরি - আরবি 'হুর' শব্দের বাংলা উচ্চারণ হুরি। স্বর্গের অঙ্গরীদেবী হুর বলা হয়। যাদের আর এক নাম বেহেশতের সুন্দরী। ইসলামি শাস্ত্র অনুসারে, জান্নাতের

পুণ্যবান (ঈমানদার) ব্যক্তিদের সঙ্গিনী হবে হুরেরা। হাদিসে রয়েছে, এক একজন পুরুষকে সত্তরজন হুর প্রদান করা হবে। জান্নাতি পুরুষদের সেবা করাই হবে হুরদের প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ।

- হেফজ্/হাফিজ - আরবি শব্দ। হেফাজতকারী বা সংরক্ষক। যিনি সমগ্র কোরান কণ্ঠস্থ করেন তাঁকে হাফিজ বলা হয়। এটি একটি উপাধি।

ঋণ স্বীকার: রশিদ, মোহাম্মদ হারুন; বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফার্সি উর্দু শব্দের অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, আগস্ট ২০২৩

পরিশিষ্ট - ২

খ. আবুল বাশারের সাক্ষাৎকার

তারিখ: ০৪.১২.২০২৪

সময়: বিকেল ৪:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০

স্থান: মরুস্বর্গ (আবুল বাশারের বাসভবন), বৈকুণ্ঠপুর, রাজপুর, সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০১৪৯

মহম্মদ সামসুর রহমান: আমি মিথ-পুরাণ দিয়েই শুরু করছি আমাদের আলোচনা। আপনি লিখেছেন— ‘মরুস্বর্গের বীজ দাদিমায়ে’র দান, মূলত রাজাবলি, তাঁরই উপহার। দাদিমায়ে’র আত্মা ছিল পুরাণ-মুগ্ধ।’— স্মৃতি থেকে সঞ্চারিত কাহিনিই আপনার আখ্যানগুলিকে নির্মাণ করেছে। আপনি ইহুদি পুরাণের কথা লিখলেও কোরানের কাহিনিগুলিও সেখানে এসে মিশেছে। কোথাও পুরাণের ঘটনারই পুনর্কথন হয়েছে, কোথাও মূল গল্পের কাঠামো ভেঙে নবমিথ নির্মিত হয়েছে— এ ব্যাপারে যদি কিছু বলেন?

আবুল বাশার: হ্যাঁ, ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকমই, আসলে আমি ছোটবেলা থেকেই এই সমস্ত কাহিনিগুলি শুনে বড়ো হয়েছি। বিশেষত, আমার ঠাকুমা, দিদিমা, মায়ের মুখেও শুনেছি। তাঁরা অবশ্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলতেন। সেগুলি শুনতে শুনতে মনের ভেতরে গেঁথে গিয়েছিল। গল্পগুলি সব মাথার ভেতরে ছিল, তোমার কথা ধরেই বলি, স্মৃতিতে সব জমেছিল। প্রায় ১৪-১৫ বছর পর উপন্যাস লেখার ভাবনা মাথায় আসে। কিন্তু কীভাবে লিখব এইটা আমার কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যখন এইসব ভাবছিলাম, তখন একটি পুজো সংখ্যায় বিষয়টি নিয়ে উপন্যাস লিখব মনস্থির করেছিলাম।

প্রশ্ন: তখন কি কলকাতায় পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেছেন?

উত্তর: হ্যাঁ, কলকাতায় আসা ওই বছর তিন-চারেক হবে। দেশ পত্রিকায় চাকরি করি। দেখবে কলা-সমালোচক সন্দীপ সরকার, যাকে আমি মরুস্বর্গ উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছি। এই মানুষটি ছিলেন বাঙালি খ্রিস্টান। ধর্মচিন্তার সূত্রে ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’- বিষয়টি ওঁর মধ্যে ছিল। ওঁকে আমি প্রথম বলি, যে এমন বিষয় নিয়ে আমি লিখতে চাই, তখন ওঁ বলে— ‘তোমায় আমি লরেন্স টুমস্-এর বই দিতে পারি, সেখান থেকে যদি কিছু পাও তাহলে খুব ভালো হবে।’ তখন বইগুলি পড়ে আমি যেটা দেখেছিলাম, যে ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি সেখানে মিথ-পুরাণের দীর্ঘ আলোচনা ছিল। আমি যেভাবে মিথ-পুরাণকে চিনেছি, বুঝেছি তার সঙ্গে এই বইগুলির একটি পার্থক্য খুঁজে পেলাম। উভয় পুরাণের উৎস এক হলেও বিন্যাস একেবারে আলাদা। তখন সবটা পড়ার পর আমার জন্মগত অর্জিত পুরাণের সঙ্গে, মানে ইসলামি পুরাণের কাহিনিগুলির সঙ্গে ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’-এর কাহিনির মিশ্রণ ঘটে গিয়েছিল একরকম। মাথার ভেতরে এইভাবে আনাগোনা করছিল। এর উপর আরও অনেকগুলি বই পড়েছিলাম। যেমন, উটের নবি সালেহ-কে নিয়ে ভাবনা। অর্থাৎ উটের যে জগৎ, উট থেকে যেখানে সভ্যতার জন্ম। সেই উটের নবি সালেহর মৃত্যু হওয়ার পর তিনি মরুভূমিতে কবরের জন্য সাড়ে তিন হাত জমিও পেলেন না। এই কাহিনি আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল। ভাবলাম এই বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা শুরু করতে পারি, এভাবে কিন্তু আমার দিদিমা বা দাদিমা বলেননি। আমি লৌকিক পুরাণের কাহিনি নিয়েই তখন নবি সালেহর বিষয়টি লিখেছিলাম। ওই যে উট পিঠে করে নবি সালেহ-কে নিয়ে চলে গেল এবং আড়াই দিন পর ফিরে এল। উট যখন ফিরে এল তখন দেখা গেল উটের পিঠে একটি কুঁজ তৈরি হয়েছে, এটাকেই বলা হয় সালেহর কবর।

প্রশ্ন: একটি জীবন্ত প্রাণীর শরীরে একটি মানুষের মৃতদেহ শুয়ে আছে, এই মিথ খুবই অবাক করে। এই ভাবনা এল কীভাবে?

উত্তর: আমি বরাবর বলি, লেখকরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করতে জানে। এই ইঙ্গিত তুমি রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও পাবে। অর্থাৎ চোখ, নাসিকা, জিহ্বা, কান, ত্বক-কে ব্যবহার করার কথা। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সজাগ করেছেন। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, আবেগ বিষয়টি আমরা ইন্দ্রিয় থেকে পাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, চোখে যদি দৃষ্টি না থাকত তাহলে তো সৌন্দর্যই আমরা উপভোগ করতে পারতাম না। ত্বক থেকে যে স্পর্শসুখ আমরা পাই। তত্ত্বের দিক থেকে যদি বলতে চাই, তাহলে পণ্ডিতদের কথা মতো জ্ঞানেন্দ্রিয় ইত্যাদি ভাবনা চলে আসবে। কিন্তু লেখকদের কাছে কেবল জ্ঞান নয়, তার সঙ্গে আবেগও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ আবেগযুক্ত জ্ঞান। জীবনানন্দ বলেছিলেন ‘অন্ধকারের তরঙ্গ’-এর কথা। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরের পাখিদের উড়ে যাওয়ার দৃশ্যকে জীবনানন্দের মনে হয়েছিল ‘অন্ধকার তরঙ্গের ঢেউ’। আমাদের ঘুমের মধ্যে আমাদের প্রিয়জন পাশে শুয়ে থাকলে তার হাত গায়ে এসে লাগলে আমাদের ঘুম ভাঙে না, অথচ অচেনা স্পর্শে মানুষ ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে, বিশেষত মেয়েরা তো ভীষণই ভয় পায়। তাহলে চেনা হাতে আমরা একরকম স্পর্শ-সুখ অনুভব করি। এই যে একে ‘সেনসেশন’ বা যাই-ই বলি না কেন, একে আমরা শুধু জ্ঞান বলব না, জ্ঞানের সঙ্গে আরও কিছু যুক্ত রয়েছে। এইভাবে ভাবতে ভাবতে একটি জীবন্ত প্রাণী উটের মধ্যে একটি মানুষ আশ্রয় পেল। এই মরুভূমি তাঁর, এই উট তাঁর, অথচ সে মরুভূমিতে জায়গা পাচ্ছে না। এই মিথটাকে এমনভাবেই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলাম।

প্রশ্ন: উটের পিঠে যৌনবিহার বা যৌনাচারের প্রসঙ্গও এসেছে আপনার লেখায়, লোককথার সঙ্গে লেখকের কল্পনাও তো মিশে গেছে এখানে?

উত্তর: এইগুলি আমার নিজস্ব ভাবনা, সবই আখ্যানের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যু আর যৌনতা পুরোমাত্রায় উঠে এসেছে এই বিষয়ক লেখাগুলিতে। উপন্যাসে উটের পিঠে নারীকে ধর্ষণ— ইহুদি পুরাণ এবং ইসলামি শাস্ত্রে উটের পিঠে যৌনতা এবং মৃত্যু এসবই এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। একটি গল্পের সঙ্গে অন্য গল্প মিশেছে, আবার কোনো গল্প ভেঙেছে।

প্রশ্ন: আব্রাহামের ‘উৎসর্গ’-এর কাহিনি ভেঙে তো নবমিথ নির্মিত হয়েছে?

উত্তর: একদমই। ওটাকে বিনির্মাণ বা ডিকনস্ট্রাকশন্। যাই-ই বলো না, ওটাকে আমি অন্যভাবে দেখিয়েছি।

প্রশ্ন: ইস্রায়েল ইহুদি পুরাণে নিন্দিত বলেই তাঁকে নির্বাচন করলেন আখ্যানে?

উত্তর: অবশ্যই। কেবল পুরাণ নয়, ইতিহাসও তাঁকে উপেক্ষা করেছে, নবি সালেহর ক্ষেত্রেও তাই। উপেক্ষিত চরিত্রদের প্রতি একটি প্রবল আকর্ষণ তো শিল্পীদের থাকেই। ইতিহাস থেকে বিতাড়িত, সমাজ যাঁদের জায়গা দেয়নি তাঁরাই নায়ক হয়েছেন।

প্রশ্ন: ইসলামি পুরাণে নিন্দিত শাদ্দাদ বাদশাহ যেমন আপনার উপন্যাসে নায়ক চরিত্র। পুরাণ এবং উপন্যাসে শাদ্দাদের স্বর্গ নির্মাণের অভিপ্রায় তো আলাদা। এই ভাবনাটি কীভাবে নিয়ে এলেন?

উত্তর: শাদ্দাদ পুরাণে নিন্দিত এবং ভিলেন। আসলে আখ্যানে শাদ্দাদের বস্তুবাদী চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, ও একজন বাদশাহ, তাকে কেবল ভাববাদী হিসাবে নির্মাণ করতে

চাইনি। একজন বাদশাহ যে নগর পরিকল্পনার কথা ভাবছে, নগর নির্মাণের কথা ভাবছে। তৎকালীন নগর সভ্যতার নির্মাণ ভাস্কর্য দেখেই সে কিন্তু নগর নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিল। স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, ঈশ্বরের স্বর্গকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে চেয়েছিল। এই আকাঙ্ক্ষাকে কেন নিন্দা করা হবে? মানুষ তো ঈশ্বরের কথাই ভাবছে, ঈশ্বরের ভাবনাটিকেই রূপ দিতে চাইছে। স্বয়ং ঐশ্বরিক গ্রন্থেই বলা হয়েছে, ঈশ্বর বলেছেন, মানুষকে আমি রূপ এবং গুণ দিয়ে তৈরি করেছি, আমারই রূপ এবং গুণ দান করেছি। ইসলামি পুরাণের একটি কাহিনীতেই রয়েছে, ঈশ্বর আজাজিলকে বলেছিলেন, তুমি মাটি থেকে মূর্তি তৈরি করো, আজাজিল বলেছিল, আমি তো মূর্তি দেখিনি কেমনভাবে চেহারা নির্মাণ করব? তখন ঈশ্বর মানুষের মতোই রূপধারণ করেছিলেন। খুবই মজার বিষয়, ভারতীয় পুরাণের ‘নর-ই নারায়ণ’ গল্পটিও যেন খানিকটা মিশে যাচ্ছে।

প্রশ্ন: প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাচ্ছে, *মরুস্বর্গ* উপন্যাসে মূর্তিহীন ও মূর্তিমান ঈশ্বরের দ্বন্দ্ব বোঝাতে গিয়ে সাদইদ বলেছিল— ‘আকাশের ঈশ্বর মূর্তি বানিয়েছিল, সেগুলি মানুষ। মূর্তি গড়া একা ঈশ্বরের অধিকার নয়। মানুষেরও অধিকার।’ কোথাও মিলে যাচ্ছে?

উত্তর: একদমই। মানুষের রূপ দান ঈশ্বরই করেছেন। মানুষকে মূর্তি পূজার ব্যবস্থা তো ঈশ্বরই করে দিয়েছেন। মানুষ মূর্তি পূজক নয়। এইবার নিজের হাতে গড়া মূর্তিকে আজাজিল কীভাবে সিজ্দ্দা করবে? কিন্তু ধর্মে প্রশ্ন করাই পাপ, প্রশ্ন করেছিল বলেই কিন্তু আজাজিল শয়তানে পরিণত হয়েছিল। ইসলাম ধর্মে যেমন আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে সিজ্দ্দা করা নিষিদ্ধ। হাদিসে হজরত মুহম্মদ বলেছেন, যদি অন্য কাউকে সিজ্দ্দা করার কথা বলতাম, তাহলে মেয়েদের বলতাম স্বামীদের সিজ্দ্দা করো।

আসলে ইতিহাসের চোখ দিয়ে যাঁরা মরু-সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করেছেন। হিটি সাহেব যেমন করেছেন। উটকে আশ্রয় করেই মরু-সভ্যতার মানুষ বাঁচে। উটই মরুভূমির চালিকাশক্তি। আমি শুনেছি, উটের নাকি এক হাজারটি প্রতিশব্দ রয়েছে, ওটা যদি একশোটাও হয় তবুও তো বিস্ময়কর। কেন হয়েছে সেটি রবীন্দ্রনাথের কথা ধরে আমরা সাজিয়ে বলতে পারি, এক একটি শব্দের ভিন্ন অর্থ তৈরি হয়। একটি শব্দের সঙ্গে আর একটি মেলে না। আমি উদাহরণ দিয়ে বলি, যেমন ধরো, Well শব্দের একটি অর্থ ‘ভালো’, আবার অন্য একটি অর্থ ‘কুঁয়ো’। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এর কারণ হচ্ছে একটি শব্দের উপর বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ভাবপ্রবাহ বয়ে যায়, যার ধাক্কায় নানারকম অর্থ তৈরি হয়। এখন এই নিয়ে ইদানীং কালে অনেক ভাবনার জন্ম হচ্ছে।

প্রশ্ন: তাহলে কি যুগের ভাবপ্রবাহের নিরিখেই ইহুদি এবং ইসলামি পুরাণের গল্পগুলি এক হয়েও যেন কোথাও আলাদা হয়ে গেছে?

উত্তর: হ্যাঁ, একই গল্প কিন্তু কোরান একভাবে ব্যাখ্যা করেছে, অন্যদিকে হিব্রু বাইবেল একভাবে ব্যাখ্যা করেছে, আবার খ্রিস্টীয় পুরাণেও একরকম ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু ইসলামি পুরাণ, অর্থাৎ হজরত মুহম্মদ যেটা করেছেন, আমি খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছি, অতীতের গল্পগুলিকে তিনি প্রতিটি বালিকণার ভেতর থেকে পুনরুদ্ধার করে তার অন্য তাৎপর্য সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা একটা গভীর গবেষণার বিষয়। প্রতিটি ‘বালিকণা’ বললাম এটা আমার ভাষা, আমার স্টাইলও বলতে পারো। প্রতিটি বালিকণা থেকে তিনি গল্পগুলিকে তুলে পুনর্জীবিত করেছেন এবং তাকে পরিবর্তিত করে ব্যাখ্যা করেছেন। খুবই আশ্চর্যের ঘটনা হজরত মহম্মদ ছিলেন নিরক্ষর। অনেক মুক্তবুদ্ধির পণ্ডিত মানুষ যাঁরা কোরানের ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, হজরত

মুহম্মদ যে নিরক্ষর ছিলেন তার কারণ এবং ব্যাখ্যা কোরানেই রয়েছে। সেটা হল, আমাদের জ্ঞান অর্জনের পথে আমাদের পূর্ব-জ্ঞান যেটা তা হল বাধা। পূর্ব-জ্ঞান থেকে জাত যে সংস্কার, তা নতুন কিছুকে গ্রহণ করতে বাধা দেয়। কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখো। সেই কারণে হজরত মুহম্মদের মনটা ছিল নতুন স্লেটের মতো, যেখানে কোনও আঁচড়ই পড়েনি। যেটা এসেছে অবিকৃত ভাবেই এসেছে, ওখানে মিথ্যে কিন্তু জায়গা পায়নি। সেইজন্য ঈশ্বর নিরক্ষরকে নির্বাচন করেছিলেন। এ কিন্তু হজরত মুহম্মদের নিজেরও কথা। কিন্তু ইদানীং সময়ে মানুষ এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে যে, সে নতুন জ্ঞান গ্রহণই করতে চাইছে না, অথচ কোরান তার উল্টো কথা বলে। এমনকি রামমোহন রায়ও কোরানের যুক্তিবাদের চর্চা করেছিলেন। কেবল তাই নয়, আমি এখন ব্রাত্য বসুর লেখা পড়ে জানতে পারলাম, যে কোরান পাঠ করতেন দস্তয়ভস্কি। কেন পাঠ করেছিলেন তার ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু ব্যাখ্যা এটাই যে তিনি কোরান থেকে যুক্তি গ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপীয় যুক্তিবাদের মধ্যে একটা গুরুত্ব আছে, যেটা আবার কিয়ের্কেগার্ড স্বীকার করেননি। এইটা অস্তিত্ববাদীদের দ্বন্দ্বের জায়গা। পাশ্চাত্যবাদীরা যতই বলুক যুক্তি দিয়ে সবকিছুর সমাধান করেছি, যুক্তিরও কিন্তু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যুক্তির বাইরেও যে মানুষের জীবন আছে। যুক্তি একজন মানুষকে সম্পূর্ণরূপে ধরতে পারে না, মানুষের আবেগকে, আসক্তিকে, কামনা-বাসনাকে ধরতে পারে না। এই সময় আমি কোরানের যুক্তিগুলির কথা ভাবি প্রায়শই। যেমন, কোরানের ৯২ সংখ্যক সূরা ‘আল লাইল’-এর ৬ সংখ্যক আয়াতে রয়েছে, ‘ওয়া সাদ্ধাকা বিলহুসনা’— ওয়া সাদ্ধ্ অর্থ ‘The truth’, বিল মানে ‘মধ্যে’, হুসনা অর্থ ‘সৌন্দর্য’— অর্থাৎ সৌন্দর্য কোথায় আছে, তা সত্যের মধ্যে আছে। সৌন্দর্যকে খুঁজলে তুমি সত্যের মধ্যে খোঁজো। এটাই কোরানের অবদান।

প্রশ্ন: বাইবেল বা কোরানের মতো হাদিস নিয়েও তো আপনার একটি উপন্যাস রয়েছে। আপনি *রাজাবলি* উপন্যাসের ভূমিকায় আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন— ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেভাবে *কৃষ্ণচরিত্র*-কে নির্মাণ করেছিলেন, আমরা সেভাবে মহানবিকে স্পর্শ করারও অধিকারী নই’। হজরত মুহম্মদকে নিয়ে কখনো উপন্যাস লেখার ইচ্ছে হয়েছে?

উত্তর: প্রথম প্রশ্নেই কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। একটি উপন্যাস লিখেছি। *মরুভূমি*, *রাজাবলি*-র সঙ্গে এক করে ট্রিলজি বলা যায়। ওটার নাম *যেভাবে একটি হাদিসের জন্ম হয়*। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, পত্রিকাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই যে ‘ওয়া সাদ্কা বিলহুসনা’- কোরানের এই আয়াতগুলিকে ধরেই তো মুহম্মদকে গঠন করব। ওই উপন্যাসটিতে এই বিষয়টিই দেখানো হয়েছে। এখানে একটি অভিযাত্রা রয়েছে, মাকে খুঁজতে বেরিয়েছে নায়ক। ওর মা হারিয়ে গেছে মরুভূমিতে। ওই সময় হাদিস ব্যবসায়ীদের উত্থান হয়েছিল, যার ফলে তারা ক্রমাগত মিথ্যে হাদিস দিয়ে প্রকৃত হাদিসগুলিকে আচ্ছন্ন করেছিল। সেটিকে রক্ষা করার জন্য সৎ লোক খোঁজা শুরু হল, যিনি মরুভূমির বালিকণা থেকে সত্য হাদিস উদ্ধার করে আনবেন। এই নায়ক সেই লোকের খোঁজে পথে বের হল। নায়কের মামা একজন হাদিসের কারবারি। সে নায়ককে বলে, তুমি যদি একটি খাঁটি হাদিস অমুকের কাছে থেকে এনে দিতে পারো, তাহলে তোমাকে একটি মিশরীয় সাদা অশ্ব দেব এবং আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। যুবক গিয়ে দেখল যার কাছে হাদিস নেবে সেই-ই তার মাকে বন্দি করে রেখেছে। যে লোকের কাছে যুবক এসেছে সে কাফন এবং বোরখার কারবারি। মরুভূমিতে সন্ধ্যা নামছে এমন সময় ওই লোকটি তার ঘোড়াটিকে ডাকছে, তার হাত দুটো অঞ্জলি দেওয়ার মতো করে রয়েছে, যেন হাতে কিছু একটা আছে, যার লোভে ঘোড়া এগিয়ে আসছে। ঘোড়া কাছে আসার পর দেখা গেল তার হাতে কিছুই নেই। তখন নায়ক ভাবল, এই

লোকটির কাছে আমি হাদিস নিতে এসেছি যে একটি অবলা পশুর সঙ্গে প্রতারণা করে।

তার মানে এর কাছে হাদিস নেই। এর কাছে যে হাদিস নেই, এটাই হল হাদিস।

প্রশ্ন: মরুস্বর্গ উপন্যাসের ইহুদ নবি, যিনি ‘মুসাপত্নী অখ্যাত নবি’ নামে পরিচিত। পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছে ইহুদ নবি যেন একই সঙ্গে মুসা এবং হুদ নবির মিলিত রূপ, দ্বৈতসত্তা। তাই কি?

উত্তর: একদমই তাই, ইহুদ আসলে হুদ নবির একটি রূপ। এবং মুসার হাতের লাঠির মতোই তার হাতে লাঠি রয়েছে।

প্রশ্ন: উপন্যাসে সাদইদের স্বর্গ ঠিক পুরাকাহিনিতে বর্ণিত পরকালের স্বর্গ নয়, স্বর্গ একটি নগরের সার্থক রূপ নিয়ে উঠে এসেছে বলেই মনে হয়। আপনি কি তাই মনে করেন?

উত্তর: একেবারেই ঠিক। নগর সভ্যতার সবচেয়ে উন্নত রূপই তো স্বর্গ।

প্রশ্ন: আপনার পুরাণ-মিশ্রিত আখ্যানে কিন্তু ক্ষমতার প্রতিস্বর প্রতিষ্ঠিত, স্বরের প্রতিস্বর উঠে এসেছে। ইহুদি পুরাণে ঈশ্বরের সঙ্গে ইয়াকুবের মল্লযুদ্ধের ঘটনা, আজাজিলের সঙ্গে ঈশ্বরের দ্বন্দ্ব, আজরাইলের কান্না, শাদাদ চরিত্রের রূপান্তর। এ বিষয়ে কী বলবেন?

উত্তর: স্বর-প্রতিস্বর এই শব্দবন্ধগুলি তোমাদের গবেষকদের ভাষা, সেইসঙ্গে পণ্ডিতদেরও ভাষা বটে। চমৎকার বিশ্লেষণ। আসলে প্রথম পাপ, যার জেরে ইহুদি, খ্রিস্টান বা ইসলামি পুরাণেই কিন্তু মানুষ সমাজ-বিচ্ছিন্ন। ইদানীং সময়েও দেখবে অজানিত অনুশোচনা বা মনস্তাপ রয়েছে, এটি তার বৃত্তি। আমার উপন্যাসেও দেখবে অকারণ নিজেকে অপরাধী ভাবছে। এটা আমার গল্প-উপন্যাসের একটি থিম। পাপ করেনি তবুও পাপবোধে দগ্ধ। এই অনুশোচনা-বোধ শেক্সপিয়ারের নাটকেও রয়েছে, গ্রিক মিথেও রয়েছে।

আমি: আপনার ‘সিমার’ গল্পই সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। শেষ অবধি কিন্তু তার পাপবোধ দূর হয়নি। তাই নয় কি?

উত্তর: একদমই। একটা বিষয় লক্ষ করবে, এইভাবে মিথোলজির পুনর্নির্মাণ কখনো হয়নি। আধুনিক মানুষের সমস্যার শিকড়ে গিয়ে তার বিশ্বব্যাপ্ত সমগ্রতায় পৌঁছতে চেয়েছে পুরাণ-মিশ্রিত আখ্যানগুলি।

প্রশ্ন: পুরাণের চরিত্রগুলি যেন লেখকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকছে না শেষ পর্যন্ত, নিজেরাই মর্জি মতো এগিয়ে যাচ্ছে। শলোমন বা সাদইদের ক্ষেত্রে যেন এমনই ঘটেছে। আপনার কি মনে হয়?

উত্তর: ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমি লিখতে গিয়ে দেখেছি, আমি কথা শুরু করেছি কিন্তু বাকিটা যেন কোনো এক ‘অন্তর্পুরুষ’ করিয়ে নিচ্ছেন। এই যে ‘অন্তর্পুরুষ’ একে প্রেরণা বলা যায়। *রাজাবলি*-র দ্বন্দ্ব বোঝাতেই চরিত্রটিকে এমনভাবে নির্মাণ করেছিলাম আমি।

প্রশ্ন: আপনার *মরুস্বর্ণ* উপন্যাসে সাদইদের জন্মের মুহূর্তে সমুদ্র তাকে নির্জন দ্বীপে ঠেলে দিয়েছিল, আবার শেষে দেখি সমুদ্র পরম সমাদরে তাকে টেনে নেয়। সমুদ্র কি বিশেষ কোনো মাত্রা নিয়ে এখানে উঠে এসেছে?

উত্তর: আমি রিসেন্ট একটা লেখা লিখছি, সেখানে সমুদ্রের কথা রয়েছে। তাতে সমুদ্রের প্রবৃত্তি নিয়ে লিখেছি। সমুদ্রের প্রবৃত্তি আসলে সে কিছু গ্রহণ করে না। সবই ফিরিয়ে দেয়। সামুদ্রিক প্রবৃত্তিই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

প্রশ্ন: আপনি নিজেই জানিয়েছিলেন— ‘প্রেমের মধ্যে যখন রাজনীতি আসে, তখন সমস্যার সৃষ্টি হয়।’ *অগ্নিবলকা*-র বুলবন-চন্দ্রিমা কিংবা রাহুল-মোহরের সম্পর্কের পরিণতির মধ্যে কি সেটাই দেখাতে চাইলেন?

উত্তর: হ্যাঁ, এটাই দেখাতে চেয়েছিলাম। ওদের সম্পর্কের রাজনীতি এসে কীভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক তছনছ হল, এটা স্পষ্টভাবে দেখাতে চেয়েছিলাম।

প্রশ্ন: *অগ্নিবলকা*-র প্রেক্ষাপট বহরমপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল, জরুরি অবস্থা পীড়িত সাতের দশক নিয়ে যদি কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেন?

উত্তর: তখন কলেজে পড়তাম। ঘোড়াপিরের আস্তানা বলে একটা জায়গায় থাকতাম। আমার *স্পর্শের বাইরে* উপন্যাসে এই ঘোড়াপিরের আস্তানা-র কথা রয়েছে। একজন খাদেম থাকতেন। এইখানে এসে নাসির বলে একজন নিয়ে যেত আমার এক স্যারের বাড়ি। তোমাদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক আব্দুল কাফির বাবা অধ্যাপক আবুল হাসনাত ছিলেন আমার স্যার। নাসির হল আব্দুল কাফির ভাগ্নে। কাফিদের পরিবার না থাকলে আমার জীবনটাই তৈরি হত না। নাসির ‘মা ডেকেছে’ বলে ডেকে নিয়ে যেত। আব্দুল কাফির মা আমাকে খুব যত্ন করে অনেক কিছু খাওয়াতেন। ওঁরা ভাবতেন, এই ছেলেটি একা কীভাবে একটি নির্জন কবরখানার ভেতরে থাকে! আমি তা সত্ত্বেও ওখান থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম, তখন আমার বন্ধু গোলাম হাদি বলল, ‘তুমি যখন চলেই যাব মনস্থির করেছ, তখন তুমি তোমার কবিতার নতুন বইটা *জড় উপড়ানো ডালপালা ভাঙা আর এক ঋতু* এইটা নিয়ে স্যারদের দাও। আর না দেখাতে পারলে হাতে রেখো।’ আমার হাতে বইটি ছিল, ঘোরাঘুরি করছিলাম, হঠাৎ আবুল হাসনাত স্যার বললেন, ‘কে তুমি? এখানে কী চাই?’ আমি উত্তর দিই, ‘স্যার আমি চলে যাচ্ছি। ফিজ দিতে পারিনি ব’লে

চলে যাচ্ছি।’ স্যার বললেন, ‘তোমার হাতে কী ওটা?’ বললাম, ‘আমার লেখা কবিতার বই স্যার।’ আবুল হাসনাত স্যার তখন মহানন্দে সবাইকে ডাকলেন, বাকি স্যারদের ব’লে আমার জন্য কিছু স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। স্যার যদি এটা না করতেন, আমার পড়াশোনা হত না। স্যারের আশীর্বাদ এবং ওঁদের পরিবার না থাকলে কিছুই হত না। পরে আব্দুল কাফির দাদু রেজাউল করিম সাহেবের কাছে গিয়ে গল্প করতাম। দেশ পত্রিকায় একটা বড়ো ইন্টারভিউও করিয়েছিলাম। ওই পরিবারের সঙ্গে আমি নানাভাবে যুক্ত ছিলাম।

আর *অগ্নিবলকা*-য় যা লিখেছি সবই আমার চোখে দেখা। মোহন সিনেমার মোড় বা স্কোয়ার ফিল্ডের ঘটনা এসবই সত্য ঘটনা। গুলি খেয়ে কতজনকে মরতে দেখেছি। আমার উপন্যাসের বুলবন-দোলন তো আমার স্ত্রী সাহানার ভাই এবং বৌদি। সবই আত্মজৈবনিক বলতে পারো।

প্রশ্ন: জীবন কি ঘটনাবহুল হওয়া প্রয়োজন? নাকি শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ?

উত্তর: দু-রকমই হয়। অনেকেই আছেন যাঁদের জীবনে তেমন খুব বেশি ঘটনা নেই, সাদামাটা, একঘেয়ে জীবন, অথচ বড়ো দার্শনিক। তবে ঘটনাবহুল জীবনের একটি রোমাঞ্চ আছে। জীবনানন্দের জীবন কিন্তু খুব বেশি ঘটনাবহুল নয়, অথচ তিনি কত বড়ো কবি। কী সাংঘাতিক অবজারভেশন! আবার তুলনায় শরৎচন্দ্রের জীবন ঘটনাবহুল। বিদেশিদের মধ্যে দস্তয়ভস্কি, টলস্টয় এঁদের জীবনে ঘটনার ঘনঘটা। আসলে ঘটনা দেখা এবং ব্যাখ্যা করার জন্য মনেরও তো প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন: আপনার পুরাণ-মিশ্রিত আখ্যানেই রয়েছে, প্রাচীন মিশরের রাজারা প্রথম আবিষ্কার করেছিল মানুষ হৃদয় দিয়ে চিন্তা করে। আধুনিক যুগেও মন দিয়েই মানুষ সবকিছু বোঝে, যৌক্তিকভাবে যাচাই করে, একজন লেখক হিসাবে এ বিষয়ে কী বলবেন?

উত্তর: এই মন কিন্তু শুরুতে আবিষ্কৃত হয়নি। মন-কে আবিষ্কার করেছিলেন দার্শনিকেরা। মনের খুব ভালো ব্যাখ্যা দিয়েছেন দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট। তিনি বলেছেন, বহির্জগৎ থেকে আমরা যে জ্ঞান পাই, সেই জ্ঞানের সঙ্গে মনও কিছু দান করে। মন-এর একটা নিজস্ব দান আছে। একটা ব্যক্তি-মন কিন্তু অজস্র যুগের ভেতর দিয়ে তৈরি হয়। জিন-বাহিত হয়ে প্রজন্ম-পরম্পরায় মন তৈরি হয়। আজকে এই মন কিন্তু একটি আলাদা সত্তা হয়ে গেছে। ঈশ্বরের মতো সত্তা। অনেক সময় ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী সত্তা বলেও মনে হয়। এই মন একদিনে বিকশিত হয়নি। জন্মের পরেই সব জ্ঞান অর্জন হল এই কথাটিই তো ভুল। তাহলে সে ডারউইনের মতবাদকেও উপেক্ষা করছে। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে বলেছেন, জীবজগতের ইভালুয়েশন যখন থেমে যায়, মানুষের মনের তখন ইভালুয়েশন শুরু হয়। দেহের বিবর্তন থেমে গেল, কিন্তু মনের পরিবর্তন শুরু হল। পশুদের ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি। ইমানুয়েল কান্টের মতো একজন দার্শনিক আসতেই লেগে গেছিল এক হাজার বছর। তাই মানবসভ্যতার ইতিহাস বিভিন্ন যুগের ব্যক্তির রচিত ইতিহাস। সক্রোটাস থেকে আইন্সটাইন— এভাবেই মানব-সভ্যতা এগিয়ে চলেছে।

প্রশ্ন: *অগ্নিবল্যাক*-র শেষ লাইনে রাহুলকে নিয়ে লিখেছেন— ‘অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে একটি অগ্নিকণিকা; তপ্ত, উষ্ণ, কঠিন একটা মানুষ। তার কণ্ঠে জেগে কত গান, অজস্র সুর; সে ছুটে চলেছে ডানায় ভর দিয়ে, ঠোঁটে তার ভালোবাসার বীজ। ঠোঁটে তার শস্যের কণা।’— এরপরেও আমরা দ্বিতীয় খণ্ড পেলাম না?

উত্তর: আসলে যে মতবাদটি ওইভাবে জেগে উঠেছিল তার তো আসলে পুরোপুরিভাবে পৃথিবীতেই মৃত্যু হয়েছে, আদর্শটি তো আর রইল না, ছত্রাখান হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। রাহুলকে নিয়ে এসে আমি কোথায় তুলব? কী করবে সে? অ্যাক্টিভিটি করার জায়গা কোথায়? স্থবির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: চারু মজুমদারের ঘোষিত বক্তব্য মান্য করেননি সমকালীন রাজনীতি, এমনকি পরবর্তী সময়ে ১৯৭২-এ চারু মজুমদার বলেছিলেন— ‘আমাদের সশস্ত্র লড়াই একটা স্তর পর্যন্ত ওঠার পর আমাদের অগ্রগতি থেমে গিয়েছে, আমরা জোর ধাক্কা খেয়েছি।’ এরপরেও ১৯৭৫-তে সেই একই আদর্শ অনুসরণ করে রাহুল-কবিদের লড়াই?

উত্তর: ওই সময় নতুন একটা ঢেউ উঠে এসেছিল আবার। আজিজুল হক ছিলেন তখনকার বড়ো নেতা। আঠারো বছর জেল খেটেছিলেন। আসলে নতুন করে জেগে ওঠা মানে যে কালের বৈগুণ্য ঘটেছে এমন নয়, সময়টাই এইরকম ছিল। তখন মফস্বলকে ঘিরে বেশি করে জেগে উঠেছিল। বিশেষত মুর্শিদাবাদে ধাক্কাটা বড়ো ছিল। অন্যান্য জেলাতেও ছিল। উপন্যাসের চরিত্র মুমতাজ তো বাস্তব চরিত্র। আর মণি চরিত্রটি আমার ভাইয়ের আদলে তৈরি। আমাদের পরিবার তখন খুব সাফার করেছিল। এক দশক সক্রিয় রাজনীতি করেছি। আত্মপ্রক্ষেপ রয়েছে। গণ-ইতিহাসের পাশাপাশি পারিবারিক ইতিহাসও উঠে এসেছে।

প্রশ্ন: স্পর্শের বাইরে উপন্যাসে রুস্তমকে আবুল বাশার ঈশানের বাড়ির ঠিকানা দেয়, ঈশান রুস্তমকে জানায়— ‘ও মুসলমান বলে যাদবপুরে বাসা না পেয়ে সোনারপুর চলে যায়।’ রুস্তম জবাব দিয়েছিল— ‘মুচি মেথর মুসলমান, এ দেশে তিন সমান।’— এ কি কথকের অভিমান না দ্রোহ?

উত্তর: এটা তো প্রায় প্রবচন-এর আকার নিয়েছে। আসলে এটি এমন ঘটনা যা গ্রাম্য ছড়ায় পরিণত হয়েছে। এমন ছড়া যখন প্রচার পায় তখন জানতে হবে এর মধ্যে কিন্তু সত্যতা আছে। ছড়াটি সর্বৈব সত্য আর কী! সমাজ-সত্য। আর ঘর না পাওয়ার কথা আজও কমবেশি সবাই ফেস করে।

প্রশ্ন: যে ঈশান রুইদাস সরীসৃপ থেকে একরকম হাঁটতে শিখে শহরে এসেছিল, এ সমাজ শেষে তো আবার তাকে সরীসৃপ বানিয়ে দিল?

উত্তর: স্পর্শের বাইরে উপন্যাসের নায়ক রুইদাস প্রথম যখন কলকাতায় আসছে, তখন কিন্তু সে তার পদবী রুই-টাকে গ্রামের নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসছে। রুই ভেসে গেল, রইল কেবল দাস। দাস হলে তবু শহরে জায়গা পাবে, কিন্তু রুইদাস হলে তো জায়গাই পাবে না। তারপরেও কিন্তু শহর ওকে প্রত্যাখ্যান করছে, রুইদাস-কে বরণ করে নেওয়ার জন্য সমাজ প্রস্তুত নয়। কেবল ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামি নিয়েই কিন্তু লিখিনি, হিন্দু ধর্মের জাত-বর্ণ বিভাজন নিয়েও লিখেছি। গোঁড়া মুসলিম মৌলবাদীরা ভাবে হিন্দুদের গোঁড়ামি নিয়ে কিছু লিখিনি, কেবল ইসলাম ধর্ম নিয়ে লিখেছি। উপন্যাসের রুইদাস কিন্তু যেখানে মানুষ হচ্ছে, সেখানে মুসলিমদের সংস্পর্শেই বড়ো হয়ে উঠছে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা ঘৃণা করলেও মুসলিমরা কখনো উচ্ছেদ করেনি। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং জায়গা। মুসলিমদের আশ্রয়ে থাকছে রুইদাস। আর পরবর্তীকালে ওর স্ত্রী অপূর্ণা, অপূর্ণা-ই তো, ও পূর্ণ নয়, ওর মধ্যে পারফেকশন আসেনি কখনো। সে যখন ঈশান রুইদাসকে লাথি মারছে তখন কি কেবল স্বামীকে লাথি মারছে? সেই সঙ্গে তার জাতকেও লাথি মারছে।

প্রশ্ন: গল্প-উপন্যাসের নারী চরিত্ররা প্রতিবাদ করছে, অথচ সম্পর্কের বাঁধন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি কেউই। যেমন- নবীনা (ফুলবউ), রাবেয়া (‘নাস্তিক’), শিরিন (‘এক টুকরো চিঠি’), আসমানতারা (‘ডানামেলা বৃশ্চিক’)— বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান ভেঙে কেউই বেরোতে পারল না?

উত্তর: তখন মিডল্ ক্লাসই তৈরি হয়নি, কীভাবে বেরোবে, কে করবে? আর যে পটভূমিতে এগুলি লিখেছিলাম তখন মুসলিমদের শিক্ষার হার ছিল ৬%। এখন বিদ্যালয়-কলেজ গড়ে উঠেছে অনেক, মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে। গল্প-উপন্যাসের পটভূমিতে আলো আসার কোনো উপায় ছিল না। সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হলে আলো আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিছুটা আভাস কিন্তু রয়েছে, পরাস্ত হয়েও কিন্তু তাদের চরিত্র প্রতিবাদী। নিজে হেরে গিয়ে যে যন্ত্রণা জাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু পজেটিভ। নবীনা আত্মবিসর্জন দিলেও এটি একপ্রকার প্রতিবাদ। আপাত হেরে যাচ্ছে অথচ কোথাও একটা ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন: ‘দুই অক্ষরের গল্প’-এর চরিত্র নাজিয়া একটি বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সমস্ত বাঁধন ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল, এমন চরিত্র আরও পেলাম না কেন?

উত্তর: এই গল্পটিতেও কিন্তু বাস্তবের ছায়া আছে। এটি ওই পটভূমিতে বিরল দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি এ গল্পে সিম্বলিজম-এর নতুন একটি চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অক্ষর নিয়ে খেলা।

প্রশ্ন: পুরাণ-মিশ্রিত আখ্যানের নায়িকারাও কিন্তু শেষে একা হয়ে যায়। *মরুস্বর্ণ*-এর রিবিকা বা *রাজাবলি*-র আনাথ— এখানেও সেই ট্রাজিক নারী?

উত্তর: রিবিকা এতই বড়ো, এতকিছু ধারণ করে আছে ওকে, সে তো একাই হবে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যখন বিচ্ছেদ হচ্ছে তখন কিন্তু উট একজন ঋতুমতী নারীকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ যে নারীর বাচ্চা-ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। ইঙ্গিত করছে আবার নতুন পৃথিবী তৈরি হবে। মরুভূমিতে আবার একটি স্বর্গ তৈরি হবে। এখান থেকে ফের শুরু হল রিবিকার অভিযাত্রা। এখানেই পজিটিভিটি রয়েছে। আনাথের ক্ষেত্রেও মিথ ভেঙে বাস্তব ফুঁড়ে উঠেছে। যখন বাস্তব বলা হয় তখন গোটা গল্পটাকেই ভেঙে দেওয়া হয়, যে এর জন্যেই তো এতকিছুর আয়োজন। এটার সঙ্গে মিশে যায় আমাদের চলিষ্ণু বাস্তব।

প্রশ্ন: চর-সীমান্ত এলাকার জনজীবন, সমস্যা-সংকট, চোরা-কারবার আপনার বহু লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে। এ ব্যাপারে যদি কিছু বলেন?

উত্তর: মুর্শিদাবাদের সেখ পাড়া অধ্যুষিত চর এলাকা নিয়েই এগুলি লেখা। আমার বাড়ির সামনের নদীটি হল ভৈরব। আর পদ্মার চর-সীমান্ত এ লেখাগুলির প্রেক্ষাপট। পদ্মার জলে যে হিন্দুরা মাছ ধরে তাদের বলে মালো এবং মুসলিম জেলেদের বলে গুঁড়ি। মালোরা যে সুযোগ-সুবিধা পায় সেগুলি গুঁড়িরা পায় না, এই নিয়ে একটি লেখাও লিখেছি। মুসলমান একটি সম্প্রদায়ের নাম গুঁড়ি, এটাই তো সবাই জানে না। আমি নৌকায় চেপে বহুবার ঘুরেছি ওদের সঙ্গে। একবার ডিঙি নৌকায় গিয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি, নদীর মাঝে একটি বড়ো পাথর দ্বীপের মতো জেগে আছে। আমাকে ডিঙির মাঝি ওইখানে বসতে বলে। আমি বসে পদ্মার স্রোত দেখছি। জলের সঙ্গে মাছও ছুটে যাচ্ছে। প্রকৃতির প্রতি অনবদ্য টান ছোটো থেকেই ছিল। এখান থেকেই লেখাগুলি তৈরি হয়েছিল। *ভোরের প্রসূতি* উপন্যাস নিয়ে তো চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। নায়িকা ‘সিতারা’-র নামেই ছবি মুক্তি পেয়েছে।

প্রশ্ন: আপনার *জল, মাটি ও আগুনের উপাখ্যান*-এও ভারতীয় পুরাণ, শাস্ত্র ও কথকতার সঙ্গে মিশেছে নদী-তীরবর্তী জটিল বাস্তব জনজীবন। নদী ও তার প্রতিহিংসার আগুন যেন একাকার এ আখ্যানে। কী বলবেন?

উত্তর: স্পিরিচুয়ালি- আধ্যাত্মিকতা বলছি না, ভাবগত দিক থেকে এগুলি সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়। এখনও এই বিষয়গুলি নিয়ে মানুষ যেভাবে ভাবছে সেইটা শুনলে সার্থকতা অনুভব করি। অভিষাপের সঙ্গে পাপের সম্পূর্ণতাই এ উপন্যাসে দেখিয়েছি।

প্রশ্ন: টাঙ্গার শহর মুর্শিদাবাদ, বিশেষত লালবাগ শহরের পুরানো রূপটি উঠে এসেছে *সঙ্গদা বাঙ্গ* উপন্যাস বা ‘পথ’-এর মতো গল্পে। ইতিহাস ঘেরা একটি শহরের বদল নিয়ে কী বলবেন?

উত্তর: এই লেখাগুলি সবই আত্মপ্রেক্ষেপ বলতে পারো। ওই টাঙ্গার শহর আর নেই। জীবিকার বদল হয়েছে। কালের নিয়মে বাংলার প্রতিটি স্থানই এইভাবে বদলে যাচ্ছে।

প্রশ্ন: ‘জীবনের কতকগুলি অশ্লীল ঘটনার মোকাবিলা করছিল মিল্লাত’— *ফুলবউ* উপন্যাসের প্রথম বাক্যের ‘অশ্লীল’ শব্দটি নিয়ে গোঁড়াপন্থী মানুষরা আজও সমালোচনা করেন?

উত্তর: এই লাইনটির অর্থ ওরা বুঝতে পারেনি। মিল্লাত শব্দের অর্থ হল ধর্ম। ধর্ম নাম তো হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও হয়, ধর্মদাস যেমন। দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটক *নীলদর্পণ* এর চরিত্র তোরাপ, এটি উর্দু শব্দ। এর মানে হল মাটি। আসলে লড়াইটাই তো ছিল মাটির লড়াই। *ফুলবউ*-এর ক্ষেত্রে আসলে ধর্মের অশ্লীল বা ধর্ম নিজেই কতকগুলি অশ্লীল ঘটনার মোকাবিলা করছিল। আমি অধর্মের কথা বলিনি, ধর্মের কথাই বলেছি। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে, পুরোটা ধর্মেরই লড়াই। যেগুলি ধর্ম-সম্মত নয়, সেগুলি হওয়া উচিত

নয়। চোখে যেটা সুন্দর দেখাচ্ছে না তাকে তো হাদিস বাতিল করছে। এখানে সেই কারণে ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে লড়াইটিকে দেখানো হয়েছে বারবার। যেমনভাবে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগর ধর্মতত্ত্বই ঘাঁটছেন, আমার উপন্যাসেও কিন্তু ধর্মের মধ্যে থেকেই যুক্তি খুঁজেছে। এইজন্য শুরুতেই মৌলবী সাহেবকে খুঁজতে যাচ্ছে, মৌলবীর সাহায্যে সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় কিনা দেখতে যাচ্ছে। ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইছিল না, ধর্ম-সম্মত বিষয়টিকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল। আক্ষেপের বিষয়, এমন বহু লেখাই যাদের নিয়ে লিখেছি তাদের কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না!

প্রশ্ন: ফুলবউ উপন্যাস বা ‘নাস্তিক’ ছোটগল্প যদি আজ লিখতেন তাহলে কি কাহিনির পরিণতি অন্যরকম হত? কেননা ভারত সরকার ‘তালাক’ সম্পর্কিত নতুন আইন প্রণয়ন করেছে।

উত্তর: সরকারি আইন প্রণয়নের দিন খবরে বেরিয়েছিল— ‘জিতে গেল ফুলবউ’। লেখক তো এমনই একটা আইনই চেয়েছিল, সেদিক থেকে ফুলবউ জয়যুক্ত হয়েছে। আইন কেবল যে ইতিবাচকভাবে এসেছে এমন তো নয়, এখন যেটা হয়েছে এর সঙ্গে ঘৃণা মিশেছে, রাজনীতি জড়িয়ে আছে। যার ফলে কিন্তু পুরুষদেরও কোথাও একরকমভাবে বন্দি করা হয়েছে, ফলত ট্রাজেডিটা মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরও গ্রাস করেছে। এখান থেকে একটি নতুন ধরনের গল্প তৈরি হতেই পারে।

প্রশ্ন: শেষ প্রশ্ন— এবিপি আনন্দ-এর ‘যুক্তি-তক্কো’-র একটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আপনি বলেছিলেন— ‘পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে।’ বর্তমান বাংলাদেশ নিয়ে কী বলবেন?

উত্তর: বাংলাদেশে যেটা ঘটেছে সেটা খুব বড়ো ক্ষতি। একটা আন্দোলন পুরোপুরি বিফল হল। মৌলবাদ জেগে উঠলে কখনোই সেটা ভালো নয়। আশা রাখি, অবস্থার পরিবর্তন হবে। বাংলাদেশ একবার গণতন্ত্রের সাধ পেয়েছে, মৌলবাদী শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য জোরালো কণ্ঠস্বর আছে এখনো। তাই ইতিবাচক দিক থেকেই ভাবছি অন্যরকম কিছু একটা ঘটবে।

পরিশিষ্ট - ২
আলোকচিত্র



চিত্র-১: সাক্ষাৎকার গ্রহণের মুহূর্তে কথাকার আবুল বাশার ও গবেষক।



চিত্র-২: কথাকার আবুল বাশারের ‘মরুস্বর্গ’-এ (বাসভবনে)।



চিত্র-৩: কথাকার আবুল বাশারের ‘অটোগ্রাফ’ নেওয়ার মুহূর্তে।



চিত্র-৪: ‘মরুস্বর্গ’-এর সামনে সাহিত্যিক আবুল বাশার ও গবেষক।

আলোকচিত্র: আলোক সরকার

এত্পঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:

- বাশার, আবুল; *অগ্নিবলকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, সপ্তম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৪
- বাশার, আবুল; *আকাশলীনা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৫
- বাশার, আবুল; *আবুল বাশার গল্পসমগ্র*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
- বাশার, আবুল; *আবুল বাশার শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২
- বাশার, আবুল; *ঋষি ও খুকুর উপাখ্যান*, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫
- বাশার, আবুল; *একই বৃত্তে*, প্রজ্ঞা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৮৯
- বাশার, আবুল; *একটি খামে ভরা কাহিনি*, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯
- বাশার, আবুল; *কাগজ মাটির বায়োস্কোপ*, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা জানুয়ারি ২০১৪
- বাশার, আবুল; *চন্দ্রভানু রুইদাস ও নতুন মনসামঙ্গল*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৩
- বাশার, আবুল; *দশটি উপন্যাস* : আবুল বাশার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১১

- বাশার, আবুল; *ধর্মের গ্রহণ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯২
- বাশার, আবুল; *নন্দিনী পাখিরা ও বকুল মুসকান*, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা জানুয়ারি ২০১৪
- বাশার, আবুল; *পাঁচটি উপন্যাস*, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা জানুয়ারি ২০১৪
- বাশার, আবুল; *পানিকয়েদ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে ২০১১
- বাশার, আবুল; *ফুলবউ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, দশম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩
- বাশার, আবুল; *মরুস্বর্গ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, জুন ২০১৬
- বাশার, আবুল; *মহিষ মঙ্গলা কাব্য*, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৩
- বাশার, আবুল; *মাটি ছেড়ে যায়*, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা জানুয়ারি ২০১৪
- বাশার, আবুল; *মাধবসুন্দরী*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৭
- বাশার, আবুল; *মায়ের সঙ্গে খেলা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২
- বাশার, আবুল; *সিয়ার*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০১
- বাশার, আবুল; *রাজাবলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৭

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ:

- আচার্য, অনিল (সম্পাদিত); *সত্তর দশক* - তৃতীয় খণ্ড, অনুষ্ঠাপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২

- আচার্য, অনিল (সম্পাদিত); *সত্তর দশক* - দ্বিতীয় খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২
- আচার্য, অনিল; (সম্পাদিত); *সত্তর দশক* - প্রথম খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২
- আর্মস্ট্রং, ক্যারেন; *জেরুজালেম— এক নগরী তিন ধর্ম* (অনুবাদ মোহাম্মদ হাসান শরীফ), অন্যধারা, ঢাকা, একুশে বইমেলা ২০১৯
- আর্মস্ট্রং, ক্যারেন; *স্রস্টার ইতিবৃত্ত*, (অনুবাদ শওকত হোসেন), রোদেলা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১০
- আর্মস্ট্রং, ক্যারেন; *স্রস্টার জন্যে লড়াই (মৌলবাদের ইতিহাস)* (অনুবাদ শওকত হোসেন), রোদেলা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১১
- আলী খান, আব্বাস; *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা- সপ্তম প্রকাশ জুন ২০১১
- আলী, ইমাম; *মিশরীয় সভ্যতা*, পার্ল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, একুশে বইমেলা ২০১১
- আলী, সৈয়দ আমির; *আরব জাতির ইতিহাস*, (অনুবাদ শেখ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮
- আসিমভ, আইজাক; *পুরাণের কথা* (অনুবাদ শফিউল আলম), সন্দেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১৬
- আহমেদ, শামিম; *বিষাদবিন্দু*, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৩
- ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান; *খোয়াবনামা*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৬
- ইসলাম, নীহারুল; *পিরনানার জ্বিন*, আবিষ্কার, কলকাতা, মার্চ ২০১৮

- ইসলাম, মহম্মদ নজরুল (সম্পাদনা), *হযরত ঈশা (আঃ)-এর জীবনী*, কসমস্ কম্পিউটার্স, ঢাকা, বইমেলা ২০০৫
- ইসলাম, রফিকুল; (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) *বাণী পবিত্র কোরান থেকে*, চারুলিপি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২২
- ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ; *উপন্যাসসমগ্র*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩
- ওয়েলস, এইচ জি; *পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (অনুবাদ সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও মনোজ ভট্টাচার্য), বাতিঘর, ঢাকা, জানুয়ারি ২০২৪
- কবির, এম এইচ; *ধর্ম: ইতিহাস ইহুদিবাদ*, সাউন্ডবাংলা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭
- কামু, আলবের; *দ্য মিথ অব সিসিফাস*, (অনুবাদ উদয়শংকর বর্মা), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৮
- কার, ই এইচ; *কাকে বলে ইতিহাস*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৫
- *কাসাসুল আশ্বিয়া*, (সম্পাদনা তাহের সুরাটি) হোসাইনিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮
- *কোরয়ান শরীফ বঙ্গানুবাদ* (ড. ওসমান গনী অনুদিত), বুক ওয়ে, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ ২০২০
- কোসাম্বি, দামোদর ধর্মানন্দ; *ভারত ইতিহাস চর্চার ভূমিকা*, (অনুবাদ গৌতম চৌধুরী), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০২
- ক্যাম্পবেল, জোসেফ; *মিথের মাঝে বসবাস*, অনুবাদ শামসুদ্দিন চৌধুরী, বর্ণায়ন, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০১৪
- ক্যাম্পবেল, জোসেফ; *মিথের শক্তি* (অনুবাদ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস), বাতিঘর, ঢাকা, মার্চ ২০২২

- খলিল, ড. মোঃ ইব্রাহিম; *বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০২১
- খান, গাজীউল হাসান; *প্যালেস্টাইন এক সংগ্রামের ইতিহাস*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, এপ্রিল ২০১৮
- খান, ফরহাদ; *প্রতীচ্য পুরাণ*, প্রতীক, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২০
- খান, মুহাম্মদ ইনসান আলী; *আল কোরআনের অলৌকিক ঘটনাবলী*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯
- গিলগামেশ কাব্য, (বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা গৌতম বসু), ভাষালিপি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২০
- গুপ্ত, সৌমেন্দ্র কুমার; *চেনা মুর্শিদাবাদ: অচেনা ইতিবৃত্ত*, অমৃতা প্রকাশনী, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৯৬
- গুহ, রামচন্দ্র; *গান্ধী-উত্তর ভারতবর্ষ*, (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, জুন ২০২২
- ঘোষ, জয়দীপ; *তারই কিছু রঙ*, ধানসিঁড়ি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২১
- ঘোষ, প্রভাস; *ভারতের বিপ্লবের স্তর নির্ধারণে সি পি এম, সি পি আই ও নকশালপন্থী-মাওবাদীদের সাথে এস ইউ সি আই (সি)-র পার্থক্য কোথায় এবং কেন*, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট), কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০২১
- ঘোষ, শঙ্খ; *কবিতাসংগ্রহ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৌষ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ
- ঘোষ, শিবদাস; *কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল*, এস ইউ সি আই (সি) অফিস, কলকাতা, মে ২০১৬

- ঘোষ, শুদ্ধসত্ত্ব; *মিথের সাম্রাজ্য সাম্রাজ্যের মহাকাব্য*, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২১
- চক্রবর্তী, রাজকুমার; *ইতিহাসচর্চা নির্মাণ অবিনির্মাণ বিকৃতি*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, নভেম্বর ২০১০
- চক্রবর্তী, সুধীর; *বাউল ফকির কথা*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০২
- চক্রবর্তী, সুধীর; *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৪
- চট্টোপাধ্যায়, তপনমোহন; *যীশুচরিত*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, এপ্রিল ২০২৩
- চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ; *প্রাচীন প্যালেস্টাইন*, অরিত্র, ঢাকা, আগস্ট ২০১৬
- চন্দ, পার্থজিৎ; *মরুপুত্রের দিনরাত*, প্ল্যাটফর্ম, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৪
- চন্দ, পুলক (সম্পাদিত) *নারীবিশ্ব*, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৮
- চৌধুরী, কমল; *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (দ্বিতীয় পর্ব)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ মে ২০১১
- চৌধুরী, কমল; *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (প্রথম পর্ব)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৫
- চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব; *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪
- চৌধুরী, শামসুদ্দিন; *মেসোপটেমিয়ার মিথ*, বর্ণায়ন, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৬
- চৌধুরী, শামসুদ্দিন; *রোমের মিথ*, বর্ণায়ন, ঢাকা, একুশে বইমেলা ২০১১

- জাহাঙ্গীর, ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ, *পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা*, আস সুন্নাহ পাবলিকেশন, বিনাইদহ, ঢাকা, জুন ২০১৬
- জোন্স, ডেভিড; ও কট্রিল, আর্থুর; *দ্য গ্রেট মিথোলজি* (অনুবাদ ড. মনজুর রহমান), সৃজনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৯
- ঠাকুর, জ্যোতির্ময়; (সম্পাদিত), *আরববিশ্বের রূপকথা*, কথাপ্রকাশ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; *গোরা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; *রবীন্দ্র রচনাবলী*, বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৭৪
- থাপার, রোমিলা; *আখ্যানাবলি এবং ইতিহাসের নির্মাণ* (অনুবাদ নূপুর দাশগুপ্ত), প্রথ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৮
- দত্ত, বিজিতকুমার; *বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
- দত্ত, মিলন; *চলিত ইসলামি শব্দকোষ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ২০০৮
- দরবেশ, ইসমাইল; *তালাশনামা*, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১
- দাশ, জীবনানন্দ; *জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ভারবি, কলকাতা, চতুর্দশ মুদ্রণ আগস্ট ২০১৪
- দাশগুপ্ত, অশীন; *ইতিহাস ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯
- দাস, অরূপ কুমার; *সমাজ দ্বন্দ্ব ও বাংলা কথাসাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বইমেলা ২০০৫

- দাস, অরুণকুমার (সম্পাদিত) *গণযুগের দিনপঞ্জি*(১৯৬০-১৯৭৯), প্রথেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০২
- দাস, অরুণকুমার; *ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১২
- দাস, ড. সচ্চিদানন্দ; *বাংলা সাহিত্যে পুরাণ ও পৌরাণিক বাংলা কথাসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫
- নাসরীন, সৈয়দ তানভীর; *তিন তালাক, মুসলিম নারী, আরো কিছু নিবন্ধ*, রত্না প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৭
- নূরানী বাংলা কোরআন শরীফ, মূল আরবীয় উচ্চারণ, অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় টীকাসহ, (অনুবাদ মাওলানা মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম), মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫
- *পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম*, ভারতের বাইবেল সোসাইটি, ২০৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর-৫৬০ ০০১
- পাণ্ডা, বিশ্বজিৎ; *স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম-মানস*, সৃষ্টিসুখ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০২০
- পিন্টু, আশরাফ; *মিথের গল্প*, পাললিক সৌরভ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬
- ফজল, আবুল; *নির্বাচিত প্রবন্ধ আবুল ফজল*, (সম্পাদনা: মাহবুবুল হক), সময় প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৮
- ফজল, আবুল; *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৮
- ফিরদাউস, শাহ্‌যাদ; *অহি-নকুল*, মধ্যমা, ঢাকা, ২০১৫
- ফিরদাউস, শাহ্‌যাদ; *কানানগণ*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

- ফ্রেজার, স্যার জেমস জর্জ; *গোল্ডেন বাউ— মানুষের জাদুবিশ্বাস ও ধর্মাচার বৃত্তান্ত*, (অনুবাদ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস), বিপিএল, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭
- ফ্লয়েড, সিগমুন্ড; *মোজেশ ও একেশ্বরবাদ*, (অনুবাদ সৌরিন নাগ), সন্দেশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু; *ঐতিহাসিক কাহিনি সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, নভেম্বর ২০০১
- বসু, বুদ্ধদেব; *মহাভারতের কথা*, এম সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
- বসু, সজল; *জরুরি অবস্থা আন্দোলন ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতি*, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ২০২২
- বসু, সমরেশ; *মহাকালের রথের ঘোড়া*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৬
- বসু, স্বপন ও চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ; (সম্পাদিত), *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩
- বার্তা, রলাঁ, *মিথলাজি* (অনুবাদ শামসুদ্দিন চৌধুরী), বর্ণায়ন, ঢাকা, একুশে বইমেলা ২০১২
- ব্লক, মার্ক; *ইতিহাস লেখকের কাজ*, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, প্রথম প্রকাশ ২০০৪
- ভট্টাচার্য, অমিত; *মিথকথা*, পারুল প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১২
- ভট্টাচার্য, নবারণ; *হারবার্ট*, উপন্যাস সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

- ভট্টাচার্য, সুকুমারী; *নিয়তিবাদ: উদ্ভব ও বিকাশ*, ক্যাম্প, কলকাতা, জুলাই ১৯৯৪
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী; *প্রবন্ধ সংগ্রহ-৩*, গাঙচিল, কলকাতা, মে ২০১৩
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী; *হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮
- ভুইয়া, আমিনুল ইসলাম, *মিথের পথ*, (জোসেফ ক্যাম্পবেলের সঙ্গে ফ্রেজার বোয়ার আলাপচারিতা) বাতিঘর, চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৯
- মওদুদী, সাইয়েদ আবুল লালা; *রাসায়ন ও মাসায়ন*, আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ২০০৮
- মণ্ডল, ড. সেলিম বক্স; *সত্তরের রাজনৈতিক উপন্যাস*, একুশ শতক, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৬
- মন্টেফিওরি, সাইমন সেবাগ; *জেরুজালেম ইতিহাস*, (অনুবাদ মোহাম্মদ হাসান শরীফ ও মাসুম বিল্লাহ), চারদিক, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪
- মাওলা, এস এম নিয়াজ; *গ্রিক মিথলজি— আদি থেকে অস্ত*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, একুশে বইমেলা ২০২২
- মাওলা, এস এম নিয়াজ; *মিশরীয় মিথলজি— আদি থেকে অস্ত*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, একুশে বইমেলা ২০২২
- মাওলা, এস এম নিয়াজ; *মেসোআমেরিকান মিথোলজি— ওলমেক ও মায়া*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, একুশে বইমেলা ২০২২
- মাওলানা খোন্দকার মহম্মদ বশিরউদ্দিন; *দোজখের আজাব ও বেহেশতের শান্তি*, রহমানিয়া লাইব্রেরি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, প্রকাশকাল ২০০৮
- মাওলানা, হজরত; *মুত্তাখাব হাদীস*, হাফিজিয়া কুতুবখানা, মগরাহাট, আগস্ট ২০১০

- মাহমুদ, ইবনে আবদুল্লাহ; *ইহুদি জাতির ইতিহাস*, ছায়াবীথি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২০
- মাহমুদ, এস এম সুলতান; *তাওরাত ইঞ্জিল ও বাইবেল*, আরাফাত প্রকাশনী, ঢাকা, নভেম্বর ২০১৬
- মাহমুদ, শিমুল; *মিথ-পুরাণের পরিচয়*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, বইমেলা ২০১৬
- মিত্র, গৌরী; *যিগুথ্রিস্ট*, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩
- মিত্র, শাঁওলি; *ইতিহাস, পুরাণ ও আখ্যান*, কারিগর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮
- মিন্দে, সুরঞ্জন; *বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য*, নান্দনিক, কলকাতা, এপ্রিল ২০২৩
- মিয়া, বন্দে আলী; *কোরান ও হাদিসের গল্প*, আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩
- মীর, মোস্তফা; *মিশরীয় পুরাণ*, বর্ণায়ন, ঢাকা, একুশে বইমেলা ২০০৭
- মুখোপাধ্যায়, অনুপম, *খ্রিস্ট*, তবুও প্রয়াস, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২২
- মুখোপাধ্যায়, পবিত্র; *ইবলিশের আত্মদর্শন*, দিবারাত্রির কাব্য, কলকাতা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
- মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী; *উপন্যাসে অতীত : ইতিহাস ও কল্পইতিহাস*, থীমা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩
- মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু; *ঘুণপোকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২
- মৌলিক, সলিল; *ওল্ড টেস্টামেন্ট পরিচয়*, পুনশ্চ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০
- রশিদ, মোহাম্মদ হারুন; *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফার্সি উর্দু শব্দের অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, আগস্ট ২০২৩

- রহমান, আকিমুন; পৌরাণিক পুরুষ, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১
- রহমান, ড. মনজুর; দ্য গ্রেট মিথোলজি, সৃজনী, ঢাকা, নভেম্বর ২০১৯
- রহমান, বজলুর; কোরআন ও সহী হাদিসের আলোকে জান্নাত ও জাহান্নাম, আস-সিরাত প্রকাশনী, রাজশাহী, ডিসেম্বর ২০১৬
- রহমান, হোসেনুর; ইসলাম মৌলবাদ ও মৌলবিবাদ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
- রহমান, হোসেনুর; ইসলাম: বিশ্বমৈত্রী-বিশ্বশান্তি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৌষ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ
- রাউফুন, হাসান; মহানবির যুদ্ধজীবন, শব্দাঙ্গন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২২
- রাণা, সন্তোষ; রাজনীতির এক জীবন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ মে ২০২২
- রায়, অমিত (সম্পাদিত), অন্তরঙ্গ চারু মজুমদার, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, চতুর্থ প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩
- রুন্না, মফিজুর রহমান; পুরাণতত্ত্ব ও মানবমন, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩
- ল্যাম্ব, হ্যারল্ড; দ্য ট্রুসেডস্ দ্য ফ্লেইম অভ ইসলাম, (অনুবাদ শওকত হোসেন), অশ্বেষা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৮
- শরীফ, আহমদ; বাংলার সূফী সাহিত্য, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
- শামসুজ্জামান, মোহাম্মদ; (সংকলিত) কোরান ও হাদিসের দৃষ্টিতে কেয়ামতের আলামত ও ইমাম মাখ্দির আগমন, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৮

- সরকার, মহর্ষি; *জরুরি অবস্থা ও সমকালীন বাংলা সাহিত্য*, সোপান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২১
- *সহীহ বুখারী শরীফ* (অনুবাদ হজরত মাওলানা শামসুল হক, শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ), মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০১৯
- সাংকৃত্যায়ন, রাহুল; *ইসলাম ধর্মের রূপরেখা*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৪৭
- সালিম, মোঃ আদনান আরিফ; *জেরুজালেম*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬
- সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা; *অলীক মানুষ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪
- সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা; *উপন্যাস সমগ্র* (খণ্ড-২), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা, আগস্ট ২০০৯
- সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা; *নানা রসের ৬ টি উপন্যাস*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮
- সেন, অঞ্জন ও সিংহ, উদয়নারায়ণ (সম্পাদিত), *মিথ সাহিত্য সংস্কৃতি*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০১৩
- সেন, কল্পনা; (সংকলন ও সম্পাদনা), *নকশালবাড়ির মেয়েরা*, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, বইমেলা ২০২৪
- সেন, ক্ষিতিমোহন; *হিন্দু ধর্ম*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, মার্চ ২০১৫
- সেন, সত্যেন; *অভিশপ্ত নগরী*, পানগুছি প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯
- সেন, সত্যেন; *পাপের সন্তান*, পানগুছি প্রকাশন, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০২৩
- সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; *জোয়ার ভাটায় ঘাট সত্তর*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯৭

- সেনগুপ্ত, অমিতাভ; *ইহুদিকথা*, রূপালী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫
- সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী; *মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫
- সেনগুপ্ত, পল্লব; *লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫
- সেনগুপ্ত, মল্লিকা; *গদ্য সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৬
- সেনগুপ্ত, সম্রাট; *প্রতিবাদের পাঠক্রম— বাঙালির নকশালবাড়ি-উত্তর প্রতিবাদ ভাবনা ও পার্শ্বের রাজনীতি*, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২২
- সেনগুপ্ত, স্বরাজ; (সম্পাদিত) *সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিবিধ কণ্ঠস্বর*, রেডিয়ান্স পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০১৮
- স্ত্রস, ক্লড লেডি, *মিথ অ্যান্ড মিনিং*, (অনুবাদ প্রিসিলা রাজ), বাতিঘর, চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০২
- স্মিথ, উইলবার; *প্রাচীন মিশরের কাহিনি*, (অনুবাদ শাহেদ জামান), রোদেলা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১৭
- হক, ইনামুল; *ইতিহাস পুরাণ: মিথ ও মিথ্যা*, পত্রভারতী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৪
- হক, ইমানুল; *সাম্প্রদায়িক মন ধর্মনিরপেক্ষ মুখ*, কথাপ্রকাশ, কলকাতা, ২০০৬
- হক, ড. মুহম্মদ এনামুল; *বঙ্গে সুফি প্রভাব*, রায়মণ পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১
- হাসান, খন্দকার মাহমুদুল; *হিব্রু থেকে ইহুদি*, কথাপ্রকাশ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০০

- হিট্টি, ফিলিপ কে; *আরব জাতির ইতিহাস*, আদি মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৯
- হোসেন, মীর মশাররফ; *বিষাদ সিন্ধু*, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা, বইমেলা ২০১৮
- হ্যামিলটন, এডিথ; *মিথলজি* (অনুবাদ এনায়েত রসুল), বিনুক প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ:

- Asad, Talal; *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*, Stanford University Press, California, 2003
- Barthes, Roland; *Mythologies*, The Noonday Press, New York, Twenty Fifth Printing, 1991
- David, Waines; *An Introduction to Islam*, Cambridge University Press, 2005
- Dennis, Geoffrey W; *The Encyclopedia of Jewish Myth, Magic & Mysticism: Second Edition*, Llewellyn Publications, February 2016
- Ginzberg, Louis; *The Legends of the Jews- Volume-2*, Double 9 Books, New Delhi, 2023
- Ginzberg, Louis; *The Legends of the Jews*, Adanson Publishing, 1956
- Goldstein, David; *Jewish Legends*, Chancellor Press, First Edition 1996
- Graetz, Heinrich; *History of Jews*, (Translated by Bella Lowy), Lea and Co Printers, London, 1989
- Kosambi, Damodar Dharmanand; *An Introduction to the Study of Indian History*, Popular Prakashan, Bombay, Reprinted 2008

- Kosambi, Damodar Dharmanand; *Myth and Reality, (Studies in the Formation of Indian Culture)*, Popular Prakashan, Bombay, First Printed 1962
- Lewis, Bernard; *The Middle East: A Brief History of The Last 2000 Years*, Scribner, New York, 1995
- Metcalf, D. Barbara; *Islamic Contestation*, Oxford University Press, 2004
- Montefiore, Simon Sebag; *Jerusalem (A history of the Middle East)*, Weidenfeld and Nicolson, First edition, January 2011
- Mukherjee, Pranab; *The Dramatic Decade: The Indira Gandhi Years*, First published by Rupa publication India pvt. Ltd. New Delhi, India, 2015
- Plato, *The Symposium*, (Translated by W. Hamilton), The Penguin Books, 1956
- *The Holy Bible* (Old and New Testament), The church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City, Utah, USA, 2013
- Toombs, Lawrence E, *The Threshold of Christianity: Between the testaments*, The Westminster Press, Philadelphia, 1985

পত্র-পত্রিকাপঞ্জি

- অধিকারী, রণজিৎ (সম্পাদিত), পূর্ব(অধর্ম- একটি চিন্তাশীল প্রকল্প), ১৪ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৮
- আনন্দ বাজার পত্রিকা, 'রবিবাসরীয়', ২ ডিসেম্বর, ২০১২
- ইউসুফি, এজাজ (সম্পাদিত), লিরিক (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বিশেষ সংখ্যা), বাতিঘর, চট্টগ্রাম, ২০১৬
- চৌধুরী, রাজদীপ সেন (সম্পাদিত), কোরাস সাহিত্য পত্রিকা, (শাহ্‌যাদ ফিরদাউস সংখ্যা), ৪র্থ বর্ষ বিশেষ সংখ্যা, ২০২৩-২০২৪
- জুলফিকার, এন (সম্পাদিত), দীপন, (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা), রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২৩
- দাস, সোমনাথ (সম্পাদিত); সময় তোমাকে (আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মিথ), বিশেষ সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ ২০১১
- ফুয়াদ, আফিফ (সম্পাদিত), দিবারাত্রির কাব্য (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা), এপ্রিল-জুন, ২০০৮
- ফুয়াদ, আফিফ (সম্পাদিত), দিবারাত্রির কাব্য, (সুকুমারী ভট্টাচার্য সংখ্যা), ত্রয়োবিংশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর ডিসেম্বর ২০১৫
- বইয়ের দেশ, ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯, পৃ. ১২৩
- ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত), কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয় ১৩৯৭
- মণ্ডল, নাজিবুল ইসলাম (সম্পাদিত), সমকালের জিয়নকাঠি, (সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশেষ সংখ্যা), জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩

- মিত্র, কুন্তল (সম্পাদিত); *দোতারা*, (বিষয় মিথ), প্রথম বর্ষ, সূচনা সংখ্যা, মার্চ ২০১২
- সরকার, পার্থ (সম্পাদিত); *কারু বাসনা*, প্রথম বছর, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৭
- সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত); *এবং মুশায়েরা* (গল্প ও গল্পকার বিশেষ সংখ্যা), নবম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, শারদীয় ১৪০৯
- সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত); *এবং মুশায়েরা*, (আরব্য রজনী সংখ্যা), নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৪০৯
- স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত), *এবং জলার্ক* (চারু মজুমদার সংখ্যা-২), পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৯-মার্চ ২০১০

অভিধানপঞ্জি

- আকাদেমি বানান উপসমিতি (সম্পাদিত), আকাদেমি বানান অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৫
- দত্ত, মিলন; চলিত ইসলামি শব্দকোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ২০০৮
- রশিদ, মোহাম্মদ হারুন; বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফার্সি উর্দু শব্দের অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, আগস্ট ২০২৩
- সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১

বৈদ্যুতিন তথ্যপঞ্জি (অন্তর্জাল সূত্র)

- <https://roar.media/bangla/main/history/plato-symposiumsoulmate>, Accessed on 18.12.2023 at 1:30 am
- <https://appliedjung.com/the-archetypes-of-the-anima-and-animus/>, Accessed on 23.07.2024 at 11:55 pm
- <https://en.m.wikipedia.org/wiki/TheBuddha>, Accessed on 28.07.2024 at 2:03 am
- https://en.wikipedia.org/wiki/Safa_and_Marwa, Accessed on 28.07.2024 at 1:55 am
- https://archive.roar.media/bangla/history_of_eram-lost-city-of-eram-shaddads-heaven, Accessed on 11.07.2022 at 3:18 am
- <https://archive.roar.media/bangla/main/history/.lost-city-of-eram-shaddads-heaven>, Accessed on 12.01.2022 at 1:43 am
- <https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,941216,00.html>, Historical Notes: The Death of Stalin's Son, Accessed on 02.04.2023 at 1:52 am
- <https://en.m.wikipedia.org/wiki/ZamzamWell>, Accessed on 28.07.2024 at 1:32 am
- <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Madhhab>, Accessed on 27.07.2024 at 4:56 pm
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_India, Accessed on 24.01.2024 at 8:02 pm
- <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Madhhab>, Accessed on 27.01.2022 at 4:47 am
- <https://en.m.wikipedia.org/wiki/.Al-Falaq>, Accessed on 18.01.2022 at 3:03 am

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/2015_Dadri_lynching, Accessed on 20.03.2024 at 11:35 pm
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Imrana_rape_case, Accessed on 18.02.2023 at 1:47 am
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Polygyny_in_Islam, Accessed on 24.01.2023 at 11:37 pm
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ram_Mandir, Accessed on 04.05.2023 at 2:35 am
- https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Stone, Accessed on 05.07.2021 at 2:58 am
- <https://quran.com/en/al-fil>, Accessed on 12.01.2022 at 9:11
- <https://www.britannica.com/topic/Communist-Party-of-India>, Accessed on 24.01.2024 at 10:27 pm
- https://www.milansagar.com/kobi/saroj._dutta/kobi-sarojdutta., Accessed on 17.03.2024 at 2:02 am
- <https://www.silypoint.co.in/post/Saroj-Dutt's-Encounters,-Uttamkumar-and-a-Forgotten-Poem/id/>, Accessed on 17.03.2024 at 2:55 am
- <https://www.silypoint.co.in/post/Saroj-Dutt's-Encounters,-Uttamkumar-and-a-Forgotten-Poem/id/>, Accessed on 24.01.2024 at 3:02 am